আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ. এর
বক্তৃতামালার অমর সংকলন

# খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম



আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ. এর
বক্তৃতামালার অমর সংকলন

# খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম-৯

অনুবাদ
মাওলানা আবু সাকী মাহবুব
মুহাদ্দিস, সম্পাদক ও সাহিত্যিক
ফাযেলে হাটহাজারী

বই ঘর বইঘর
[অভিজাত বইয়ের ঠিকানা]
৪৩ ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
দূরালাপনী : ০১৭১৭৫৫৪৭২৭, ০১৭১১৭১১৪০৯
e-mail: boighorbd@gmail.com, boighor2008@gmail.com
web: www. boighorbd.com

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

ব ই ঘ র

খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম-৯
কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ.

প্রকাশক
ব ই ঘ র -এর পক্ষে
এস এম আমিনুল ইসলাম

© সংরক্ষিত

তৃতীয় প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০১৯

দ্বিতীয় প্রকাশ
জানুয়ারী ২০১৭

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ২০১৬

প্রচ্ছদ
আরিফুর রহমান

কম্পোজ
ব ই ঘ র বর্ণসাজ
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
০১৭১১৭১১৪০৯

মুদ্রণ : মাসুম আর্ট প্রেস
২৬/২ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৪০০ টাকা মাত্র

ISBN : 984-70168-0045-0

KHOTOBAT-E-HAKIMUL ISLAM : Translate by Abu Saki Mahbub
Published by : S M Aminul Islam, BhoiGhor : Islami Tower Ground floor
11/1 Banglabazar, Dhaka-1100 First Edition : November 2016 © by the pablisher

Price : 400 Taka only

# অ।র্প।ণ

যাঁদের স্নেহ-সান্নিধ্যে ধন্য হয়েছে জীবন
যাঁদের দোয়া ও অনুপ্রেরণা আমার
নিত্যদিনের পাথেয়–

মাওলানা আবদুল জব্বার জাহানাবাদী
*মহাসচিব, বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড*

মুফতি মুহাম্মাদ নূরুদ্দীন রহ.
*সাবেক খতিব, জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকাররম*

মাওলানা ইসহাক ফরিদী রহ.
*সাবেক মুহতামিম, চৌধুরীপাড়া মাদরাসা*

–অনুবাদক

# পূর্ব কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حَامِدًا لِلّٰهِ الْعَظِيْمِ وَمُصَلِّيًا عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ. وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম-এর ধারাবাহিক প্রকাশনার নবম খণ্ডটি এখন আপনাদের সামনে রয়েছে, যা হযরত হাকীমুল ইসলাম আল্লামা কারী তৈয়ম রহ.-এর আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের এক অভিনব ও মনোমুগ্ধকর সংকলন। আলহামদুলিল্লাহ, পূর্বের সবগুলো খণ্ডই ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে এবং অকল্পনীয় আন্তরিকতার সাথে সর্বজন সমাদৃত হয়েছে।

হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে দারুল উলুম দেওবন্দের জিম্মদারি আদায়ে। দারুল উলুমের জিম্মাদারী পালনের কারণেই দেশ ভ্রমণ করা জীবনের একটি অংশে পরিণত হয়েছিল। তিনি অর্ধ শতাব্দিরও বেশি সময়ের সফরকে তাবলিগ ও আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্য এবং দারুল উলুম ও আকাবিরে দারুল উলুমের পরিচয় ও পরিচিতির মাধ্যম বানিয়েছিলেন।

এ উদ্দেশ্যে তাকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। যদি ঐ সফরগুলোতে কৃত খুতুবাত ও ওয়াজসমূহকে লিপিবদ্ধ করার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হতো তাহলে বর্তমানে একটা বিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডার, আকাবিরে দারুল উলুমের লিখনিতে আলাদা মর্যাদা অর্জিত হতো। মনে হয় এতটুকু বলা অতিরঞ্জিত হবে না যে, তার সংখ্যা হযরত থানুভী রহ. এর মাওয়ায়েজে আশরাফিয়ার কাছাকাছি অবশ্যই হতো। দারুল উলুমের যে ফাইলসমূহে মুহতামিম হিসেবে হযরত হাকীমুল ইসলামের মাসিক সফরনামা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ হতো তার আলোকে আমরা এতটুকু বলতে পারি যে, দারুল উলুমের আকাবিরদের মধ্য হতে হাকীমুল উম্মত হযরত থানুভী রহ. এর খুতুবাত ও মাওয়ায়েজের পর কোন বুজুর্গের মাওয়ায়েজ লিখিত আকারে এতো পরিমাণ মানুষের দৃষ্টিগোচরে আসেনি যতটুকু হাকীমুল

ইসলামের এসেছে। إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ، يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ

মহান আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে বর্তমান অনুভূতিশীল, পর্যবেক্ষণশীল এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুক্তির যুগে এই খুতবাগুলো আলেম-উলামা ও সাধারণ জনগণের জন্য সমানভাবে উপকারি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আলেম-উলামা ও সম্মানিত খতিবগণ তা থেকে সারাংশ গ্রহণ করে নিজেদের বয়ানকে সুপ্রশস্ত করতে পারেন। আর সাধারণ মানুষেরা তাকে অতি সহজে সংরক্ষণ করতে পারেন। বিশেষ করে আধুনিক উর্দু সাহিত্যের স্বাদ ও উচ্চতর সৌন্দর্য পিয়াসীরা তার বয়ান থেকে তৃপ্তি হাসিল করতে পারেন। সাথে সাথে তার মেধা ও মস্তিষ্কে হযরত হাকীমুল ইসলামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মর্ম উদ্ভাবনের বিশেষ পদ্ধতি বদ্ধমূল হয়ে যায়। তিনি ভারি ভারি কঠিন ইলমি আলোচনাকে অতি সহজ কৌশলে বুঝিয়েছেন, যা অত্যন্ত উপকারি ও ফর্যকর সাব্যস্ত হয়েছে।

প্রকৃত বিষয় হল, মরহুম হাকীমুল ইসলাম রহ. উলুমে কাসেমিয়াকে (কাসেম নানুতুবী রহ.-এর জ্ঞান) উর্দু সাহিত্যের ঐ আচ্ছাদন পরিয়েছেন যা বর্তমান যুগের বাস্তবতাকে সামনে রেখে তৈরি করা হয়েছে। এ জন্যই যখন তার খুতবাগুলো মানুষের সামনে বর্ণনা করা হয় তখন শ্রোতাদের মন ও মস্তিষ্ক তা গ্রহণে প্রস্তুত হয়ে যায়। সম্ভবত এমন বৈশিষ্ট্যের কারণেই খুতুবাতে হাকীমুল ইসলামের ধারাবাহিক প্রকাশনার চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অন্বেষণও বেড়ে চলছে। এ কারণেই অত্র সংকলক বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন যে, হযরত হাকীমুল ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত যে কোনো বয়ান অথবা ইলমি বিষয় পাওয়া গিয়েছে তাকেই একত্রিত করে আহলে ইলমের নিকট পেশ করেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রেখে কিতাবের শেষের দিকে 'ইলম ও হিকমতের উপকারিতা' শিরোনামে এ বিষয়গুলোর সংকলনের ধারাবাহিকতা জারি করেছেন।

বিভিন্ন সমাবেশে আত্মশুদ্ধিমূলক ও তাবলিগী বয়ানগুলো ছাড়াও জুমুয়ার খুতবা দেয়াও তার অভ্যাস ছিল। তাঁর জুমুয়ার বয়ানের ধরন বর্তমান যুগের, বিশেষ করে আমাদের দেশে

প্রচলিত বয়ানের মতো নয়; বরং জুমুয়ার নামায আদায়ান্তে শুধু তার বয়ান শোনার জন্য আন্তরিক তামান্না নিয়ে মানুষ বসত, অতঃপর তার বয়ান হত। বয়ানের আকর্ষণ ও অনুরাগের হালত হত এমন যে, তাতে দারুল উলুমের উলামা, সালেহিন ও তোলাবা ছাড়াও অনেক শহরবাসী শরীক হত।

হযরত হাকীমুল ইসলামের ইনতেকালের পর জামিয়া খাইরুল মাদারিস মুলতান (পাকিস্তান)-এ এক শোক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে দারুল উলুম দেওবন্দের সাবেক উস্তাদ এবং জামিয়া খাইরুল মাদারিস-এর সদরুল মুদাররিসিন শাইখুল হাদীস আল্লামা মুহাম্মদ শরীফ সাহেব কাশ্মিরী রহ. হযরত হাকীমুল ইসলামের জুমুয়ার খুতবার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন–

'সে সময়ে দারুল উলুমে সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ ছিল যে, খাতামুল মুহাদ্দিসিন আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. এর মজলিসে ইলমের ফোয়ারা বয়ে যেতো। হাদীসের সবকে সর্বপ্রকার ইলমের উপর পরিপূর্ণ দক্ষতা ও অভিজ্ঞ চিন্তাধারার এমন সমন্বয় ঘটতো যে, কেমন যেন একই সবকে সমস্ত ইলমি বিষয় পড়ানো হচ্ছে। কোন বিষয় সম্পর্কে সামান্য কিছু বলার প্রয়োজন হয়েছে তো অনিচ্ছাকৃতভাবে সে সম্পর্কে অবিরাম আলোচনা হতে থাকতো। পক্ষান্তরে হাকীমুল ইসলাম কারী তৈয়ব সাহেবের মজলিসে আল্লাহ প্রদত্ত মারেফাতের অবতরণ এমনভাবে হতো যে, দাবি প্রমাণের জন্য দলিল ও তার ব্যাখ্যা শ্রোতাদের মাঝে এক আশ্চর্য মোহাচ্ছন্নতা তৈরি করতো। শ্রোতাদের মনে উদিত বৌদ্ধিক প্রশ্নগুলো দূর হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আধ্যাত্মিকতাও অর্জিত হতো। সাধারণত দর্শন বিষয়ক আলোচনায় শ্রোতাদের মনে নানান খটকা ও প্রশ্নের উদয় হয়; কিন্তু হাকীমুল ইসলামের আলোচনায় আধ্যাত্মিকতা ও যুক্তির চমৎকার সংমিশ্রণ তাদেরকে আত্মিক প্রশান্তি ও প্রফুল্লতা দান করতো। এ জন্যই তার বয়ান থেকে মানুষ মুগ্ধতা ছড়ানো মারেফাতের দৌলত দ্বারা নিজেদের ভাণ্ডার পূর্ণ করে নিতো।'

দারুল উলুম দেওবন্দ ইলমের কেন্দ্রস্থল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের উর্ধ্বে। এ জন্যই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইলম

অর্জনের উদ্দেশ্যে ইলম-পিপাসুরা নিজেদের পিপাসা মেটানোর জন্য উপস্থিত হয় এবং ইলমে কুরআন ও ইলমে নববী দ্বারা সম্মানিত ও সফলকাম হয়ে দারুল উলুম ও আকাবিরে দারুল উলুমের অনুগ্রহ-ধন্য হয়ে ফিরে যায়। মোট কথা, দারুল উলুম নিজস্ব এক জগত তৈরি করে সেখান থেকে মুসলিম মিল্লাতের জন্য অবিরাম ইলমী ও আমলী রসদ বিতরণ করে যাচ্ছে। আর তাঁর নিজস্ব ঝর্ণা আল্লাহর অনুগ্রহে দিন দিন উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। এখানকার আহলে ইলমগণ মানব সেবার এমন হাজারো দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যার নজির বিশ্বজুড়ে কোথাও পাওয়া দুষ্কর।

হযরত হাকীমুল ইসলামের এমন আলাদা প্রসিদ্ধি অর্জন হয়েছে যে, তিনি ইলম অন্বেষণ করার নিয়তে আগত সকলের জন্য ইলমি খেদমত ছাড়াও তাদের প্রয়োজন সম্পর্কিত পার্থিব বিষয়েও সমাধান করতেন। তিনি মানব জীবনের একটা দীর্ঘ ও সুন্দর এবং স্বর্ণপ্রলেপযুক্ত অধ্যায়ও কায়েম করেছেন। সাথে সাথে দারুল উলুমের ভাষ্যকার হিসেবে ইসলামি বিশ্ব ছাড়াও আমেরিকা, আফ্রিকা, ব্রিটেন– এক কথায় মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে তাবলিগে ইলমের বড় বড় খেদমতের দায়িত্ব তিনি আদায় করেছেন।

তার নিম্নের খুতবাগুলো ঐ সকল স্থানের উপদেশ ও নসিহতসমূহের প্রতিলিপি যা কলম ও কাগজ দ্বারা রূপায়ন করে আপনাদের খেদমতে পেশ করছি, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ইলম ও হিকমাতের ভাণ্ডার স্বরূপ।

আল্লাহ তায়ালা স্বর্ণমালা-তুল্য এই খুতুবাতকে তার খতিব, বিন্যাসকারী ও পাঠক মহলের জন্য দীন ও দুনিয়ার দৃষ্টিতে সফলতা ও পরকালের মুক্তির মাধ্যম নির্ধারণ করুন এবং পূর্ণরূপে কবুল করে নিন। আমিন।

**মুহাম্মাদ ইদ্রিস হুশিয়ারপুরী**
সদরে মুদাররিস, মাদরাসায়ে তাহফিজুল কুরআনিল কারীম
ফয়েজ রোড, মুলতান, পাকিস্তান।
২৩ রবিউল আউয়াল ১৪১২ হিজরী
২ অক্টোবর, ১৯৯১ ঈসায়ী

# কালিমাতে তাবাররুক

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِوَلِيِّهٖ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى نَبِيِّهٖ

বারাকাতুস সালফ, হুজ্জাতুল খালফ হাকীমুল ইসলাম হযরাতুল আল্লাম মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তৈয়ব সাহেব-এর মতো ইলমী ও রূহানী ব্যক্তিত্বের নাম যুক্ত হওয়াই মাওয়ায়েজ ও খুতুবাত গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। উলুম ও মারেফাতসম্বলিত এই মর্যাদাপূর্ণ বয়ানসমূহ আহলে ইলম, খতিবগণ, আইম্মায়ে মাসাজিদ, বক্তা ও মুবাল্লিগদের জন্য ইলম ও হিকমতের বিরাট ভাণ্ডার। শিরোনাম যুক্ত করার কারণে বিষয়বস্তু হৃদয়াঙ্গম করা অতি সহজসাধ্য হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ, অত্র কিতাবটি আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুব গভীর দৃষ্টিতে পাঠ করেছি এবং বেশ কিছু স্থানে সংশোধনের জন্য চিহ্ন দিয়েছি।

وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ

আমার স্নেহের মৌলভী হাফেজ কারী মুহাম্মাদ ইদ্রিস [ফাযেলে জামিয়া খাইরুল মাদারিস, মুলতান] সাহেব দিন-রাত অবিরাম মেহনত ও অনুসন্ধান করে এটি সাজিয়েছেন। পরিশেষে আল্লাহ তায়ালার ফজল ও করমে আজ তা কিতাব আকারে পাঠক মহলের সামনে এসেছে। অন্তর থেকে দোয়া করি, আল্লাহ যেনো প্রিয় সংকলকের এই মেহনত ও কুরবানীকে স্বীয় রেজামন্দির মাধ্যম বানান এবং নিজ পক্ষ হতে তাকে অগাধ প্রতিদান প্রদান করেন। সাথে সাথে ইলম ও আমলে, সুস্থতা ও জীবনে বরকত দান করে ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতের সাথে দীনের আরো

অধিক শক্তিশালী ও মজবুত সেবা করার তাওফিক দান করুন আর আমাদের সকলকে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

جَزَاكَ اللهُ يَا إِدْرِيْسَ خَيْرًا

عَلٰى مَا صَنَعْتَ لِأَهْلِ الدِّيْنِ خَيْرًا

بندہ محمد شفیع غفرلہٗ
۱۱-۳-۱۴۱۱ھ

হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ শফী
১১/০৩/১৪১১ হিজরী

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

# সূ চি প ত্র

বয়ান : ১
বুনিয়াদী ইবাদত / ২৭
মৌলিক ইবাদত / ২৯
ইবাদতের দাবি / ২৯
জালাল ও জামাল সিফাতের উৎস / ৩১
জালাল ও জামাল সিফাতদ্বয়ের প্রতিক্রিয়া ও অপরিহার্যতা / ৩২
নামায আল্লাহ্ পাকের বড়ত্বের বহিঃপ্রকাশ / ৩৪
হজ ব্যক্তিগত প্রেমের বহিঃপ্রকাশ / ৩৪
সুন্দর ব্যাখ্যা / ৩৬
আজব (অক্ষমতা) ও ইশকে (প্রেমপ্রীতি)-এর
বাহ্যিক রূপ / ৩৬
যাকাত ও রোযার অবস্থান / ৩৭
নামাযের প্রতিবন্ধক ও তার প্রতিকার / ৩৭
নামাযের ভূমিকা / ৩৯
হজের প্রতিবন্ধক ও তার প্রতিকার / ৪০
ইতেকাফের রহস্য / ৪১
হজের বার্তা বা ঘোষণা / ৪২
ইহরামের হেকমত বা রহস্য / ৪২
প্রেমিকসুলভ কথাবার্তা / ৪৩
তাওয়াফের হেকমত / ৪৩
আরাফাত ময়দানে অবস্থান করার রহস্য / ৪৪
প্রাণ উৎসর্গ / ৪৪
হজের পটভূমি / ৪৫
যাকাত ও রোযা অন্যের উসিলায় ইবাদত / ৪৬
নামায ও হজের মাধ্যকার পরস্পর বিপরীত সম্পর্ক / ৪৭
ইলমী হজ / ৫০
'আয়নায়ে হজ' ও আয়না প্রদর্শনী / ৫১

## বয়ান : ২

নামাযের গুরুত্ব / ৫৩
পূর্ব কথা / ৫৪
বিশ্ব জগতের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য / ৫৫
ইবাদতের পরিপূর্ণ একক / ৫৭
নামাযে কেয়াম দ্বারা বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি উদ্দেশ্য / ৫৯
ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য / ৬১
নামাযী বা নামাযের ফলাফল / ৬১

## বয়ান : ৩

রমযান এবং তার উদ্দেশ্য ও বরকত / ৬৩
স্বভাব বা তবিয়তশুদ্ধি / ৬৪
কল্যাণের ভিত্তি / ৬৫
শূন্যকরণ ও পূর্ণকরণ / ৬৫
সৎকর্মের নেযাম / ৬৭
ঈমান ও আমানত / ৬৯
লজ্জাশীলতা ও বেহায়াপনা / ৭১
আলোচনার সারসংক্ষেপ / ৭২
বির্ ও তাকওয়ার মাধ্যমে বাতেনী পরিবর্তন / ৭২
নফসের দোষ দূর করা ব্যতীত মালেকানার
কল্যাণ স্থিরতা লাভ করে না / ৭৪
ইবাদতি বর্ষের শুরু ও শেষ / ৭৪
মাহে রমযান হলো নেকসমূহের কেন্দ্রীয় যোগাযোগ / ৭৫
আল্লাহ্ ও বান্দার মাঝে বাতেনী সম্পর্ক / ৭৭
পরিপূর্ণ মিলন / ৭৭
কবুলিয়্যাত বা গ্রহণযোগ্যতার স্বীকৃতি / ৭৮
মানবিক উন্নতির পূর্ণতার কেন্দ্রবিন্দু / ৭৮
রোযা ও মাহে রোযার উপকারিতা / ৭৯
সিয়াম ও কিয়ামের পরস্পর সম্পর্ক / ৮০
ঈদের চাঁদ / ৮১
রমযানের পরিশিষ্ট / ৮২
ইবাদতের শুরু বিন্দু সকল ইবাদতকে বেষ্টন করে নেয় / ৮৩
মাহে রমযানের সংখ্যার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া / ৮৪

মাহে রমযান ও হজের মাসগুলোর মাঝে পরস্পর সম্পর্ক / ৮৬
আশেকী, দরবেশী ও মাতলামী / ৮৭
চটকদার উজ্জ্বল-গাম্ভীর্যপূর্ণ সুরতও নিষিদ্ধ / ৮৯
সংসারত্যাগী বেদুঈন / ৮৯
জ্ঞান উৎসর্গ / ৯১
হজের দিনগুলোতে মাহে রমযানের স্মরণ / ৯২
কুরবানীর ঈদের হেকমত / ৯২
জালাল ও জামাল শানের শুকরিয়া / ৯২
নামায ও হজ ইসলামের মৌলিক ইবাদত / ৯৪
ইজতেমায়ী দীন / ৯৫
ইবাদতি বছরের মধ্যবর্তী রোযাগুলোর গুরুত্ব / ৯৬
মাস ও বছরের মাঝে সামঞ্জস্য / ৯৭

## বয়ান : ৪

তাকওয়ার ফযীলত / ৯৯
বাস্তব অবস্থাসমূহ / ১০০
সালফে সালেহীনদের পথ ও তাকওয়ার অসিয়ত / ১০১
তাকওয়ার ফলাফল / ১০১
তাকওয়া বিশ্বশান্তির জিম্মাদার / ১০২
তাকওয়া ব্যতীত শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় / ১০৩
বাতেনী অনাচারও তাকওয়া দ্বারা নির্মূল হয় / ১০৪
তাকওয়া আখেরাতের হিসাব-নিকাশ হতে মুক্তির মাধ্যম / ১০৫
সতর্কতা তাকওয়ার প্রথম ধাপ / ১০৬
তাকওয়ার স্তরসমূহ / ১০৮
তাকওয়া অর্জন / ১০৮
মূর্খরা তাকওয়ার মাকাম সম্পর্কে অপরিচিত / ১০৯
আযমত যতখানি তাকওয়া ততখানি / ১১০
তাকওয়ার সর্বোচ্চ মাধ্যম / ১১১
দারিদ্র্য ও সচ্ছলতা সর্বাবস্থায় তাকওয়া জরুরি / ১১২
অন্তরের অবস্থা অনুপাতে সম্পদ বণ্টন / ১১২
বাতেনী দৌলত / ১১৩
মারেফত শ্রেষ্ঠ সম্পদ / ১১৫
সবর ও শোকর মর্যাদা উন্নতির মাধ্যম / ১১৬

## বয়ান : ৫

ইসলামে ঈদের ধারণা / ১১৯
ঈদ মুসলমানদের সাধারণ সমাবেশ / ১২০
দু-রাকাত নামাযের হেকমত / ১২১
ফিতরা ও কুরবানীর হেকমত / ১২২
ঈদের আত্মা / ১২২
বিশাল সমাবেশ / ১২৩
উভয় জগৎব্যাপী সমাবেশ / ১২৩
ভাগ্যবান জাতি / ১২৪
ঈদ হলো আসল ও বুনিয়াদী বস্তু / ১২৫
সারা বছরের জন্য আলোকময় প্রতিক্রিয়া / ১২৫
ইজতেমায়ী যোগ্যতা অর্জনের কৃতজ্ঞতা / ১২৬
রমযানের হাকিকত / ১২৭
একজন মুসলিম একটি উম্মাহর সমান / ১২৭

## বয়ান : ৬

ভালবাসা ও সাহচর্য / ১২৯
সকল বস্তুর হাকিকত / ১৩০
সমর্থন ও ছিদ্রান্বেষণ / ১৩১
দেহজগতের রাজা / ১৩২
কলব আসল, না দেমাগ আসল / ১৩২
আমলের কেন্দ্র হলো কলব বা আত্মা / ১৩৩
হায়াত নির্ভরশীল কলবের উপর / ১৩৩
মস্তিষ্ক কলবের অনুগামী / ১৩৫
কলবই বাস্তবে উপলব্ধিকারী / ১৩৬
ইসলাহের কেন্দ্র হলো কলব / ১৩৭
কলবের ফতওয়া / ১৩৮
ঈমান সর্বপ্রথম কলবে পতিত হয় / ১৩৯
ইসলামের স্থান / ১৪১
ঈমানের হাকিকত / ১৪১
ঈমানের আলামত / ১৪২
সিদ্দিকী মাকাম / ১৪৩

মহব্বতের আধিক্য / ১৪৪
মহব্বতের আলামত / ১৪৬
শোয়ার সুন্নত তরিকা ও ইচ্ছাশক্তি / ১৪৭
ডান দিক থেকে শুরু করা / ১৫০
আকলের মাপকাঠি / ১৫১
পথের কষ্ট ও আরাম এবং মঞ্জিলে মাকসাদ / ১৫৩
নাজাত কিসের উপর নির্ভরশীল / ১৫৫
মহব্বতের তিক্ততা / ১৫৬
অধিক আদব ও শিষ্টাচার / ১৫৭
সুগভীর ভালবাসা / ১৫৯
মহব্বতের পাত্র / ১৬০
মহব্বতের দাবির প্রমাণ / ১৬০
বড়দের বড় কথা / ১৬১
আমল মিশ্রিত মহব্বত / ১৬২
সর্বকালীন সাহচর্য : নববী সুসংবাদ / ১৬৩
মহব্বত ও খায়েশের সংঘাত / ১৬৩
গোনাহের আত্মপ্রকাশ এবং মহব্বতের দবি / ১৬৪

## বয়ান : ৭

আধুনিক শিক্ষা / ১৬৭
অপার আনন্দ / ১৬৮
অদৃশ্য নির্মাণের নিদর্শন / ১৬৯
ইলমের প্রকারভেদ / ১৬৯
দীনি ইলমের পাশাপাশি জাগতিক ইলমের প্রয়োজনীয়তা / ১৭০
সুরক্ষিত ও শক্তিশালী নেযামের সাক্ষ্য / ১৭০
পূর্ববর্তীদের ফাউন্ডেশনের ওপর পরবর্তীদের নির্মাণ / ১৭১
শরীয়তের হাকিকত ও জগতের বিস্ময়কর
বস্তুসমূহে পরস্পর সম্পর্ক / ১৭১
উভয় ইলমের মূল বিষয়বস্তু / ১৭৩
মঞ্জিলে মাকসুদ ও এই বিশ্বজগতের হাকিকত / ১৭৪
মনুষ্যত্বের সর্বপ্রথম বুনিয়াদ / ১৭৫
মারেফাতে ইলাহী / ১৭৫
সম্মিলিত উদ্যোগ / ১৭৬

শাহের সাহচর্য / ১৭৬
নেসবতের আযমত / ১৭৭

**বয়ান : ৮**

**সৌভাগ্যের মারকাজ / ১৭৮**
শুরুর কথা / ১৭৯
অর্জনকৃত বস্তু পুনরায় অর্জন করা / ১৮০
ভাগ্যবঞ্চিতের অবস্থা / ১৮১
সৌভাগ্যের কেন্দ্রবিন্দু / ১৮১
বুযুর্গদের জায়গা বুযুর্গদের স্থলাভিষিক্ত হয় / ১৮২
ইলহামী বিদ্যাপীঠ / ১৮৩
ইলহামী মুহতামিম / ১৮৪
ইলহামী ছাত্র / ১৮৪
ইলহামী ভিত্তি স্থাপন / ১৮৫
হাকায়েক ও কাইফিয়্যাতের পার্থক্য / ১৮৬
নেসবতসমূহের বাগান / ১৮৬
ইলম বাড়ানো / ১৮৭
ইলমের ধ্যান : সর্বদা একটিই ফিকির / ১৮৮
ইলম ও আমলের সনদ / ১৮৮
ইলম ও ভয়ভীতি / ১৮৯
দিশারী তৈরি হওয়ার কাল / ১৮৯
খুলুস ও মহব্বতের শুকরিয়া / ১৯০

**বয়ান : ৯**

**দারুল উলুম দেওবন্দের স্বাতন্ত্র্য / ১৯১**
যে অভাব পূরণ হবার নয় / ১৯২
অতিথিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা / ১৯৩
দারুল উলুমের ভিত্তিগত বৈশিষ্ট্য / ১৯৩
দারুল উলুমের ছাত্রদের বৈশিষ্ট্য / ১৯৪
ইলম অর্জনের বৈশিষ্ট্য / ১৯৫
দারুল উলুমের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার বিশেষত্ব / ১৯৫
দারুল উলুম দেওবন্দের ওস্তাদগণের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য / ১৯৬
দারুল উলুমের আত্মা / ১৯৭

## বয়ান : ১০

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে দারুল উলুম দেওবন্দ / ১৯৯
স্বাধীনতার আনন্দের পূর্ণতা / ২০০
স্বাধীনতার হিরো যাঁরা / ২০১
শামেলীর ময়দানের ক্ষতিপূরণ / ২০২
সরকারি প্রভাবমুক্তির কৌশল / ২০২
শামেলী যুদ্ধের দিক পরিবর্তন / ২০৩
স্বাধীন নেযাম স্থায়ীকরণের ফয়সালা / ২০৪
নীরব রাহবার আট উসূল / ২০৫
এমন কিছু উসূল যার উপর এই মাদরাসা ও অন্যান্য মাদরাসার
চাঁদার ভিত্তি প্রতীয়মান হয় / ২০৫
জনতার প্রতিষ্ঠান এবং তাদের সাথে সম্পর্ক / ২০৭
সরকারি অনুদানের বিকল্প / ২০৮
বিশেষ ব্যক্তিবর্গের মনোরঞ্জন / ২০৯
ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক একতা / ২১১
বিশ্বজনীন বিপ্লবের মানসিক প্রস্তুতি / ২১১
আধ্যাত্মিকতা ও আখলাকের মাধ্যমে আযাদীর মঞ্জিল / ২১২
সরকারি অনুদান গ্রহণ না করার হেকমত / ২১৪
পুঁজিবাদ ধ্বংস করা / ২১৫
তানযীমে মাদারিস স্বাধীনতার প্রথম ইট / ২১৬
জমিয়তে উলামার প্রেক্ষাপট / ২১৭
জাতির হৃতমর্যাদা পুনরুদ্ধারের মৌলনীতি / ২১৮
জনতার শক্তির উত্থান / ২১৯
সহজ পন্থায় বিপ্লবের মানসিক চিত্র / ২২০
ইউরোপের পর্যবেক্ষণে হযরত নানুতুবী রহ.-এর
উসূলের মূল্য ও মূল্যায়ন / ২২১
স্বাধীনতার অগ্রসেনানীর চূড়ান্ত প্রভাব / ২২২
১৯৪৭ সালের ইনকিলাবে প্রথম সারির হিরো যারা / ২২৩
শরয়ী আদালত প্রতিষ্ঠা / ২২৪
দারুল উলুমে কারিগরি ও প্রকৌশল বিভাগ চালু করার উদ্দেশ্য / ২২৪
দারুল উলুমের মাধ্যমে 'হিন্দু-মুসলিম'-এর উত্থান / ২২৫
দারুল উলুম আন্তর্জাকিতার উপাদান / ২২৫

জাতিকে সুসংগঠিত করার নতুন কাঠামো / ২২৬
দারুল উলুম প্রতিষ্ঠার মূল প্রেক্ষাপট / ২২৮
স্বাধীনতার মূলনীতির বিশ্বস্ত ব্যক্তিত্ব / ২২৮

## বয়ান : ১১

আকাবিরে দেওবন্দ এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা / ২৩০
সুস্বাদু ফল অর্জনে মুবারকবাদ / ২৩১
আকাবিরে মিল্লাত ও স্বাধীনতার জিহাদ / ২৩২
দারুল উলুমের শায়খুল হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী / ২৩৩
ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রচেষ্টা শুরু করেছে মুসলমানরা / ২৩৪
ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বিশ্বব্যাপী প্রভাব / ২৩৫
ভারতবাসী মুসলমানদের ভবিষ্যৎ / ২৩৫
হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া / ২৩৫
নতুন হিন্দুস্তানে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা / ২৩৬

## বয়ান : ১২

পাকিস্তানের কথা / ২৩৭
পূর্বকথা / ২৩৮
অনেক বড় মুনাফা / ২৪১
পাকিস্তান সফরের উদ্দেশ্য / ২৪২
পৃথিবীজুড়ে দীনি অধঃপতন / ২৪২
সংশোধনের দায়িত্ব / ২৪৩
পাকিস্তানে যে সকল ফেতনা প্রকাশ পেয়েছে / ২৪৪
ফেতনা বন্ধের উপায় ও উপকরণ / ২৪৫
ইসলাহী কর্মে ভারত-বিভক্তির প্রভাব / ২৪৫
অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক গুণ / ২৪৬
স্বনির্ভরতার ঘোষণা / ২৪৭
আমলে সততার প্রভাব / ২৪৭
দারুল উলুম দেওবন্দের মর্যাদা / ২৪৮
হযরত মাদানী রহ.-এর রূহানি হস্তক্ষেপ / ২৪৯
উসমানী জামা / ২৪৯
শুকরিয়া জ্ঞাপন / ২৫০

বয়ান : ১৩
ইসলামী শাসন / ২৫১
আনন্দ দিবস / ২৫২
ইসলামের বুনিয়াদ / ২৫৩
আকাঈদ বা বিশ্বাস / ২৫৩
ইবাদত / ২৫৪
আখলাকিয়্যাত / ২৫৫
মুয়ামালাত / ২৫৬
ইজতিমাইয়্যাত / ২৫৬
দার্শনিকদের ইসলামী খেদমত / ২৫৭
আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের দীনি খেদমত বা অবদান / ২৫৭
ভিন্ন ভিন্ন বিতরণকেন্দ্র / ২৫৮
ফুকাহায়ে ইসলাম ও তাঁদের শিষ্টাচার / ২৫৯
ইমাম শাফিয়ী রহ. / ২৬০
ইমাম মালেক রহ. / ২৬০
ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. / ২৬৩
উরাফায়ে ইসলামের দীনি খেদমত / ২৬৪
উমারায়ে ইসলামের খেদমত / ২৬৪
খুলাফায়ে ইসলামের দীনি খেদমত / ২৬৫
খলিফাদের কর্মপদ্ধতি / ২৬৫
শানে নবুওয়াতের হেফাজতকারীদের সম্মান
প্রদর্শন আবশ্যক / ২৬৭
ইমাম বা নেতা ছাড়া একতা সম্ভব নয় / ২৬৯
শ্রবণ করা ও পালন করা / ২৭০
আমিরের দায়িত্ব / ২৭১
মজার একটি কাহিনী / ২৭২
সর্ববিষয়ে একতার বিধান / ২৭৪
দলিলভিত্তিক ইখতেলাফ দূষণীয় নয় / ২৭৫
ঝগড়ার আমীন / ২৭৬
মাসয়ালার আড়ালে ভিতরগত রাগ প্রকাশ / ২৭৭
ঐক্যবদ্ধকরণের উদ্দেশ্য / ২৭৮
সামাজিক ও পারিবারিক মুয়ামালাতে আমির নির্ধারণ / ২৮১
আমির হওয়ার অধিকার / ২৮১
সত্তাগত আনুগত্য ও গুণগত আনুগত্য / ২৮২

আমিরের আনুগত্যের মানদণ্ড / ২৮৫
যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ / ২৮৫
অবাধ্যতা ঐক্য নষ্টের কারণ / ২৮৭
আমির হওয়ার জন্য কিছু বুনিয়াদী শর্ত / ২৮৮
ইসলামী হুকুমাত না থাকলে মুসলিমদের করণীয় / ২৮৮
আমির নির্বাচনে সমষ্টিগত জীবন লক্ষণীয় / ২৮৯

**বয়ান : ১৪**
**উপদেশ দানকারী / ২৯১**
উপকার শুধু আমল দ্বারা-ই হয় / ২৯২
আকল, ফিকির ও নজর সবচেয়ে বড় উপদেশদাতা / ২৯৩
মৃত্যু এক নীরব উপদেশদাতা / ২৯৪
দৈনন্দিনের বক্তা / ২৯৬

**বয়ান : ১৫**
**শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করা / ২৯৭**
মৃত্যুর পেয়ালা / ২৯৮
মর্যাদার পার্থক্য / ২৯৯
অনুগ্রহ হারানোর বেদনা / ২৯৯
সুস্থ স্বভাবের মানুষ / ৩০০
স্বচ্ছ ও সুন্দর মনের অধিকারী / ৩০১
দীনি গ্রহণযোগ্যতা / ৩০২
আকাবিরদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা / ৩০৩
ভিন্ন ধরনের গ্রহণযোগ্যতা / ৩০৪
প্রথাগত ক্রন্দন ও শোকগাথা / ৩০৫
মৃত ব্যক্তির জন্য আরামদায়ক বস্তু পাঠানো / ৩০৫
সহজ ইসালে সাওয়াব / ৩০৬
মৃত ব্যক্তির ভালো গুণাবলির আলোচনা / ৩০৬
মরহুমের রেখে যাওয়া স্মৃতি / ৩০৭

**বয়ান : ১৬**
পূর্ণাঙ্গ ধর্ম / ৩০৯
পূর্ণাঙ্গ ধর্ম / ৩১১
দলভিত্তিক সমন্বয় / ৩১২
দারুল উলুমের সমন্বয়ের অবস্থা / ৩১২
বেফাকুল মাদারিস / ৩১৩
ইলম ও হিকমতের উপকারিতা / ৩১৪
নিয়ত ভালো হলেই হারাম জিনিস হালাল হয়ে যায় না / ৩১৪
শরয়ী কাজেই ভাল নিয়ত গ্রহণযোগ্য / ৩১৫
আমলে সালেহের দুটি বুনিয়াদ / ৩১৬
শিরক ও বিদয়াতের বুনিয়াদ / ৩১৭
জাতির চরিত্র হেফাজত করা / ৩১৮
চরিত্রের অন্ধকার / ৩১৯
জাতির সেবা বৈধ পন্থায় হওয়া উচিত / ৩১৯
হারাম বস্তুতে নিরাময় নেই / ৩২০
পরিবর্তিত প্রক্রিয়া / ৩২১
স্বশিক্ষা গ্রহণযোগ্য নয় / ৩২১
মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে সুদী লেনদেন / ৩২২
দারুল হরবের আড়ালে সম্পদ সঞ্চয় করা / ৩২৩
সুদ নিয়ে চিত্তাকর্ষক বাহাস / ৩২৪
কওমের হামদর্দী শরীয়ত মোতাবেক হওয়া উচিত / ৩২৫
দলিল ও হুজ্জত হলো দীনের সীমারেখা / ৩২৫
ইসমতের স্তর / ৩২৬
পাপের উৎপত্তিস্থল / ৩২৭
শয়তানের পাপ ও হযরত আদম আ.-এর পদস্খলন / ৩২৮
অভিশপ্ত ইবলিসের প্রতারণা / ৩২৯
ইজতেহাদী ভুল ও ইসমতে আদম আ. / ৩৩১
পদস্খলন ও গোনাহের পার্থক্য / ৩৩১
নাবালকের ইসমত / ৩৩২
নবী-রাসূলদের ইসমত / ৩৩৩
ইসমতে আম্বিয়া ও ইসমতে নাবালেগের পার্থক্য / ৩৩৪
বিস্ময়কর ঈমান / ৩৩৪

বাধ্যতামূলক ইসমত / ৩৩৫
আউলিয়াদের গোনাহ থেকে হেফাজত / ৩৩৬
হযরত শিবলী রহ.-এর নসিহতপূর্ণ ঘটনা / ৩৩৭
অলীদের গোনাহ হতে হেফাজত থাকার মাধ্যম / ৩৩৯
নবীদের ইসমতের কারণ / ৩৪০
অলীদের থেকে গোনাহ প্রকাশ তাকওয়া বিরোধী নয় / ৩৪১
ইসমতের মাকাম ও শয়তান / ৩৪৩
অলীদের হেফাজত ও শয়তান / ৩৪৩
সারকথা / ৩৪৪
হুকুমের গোলামের নিকট রহস্য প্রকাশ হয় / ৩৪৪
কাফেরদের নাবালেগ সন্তানরা জান্নাতি না জাহান্নামি / ৩৪৬
অধিকতর নিরাপদ মাযহাব / ৩৪৮
জন্মনিয়ন্ত্রণ / ৩৪৮
বিশেষ মুহূর্তে ভিন্ন হুকুম / ৩৪৯
সুপরিকল্পিত বিশৃঙ্খলা দ্বারা রুটির হেফাজত হয় / ৩৫০
সম্পদের সুষম বণ্টন না থাকায় / ৩৫১
পুঁজিবাদীদের বিপত্তির কারণ / ৩৫২
অধিক সন্তান গ্রহণে পুরস্কার / ৩৫২
বিশেষ মুহূর্তে অনুমতি / ৩৫৩
হাকীমুল ইসলাম আল্লামা কারী মুহাম্মাদ তৈয়ব সাহেব
কাসেমী রহ.-এর সাক্ষাৎকার / ৩৫৪
দারুল উলুমের ভবিষ্যৎ / ৩৫৪
মহব্বতের কারণে হাজারো কুধারণা / ৩৫৫
দীন সংস্কারের সফল ময়দান / ৩৫৬
কৌতুকমিশ্রিত শেকায়েত / ৩৫৭
তিনটি বড় কাজ / ৩৫৯
দারুল উলুমের প্রাণশক্তি / ৩৬১
ইসলাহে মুয়াশারায় এবং ইসলামী খেলাফত / ৩৬১
আফগানিস্তানের সাথে সুসম্পর্ক / ৩৬২
তুর্কীদের সাথে সম্পর্ক / ৩৬৩
ইংরেজ আমলে বিচারালয় প্রতিষ্ঠা / ৩৬৪
তাহাফফুজে খেলাফত এবং ইসলামী বন্ধনের সুরক্ষা / ৩৬৫
হযরত নানুতুবী রহ.-এর ইলমী শান হলো সংস্কার / ৩৬৬
উলুমের উচ্চতা ও উলুমের গভীরতা / ৩৬৭

আপনার জীবনী সম্পর্কে কিছু বলুন / ৩৬৯
জন্মের পূর্বের ঘটনা / ৩৬৯
হযরত হাকীমুল ইসলামের বিসমিল্লাহ / ৩৭০
অতি আদর-সোহাগ / ৩৭১
মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ / ৩৭১
ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অধঃপতনের কারণ / ৩৭৩
দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা / ৩৭৪
উচ্চ শ্রেণীর লোকদের সংশোধনের পদ্ধতি / ৩৭৫
হুকুমত থেকে কাজ নেওয়ার পদ্ধতি / ৩৭৬
প্রশাসন ও দীনদারদের মাঝে দুরত্ব দূর করার প্রস্তাব / ৩৭৮
গঠনমূলক প্রক্রিয়ায় ইসলাহ্ বা সংশোধন / ৩৭৯
রাসূলুল্লাহর ওয়ারিশ / ৩৮১
দারুল উলুমের উন্নতি / ৩৮১

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

# বয়ান : ১

## বুনিয়াদী ইবাদত

সর্বপ্রথম প্রদর্শনী হলো বিনয় ও প্রার্থনার, যা হয়ে থাকে নামাযের আকৃতিতে। আর দ্বিতীয় প্রদর্শনী হলো প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার, যা প্রকাশ পায় হজের আকৃতিতে। এ জন্যই এ দুটি ইবাদতকে ইসলামের ভিত্তি ও বুনিয়াদ বানানো হয়েছে। যেহেতু আল্লাহ তায়ালার সকল গুণ দুই শ্রেণীর (জালাল ও জামাল) সিফাতের মধ্যে একত্র করা হয়েছে। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালার হকসমূহ আদায় করা সম্ভব যদি তাঁর এ দুই শ্রেণীর গুণাবলির হক আদায় করা যায়, যার খসড়া প্রস্তুত করার জন্য নামায ও হজের কর্মসমূহকে রাখা হয়েছে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ• تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

## মৌলিক ইবাদত

সম্মানিত উপস্থিতি! ইসলাম ধর্মে বুনিয়াদী ইবাদত হলো দুটি, যার উপর পূর্ণ ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে। ১. নামায ২. হজ। কারণ, আল্লাহ তায়ালার অগণিত গুণকে যদি মৌলিকভাবে একত্র করা হয়, তাহলে এই দুই শ্রেণীর সিফাতে একত্রিত করা হয়েছে বলে দেখা যায়। একটি হলো জামালি গুণ আর অপরটি জালালি গুণ।

## ইবাদতের দাবি

আল্লাহ তায়ালার জামাল সিফাত হলো স্নেহ ও দয়ার্দ্রতার সিফাত। যেমন– রহমত ও করুণা, ক্ষমা ও মহত্ত্ব, সহনশীলতা ও ধৈর্য, সৃষ্টি ও রিজিকদান, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ, পথপদর্শন ও হিদায়াত, ক্ষমা ও সহনশীলতা, দান ও বদান্যতা, পুরস্কার ও ইহসান, সাহায্য ও সহযোগিতা প্রভৃতি। আর জালাল

সিফাতগুলো হলো প্রতিশোধমূলক সিফাত। যেমন– ক্রোধ ও শাস্তি, উগ্রতা ও নিষ্ঠুরতা, পাকড়াও ও প্রতিশোধ, প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ, ইজ্জত ও শ্রেষ্ঠত্ব, মালেকানা ও আধিপত্য, রাজত্ব ও শাসনক্ষমতা, বিলুপ্তিকরণ ও নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি। কুরআনে কারীম আল্লাহ তায়ালার এ দুই শানের দিকে যার অধীনে এ দু-ধরনের গুণাবলি রয়েছে বা এসেছে এই ব্যাপক অর্থবোধক ও অলৌকিক শব্দাবলি দ্বারা ইশারা করেছে–

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

কত পুণ্যময় আপনার পালনকর্তার নাম, যিনি মহিমাময় ও মহানুভব। *[আর রহমান ৫৫:৭৮]*

জালাল সিফাতের অধীনে প্রতিশোধ ও ক্রোধমূলক গুণাবলি এসে যায়। আর ইকরাম সিফাতের অধীনে, স্নেহ ও দয়ামূলক গুণসমূহ এসে যায়।

একস্থানে মহান আল্লাহ প্রকাশ্যভাবে এ দুই শান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ

আপনি আমার বান্দাদের জানিয়ে দিন, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু এবং এও জানিয়ে দিন যে, আমার শাস্তিই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। *[হিজর ১৫:৪৯-৫০]*

অন্য একস্থানে বলেছেন–

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ

পাপ ক্ষমকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা ও সামর্থ্যবান। তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। *[গাফির ৪০:৩]*

একস্থানে জামাল সিফাতের কর্মগুলো বর্ণনা করা হয়েছে–

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। *[যুমার ৩৯:৫৩]*

আর তারপরেই জালাল সিফাতের কর্মগুলোর আলোচনা করেছেন–

وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ

এবং তাঁর আজ্ঞাবহ হও তোমাদের নিকট আযার আসার পূর্বে;

তারপর তোমরা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না।

এমনিভাবে একস্থানে স্নেহ ও দয়া গুণের অধীনে আশান্বিত থাকতে বলেছেন এবং নিরাশাকে খতম করতে বলেছেন–

إِنَّهُ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ

নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত হতে কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না। *[ইউসুফ ১২:৮৭]*

এবং সিফাতে কাহম (ক্রোধ ও রাগ) এর অধীনে ভীতিহীন হতে বারণ করা হয়েছে–

فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُوْنَ

এবং আল্লাহর পাকড়াও থেকে তারাই নিশ্চিত হতে পারে, যাদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসে। *[আরাফ ৭:৯৯]*

## জালাল ও জামাল সিফাতের উৎস

একস্থানে জালাল ও জামাল উভয় সিফাতের উৎস সম্পর্কে অবগত করা হয়েছে যে, ক্রোধ ও প্রতিশোধ সিফাতের মানশা হলো অপরাধ আর স্নেহ ও দয়া সিফাতের মানশা ঈমান–

فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ أَجْرَمُوْا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ

তারপর যারা পাপী ছিল, তাদের আমি শাস্তি দিয়েছি। আর মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। *[সূরা রূম ৩০:৪৭]*

আর অন্যস্থানে প্রথমে রহমত শানের অধীনে ভাল কাজের জন্য পুরস্কারের কথা বলেছেন। আর তার সাথে সাথে গজবের শানের অধীনে খারাপ কাজের জন্য শাস্তি ও প্রতিশোধের কথা বর্ণনা করেছেন–

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَّوْمَئِذٍ آمِنُوْنَ ○ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ

যে কেউ সৎকর্ম নিয়ে আসবে, সে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে এবং সেদিন তারা গুরুতর অস্থিরতা থেকে নিরাপদ থাকবে। এবং যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাকে অগ্নিতে অধঃমুখে নিক্ষেপ করা হবে। *[সূরা নামল ২৭:৮৯-৯০]*

মোটকথা, কামাল সিফাতের এ দুটি বুনিয়াদী শ্রেণীর সিফাত, যাদের অধীনে আল্লাহ তায়ালার সকল সিফাতের সমাবেশ ঘটে। জালাল ও জামাল এবং মহর (দয়া) ও কহর (ক্রোধ)। জামাল সিফাতের উৎসস্থল হলো রহমত আর জালাল সিফাতের উৎসস্থল গজব (ক্রোধ)। এ জন্য আল্লাহর সত্তায় রহমতও রয়েছে আবার গজবও (ক্রোধ) রয়েছে। রহমতের শানের কারণে দয়া করেন, অনুগ্রহ করেন আর গজবের কারণে সতর্ক ও পাকড়াও করেন। আর এ কথা তো স্পষ্ট যে, বান্দাদের জন্য দুপ্রকার গুণই প্রয়োজন। কারণ, সৃষ্টিজীব ভাল ও মন্দ উভয় বস্তু দ্বারা ঘটিত। বান্দার ভাল কর্ম আল্লাহর রহমতকে আকর্ষণ করে আর তার মন্দ আল্লাহর গজব (ক্রোধ) টেনে আনে। আর এ কথা তো সবার জানা যে, এ দু-ধরনের বস্তুর সংমিশ্রণ বা সমাবেশ ব্যতীত প্রভুত্ব ও প্রতিপালনের কারখানা চলতে পারে না। মা একদিকে যেমন সন্তানকে স্নেহ করে, আদর করে, অপরদিকে তা থেকে ফিরে তাকে চড়ও মারে। কেননা, নরম ও গরম উভয়ের মিলনেই তারবিয়াত বা দীক্ষা হয়, প্রতিপালন হয়–

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ

বরং তার উভয় হাত (অনুগ্রহের হোক বা ক্রোধের) উন্মুক্ত। তিনি যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন। *[মায়েদা ৪:৬৪]*

## জালাল ও জামাল সিফাতদ্বয়ের প্রতিক্রিয়া ও অপরিহার্যতা

এ দুটো শান যেহেতু একটি অপরটির বিপরীত, এ জন্য তাদের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া, দাবি-দাওয়া এবং চাওয়া-পাওয়াতেও বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। সিফাতে জামাল অর্থাৎ মহর (দয়া) ও লুত্ফ (মেহেরবান)-এর কুদরতি প্রভাব হলো এমন সম্প্রীতি, মহব্বত, প্রেম-প্রীতি, কৃতজ্ঞতা ও আসক্তি যে, বান্দা অনুগামী হয়ে যায়, নত হয়ে যায়, প্রেমপ্রীতি ও ভালবাসায় মাতাল হয়ে পড়ে, নিজ ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে ফেলে, মিটিয়ে দেয়, নিজস্ব কোন ইচ্ছা থাকে না, থাকে না কোন ধরনের চাহিদা, নিজের প্রতি লক্ষ্য থাকে না, থাকে না নাম-দামের প্রতি ভ্রূক্ষেপ, আত্মা যাদুগ্রস্ত ও চলন-পঠন বিপদগ্রস্তের মতো হয়ে পড়ে। শারীরিক দুর্বলতায় নিজের ভিতরগত হুশ থাকে না, থাকে না কোন জোশ। সারাক্ষণ দৃষ্টির কেন্দ্রবন্দি এবং অন্তরের কামনা-বাসনা হয় তার মাহবুব বা প্রেমিক। তার আসক্তির কারণে তাঁর দিকে দৌড়ান। শয়নে-স্বপনে তাঁর ধ্যান-খেয়াল ও কল্পনায় জাদুগ্রস্ত, মাতাল থাকে। এমনটিই জামাল সিফাতের কুদরতি দাবি।

আর সিফাতে জালাল অর্থাৎ কহর (ক্রোধ) ও গজব (রাগ)-এর কুদরতি প্রভাব-প্রতিক্রিয়া হল ভয়-ভীতি, চিন্তা, পরাজয়, লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া যে বান্দা সারাক্ষণ ভয়াতুর, কম্পিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে, গর্দান নিচু থাকে, নাসিকা নিম্নমুখী হয়। শাহেনশাহের দরবারে (মসজিদে) উপস্থিত হলে তখন দৃষ্টি থাকে শরীরের অঙ্গগুলোর আদবের প্রতি, যবান থাকে বন্ধ, চলাফেলায় থাকে নীরবতা ও নিঃস্তব্ধতা। আর চেহারার ভয়-ভীতির ভাব পকাশ পায়। আদবের কারণে ডান পা আগে আর বাম পা পরে প্রবেশ করে। দাঁড়ানো হয় হাত জোড় করে ও বাঁধা অবস্থায়। বসলে উরু বিছিয়ে বসে। দাঁড়ালে ও হাঁটা-চলা করলে নীরবতা ও নম্রতার সাথে হয়। দৌড়-ঝাঁপ, লাফালাফি, নাচানাচি হয় না। সারাক্ষণ নীরবতা ও গম্ভীরতার মাঝে ডুবে থাকে এবং জোশের সাথে হুশও থাকে। প্রতিটি ওঠা-বসা ও চাল-চলন এবং অবস্থান ও কর্মে আদব ও অধম-অধম ভাব, তুচ্ছতা, নমনীয়তা, বিনয় ও প্রার্থনার আবেদন থাকে।

সারকথা এই যে, সিফাতে কহর ও জালাল চায় আল্লাহর বান্দা তাঁর সামনে ভীত-সন্ত্রস্ত ও আতংকের সাথে আবেদন ও প্রার্থনার অবস্থায় হাজির হোক, যার প্রতিটি রোমকূপ থেকে দাসত্ব, অসহায়ত্ব ও গোলামির ও একজন শাসিতের সকল নিয়মাবলির পাবন্দি ঝরে পড়ুক। আর সিফাতে জামাল ও মহর (ভালবাসা) চায়, আল্লাহর বান্দা তাঁর সামনে, সম্প্রীতি, মহব্বত, বিলীনতা ও বিলোপতা ও নিঃশেষ নিশ্চিহ্ন ও ডুবন্ত হালতে হাজির হবে, যার প্রতিটি নড়চড়, শীর্ণতা ও চলাফেরা উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে এবং আত্মসমর্পণ, রাজি-খুশি, ইশক-ভালবাসারূপে দৃশ্যমান হবে।

প্রথম অবস্থা একজন ভদ্র ও বাআদব প্রজার। আর দ্বিতীয়টি একজন আত্মভোলা আশেকের। অর্থাৎ– এক শানের অধীনে মানুষ আশেক ও ফানা হওয়াকে পছন্দ করে আর অপর শানের কারণে আকেল ও চিন্তাশীল হওয়া পছন্দ করে। এ জন্য আল্লাহর তায়ালার এ দুই সিফাতের (জালাল ও জামাল) তাকাজার কারণে মানুষের উপর দু-ধরনের ইবাদত ফরজ করা হয়েছে। জালাল সিফাতের অধীনে অপারগতা ও আবেদন প্রকাশ এবং অপদস্থতা ও নীরবতা প্রদর্শনের ইবাদত রাখা হয়েছে, যার বাস্তব আকৃতি হলো নামায। আর সিফাতে জামালের অধীনে ইশক ও ভালবাসার প্রকাশ এবং যাদুগ্রস্ততা ও বিলীনতা প্রদর্শনীর ইবাদত ফরজ হয়েছে, যার প্রকৃত রূপ হলো হজ।

## নামায আল্লাহ্ পাকের বড়ত্বের বহিঃপ্রকাশ

নামাযের এক-একটি কর্ম দ্বারা নিজের বা নামাযীর আত্মোৎসর্গতা, দাসত্ব, অক্ষমতা, তোষামোদি, ভীতসন্ত্রস্ততা ও ভক্তিমাখা ভয় সুস্পষ্ট হবে ওঠে, যাতে চিন্তা ও বুদ্ধির সাথে আদব ও অমায়িকতা প্রদর্শন করা হয়। নামাযের শুরুতে উভয় হাত কানবরাবর রেখে দুনিয়া ও দুনিয়ার মাঝে যা কিছু আছে তা থেকে অনাসক্ত হয়ে নিজ হাকিম ও শাহেনশাহের বড়ত্বে ঘোষণা দেয়, যাকে তাকবিরে তাহরিমা বলে। তারপর চাকরদের ন্যায় হাত বেঁধে দাঁড়ানো, যাকে কিয়াম বলে। তারপর অপমানিত ও লজ্জিতদের ন্যায় মাথা অবনত করা, যাকে রুকু বলে। আবার সর্বোচ্চ অবনত হয়ে হাত, নাক ও কপালকে জমিনে লাগিয়ে দেয়া, যাকে সিজদা বলে। তারপর সর্বোচ্চ আদব ও সম্মানের সাথে আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য প্রদান করা, যাকে তাশাহহুদ বলে। পুনরায় সর্বোচ্চ নিরুপায়, মোহতাজ, মুখাপেক্ষিতার সাথে আল্লাহকে ডাকে, যাকে সাহায্য প্রার্থনা বা ফরিয়াদ বলে। তারপর পরিপূর্ণ দুর্বলতা, অপারগতা ও তোষামোদির সাথে ভিক্ষা চাওয়া, যাকে দু'আ বলে। তারপর সর্বোচ্চ সুসম্পর্ক, দরদ ও আবেদনের সাথে তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফাগণের (নবী-ওয়ালীগণ) উপর দরূদ-সালাম পাঠানো, যাকে দরূদ, সালাম ও সালাত বলে। তারপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আবেদনের সঙ্গে দরবারে উপস্থিত (নামাযী ও ফেরেশতা)দের দুদিকে সালাম প্রদান করে বিদায় নেয়, যাকে তাহলীল বা তাসলীম বলে ইত্যাদি ইত্যাদি।

এমন অসহায় ও প্রজাত্বমূলক কর্মসমূহ যেগুলো বাস্তবে আল্লাহ তায়ালার হুকুমাত, রাজত্ব, বাদশাহী ও হাকিমী (বিচারক) গুণের স্বভাবজাত দাবি। সুতরাং নামায তাঁর শানে কিবরিয়া (বড়ত্ব), শানে জালাল ও হাকিম গুণের তাকাজা হতে সৃষ্টি হয় আর বান্দার মধ্যে ভয়-ভীতির বীজ বপন করে, যা দ্বারা সে আল্লাহর নিয়ম-কানুনের নাফরমানি ও অবৈধ ও নিষিদ্ধ কর্মসমূহ থেকে বেঁচে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে।

## হজ ব্যক্তিগত প্রেমের বহিঃপ্রকাশ

এদিকে হজের প্রত্যেকটি রুকন, ওয়াজিব ও সুন্নাত দ্বারা প্রেমিক ভালবাসা, স্নেহ ও মহব্বতের উপর প্রাণ উৎসর্গ করার প্রমাণ উপস্থাপন করে। সুতরাং হজে লিপ্ত ব্যক্তির প্রেম ও ইশকের হালত এবং চলনশক্তি হারিয়ে ফেলার পরিবেশ এমন হয় যে, তার দেহ, মন ও ধন সম্পদের প্রতি লক্ষ্য থাকে না।

পরিধেয় বস্ত্রের খবর থাকে না। থাকে না সাজসজ্জা ও ফ্যাশনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ। কাটা-ছাটা ও বানানো পোশাকের প্রতি নজর থাকে না। চুল থাকে এলোমেলো, নখ থাকে লম্বা-লম্বা। চেহারা থাকে মলিন। মাথা থাকে খালি, পায়ে থাকে না জুতা। কাপড় থাকে ধুলা-বালিযুক্ত। শরীরে থাকে ময়লা-কাদা দৃশ্যমান। প্রিয়তমের দরজায় মাথানত করে, সিজদা করে ঘর হতে বের হয়ে যায়। মাল ও ধন-সম্পদ পরিহার করে ফেলে। খাবার-দাবারের প্রতি নজর থাকে না। অন্তরে থাকে না বিবাহের স্বাদের প্রভাব। শরীরে থাকে না ধন-সম্পদের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। আতর, সুগন্ধি ব্যবহার বৈধ নয়। গোসলের খেয়াল নেই। নেই পরিষ্কারের কল্পনা। মহব্বত ও ভালবাসার প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় দিশেহারা, নিয়ন্ত্রণহারা, মাতাল। ক্রন্দন ও মাতম দ্বারা বিপদগ্রস্ত, ভস্মীভূত। অন্তর সামাজিক পদমর্যাদা হতে বিমুখ। প্রিয়তমের ঘরের কল্পনায় চলনশক্তি হারিয়ে ফেলা। প্রিয়তমের ঘর সামনে এলে 'হাজির হাজির' বলে চিৎকার করা আর লাফিয়ে-লাফিয়ে হাঁটা। তাঁর ঘরের চারদিকে প্রদর্শন করা, দরজা ও দেয়ালকে চুমু দেয়া, দেয়ালে পর্দার সাথে নিজেকে জড়িয়ে নেয়া ও ক্রন্দন করা। কোথও আনন্দে লাফিয়ে ওঠা আবার কোথাও ভয়ে থেমে যাওয়া। কোথাও আনন্দে, উৎসাহে দৌড়ানো আবার কোথাও জামাল গুণের ভয়ে থেমে যাওয়া। কখনও প্রিয়তমের দেখা হলে চিৎকার করে উন্মাদনার সাথে মাথা নত করে দেয়া আর মাহবুবের দুশমনের কল্পনা এলে বক্ষদেশ উঁচু করে দম্ভ করে চলা। মাহবুবের তাজাল্লি (জ্যোতি) দৃশ্যমান হলে মাথা অবনত করে আর মাহবুবের দুশমনের (শয়তানের) স্থান সামনে এলে পাথর-কংকর নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সব ধরনের স্বাদ ও সৌন্দর্য এবং প্রথাগত সামাজিক অবস্থান হতে নারাজ থাকে। কোন এক জায়গার স্থির থাকে না। প্রিয়তমের অলি-গলির বিভিন্ন স্থানের মাটি অন্বেষণ করে। কখনও মক্কায়, কখনও মিনায়, কখনও আরাফাতে আবার কখনও মুজদালিফায়। চাল-চলনে স্থিরতা নেই, নেই পরিমাপ ও অনুমানে। কখনও এখানে কখনওবা ওখানে। নিজেকে মিটিয়ে দেয়ার উৎসাহ এবং মন ও ধন-সম্পদকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়ার দৃঢ় প্রত্যয়। পরিশেষে আত্মত্যাগ ও আত্মদানের সর্বশেষ পর্যায়ে কেউ মাহবুবের আদেশে প্রাণী কুরবানীর মাধ্যমে নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়। সামান্য কমতি বা ত্রুটি হলে ধন-সম্পদ সদকা দ্বারা তোষামোদ করে ক্ষতিপূরণ করা। মাহবুবের উসিলার খেয়াল এলে যে কোন মূল্যে সেখানে পৌঁছা সম্ভব হয় তো শত অসুবিধা সত্ত্বেও সেখানে (মদীনায়) পৌঁছে। সালাম করা, লজ্জিত হওয়া।

আগ্রহ, উদ্দীপনায় আর্জি ও দরখাস্ত করে অসিলা গ্রহণ করা ইত্যাদি। এমন ইশক ও প্রেমসুলভ কর্মকা-, যা ইশক ও মহব্বতের জযবায় (আগ্রহ) স্বভাবগতভাবে আশেক থেকে প্রকাশ পায় এবং আল্লাহ তায়ালার জামাল সিফাতের এবং প্রেমাস্পদের দাবি বা তাকাজা।

## সুন্দর ব্যাখ্যা

তন্মধ্যে আরাম আয়েশ, সাজসজ্জা এবং লজ্জত ও ফ্যাশন বিলাসিতা পরিহার করার নাম ইহরাম। প্রিয় ঘরের আশপাশ প্রদক্ষিণ করার নাম তাওয়াফ। দুশমন ও বিরোধী কল্পনার স্থানে বুক টান করে লাফিয়ে চলার নাম রমল। উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে দৌড়ানোকে সায়ী বলে। প্রিয়তমের অলি-গলির দরজাসমূহের মাটি অন্বেষণ করার নাম সিয়াহাতে হজ বা হজের সফর। সাহানের মাটিতে থেমে ক্রন্দন ও মাতম করা এবং মিলনের আনন্দ প্রকাশ করার নাম ওয়াকুফ বা অবস্থান। শয়তানের উপর পাথর নিক্ষেপ করার নাম রমি। প্রাণী কুরবানীর মাধ্যমে নিজে কুরবান হয়ে যাওয়ার নাম নাহর।

উল্লিখিত কোন প্রকার প্রেমসুলভ কর্মে ভুল-ত্রুটির নাম জেনায়েত বা অপরাধ। আর তার প্রতিকার ও ক্ষতিপূরণের নাম সাদকা ও কাফফারা। আর উল্লিখিত সকল কর্মসমূহের একত্র নাম হলো মানাসিক বা হজের আহকাম। আর মাহবুবের অসিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে (মদীনার) হাজির হয়ে জিয়ারত করা এবং দরূদ-সালামের পর হাজারো তোষামোদের মাধ্যমে অসিলা গ্রহণ করার নাম জিয়ারত ও তাওয়াসসুল (অছিলা ধরা)।

## আজব (অক্ষমতা) ও ইশকে (প্রেমপ্রীতি)-এর বাহ্যিক রূপ

প্রথম প্রদর্শনী হলো অক্ষমতা ও প্রার্থনার, যার প্রকৃত রূপ নামায। আর দ্বিতীয় প্রদর্শনী হলো ইশক ও মহব্বতের, যার প্রকৃত প্রতিচ্ছবি হলো হজ। এ কারণেই এ দুটি ইবাদতকে ইসলামের ভিত্তি বা মৌলিক বানানো হয়েছে। যখন আল্লাহর তায়ালার সকল গুণ এ দু-ধরনের গুণের (জামাল ও জালাল) মধ্যে একত্রিত বা সমাবেশ হয়েছে, তখন আল্লাহ তায়ালার হকসমূহ আদায় করা এ ধরনের গুণাবলির হকসমূহ পালন করার দ্বারা সম্ভব। আর তার খসড়া প্রস্তুত করার জন্য নামায ও হজের কর্মসমূহ রাখা হয়েছে। এ কারণে নীতিগতভাবে ইসলামে এ দুটো ইবাদতকে মূল ধরা হয়েছে। বাস্তবতার

নিরিখে এ দু-ধরনের ইবাদত ছাড়া আর কোন ইবাদত নেই। আর ইবাদত তাকাজাকারী গুণ এ দুটিই; এর বেশি নয়।

## যাকাত ও রোযার অবস্থান

রয়ে গেল যাকাত ও রোযার কথা। এগুলোকেও তো ইবাদত বলে। বরং নামায ও হজের মতো ইসলামের ভিত্তি বা রুকনসমূহে পরিগণিত হয়। নিঃসন্দেহে এগুলো ইবাদত এবং ইসলামের ভিত্তিমূলক ও বুনিয়াদী ইবাদত। কিন্তু তারপরও এগুলোও নামায, হজ ইবাদত হওয়ার ধরনের মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যাবে, যাকাত ও রোযা সত্তাগতভাবে কোন ইবাদত হয় বরং নামায ও হজের খাতিরে এবং তাদের বদৌলতে ইবাদতে পরিণত হয়েছে। যাকাত নামাযের অনুগামী হয়ে তার অসিলার মর্যাদা অর্জন করে ইবাদত হয়েছে। আর রোযা হজের অনুগামী হয়ে তার অসিলার মর্যাদা অর্জন করে ইবাদত হয়েছে। অন্য কথায় এভাবে বলা যেতে পারে যে, যাকাত নামাযের কারণে বা মাধ্যমে এবং রোযা হজের কারণে বা মাধ্যমে ইবাদত হয়েছে। আর অছিলা বা মাধ্যম যেহেতু হুকুমগতভাবে মূলেই হয়ে থাকে, এ জন্য এ দুটিকে নামায ও হজের কারণে ইবাদত বানিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা সত্তাগতভাবে ইবাদত নয়।

## নামাযের প্রতিবন্ধক ও তার প্রতিকার

কারণ হলো, এই নামাযের মতো গুরুত্ববহ ইবাদতে যদি কোন বস্তু প্রতিবন্ধক ও বাধাদানকারী হয়, তাহলে সেটি হবে বিলাস-উপকরণ, যার মৌজে পড়ে মানুষের মধ্যে নামায হতে গাফলতি ও অলসতা সৃষ্টি হয়। আর মানুষ জামাত হতে নয়, বরং নামায হতেও অপরিচিত হয়ে যায়। কারণ, একই সময়ে নফসের দুদিকে মনোযোগ হতে পারে না। এ কথা তো সুস্পষ্ট যে, নফসের পছন্দনীয় বস্তু যখন তাকে নিজের দিকে টেনে নিবে, তখন সে আমার পছন্দনীয় বস্তুর প্রতি কিভাবে ধাবিত হবে? এ জন্যই অধিকাংশ আমির-উমারা ও সম্পদশালীগণ নামায হতে গাফেল থাকে। কারণ, তাদের চার পাশে যখন বিলাস-উপকরণ, অনন্দ ও আত্মার স্বাদ ও রুচিসম্পন্ন বস্তুর ভিড় থাকে, তখন স্বভাবগতভাবে তাদের মন মসজিদের দিকে ধাবিত হতে সুযোগই পাবে না যে, তারা নামায ও মসজিদমুখী হবে। সুতরাং গরিব শ্রেণীরা যেহেতু সামান্য জীবিকার অধিকারী বা উপকরণবঞ্চিত হয়, সে জন্য

তারা সাধারণত বিলাসিতা হতে মুক্ত থাকে। তখন তাদের ঝামেলামুক্ত আত্মা-ই লৌকিকতা ব্যতীত নামাযের দিকে ধাবিত হতে পারে।

عمراء نشہ دولت میں ہیں غافل ہم سے
زندہ ہے ملّتِ بیضا غربا کے دم سے

বিত্তশালীগণ সম্পদের নেশায় গাফেল হয়ে রয়েছে, টিকে আছে শুভ্রতার জ্যোতি গরিবের খুনে।

এ জন্য শরীয়ত মাল, সোনা-রূপা, জীবন ও আনন্দ উপকরণের মাঝে (যাতে লিপ্ত হয়ে মানুষ নামায ও মসজিদ হতে বিমুখ হয়) সমতা ও সমপর্যায় সৃষ্টি করা এবং সম্পদ কমানোর জন্য এবং মন থেকে সম্পদের মহব্বত ও দয়া বের করে দেওয়ার জন্য যাকাত ও সদকার মতো ইবাদত রেখেছে, যাতে ধন-সম্পদকে আল্লাহর রাস্তায় দান করে, ব্যয় করে, মানবীয় আত্মা হতে সম্পদপূজা এবং তা থেকে সৃষ্ট বিলাসিতার উৎসাহ বের হয়ে যায় এবং সম্পদ ব্যয় করার বাৎসরিক ইবাদত অতঃপর প্রাত্যহিক সদকাসমূহের সৌন্দর্যে নিজ আত্মাকেও আল্লাহর রাস্তায় এবং ইবাদতের পথে বিলিয়ে দেওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যায়।

জীবনের আরাম-আয়েশ ও জীবিকা উপকরণের সম্পর্ক যেহেতু শুধু সোনা-রূপা ও নগদ টাকা-পয়সার সাথে নয় বরং জমি হতে উৎপন্ন সম্পদ, গৃহপালিত পশু, আহারের জন্তু, স্বর্ণখচিত দামি পোশাক, সোনা-রূপার পাত্র, এমনকি প্রত্যেক ব্যবসায়ী মালের সাথেও। এ কারণে শরীয়ত যাকাতের সীমারেখা শুধু নগদ টাকা-পয়সা, সোনা-রূপার উপর সীমাবদ্ধ রাখেনি বরং সকল জীবনোপকরণের উপর নিজস্ব শর্ত ও সীমারেখার সাথে যাকাতের হুকুম রেখেছে। সুতরাং পালিত জীবজন্তু, ঘোড়া, উট, গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদির মাঝে যাকাতের হুকুম রেখেছে। জমিনে উৎপন্ন সম্পদে যাকাত রেখেছে, যাকে উশর বলে। ধাতব পদার্থ ও খনির মধ্যে যাকাত রয়েছে। হারানো গুপ্তধন হাতে এলে তাতেও যাকাত রয়েছে, যাকে খুমুস বলে। আর সর্ব প্রকারের ব্যবসায়ী মালের উপর যাকাতের হুকুম রেখেছে, যার দ্বারা সোনা-রূপা, টাকা-পয়সা ও সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং তার বৃদ্ধির দ্বারা আরাম-আয়েশের আসবাবও বৃদ্ধি হওয়ার কুদরতি সম্পর্ক থাকে। আর ঐ সম্পর্ক আত্মাকে উপকরণ-পূজায় লিপ্ত করে নামায ও ইবাদত হতে গাফেল ও অপরিচিত বানিয়ে দেয়।

প্রকাশ থাকে যে, যখন বাধা দেওয়ার আসবাব দূরীভূত হয়ে যায়, তখন

আত্মা বিদ্যমান বস্তু অনুমোদনকারী হয়ে যায়। সুতরাং তখন ইবাদতের প্রতিবিম্বকে অর্থাৎ সোনা-দানা, ধন-সম্পদ, জীবিকা-উপকরণ, আনন্দসামগ্রীকে যাকাত-সদকার আদলে আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেওয়ার অভ্যাস হয়ে যাবে, অন্তরে সেগুলোর চাহিদার প্রতি তীব্র কামনা বাসনা থাকবে না, তখন বাধা প্রদানকারী আসবাব খতম হয়ে যাবে আর নামায পড়া সহজ হয়ে যাবে। সুতরাং যাকাত ও সাদাকাতকে বাস্তবে নামাযের কাজে ব্যবহার করার জন্য ফরজ করা হয়েছে। এ জন্য তা নামাযের এমন মাধ্যম হিসেবে গণ্য হবে, যা মানুষকে টেনে-হিঁচড়ে নামায পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবে। এ কারণে ইবাদতের নীতিতে নামায হলো আসল আর যাকাত তার অনুগামী হয়ে ইবাদতে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে মূল মাকসাদের মাধ্যম বা অসিলার হুকুম মাকসাদেরই হুকুম হয়ে থাকে। সারাংশ এই বের হলো যে, যাকাত নামাযের ভিত্তি হলো। এ জন্য কুরআনের অনেক স্থানে যাকাতকে নামাযের সাথে মিলিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন–

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

তোমরা নামায কায়েম করো এবং যাকাত আদায় করো।

এ জাতীয় আরো বহু আয়াত তার প্রমাণ।

## নামাযের ভূমিকা

যদি কারো নিকট ধন-দৌলত ও সোনা-রূপা না থাকে আর সে নিজে দৈনিক রুটি-রোজগারের মোহতাজ হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ফরজ হয়ই না, তবে তার উপর নামায নিয়মানুক্রমে ফরজ থাকে। কেননা, যাকাতের উপযুক্ত না হলে যাকাত দেয়া জরুরি নয়। কারণ, যাকাতকে তো নামাযের প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য রাখা হয়েছে। আর যখন এখানে নামাযের প্রতিবন্ধকই নেই, তাহলে প্রতিবন্ধক দূরকারীর (যাকাত) কী প্রয়োজন হতে পারে? সুতরাং এ ধরনের গরিব-মিসকীন মানুষ সাধারণত নামায থেকে অপরিচিত হয় না। কেননা, যখন জীবিকা উপকরণই নেই, যা ইবাদতে, বিশেষ করে নামাযে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তখন একজন গরিব, নিঃস্ব মানুষ স্বভাবগতভাবে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়। সে নামাযে কখনও গাফলতি করে না।

এ জন্য মুসলিমদের সর্বাবস্থায় সাধারণভাবে সংযমী ও অল্পে তুষ্ট হতে উৎসাহ

দেয়া হয়েছে। কারণ, সে যতটুকু স্বল্প জীবিকা উপকরণভোগী হবে, ততটুকুই আনুগত্য ও ইবাদতের প্রতি ধাবিত হবে। তার অর্থ তাকে যাকাত হতে অপরিচিত বানানো। যদি যাকাত সত্তাগতভাবে মূল মাকসাদ হতো, তাহলে সংযম ও অল্পে তুষ্টির পরিবর্তে সম্পদশালী ও অধিক মালের প্রতি উৎসাহ দেয়া হতো। তবে সম্পদ হলে তার উপর ভিতরগত আদেশ যাকাত ও সাদকার হুকুম ফিরে এসে তাকে স্বল্প উপকরণওয়ালা বানিয়ে দেয়। আর সম্পদ না হলে তার উপর যাকাত ও সদকার হুকুম এ জন্য লাগানো হয় না যে, সে তো পূর্ব থেকেই অল্প সম্পদের অধিকারী ছিল। বিধায় মানুষ দুই অবস্থায় নিজের আসল মাকসাদ (ইবাদত) এর প্রতি ধাবিত হয়। এতে একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সম্পদ বা ধন-দৌলত যেহেতু ইবাদতের পথে বাধা সৃষ্টিকারী হয় আর তা না হলে বা কম হলে ইবাদতের কর্মে বাধা হয় না, তাই সংযমী ও অল্পেতুষ্টি এবং সম্পদ বিলিয়ে দেয়ার উৎসাহ দেয়া হয়েছে, যার দ্বারা যাকাত ইবাদতের মাধ্যম, বিশেষ করে নামাযের মাধ্যম হওয়া স্পষ্ট হয়। আর এ কথা প্রমাণিত হয় যে, বাস্তবে ইবাদত হলো নামায, যা ছাড়া তায়াল্লুক মাআল্লাহ (আল্লাহর সাথে সম্পর্ক) হতে পারে না। আর যাকাত হলো তার মাধ্যম ও সম্পূরক। তার উপর নির্ভর করে খসড়া বা প্রস্তুতি হয়। যাকাত নিজে মূল ইবাদত নয়।

## হজের প্রতিবন্ধক ও তার প্রতিকার

এদিকে হজের প্রেম-প্রীতিসুলভ ইবাদত যেহেতু মহব্বত ও ভালবাসার প্রদর্শন। আর মহব্বতের সর্বপ্রথম বস্তুটি হলো আল্লাহ ব্যতীত সকল কিছুকে পরিহার করা। অন্যথায় আশেক বা প্রেমিক যদি তার প্রেমাস্পদ ব্যতীত অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তাহলে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, মাহবুব বা প্রেমাস্পদের প্রতি তার আকর্ষণ বা টান একেবারেই নেই অথবা আছে তো একেবারে দুর্বল। এমতাবস্থায় তাকে আশেক বা প্রেমিক কিভাবে বলা যাবে? বলা যাবে না। সুতরাং হজ পালনকারী একজন আশেকে ইলাহীর প্রথম পদক্ষেপ হবে আল্লাহ ছাড়া সকল কিছুকে পরিহার করা। আর এ কথা তো স্পষ্ট যে, তা তো আল্লাহ ছাড়া, শুধু নফসের কামনা-বাসনাই হবে, যাতে বড় কামনা হলো, যা দ্বারা মানুষের অন্তর বাঁধা থাকে। আর তা হলো আহার করা, পান করা, এবং স্ত্রী হতে মানবিক স্বাদ উপভোগ করা। এমন গুটিকয়েক আত্মার কামনা ও চাহিদার দ্বারা মানুষ দুনিয়ার সকল ঝগড়া-বিবাদ সেরে নিতে পারে।

এ কথা স্পষ্ট যে, যতক্ষণ অন্তরে ঐ সকল বস্তুর প্রেম ও পূর্ণ অনুরাগ অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষণ আসল মাহবুব আল্লাহর প্রেম-ভালবাসা এমন হৃদয়ে কেমন করে স্থান পাবে? সেজন্য এমন ইশক ও মহব্বতের ইবাদত অর্থাৎ হজের প্রাথমিক ধাপেই একজন আল্লাহপ্রেমিকের জন্য সর্বপ্রথম খাওয়া, পান করা ও স্ত্রী সহবাসের স্বাদ উপভোগ করার মহব্বত ও অস্বাভাবিক সুসম্পর্ক হতে দূরে থাকা সামর্থ্য অনুযায়ী জরুরি হয়ে পড়ে। অন্যথায় এই আল্লাহপ্রেমের প্রদর্শনী, যাকে হজ বলে তা সূচনা হতে পারবে না। এ জন্য শরীয়ত হজের মাসসমূহের পূর্বে মিলিতভাবে রমযানের মাস রেখেছে, যাতে দীর্ঘ ত্রিশ দিন পর্যন্ত আত্মাকে এই প্রারম্ভিক কামনা-বাসনা, পানাহার, স্ত্রী সহবাসের অসাধারণ কাম ভাবকে রোযার মাধ্যমে কামিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং রমযানের ত্রিশ দিনে দিনের বেলায় তো ঐ সকল স্বাদ-মজা হতে রোযার মাধ্যমে একেবারেই ছাড়িয়ে দেয়া হয়। আর ক্ষুধা ও পিপাসায় দুর্বলতার দরুন রমযানের রাতসমূহে মানুষ ঐ সকল স্বাদ ও মজা হতে পূর্ণরূপে ফায়দা উঠানোর যোগ্যতা রাখে না।

এদিকে রাতে তারাবীহ ও কুরআন তেলাওয়াতের কর্ম রাখা হয়েছে, যাতে স্বাদ ও মজা আস্বাদন করার কোন অবস্থাতেই পূর্ণ সময় না জোটে, মানুষের মন যাতে তার মধ্যে একেবারে মিশে না যায়। এ জন্য এমনটি বলা জরুরি যে, পূর্ণ এক মাস পর্যন্ত ঐ সকল স্বাদ উপভোগ করা থেকে দূরে রেখে রমযান মাসে এই বুনিয়াদী স্বাদ দূর করে দেয়া হয়, যাতে কামনা ভাবসম্পন্ন আত্মার মানবিক চাহিদা উথলে না ওঠে। বরং তাদের কামনা-বাসনার খেয়াল নিভে যায় আর মানুষ তা হতে দূরে থেকে আল্লাহর ভালবাসা প্রদর্শন করার যোগ্য হয়ে যায়।

## ইতেকাফের রহস্য

কিন্তু এতো কিছুর পরও ঘর-বাড়ির মহব্বত যথারীতি থেকে যায়। বাসস্থানের আরাম-আয়েশ এবং ঘরোয়া সামগ্রির মহব্বত আগের মতোই স্থির ছিল। অথচ এগুলোও ঐ বস্তু, যা আল্লাহর ভালবাসার মাঝে বাধা সৃষ্টি করে। এ জন্য রমযানের বিশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর শেষ দশকে ইতিকাফের সুন্নাত দ্বারা ঘরবাড়ি হতেও সম্পর্ক ছাড়িয়ে নেয়া হয়, যাতে মানুষ ঘরোয়া জীবন ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর ঘরে পৌঁছে আর রাতদিন সেখানে অতিবাহিত করে।

এমনিভাবে খাওয়া, পান করা ও সহবাসের স্বাদ হতে অপরিচিত হওয়ার পর ঘরোয়া সামগ্রী হতেও হাত গুটিয়ে নেয়। এভাবে আত্মাকে এবং অন্যান্য প্রিয়বস্তুকে পরিহার করার যোগ্যতাও সৃষ্টি হয়ে যায়।

## হজের বার্তা বা ঘোষণা

সুতরাং মাহে রমযানে ঐ বুনিয়াদী বা মৌলিক স্বাদ-মজাকে পরিহার করার অনুশীলনী দ্বারা যখন মানুষের অন্তর আসল প্রিয়তমের দিকে ধাবিত হয়, বৃদ্ধি পায়, তখন তাঁর দিকে দৌড়ানো, তাঁর মধ্যে নৈকট্যের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে যায়। তখন রমযান শেষ হওয়ার সাথে সাথে হজের মাস শুরু হয়ে যায় এবং হজের কর্মসমূহ শুরু করার সময় এসে পড়ে। আর মানুষ মাহবুবের শহরের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেমন যেন ঐ আল্লাহর প্রেমিকের দিকে, যে আল্লাহর খাতিরে পানাহার, স্ত্রী-সন্তান এবং ঘরবাড়ি হতে অন্তরকে সরিয়ে নিয়েছিল। শরয়ী ঘোষণা প্রচারিত হয় যে, এমন ইশক বা মহব্বতের রাস্তায়, পানাহার, স্ত্রী ও ঘরবাড়ি ছেড়ে দেয়াই যথেষ্ট নয়। এখন মাতৃভূমিও ছেড়ে দাও এবং মাহবুবের শহরের দিকে অগ্রসর হও। মাতভূমিও একটা ভূত, যা আল্লাহর রাস্তায় প্রতিবন্ধক তা সৃষ্টি করে।

## ইহরামের হেকমত বা রহস্য

তারপর আল্লাহপ্রেমিক যখন নিজ মাতৃভূমি ছেড়ে জঙ্গল, জনমানবহীন মরুভূমি, পাহাড়-পর্বত মাড়িয়ে এবং সাগর-মহাসাগর পাড়ি দিয়ে প্রিয়তমের শহরে প্রবেশ করল, তখন হারামে ইলাহীর (মর্যাদা সম্পন্ন এলাকা) মিকাতে (যেখান হতে হাজীগণ ইহরাম বাঁধেন) আসামাত্রই হাকিকী মাহবুব আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে এ হুকুম পাওয়া যায় যে, শুধু আহারাদী স্ত্রী-সন্তান, ঘর-বাড়ি, মাতৃভূমি ছেড়ে দেয়াই এই ইশকের রাস্তাই যথেষ্ট নয়। বরং পোশাকের সৌন্দর্যও পরিহার করো। সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করা ছেড়ে দাও। এটুকু স্বাদের কর্ম ও মাহবুবে হাকিকীর (আল্লাহর) মিলনে প্রতিবন্ধক এবং ইশকের গায়রত (আত্মমর্যাদাবোধের) বিরোধী। শুধু দেহ ডাকা যায় এতটুকু কাপড় ব্যবহারে তুষ্ট থাকো, একটি চাদর শরীরের উপরি ভাগের অর্ধাংশ ডাকার জন্য আর আরেকটি চাদর দেহের নিম্ন ভাগের অর্ধাংশ ডাকার জন্য। মাথার টুপি থাকবে না, থাকবে না পাগড়ি, যা মাথাকে ঢেকে ফেলবে। পায়ে তৈরি করা কোন এমন জুতা থাকবে না, যা পাকে ডেকে ফেলবে। তাহলে যেমনভাবে

রমযানে আশেকে এলাহীর মহব্বতে বাতেনীভাবে বন্দি হয়েছিল, এখন তার জাহেরেই (বাহ্যিক) ইশকের প্রভাবে ও প্রতিক্রিয়ায় দিশেহারা হয়ে যাবে। আর আল্লাহপ্রেমিকের ইশকের কারণে দেহ, মন, ধনের খবর থাকবে না।

## প্রেমিকসুলভ কথাবার্তা

কিন্তু এ জাহের ও বাতেনের মাঝে একটি বস্তু বাকি ছিল, যা এখনও ইশকের প্রভাবে প্রভাবিত হচ্ছিল না। আর সেটি হলো যবান বা জিহ্বা, যা এক দৃষ্টিকোণ থেকে জাহের বা প্রকাশ্য আর অপর দৃষ্টিকোণ থেকে বাতেন বা ভিতরগত অঙ্গ। অর্থাৎ জাহের ও বাতেনের মাঝামাঝি একটা আড়ল বা পর্দা, যা বাতেনের তো ভাষ্যকার এবং জাহেরেরও পাহারাদার। বিধায় প্রয়োজন ছিল, তারও এ ইশক হতে অংশ মিলবে। আর এ কথা তো স্পষ্ট যে, যবানের অংশ কথাবার্তার আকৃতিতেই হতে পারে। এ জন্য তাকে প্রেম ও প্রেমিকসুলভ কথাবার্তা দেয়া হয়েছে। সে প্রতি কদমে মাহবুবে হাকিকী আল্লাহর মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে। এ কারণে ইহরাম বেঁধেই জিহ্বাকে লাব্বায়ক লাব্বায়ক কালিমা দ্বারা আল্লাহর যিকিরের আনুগত্য বানানো হয়, যাতে জিহ্বা দ্বারা নফস এবং নফসের অভিলাষের ভাষ্যকারী না হয়। বরং আল্লাহ তায়ালার উপস্থিতির প্রবল জোশ ও মত্ততার ভাষ্যকারী হয়। আর কেঁচির মতো ধারালো জিহ্বার চাহিদা স্বাধীন না থাকে যে, সে যতটুকু চায় বা যা চায় বলতে থাকবে। এ জন্য আশেকের এ ইশকের দিনগুলোতে প্রতিটি পরিবর্তনে, সবগুলো মোড়ে লাব্বায়কের জয়ধ্বনিকে আবশ্যক করে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি মরুভূমিতে, উঁচু ভূমিতে, পাহাড়ে, গর্তে এবং কাফেলা ও জামাত সামনাসামনি হলে এই প্রেমসুলভ ও ভালবাসাপূর্ণ জয়ধ্বনি জবানে সর্বাবস্থায় ছায়ার মতো হয়ে থাকবে যে, লাব্বায়ক আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক, লা শারিকা লাক লাব্বায়ক। সুতরাং এমনিভাবে জিহ্বার স্বাধীনতার স্বাদ ও ইশকের আল্লাহর কারণে পরিহার করে দেয়া হয়েছে। প্রেমিক নিজের জীবন, নিজের অন্তর ও সফল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে শুধু নিজের মাহবুবে হাকিকী আল্লাহর মধ্যেই লিপ্ত ও ডুবে রইল।

## তাওয়াফের হেকমত

এখন যখন মাহবুবের (প্রেমাস্পদের ) ঘরে পৌছা হয়ে গেল, মানুষ পবিত্র মক্কায় ও পবিত্র হেরেমে প্রবেশ করল, আল্লাহর সম্মানিত ঘর সামনে এসে

পড়ল, যা হতে হক তায়ালার সৌন্দর্যের তাজ্জাল্লি (জ্যোতি) বিচ্ছুরণ হয়, তখন শরয়ী বার্তা ঘোষণা হয় যে, তুমি এখন পর্যন্ত নফসের প্রেমে ঘর-বাড়ি, বিলাস-উপকরণ এবং আরাম-আয়েশের সামগ্রীর খাতিরে অনেক চক্কর লাগিয়েছ। এখন তোমার চলাফেরা, চক্কর ঐ সমস্ত বস্তু খতম করে প্রিয় ঘরের জন্য খাস করে দাও এবং ইশকের মাতালতায় ডুব দিয়ে প্রিয়তমের ঘরের চারপাশে ডান দিক থেকে চক্কর লাগাও। এক বা দুই চক্কর নয়, বরং সাত চক্কর, যা গণিত শাস্ত্র হিসেবে অধিক সংখ্যা। কখনও কম হবে না। তারপর এই তাওয়াফ এক বা দুবার নয় বরং পবিত্র দিনগুলোতে মক্কায় অবস্থানকালে সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ইবাদত হলো এ চক্কর লাগানো এবং কাবা ঘরের চার পাশে ঘোরা, যাকে তাওয়াফ বলে।

## আরাফাত ময়দানে অবস্থান করার রহস্য

পবিত্র শহরে অবস্থান করা নিজ শহরের অবস্থান করার মত নয়। তবে সর্বাবস্থায় শহরে অবস্থান করা জরুরি। এতে দেশের দালানসমূহ যথার্থ নয় বরং বালাদে ইলাহীই (মক্কা শহর) যথার্থ, যা শহুরে জীবনের সকল আরাম-আয়েশ, স্বাদ-মজা ও সৌন্দর্য নিয়ে নিয়েছে। আর আশেকের শানে ইশক ও মাহবুবের শানে গায়রত (আত্মমর্যাদাবোধ)-এর এতটুকুও বিপরীত ছিল যে, আশেকের মন ইমারতসমূহ, আরাম-আয়েমের সামগ্রী ও তাহজিব-তামাদ্দুনে কোন প্রকার আটকে থাকবে। বিধায় আসল হজের জন্য যা বাস্তবে শানে ইশকের প্রদর্শনী, হজের দিনগুলোতে এই আদেশ হলো যে মক্কা শহরের আবাদী এলাকা ছেড়ে দাও। আরাফাতের বালুকাময় জমিনে খালি মাথায় খালি পায়ে কাফনের কাপড় পরিধান করে পৌঁছে যাও। আসল হজ এটিই যে, জনমানবহীন ময়দানে, ঘর-বাড়ি, বিবি-বাচ্চা, তামাদ্দুন সামাজিকতা, আরাম-আয়েশ উপকরণ পরিহার করে এক কাপড়ে মুসাফিরখানা অর্থাৎ তাঁবু বা খিমায় অবস্থান করো, যাতে সর্বোচ্চ স্বাদ-সামগ্রী পরিহারকারী মাকাম বা অবস্থান অর্জন হয়ে যায়, যা একজন আশেকের জন্য যোগ্যতর এবং ইশকের আবশ্যকীয় বিষয়ের জন্য অত্যাবর্শক।

## প্রাণ উৎসর্গ

হ্যাঁ, এতকিছু ত্যাগ করার পরও আশেকের আত্মা এখনও আশেকের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যার ফলে সে নিজেকে আমি আমার বলে সংবোধন করছে। অথচ

পরিপূর্ণ ইশক মহব্বতের জন্য এটিও একটি বড় চ্যালেঞ্জ যে, আশেক নিজের অস্তিত্বকে স্বস্থানে রেখে মাহবুবে হাকিকী আল্লাহর বিপরীতে তার নিজের কল্পনা অন্তরে কায়েম রাখবে। বরং তার সর্বশেষ দায়িত্ব হলো, সে নিজ মাহবুবের পথে আপন নফসকেও উৎসর্গ করে দিবে এবং এই জাহেরি অস্তিত্ব হতেও মুক্ত হয়ে যাবে। তখন শরয়ী আহ্বান হতে থাকে যে, এ মুহূর্তে আরাফাত ময়দান হতে প্রত্যাবর্তন করে মিনায় যাও এবং জান কুরবানিয়ো স্থানে পৌছে যাও, যাকে কুরবানীর স্থান বলে। কুরবানী হওয়ার জন্য নিজের প্রাণকে অর্পণ করে দাও। অর্থাৎ প্রাণকেও ত্যাগ করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করে নাও।

এখন এ তো মাহবুবে হাকিকী আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ যে, এ সত্যিকারের আশেকের পক্ষ হতে (যে নিজের সারা জীবনের সব ধরনের স্বাদ, মজা, পরিশেষে আপন জীবনকেও পেশ করে দিয়েছে) তার প্রাণ কবুল করে কুরবানীর জন্তুর জানকে, তার জানের মুক্তিপণ হিসেবে গ্রহণ করে নিবেন। তারপর নিজ বাড়িতে ফিরে যাওয়া এবং ত্যাগ করা সকল প্রকার স্বাদ উপকরণ হতে উপকার লাভ করার অনুমতি দিবেন।

এ জন্যই মিনাতে কুরবানী করার হুকুম করা হয়েছে যে, জানের মুক্তিপণ জান দ্বারা দিয়ে দাও। তাই স্বয়ং তোমার জান কুরবানী হওয়া মনে করা হবে। সুতরাং মাহবুবের জন্য পরিশেষে জানও পেশ করা অর্জন করা হয়, যা একজন আশেকের সর্বশেষ মাকাম।

## হজের পটভূমি

উপরের বর্ণনা দ্বারা এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, হজ হলো পরিহার বা ত্যাগের সমষ্টির নাম। যেমন- স্বাদ মজা, সৌন্দর্য, বাড়ি-ঘরের আরাম, পোশাক-পরিচ্ছদ, মাতৃভূমি, ইজ্জত-সম্মান, ধন-সম্পদ ইত্যাদি পরিহার করার সমষ্টি হলো হজ, যার সূচনা খাওয়া, পান করা, স্ত্রী ও ঘরবাড়ি ত্যাগ করা দ্বারা হয়। আর এগুলোই দুনিয়ার জীবনের স্বাদ উপভোগের বড় অংশ বরং অন্যান্য স্বাদের মূল উৎস, যে কারণে হজের মাসগুলোর পূর্বে শুধু হজের খাতিরে, রমযান মাসেও ত্যাগ করা হয়, যাতে আগত ত্যাগ ও পরিহারের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে যায়। যদি খাওয়া, পান করা, স্ত্রী হতে দূরে থাকার যোগ্যতা অর্জন না হয়, তাহলে ভবিষ্যতে কোন কিছু ত্যাগ করার জন্য মানুষ প্রস্তুত ও উৎসাহী হবে না। এ জন্য রোযার ইবাদত বাস্তবে হজের জন্য

ভূমিকাস্বরূপ প্রমাণিত হলো। যেমনভাবে যাকাতের ইবাদত নামাযের জন্য ভূমিকারূপে প্রমাণিত হয়েছে, যার দ্বারা পূর্ণরূপে স্পষ্ট হয়ে গেল, ইসলামে জাতিগতভাবে ইবাদত মাত্র দুটি। একটি হলো নামায আর অপরটি হজ। একটি সিফাতে জালালের তাকাজা পূরণ করে, অপরটি সিফাতে জামালের। আর যাকাত ও রোযা তাদের মাধ্যম ও মৌলিক বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত। আর তাদের (যাকাত ও রোযা)কে উক্ত দুই মৌলিক ইবাদত দ্বারা ইবাদত হিসেবে বানিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা নিজে সত্তাগতভাবে ইবাদত নয়।

## যাকাত ও রোযা অন্যের উসিলায় ইবাদত

এ কারণে যেখানে নামায ও হজে ধন-সম্পদ ও সর্ব প্রকার স্বাদ-মজার উপকরণগুলো প্রতিবন্ধক হওয়ার সুযোগ নেই, সেখানে নামায ও হজ তো হয়ে যাবে; কিন্তু যাকাত ও রোযার ইবাদত চলবে না। যেমন– ফেরেশাদের নামায দেয়া হয়েছে। তারা সর্বদা রুকু, সিজদা ও কিয়ামে লিপ্ত থাকে। হজও দেয়া হয়েছে। তারা প্রতিদিন সাত আসমানের কিবলা বাইতুল মামুরের হজ ও তাওয়াফ করে। বরং প্রতিটি আসমানে বাইতুল মামুর বরাবর একটি করে কিবলা রয়েছে, যেগুলোকে প্রতিটি আসমানের অধিবাসীরা তাওয়াফ করে। কিন্তু তাদের মাঝে তো ধন-সম্পদের লিপ্সা নেই। নেই খায়েশ সৌন্দর্য ও শান্তির, যা তাদেরকে হজ ও নামায হতে বাধা দিবে। এ জন্য তাদের যাকাত ও রোযার আনুগত্য করা লাগে না। তারা যেহেতু নিজেরাই পবিত্র; তাই মাল ব্যয় করিয়ে এবং রোযা রাখিয়ে তাদের পাক করার প্রয়োজন নেই।

তাতে সুস্পষ্ট হয়ে গেল, যাকাত ও রোযাকে বাস্তবে হজ ও নামাযের ইবাদতের জন্য রাখা হয়েছে এবং তাদেরই মাবাদী বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত, যাতে তাদের (যাকাত ও রোযা) দ্বারা নফসকে পবিত্র ও যোগ্য বানিয়ে নামায ও হজের জন্য তৈরি করা হয়। আর যেখানে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা পূর্ব থেকেই অর্জিত, সেখানে নামায ও হজ তো কায়েম আছেই। তবে মাঝ থেকে যাকাত ও রোযাকে বের করে দেয়া হয়েছে। এতে সারকথা এই বের হয় যে, নামায ও হজ সিফাতে এলাহীর তাকাজা পূরণকারী। একটি হলো সিফাতে জালালের আর অপরটি সিফাতে জামালের। কিন্তু যাকাত ও রোযা হলো নফসের তাকাজা যে, যতক্ষণ-না যাকাত ও রোযার মাধ্যমে মানবিক আত্মাকে পবিত্র করা হয়, ততক্ষণ সে নামায ও হজের যোগ্য হয় না। আর এ কথা তো সুস্পষ্ট যে, বাস্তব অর্থে ইবাদত তা-ই হয়, যার তাকাজা মাবুদের সিফাত

করে। আর যার তাকাজা আবেদের সিফাত করে, তা ইবাদত হতে পারে না চাই তা মাবুদের জন্যই করা হোক। এ জন্য নামায ও হজ সত্তাগত এবং নিজস্বভাবে ইবাদত হিসেবে প্রমাণিত হলো। আর যাকাত ও রোযা সত্তাগত ইবাদত নয় বরং দুই মৌলিক ইবাদতের মাধ্যম হয়ে ইবাদত। মানে অন্যের কারণে ইবাদত।

## নামায ও হজের মাধ্যকার পরস্পর বিপরীত সম্পর্ক

নামায ও হজ এ দুটি আসল ইবাদতে যদি একটু তলিয়ে দেখা হয়, তাহলে দেখা যাবে, তাদের মাঝে যেমন উৎপত্তিগত পার্থক্য রয়েছে, একটি জালালি সিফাত হতে সৃষ্টি আর অপরটি জামালি সিফাত হতে। একটিতে উষ্ণতা আর আরেকটিতে নম্রতা রয়েছে। তেমনিভাবে তাদের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও লাওয়াযেমের মাঝেও যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এমনকি তাদের মাঝে পরস্পর বিপরীত সম্পর্ক বিরাজমান । যেসব বস্তু নামাযে উত্তম ও জরুরি, সেগুলো হজে শুধু অপ্রয়োজনই নয়, বরং নিষিদ্ধ ও মন্দনীয়। আর যে বিষয়গুলো হজের মাঝে উদ্দেশ্য ও জরুরি, সেগুলো নামাযে মাকরূহ বা অপছন্দনীয়। নামায যেহেতু আহকামুল হাকিমীন (বাদশার বাদশা)-এর শাহী দরবারে উপস্থিতি, তাই তাতে শাহী আদবের প্রতি খেয়াল করতে হবে। পাঁচ ওয়াক্ত অযু, যা গোসলের স্থলাভিষিক্ত, পোশাকের পরিচ্ছন্নতা ও তার উপর আতর-সুগন্ধির ব্যবহার এবং গাম্ভীর্য ও স্থিরতার সাথে মসজিদে উপস্থিতি। দৌড়ে বা পলায়নকারীর ন্যায় নয় বরং গাম্ভীর্যপূর্ণ চলন হেঁটে মসজিদে পৌঁছে গাম্ভীর ভাব নিয়ে বসবে। তারপর প্রস্থান করবে। তাতে এলোমেলো হবে না। নীরবতা, নিশ্চুপতা বা চুপিচুপি যিকিরের সাথে বসে থাকবে। শোরগোল বা উচ্চ আওয়াজ হবে না।

অন্যদিকে হজ তার বিপরীত যে, তা মাহবুবের (প্রেমাস্পদ) দরজায় একজন প্রেমিকের উপস্থিতি। সেজন্য সেখানে ইশক ও মহব্বতের প্রদর্শনী, মনোত্তাপ, বাহাদুরী, প্রেম-জ্বলন, কাটা-ফাড়া জামা, উন্মাদ ও মাতলামী উদ্দেশ্য। তাতে আকল (জ্ঞান-বুদ্ধি) ও ভাল-মন্দ বিবেচনাবোধ নেই, নেই নিজের আরাম-আয়েশ ও শোভা-সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি। আশেক নিজের সম্পদে মিটে যাওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। এ জন্য নামাযে যদি পরিচ্ছন্নতা আসল হয়, তাহলে হজে শোভা-সৌন্দর্য ছাড়া থাকাই আসল।

নামাযে উত্তম পোশাক হওয়ার দাবি ছিল। আর হজে সেলাইকৃত পোশাক

একেবারেই নিষিদ্ধ। নামাযে পোশাকের শোভা-সৌন্দর্যের দাবি ছিল আর হজে শোভা সৌন্দর্য পরিহার করা। নামাযে আতর-সুগন্ধি লাগানো উত্তম ছিল আর হজে ইহরাম বাধার পর সুগন্ধি হারাম। নামাযসমূহে বিশেষ করে জুমা ও দুই ঈদের নামাযে দেহের মানানসই সাজসজ্জা জরুরি ছিল, যা ক্ষৌরকার্য দ্বারা অর্জন হয়। যেমন ছাটকাট। আর হজের ইহরামকারীর জন্য দেহের সাজসজ্জা, চুল কাটা-ছাটা কোনটাই জায়েয নয়। নামাযে নীরবতা জরুরি আর হজে লাব্বায়ক শোরগোল। নামাযে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতা জরুরি যে, এক জাগায় স্থির দাঁড়িয়ে থাকবে বা গভীর ধ্যান-খেয়ালে নিমজ্জিত থাকবে আর বসলে, গর্দান নিচু করে নীরবতার সাথে বসবে। হজে নড়াচড়া, চলাফেরা, পলায়ন ও দৌড়ানো জরুরি। কখনও সাফা-মারওয়াতে দৌড়ানো, কখনও তাওয়াফে চক্কর লাগানো। নামাযে নম্রতার সাথে গর্দান নিচু করা জরুরি ছিল। হজে সায়ী করার পূর্বে যে তাওয়াফ করতে হয়, তাতে বুক টান করে উঁচিয়ে-উঁচিয়ে গর্দান হেলে-দুলে চলা ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত। নামাযের অধিকাংশ অংশ যেমন সুন্নাত ও নফলসমূহ বাড়িতে পড়া মুস্তাহাব। হজে একবারেই নিজ বাড়ি ত্যাগ করে, মাহবুবের ঘরে হাজির হওয়া জরুরি। হজ ফরজ হোক বা নফল হোক কোন অবস্থাতেই ঘরে বসে আদায় হবে না। নামাযে রক্ত প্রবাহিত করা থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। আর হজে রক্ত প্রবাহ অর্থাৎ মিনাতে কুরবানী করাই আসল ইবাদত। নামাযে শয়তানের ওয়াসওয়াসার বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা এবং ফিলহাল মন থেকে দূর করা ও সেদিক হতে ধ্যান-খেয়াল ফিরিয়ে আনাই ওয়াসওয়াসার চিকিৎসা। হজে স্বয়ং শয়তানের স্থানে এসে তাকে পাথর দ্বারা আঘাত করা জরুরি।

মোদ্দাকথা, নামাযে কাজ আর কাজ এবং হজে পরিহার আর পরিহার। নামাযে অনুভূতি, উপলব্ধি, শানের (অবস্থা) আধিক্য জরুরি, যা আকলের দাবি। আর হজে বিলীন ও নিমজ্জিত থাকার শান, যা প্রেম-ভালবাসার তাকাজা। মোটকথা, এ দুই ইবাদতের প্রয়োজনীয়তা ও প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার মাঝেও বিপরীত সম্পর্ক। যেমনভাবে আকল ও ইশকের মাঝে দাবিসমূহের বিপরীত সম্পর্ক। বাদশাহর দরবারে আকল ও হুশ-অনুভূতি নিয়ে আসতে হয় আর মাহবুবের দরজায় আকল, অনুভূতির উর্ধ্বে ওঠে, নিমজ্জন ও বিলীনতার সাথে হাজির হতে হয়।

এতে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, একদিকে আল্লাহ তায়ালার সিফাতে কামালের দুটি শান রয়েছে। একটি জালাল, অপরটি জামাল। অন্যদিকে প্রতিটি বান্দার মধ্যে দুটি জাত (মূল ধাতু) রয়েছে। একটি আকল (জ্ঞান-

বুদ্ধি) আর অপরটি ইশক।

অর্থাৎ– আল্লাহ তায়ালার শানসমূহের তাকাজা যদি হয় এমন যে, তিনি হাকিমও আবার মাহবুবও, তাহলে বান্দার এ দুটি জাওহারের তাকাজা হবে যে, সে আল্লাহর মাহকুম (প্রজা) আবার আশেক। আর ঐ দুই সিফাতের তাকাজা হতে এই দুই ইবাদত সৃষ্টি হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথমটি হলো নামায, যাতে হাকিমে হাকিকী আল্লাহর সামনে নিজের প্রজাত্বতা, উৎসর্গতা, আনুগত্য ও দাসত্ব পেশ করা হয়। আর দ্বিতীয় হজ, যাতে মাহবুবে হাকিকী আল্লাহ তায়ালার সামনে নিজের জীর্ণ-শীর্ণতা, অপদস্থতা, মাতালতা, প্রাণ উৎসর্গতা ও কুরবানী পেশ করে। এ জন্য এ দুটি ইবাদত ইসলামের বুনিয়াদী আলোচ্য বিষয় হিসেবে পরিগণিত। এ কারণে যার মধ্যে ইসলাম বোঝা ও বোঝানোর জন্য লিখিত তথ্য-দলিল সংগ্রহ করার আগ্রহ উৎসাহ উথলে ওঠে, সে সর্বপ্রথম ইবাদত, বিশেষ করে নামায ও হজের জন্য তথ্য-দলিল সংগ্রহ করে।

আর নিঃসন্দেহে এ দুটি ইবাদত এ কাজের উপযুক্ত যে, তাদের উপর পৃথক কিতাব লেখা হবে। অতএব নামায সম্পর্কে হাজারো কিতাব লেখা হয়েছে, যার মধ্যে নামাযের মাসায়েল, নামাযের আফয়াল, নামাযের রূহ বা আত্মা, নামাযের রহস্য, নামাযের মাসালেহ (উপকরণ), নামাযের উদ্দেশ্য ও তার ফলাফল ইত্যাদি একত্রিত করা হয়েছে। এ সমস্ত কিতাবের বড় একটি সংখ্যা ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়।

এমনিভাবে মানাসিকে হজ (হজের বিধিবিধান) সম্পর্কেও কিতাবসমূহের একটি বড় ভাণ্ডার পাওয়া যায়, যা হজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করার জন্য সংকলন করা হয়েছে। যেমন– ফাযায়েলে হজ, মাসায়েলে হজ, দালায়েলে হজ, আসরারে হজ, আসারে (প্রভাব-প্রতিক্রিয়া) হজ, শিয়ারে হজ, মাকামাতে হজ, তারিখে হজ, জুগরাফিয়্যাতে (ভৌগলিক) হজ, তরিকে হজ ইত্যাদি বিষয়ে বড়-বড় কিতাব লেখা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এ দুটি বিষয় এমন অধিকার রাখে যে, তাদের সম্পর্কে বড়-বড় নোটবুক সংকলিত হবে আর তাদের হাকিকত শুধু সিনায় আমানত হিসেবে না থাকে। যেহেতু এ দুটি ইবাদত ইসলামের বুনিয়াদী ও হাকিকী ইবাদত ছিল, যা থেকে অন্যান্য ইবাদতসমূহ জন্ম নিয়েছে। তারপর তার মধ্যে বিশেষ করে হজের ইবাদত যেহেতু চলাফেলা ও সফর-ভ্রমণের ইবাদতে একজন হাজীর নিজের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা-চেতনা তৈরির ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন হয়, এ জন্য হজ সম্পর্কিত লেখনির মধ্যে সফরনামা বিষয়েও একটি বড় পা-ুলিপি পাওয়া

যায়, যা আহলে ইলম আলেম হাজীরা তাদের হজের সফরে লিখেছেন। তাঁরা তাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা পরবর্তী হাজীদের লাভবান হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। আর তাদের অভিজ্ঞতা হতে পরবর্তী লোকেরা বিভিন্ন জ্ঞানের ফায়দা অর্জন করেন। এ কথা তো স্পষ্ট যে, পূর্ববর্তীদের অভিজ্ঞতা পরবর্তীদের জন্য হজের পথে সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যম হয়।

## ইলমী হজ

খুশির কথা, আমাদের দীনি ভাই, যিনি বড় বুযুর্গ, মুখলিস ও অত্যন্ত দীনদার, মুত্তাকি আলেম হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেব গিয়াবী (দাঃ বাঃ) ফাযেলে দেওবন্দও নিজের হজের সফরে তাঁর আমলি হজকে ইলমী হজ বানানোর জন্য শুকরিয়াযোগ্য চেষ্টা করেছেন এবং হজের সফরে অবস্থাসমূহ ও অভিজ্ঞতাগুলোকে অত্যন্ত পরিপূর্ণতার সাথে সফরনামা আকারে সংকলন করেছেন। শুধু ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ হতে নয় বরং শরয়ী ও বিষয়ভিত্তিক হজের বিভিন্ন সাইডকে নিজের ইলম, আমল ও অভিজ্ঞতার আলোকে একত্রিত করেছেন, যার শিরোনামগুলো দেখে অনুমান করা যায়, তাতে তিনি হজের সকল ভিতরগত ও বাহিরগত সকল প্রয়োজনীয় বস্তুর আলোচনা করে, হজের মাসায়েল, ফাযায়েল, দালায়েল, শামায়েল, শিয়ারে আসার ও ক্বালয়ে হাওয়াদেস (বিপদাপদ দূরীভূত) ও জরুরিয়াতে হজ ইত্যাদির একটি গ্রহণযোগ্য ও বড়সড় পাণ্ডুলিপিতে একত্রিত করেছেন, যা তাঁর ইলম, আমল, ইখলাস ও ত্যাগের রাজকীয় কীর্তি। কারণ, এই সফরনামায় তিনি ইতিহাস, তাহকিক (প্রকৃত প্রমাণ) ফিকাহ, ইলমে কালাম, রেওয়ায়েত (বর্ণনামূলক জ্ঞান), দেরায়েত (যুক্তিগত বর্ণনা) এর প্রতিটি সাইড হতে হজকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে এসেছেন। তিনি হজকে আয়না বানিয়ে ছাত্রদের সামনে রেখে দিয়েছেন। লেখকের বিশেষ অনুগ্রহ হলো, তিনি মাসায়েলের সাথে সাথে নিজের স্বভাবগত অভিজ্ঞতা দ্বারাও দুনিয়াবাসীকে উপকারিতা পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন।

فجزاهم الله عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء

আল্লাহ তাঁকে আমাদের ও সকল মুসলমানদের পক্ষ হতে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

## 'আয়নায়ে হজ' ও আয়না প্রদর্শনী

সম্মানিত লেখকের খায়েশ ছিল, আমি যেন এ পুস্তিকা 'আয়নায়ে হজ' এর উপর ভূমিকা হিসেবে কয়েক লাইন লেখে দেই। তখন আমার সবচেয়ে দুর্যোগপূর্ণ সময় অতিবাহিত হচ্ছিল। অপরদিকে নিজের ইলমী স্বল্পতার কারণে এমন গুরুত্বপূর্ণ ইলমী বিষয়ে কলম ধরার সাহস হচ্ছিল না। উপরন্তু কিতাবটিও পরিপূর্ণ ছিল এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আয়না হওয়ার কারণে ভূমিকা ও পূর্ব কথার মোতাজও ছিল না। যেহেতু তাতে হজের রীতিনীতি ও বিভিন্ন সাইড বিদ্যমান ছিল এ জন্য তার খায়েশ আমলে আনা অসাধারণ দেরি হয়েছে। তারপর এই কটি লাইন, কোন না কোনভাবে সফরে ও বাড়িতে অল্প-স্বল্প সময় বের করে পূর্ণ করেছি এবং শুধু আয়নায়ে হজকে সোপর্দ করার জন্য পেশ করেছি, যাতে মানুষ তাতে নিজেদের চেহারা দেখে এই কিতাব ও তার নিজের পরিমাপ করতে পারে। অন্যথায় যতটুকু তাঁর মধ্যে হজের রীতিনীতি ও বিভিন্ন সাইড রয়েছে, এই 'আয়না' সম্পূর্ণ হজের নিজেই একটি আয়না, যার ধাতু দ্বারা হজের রীতিনীতির বিভিন্ন সাইডের উজ্জ্বল ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। তাতে অতিরিক্ততা ও বৃদ্ধিকরণের কোন সুযোগ নেই। নেই ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা। সুতরাং এ মুক্কাদমা 'আয়নায়ে হজ'-এ স্বয়ং নিজে দেখার জন্য আয়না হিসেবে পেশ করা হয়েছে। হজ দেখার জন্য নয় যে, হজ দেখার আয়না বানানো হবে। স্বয়ং সম্মানিত লেখকই এমন বড় মাপের আলেম ও কাবেল ছিলেন, যিনি তাকে বাস্তব আয়না বানিয়ে দুনিয়াবাসীকে দেখিয়ে গেছেন। আমার কাজ শুধু আয়না দেখানোই ছিল, যা বড় ভাল আন্দাযে বানিয়ে পেশ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে কবুল করুন এবং সম্মানিত লেখককে উত্তম প্রতিদান দান করুন আর সফরনামার এই চেষ্টাকে শুকরিয়া হিসেবে গ্রহণ করেন। আমীন।

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات

# বয়ান : ২

## নামাযের গুরুত্ব

দীনের অন্যান্য কর্মসমূহের স্থায়িত্ব মূলত নামাযের মাধ্যমে। তার কারণেই সময়ের নিয়মানুবর্তিতা হয়। তার কারণে আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব অন্তরে স্থান পায়। তার দ্বারাই দীনি কর্মসমূহের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তারপর সেগুলোকে আমলে পরিণত করার জন্য অন্তরকে বাধ্য করে।

মোদ্দাকথা, নামায আছে তো পূর্ণ দীন আছে। নামায নেই তো দীন নেই। আর মুসলমানদের দীন আছে তো দুনিয়া আছে, অন্যথায় দুনিয়া থাকবে না। সুতরাং নামায আছে তো পৃথিবী আছে, অন্যথায় বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত হতে হবে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.



# পূর্ব কথা

জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া দিল্লীর সিলভার জুবিলি অনুষ্ঠানের সময় ১৯ যিলহজ, ১৩৬৫ হিজরীতে জুমুয়ার নামাযের পর জামিয়ার নতুন মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর রাখা হয়। সে সময় জামিয়ার পরিচালক ও মাহফিলের এন্তেজামিয়া কমিটির পীড়াপীড়িতে হযরত মুহতামিম সাহেব রহ. একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ বয়ান দিয়েছিলেন, যা এতই ক্রিয়াশীল ও গ্রহণযোগ্য হয়েছিল যে, জামিয়া মিল্লিয়ার ওস্তাদ এবং অন্যান্য হযরতগণ হযরত মুহতামিম রহ.কে তাঁর বয়ানটি লিখে দেয়ার অনুরোধ করেন, যাতে প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে অনুপস্থিত মানুষদের পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব হয় আর তারাও তা দ্বারা এমনিভাবে লাভবান ও সন্তুষ্ট হতে পারেন, যেমনভাবে উপস্থিতগণ লাভবান হয়েছেন। যেহেতু ওখানে কর্মব্যস্ততা বেশি ছিল এবং সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ভিড় সবসময় লেগে থাকত, তাই সেখানে বয়ানটি লেখার সুযোগ হয়নি।

দেওবন্দ মাদরাসা ফিরে আসার পর এই নগণ্যের পীড়াপীড়িতে একেবারেই সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও হযরত রহ. এই খুতবাটি লিখে ধন্য করেছেন। যদিও পূর্ব বয়ানের পর আজ পর্যন্ত হুবহু লেখনিতে আনা স্বভাবগতভাবেই অসম্ভব। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এই লেখা যেহেতু হযরতের নিজের কলম থেকে প্রচারিত হয়েছে, তাই আসল বয়ানের চেয়ে কোনো অংশেই খারাপ হয়নি।

–সম্পাদক, মাসিক দারুল উলুম দেওবন্দ



اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ. وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ• وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ○ صدق الله العلى العظيم.

## বিশ্ব জগতের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য

সম্মানিত শ্রোতৃম-লী! এ সময়ে আমার বয়ান করার কোন মঞ্জুরি ছিল না এবং তার প্রোগ্রামও ছিল না। আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি যেন মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে' আপনাদের দ্বারা দোয়া করাই। এ কথা তো স্পষ্ট যে, দোয়া করানোর বস্তু নয়; বরং করার বস্তু। আপনারাও দোয়া করবেন আর আমি আপনাদের সাথে দোয়ায় শরীক হব। কারণ, দোয়া করানোর জন্য আমি দাঁড়াইনি। আমার উদ্দেশ্য শুধু দোয়ার পূর্বে দোয়ার সূক্ষ্ম বিষয়াবলির প্রতি মনোযোগ প্রদান করা যে, কোন-কোন বিষয়ে দোয়া করবেন আর

আল্লাহ তায়ালার নিকট কোন-কোন উদ্দেশ্যগুলো প্রার্থনা করবেন। কারণ, এখন সাধারণ দোয়া উদ্দেশ্য নয় বরং বিশেষ দোয়া উদ্দেশ্য। সুতরাং এ দোয়ার সূক্ষ্মা বিষয়গুলোও বিভিন্ন সাইড নিয়ে এমনভাবে চিন্তা করা হবে যে, সমস্ত বিশ্বজগতের ফলাফল এবং সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য হলো মানুষ, যাদের জন্য আসমান-জমিনের এই সমস্ত তাঁবু টাঙানো হয়েছে। যদি মানুষ সৃষ্টির মঞ্জুরি না হতো, তাহলে বিশ্বজগত সৃষ্টিও কাজে আসত না। অতএব সমগ্র বিশ্বজগত মানুষের খাতিরে বানানো হয়েছে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ

নিঃসন্দেহে সমগ্র দুনিয়া তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তোমাদের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। *[সূরা বারাকা ২:২৯]*

অন্যত্র ইরশাদ করেন–

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِیَ فِی الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ۚ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دَآىِٕبَیْنِ ۚ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الَّیْلَ وَ النَّهَارَ ۚ وَ اٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ؕ

তিনিই আল্লাহ, যিনি আসমান ও জমিনসমূহ সৃজন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তারপর তা দ্বারা তোমাদের জন্য রিযিক উৎপন্ন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের অনুগত করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে সাগরে চলাফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। সূর্য ও চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে এবং রাত ও দিবসকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন। যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদের দিয়েছেন। চাই সেই দোয়া

ইচ্ছায় হোক বা আমল দ্বারা হোক' *[সূরা ইবরাহীম ১৪:৩২-৩৪]*

সুতরাং আসমান, জমিন ও রাত দিনের আসা-যাওয়া, গাছপালা, পাথর ইত্যাদির সবকিছুই মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, যা দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বিশ্বজগত সৃষ্টির সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য হলো মানুষ।'

তারপর প্রশ্ন জাগে, তবে মানুষ কিসের জন্য? এটা তো স্পষ্ট যে, জগতের জন্য নয়। অন্যথায় জগত মাধ্যম হওয়ার স্থলে মূল মাকসাদ হয়ে যাবে। আর এটা তো জ্ঞান-বুদ্ধি, ইতিহাস ও দর্শনসহ সবকিছুর বিপরীত যেমনটি স্পষ্ট হয়েছে। তাই মানুষ জগতের জন্য নয়; বরং জগতের সৃষ্টিকর্তার জন্য। অর্থাৎ তাঁর ইবাদতের জন্য। তাঁর সামনে মাথা নত করা, কাকুতি-মিনতি করা এবং তাঁর পুরোপুরি গোলামি প্রকাশ করার জন্য। সুতরা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো ইবাদত। আর মানতেক শাস্ত্রের রীতিতে এ ফলাফল বের হয় যে, বিশ্বজগৎ মানুষের জন্য এবং মানুষ ইবাদতের জন্য; তাহলে সমগ্র বিশ্বজগতের এই ব্যবস্থাপনা ও সৃষ্টি শুধু ইবাদতের জন্য কাজে লেগেছে।

## ইবাদতের পরিপূর্ণ একক

ইবাদতসমূহে যদি গভীর চিন্তা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে, পরিপূর্ণ, একক ও অদ্বিতীয় ইবাদত হলো নামায। কেমন যেন সারাবিশ্ব নামাযের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এটিই অদ্বিতীয় ইবাদত হওয়ার পরিপূর্ণ প্রতিবেদন ও সাক্ষী। বরং আমি একটু আগে বেড়ে বলব, ইবাদতের তালিকায় ইবাদত শুধু নামায। অন্য কোন বস্তু সত্তাগতভাবে ইবাদত নয়। কারণ, ইবাদতের অর্থ হলো সর্বোচ্চ লাঞ্ছনা ও যিল্লতি গ্রহণ করা, যা সর্বোচ্চ ইজ্জতওয়ালার সামনে গ্রহণ করা হয়। স্পষ্ট হয়ে গেল, উল্লিখিত অর্থে নামায ছাড়া অন্য কোন বস্তু সত্তাগতভাবে ইবাদত পাওয়া যায় না। যেমন রোযা, সত্তাগতভাবে ইবাদত নয়। কারণ, রোযার অর্থ হলো খাওয়া, পান করা এবং নফসের সকল স্বাদ হতে অমুখাপেক্ষী হয়ে যাওয়া। আর এ কথা স্পষ্ট যে অমুখাপেক্ষিতা স্বয়ংসম্পূর্ণ যিল্লতি নয়। কারণ, অমুখাপেক্ষি স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার শান। নাউযুবিল্লাহ সৃষ্টিকর্তার শান গ্রহণ করার মধ্যে কোন ধরনের বেইজ্জতি নেই। আর সাদকা ও যাকাত দেয়াকে দান-দক্ষিণা বলে। আর আতা তো স্বয়ং আল্লাহর সিফাতী নাম। নাউযুবিল্লাহ! তাতে কোন প্রকার যিল্লতি নেই। সত্য বলা; এটিও আল্লাহর শান। তাহলে তাকে ইবাদত ও সর্বোচ্চ বেইজ্জতি কিভাবে বলা হবে। এমনিভাবে সকল আখলাকে হাসানাহ (উত্তম চরিত্র) এবং

ফযীলতসম্পন্ন আমলগুলোতে সত্তাগত বেইজ্জতি নেই যে, তাদেরকে ইবাদত বলা যায়। তবে তারপরও এগুলোকে ইবাদত বলা হয় শুধু আল্লাহ তায়ালার আদেশ মান্য করার কারণে, সত্তাগতভাবে নয়। হ্যাঁ, নামায সত্তাগত ইবাদত। কেননা, তার অবস্থা এমন- কিরাম (দাঁড়ানো), কুউদ (বসা) রুকু এবং সর্বশেষে সিজদায় নাক ও কপালকে জমিনে লাগিয়ে সর্বোচ্চ যিল্লতি ও গোলামি প্রকাশ করা হয়। তাতে যিকির রয়েছে, রয়েছে আত্মত্যাগ ও রবের ইজ্জতের ঘোষণা। আর এগুলো হলো যিল্লতির অবস্থা বা শান।

মোদ্দাকথা, নামাযের অবস্থা ও বাস্তবতা সবগুলোই বেইজ্জতি ও গোলামী প্রদর্শন।

মোটকথা, বিশ্ব সৃষ্টির কারণ গোলামী অর্থাৎ নামাযের কারণে হয়েছে। এ জন্যই কুরআনে কারীমে সমগ্র বিশ্বের নেযামকে নামাযের নিয়মানুবর্তিতা প্রকাশ করেছেন – যাকাত, রোযা, হজ ও সদকার নয়। ইরশাদ হয়েছে–

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ

প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি ও স্বভাবগতভাবে নিজের নামায ও তাসবীহ অর্থাৎ নামাযের সুরত ও যিকির জেনে নিয়েছে। *[সূরা নূর ২৪:৪১]*

এতে প্রতীয়মান হয় যে, সবগ্র বিশ্বই নামাযী। সুতরাং মানুষকে কেন নামাযী বানানো হবে? তবে পার্থক্য এতটুকু যে, অন্যান্য সৃষ্টজীব গায়রে আকেল (জ্ঞান-বুদ্ধিহীন) তাই তাদের মাঝে নামাযের দাবিকে স্বভাব বা প্রকৃতিগত ও সৃষ্টিগতভাবে রেখে দেয়া হয়েছে। আর মানুষ হলো আকল ও অনুভূতিসম্পন্ন প্রাণী। এ জন্য তাদের নামায ইচ্ছাধীন, যার জন্য হেদায়েত, রাহবারী, ওয়াজ-নসিহতের প্রয়োজন হয়। সুতরাং মানুষ যদি নামাযী না হয়, তাহলে সে যেন নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে নষ্ট ও বিলুপ্ত করে ফেলল। এ জন্য হযরত উমর ফারুক রা. তার খেলাফতকালে সমস্ত মুসলিম জনগণের উপর এই ফরমান জারি করেছিলেন- 'নামায আছে তো পূর্ণ দীন আছে।' তিনি বলেন:

إِنَّ اَهَمَّ اُمُوْرَ دِيْنِكُمْ عِنْدِىَ الصَّلٰوةُ، فَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا اَضْيَعُ

আমার নিকট তোমাদের ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো নামায। যে ব্যক্তি নামাযকে নষ্ট করে দিবে সে দীনের অন্যান্য কর্মকে তার চেয়ে বেশি নষ্ট করবে। এতে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, দীনের অর্থাৎ কর্মসমূহের স্থায়িত্ব বাস্তবে নামাযেরই দ্বারা। তার দ্বারাই সময়ের নিয়মানুবর্তিতা হয়। তার দ্বারা

আল্লাহর বড়ত্ব অন্তরে বদ্ধমূল হয়। তার মাধ্যমে দীনের কর্মসমূহের সম্মান বৃদ্ধি পায়। তারপর সেগুলো পালনে অন্তরকে বাধ্য করে।

মোটকথা, নামায আছে তো দীন আছে, নামায নেই তো দীন নেই। আর মুসলমানদের দীন আছে তো দুনিয়া আছে, অন্যথায় দুনিয়া থাকবে না। সুতরাং নামায আছে তো পৃথিবী আছে। অন্যথায় বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা। অতএব নামাযের এই উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্য ভিত্তিপ্রস্তর রাখা হয়েছে, যাতে নামাযকে শরয়ী পন্থায় এই পবিত্র স্থানে আদায় করা যায়। নামায তায়ালুক মাআল্লাহর পূর্ণ নমুনা। এ জন্য আমি বলতে পারি, এখন পর্যন্ত জামিয়া মিল্লিয়া নিজের অনুষ্ঠানসমূহের রেওয়াজ আদায় করেছে। আর এখন মূল বিষয় আদায় করছে। ঐ বস্তু ও কর্মগুলো ছিল লোকদেখানো। বাস্তবতা শুধু এটিই যা আমি এখন পূর্ণ করছি, যার দ্বারা জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণতা পায়। নামায তায়ালুক মাআল্লাহর পূর্ণ নিদর্শন। যদি নামায ও তায়ালুক মাআল্লাহ কায়েম থাকে, তাহলে এ সকল প্রথাগত কর্ম যা আমরা আদায় করছি, সেগুলোকে প্রাণবান ও জীবন্ত বলা যাবে। অন্যথায় ঐ সকল বস্তু যেগুলো বার্ষিক রেওয়াজ হিসেবে পালন করা হয়, সবই প্রাণহীন ও মুর্দা লাশ প্রমাণিত হবে। আর রসমের পরিণাম হয় এমন যে, কিছু দিন পর তা গলে যায়, বিকৃত হয়ে যায়, ফুলে ফেটে যায় এবং তার দুর্গন্ধে দেমাগ বিগড়ে যায় আর অনুভূতিশক্তিও নষ্ট হয়ে যায়। শুধু তায়ালুক মাআল্লাহই পারে বার্ষিক প্রথাগত কর্মসমূহের আকৃতিগুলোকে সংশোধন করতে। অন্যথায় তায়ালুক মাআল্লাহ ও আওয়ামেরে ইলাহীর মাধ্যম ছাড়া এ রেওয়াজগুলো ভণ্ডামি ও বিকৃত প্রমাণিত হবে। সুতরাং এই মসজিদের ভিত্তিপ্রস্থর রেখে এবং নামাযী হয়ে বাস্তবে আমরা এটি প্রস্তুত করছি যে, নিজের প্রথা ও রেওয়াজগুলোর আকৃতি-প্রকৃতি শুদ্ধ করে নেব। আর তাতে বাস্তবতা ও আত্মা সৃষ্টি করব, যাতে আমাদের সকল কর্ম স্থায়ী ও মজবুত হয় এবং পরিশেষে ফলদায়ক হয়। আর প্রাণহীন লাশের ন্যায় নষ্ট ও শিকড়হীন গাছের ন্যায় ফলহীন না হয়।

## নামাযে কেয়াম দ্বারা বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি উদ্দেশ্য

এ জন্য আমাদের দোয়া করতে হবে, হে আল্লাহ! আমাদের নামাযের তাওফিক দাও এবং নামাযের জন্য আমাদের এই পবিত্র মসজিদের নির্মাণ পূর্ণ করে দাও। আর মসজিদ নির্মাণকারী, সাহায্যকারী এবং মসজিদ কমিটির এই আমলকে কবুল করে নাও। আমাদেরকে আল্লাহর দরবারে এও প্রার্থনা

করতে হবে যে, তিনি যেন এই নামাযের উছিলায় আমাদের হাতে জামিয়ায় এমন পরিবেশ কায়েম করে দেন, যার মধ্যে নেকীসমূহ জন্ম নেয় এবং দিন-দিন উন্নতি হয় আর বদ ও খারাপ কর্ম একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যায়। বর্তমান পরিবেশে তো কোন নেকীর কাজ করলে সে লজ্জিত হয় এবং লজ্জায় মুখ ঢাকে। কেমন যেন সে বড় কোন অন্যায় করে ফেলেছে। অপরদিকে অপরাধী অন্যায় করে গর্বে মাথা উঁচু করে। কেমন যেন সে দুনিয়ার কোন সম্মানজনক কাজ সমাধা করেছে। আমরা আল্লাহর সাহায্য নিয়ে এবং নামায কায়েম করে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করব যে, মানুষ নেক কাজ করে মাথা উঁচু করবে আর গোনাহের কাজ করে বা শরীয়তবিরোধী কাজ করে মাথা নিচু করে রাখবে এবং মুখ ঢেকে রাখবে আর নিজের অপরাধ ও খারাবী অনুভব করবে।

বর্তমানকালে মূর্খ ও অলস মানুষের উপাধী হলো জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও বীর ইত্যাদি আর ঈমানদারদের উপাধি হয় আহমক, পাগল, মাতাল ও বেকুফ ইত্যাদি। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

يُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَلَيْسَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيْمَانِ.

মানুষকে বলা হবে, সে কতই জ্ঞানী, কতই না বুদ্ধিমান আর কতই না বাহাদুর! অথচ তার অন্তরে সামান্যতম ঈমানের চিহ্নও নেই।

অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে, সেখানে ইরশাদ হয়েছে, আমানতদারকে খেয়ানতকারী বলা হবে আর খেয়ানতকারীকে আমানতদার বলা হবে। আলেমদের এতটুকু সম্মান-ইজ্জত থাকবে না, যতটুকু একটা মৃত গাধার লাশের হয়ে থাকে। এমন বস্তুই আজ দেখা যাচ্ছে। মুত্তাকি-পরহজেগারদের নাম দেয়া হচ্ছে সাম্প্রদায়িক, পাগল, আহমক, বোকা মোল্লা প্রভৃতি, আর ফাসিক-পাপীদের উপাধী হচ্ছে জ্ঞানী, অভিজ্ঞ, উজ্জ্বল, নির্মল ইত্যাদি। তো আমরা তায়ালুক মাআল্লাহর অধিকারী লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করব যে, তাতে প্রত্যেককে তার উপযুক্ত উপাধীতে ডাকা হবে এবং তার সম্মান অনুপাতে তার সাথে আচরণ করা হবে। সুতরাং দোয়ার মধ্যে আমাদের এই সূক্ষ্ম বিষয়টি যুক্ত করার প্রয়োজন যে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে মুত্তাকিদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং নামাযী বানিয়ে আমাদেরকে নেককার বানান এবং নেককারদের ইজ্জত-সম্মান, শান-শওকত দুনিয়াতে

প্রতিষ্ঠিত করুন। আমাদের বস্তুগত শান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি যদি অর্জিত হয়, সামরিক কায়দায় যার মহড়া দিয়ে যেন আমরা তা অর্জন করার আগ্রহ প্রকাশ করছি, তার ফলাফল ও চূড়ান্ত লক্ষ্যও নামাযই। মানে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক।

## ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۭ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ○

তারা এমন লোক, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহরই ইখতিয়ারভুক্ত। *[সূরা হজ : ৪১]*

সুতরাং আমাদেরকে হেদায়েত করা হচ্ছে যে, মুসলমানদের দুনিয়াবী উন্নতি-অগ্রগতি এবং রাজত্ব ও ইমারাত এ জন্য নয় যে, কেক-পেস্ট্রির ফিকিরে ডুবে থাকব, অট্টালিকা নির্মাণ হবে তার মুখ্য উদ্দেশ্য আর ডিম, ঘি, মাখন হবে তার শেষ ইচ্ছা। বরং তার উন্নতি এ জন্য হবে যে, সে আল্লাহর দরবারে অবনত হবে, সিজদা করবে এবং তাঁর সৃষ্টিজীব মানুষকে অবনত করাবে, সিজদা করাবে। দুনিয়াতে ভালো কর্মের প্রসার করবে আর মন্দ ও অন্যায় কর্ম হতে দুনিয়াকে পবিত্র করবে। যাকাত, সদকা দ্বারা গরিব-দুস্থদের অভাব-অনটন দূর করবে, অভাবীদের অন্তরকে শান্ত করবে। ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, সহমর্মিতায় পৃথিবী ভরে দেবে। প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও অহংকার-বড়াই এবং হিংসা-ফাসাদের মূল উৎপাটন করবে।

## নামাযী বা নামাযের ফলাফল

সুতরাং শুধু এমন দোয়া করা যে, হে আল্লাহ! আমাকে উন্নতি দান কর, যাতে আমরা তোমার এ পবিত্র স্থানে একত্রিত হয়ে তোমাকে স্মরণ করতে পারি। আর এ গাফেল, ধোঁকাবাজ ও ভ্রান্ত দুনিয়াকে ব্যাপারে হুশিয়ার বানিয়ে দাও। অতএব এ কাজ করার জন্য আমরা এই পবিত্র মসজিদে দলবদ্ধভাবে একত্র হয়েছি আল্লাহর নিকট একাজের তাওফিক ভিক্ষা চাওয়ার জন্য।

মোদ্দকথা, আমরা আমাদের দোয়ায় নামায, নামাযের স্থান মসজিদ নির্মাণ পূর্ণ করার তাওফিক, নামাযের শান-শওকতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করার তাওফিক, নামাযের জন্য সন্তাগত শওকত প্রস্তুত করার তাওফিক এবং নামাযের মাধ্যমে নিজের আকৃতি, চরিত্র ও বাস্তবতাকে পবিত্র ও চাহিদা অনুপাতে অর্জন করার তাওফিক প্রার্থনা করছি। অর্থাৎ যা কিছুই চাওয়া হয় তা নামাযী ও নামাযের ফলাফল অথবা নামাযের ভিত্তি ও মাধ্যম হবে। আমরা শুধু দুনিয়াতে নামাযই চাই। আর নামাযের জন্য প্রতিটি কাজকে চাই।

যদি বাস্তবে আমার এমন জীবন লাভ হয়ে যায়, তাহলে কুরআনের ভাষায় এমন জীবনকে বলা হয় হায়াতে তাইয়্যেবা বা পবিত্র জীবন। আর তারই নাম উসওয়ায়ে হাসানাহ বা উত্তম আদর্শ এবং পবিত্র চরিত্র, যার জন্য ইসলাম এসেছে এবং নবীদের ধারাবাহিকতা কায়েম করা হয়েছে। অতএব দোয়ার এ কয়েকটি সূক্ষ্ম বিষয় ছিল, যার উপর আলোকপাত করার জন্য আমি দাঁড়িয়েছিলাম। আমার বক্তৃতা দেওয়া বা নামাযের বিষয়ে লম্বা বিস্তারিত আলোচনা করাও মঞ্জুর ছিল না। তাই এখন আপনারা সবাই হাত উঠান এবং নিজেদের দয়ালু রবের দরবারে উল্লিখিত সূক্ষ্ম বিষয়গুলোর উপর ইখলাসপূর্ণ দোয়া করুন।

# বয়ান : ৩

## রমযান এবং তার উদ্দেশ্য ও বরকত

এমন মুমিন ব্যক্তি কিভাবে ধ্বংস হতে পারে, যার ইবাদতি বছরের সূচনা হয় রমযানুল মোবারক দ্বারা, মধ্য সময়ে রয়েছে হজের মাসসমূহ ও মুহাররামুল হারাম আর শেষভাগে রয়েছে শাবানে মুয়াযযাম। সুতরাং যে মুমিনের জীবনের উপর এমনভাবে বছর অতিবাহিত হতে থাকে, তাতে তার জীবন পূর্ণ হয়ে যায়। তাহলে অবশ্যই তার অন্তর শুরু, মধ্যম ও শেষ-এর সাথে সাথে সম্মানের মোহ ও অযাচিত যৌনতা পরিহার করার মাধ্যমে নফসানি খারাবি হতে পবিত্র হবে। আর তা আনুগত্য ও দাসত্বের কর্মসমূহ এবং নেকের মাধ্যমে নূর ও বরকতে উজ্জ্বল হয়ে যাবে। তার মন্দ স্বভাব দূরীভূত হবে এবং তাতে ফাযায়েল ও সৌন্দর্য প্রবেশ করবে। আর সে জাহান্নাম হতে বেঁচে যাবে এবং নূরের দ্বারা সম্মানিত হবে– এটাই হল প্রকৃত সফলতা ও কামিয়াবী।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ. وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ • شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ۔

## স্বভাব বা তবিয়তশুদ্ধি

একটি উন্নত মানের বাগানের বাহার, বৃদ্ধি এবং তার মনোরম ও নজরকাড়া সবুজতা ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের আসল উচ্চতায় পৌঁছতে পারবে না, যতক্ষণ তার জমিনকে আগাছা-পরগাছা, খড়কুটো ও ময়লা-আবর্জনা হতে পরিষ্কার না করা হয়। এমনিভাবে কোন পাত্রে ততক্ষণ পর্যন্ত উজ্জ্বলতা ফিরে আসে না, যতক্ষণ তার থেকে মরিচা দূর করে জন্মগত মূল রঙ ফিরিয়ে আনা না হয় এবং তার উপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ময়লা পরিষ্কার করা না হয়। এমনিভাবে কোন দামি কাপড়ে নজরকাড়া রং ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকাশ পায় না, যতক্ষণ তা থেকে ময়লা ও বিভিন্ন দাগ পরিষ্কার না করা হয়।

উক্ত আলোচনা হতে বিধান বের হয়ে এল যে, কোন জিনিসই তাহজিব-তামাদ্দুন ও কর্মশুদ্ধির মাধ্যমে শত উন্নত ধাতু দ্বারাও ততক্ষণ পর্যন্ত

সুশোভিত করা যায় না, যতক্ষণ না তার ভিতরগত খারাবিগুলো এবং খারাবীর মূল ধাতুকে নিঃশেষ করে তার স্বভাব ও তবিয়ত পরিষ্কার করা হয়।

## কল্যাণের ভিত্তি

ঠিক তেমনিভাবে এই মৌলিক উসুল অনুযায়ী বিশ্বজগতের আশরাফ (সেরা) ও আসল এবং উত্তম রুকন (ভিত্তি) মানুষকে দেখ যে, তাকেও নেকী, ভদ্রতা, বুযুর্গী, মহত্তম এবং প্রকাশিত ভিতরগত ফযল ও কামাল দ্বারা ঐ পর্যন্ত সাজানো যায় না, যতক্ষণ তার ভিতরগত খারাবী হিংসা ও স্বভাবজাত দোষ-ত্রুটি, চারিত্রিক মন্দভাব, নাপাকীর উৎসস্থল তাকে পরিষ্কার ও পবিত্র না করা হয়। আর নেক কাজে ব্যবহার হয় এমন কর্মের উৎস ঐ পর্যন্ত শিকড় ধরতে পারে না বা মজবুত হতে পারে না, যতক্ষণ তার ভিতরগত খারাবী হিংসা ও স্বভাবজাত দোষ-ত্রুটি, চারিত্রিক মন্দভাব, নাপাকীর উৎসস্থল হতে তাকে পরিষ্কার-পবিত্র না করা হয়। আর নেক কাজে ব্যবহার হয় এমন কর্মের উৎস ঐ পর্যন্ত শিকড় ধরতে পারে না বা মজবুত হতে পারে না, যতক্ষণ তার জাহের ও বাতেনকে নিজস্ব রঙ ও কামনা-বাসনার রঙ হতে পবিত্র বানানো না হয়। আর তার অন্তর জমিনে ঈমান ও হেদায়েতের পবিত্র বৃক্ষ ঐ সময় পর্যন্ত তরতাজা হয় না ও ফল পেতে পারে না, যতক্ষণ তাকে নিজস্ব ওসওয়া ও নফসে সৃষ্ট সন্দেহ ও অস্থায়ী স্বাদের খারাবীকে খুটিয়ে-খুটিয়ে বের করে ফেলে দেওয়া না হয়।

## শূন্যকরণ ও পূর্ণকরণ

এমতাবস্থায় কুদরতিভাবে মানবিক তাহযীব-তারবিয়াত অর্থাৎ শিক্ষা-দীক্ষার দুটি আমল নির্ধারণ হয়ে যায়। একটি করণীয় আর অপরটি বর্জনীয়। অর্থাৎ কিছু করণীয় জিনিস, যা তার দ্বারা করানো হয়। কেমন যেন তার আত্মায় ভরে দেয় হয়। আর কিছু বর্জনীয় বস্তু, যা তার আত্মা হতে বের করা হয়। করণীয় বস্তুগুলো দ্বারা তার আত্মা ভাল ও সৌন্দর্য দ্বারা সজ্জিত হবে এবং বর্জনীয় বস্তুগুলো দ্বারা তার আত্মা মন্দ ও শয়তানি হতে পবিত্র হবে। এমনিভাবে মানবিক তারবিয়াত (দীক্ষা) দুই আমলের সমষ্টিতে গঠিত হয়। একটি তাহলিয়্যাহ (পূর্ণকরণ) অপরটি তাখলিয়্যাহ (শূন্যকরণ)। অর্থাৎ খালি করা ও ভরা। তাখলিয়্যার মাধ্যমে তাকে মন্দ আত্মা হতে পবিত্র করা হয়, আর তাহলিয়্যাহর মাধ্যমে তাকে ফাযায়েল দ্বারা সজ্জিত করা হয়। যতক্ষণ

হ্যাঁবাচক ও না-বাচক উভয় আমলকে তার মধ্যে জারি না করা হয়, ততক্ষণ, না তার তাহযীব পূর্ণতা লাভ করতে পারে, না নেক ও হেদায়েতের নূরে আলোকিত হতে পারে। এ কারণে আল্লাহর দেয়া শরীয়ত (বিধিবিধান) যা মানুষের তাহযীব ও ইসলাহের জিম্মাদার হয়ে এসেছে আর নাযিল হয়েছে দু-অংশের মিলিত রূপ ধারন করে। একটি আমর (আদেশ) অপরটি নাহী (নিষেধ)।

অর্থাৎ এক অংশ মামুরাত (আদেশমূলক কর্ম)-এর, যেগুলো পালন করতে হুকুম করা হয়েছে, যাতে আত্মা তার কল্যাণ অর্জন করতে পারে। অপরটি হলো মানহিয়্যাত (নিষিদ্ধমূলক কর্ম)-এর, যেগুলো থেকে বেঁচে থাকতে হুকুম করা হয়েছে, বর্জন করতে বলা হয়েছে, যাতে আত্মার বদনসীব দূর হয়ে যায়। অতএব মামুরাতকে করণীয় কর্মের প্রকাশ মনে কর আর মানহিয়্যাতকে বর্জনীয় কর্মের প্রকাশ মনে কর। এই নেকীর মামুরাতগুলো, যার জাতি ও বিধানগত নাম হলো শরীয়তের ভাষায় মারুফ আর মানহিয়াতগুলো যার জাতি ও বিধানগত নাম শরীয়তের ভাষায় মুনকার। এ থেকেই 'আমরে বিল মারুফ ও নাহি আনীর মুনকার' এ বাক্যটি তাবলীগি পরিভাষায় পরিণত হয়েছে তা সবারই জানা। আর কুরআনুল কারীমের স্থানে-স্থানে তার তাগিদ দিয়েছে। কোথাও তার হুকুম করা হয়েছে–

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ۭ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ۝

সৎ কাজের আদেশ কর, অসৎ কাজে নিষেধ কর আর বিপদে সবর কর। নিশ্চয়ই এটি সাহসিকতার কাজ। *[লুকমান : ১৭]*

কোথাও উম্মতের কল্যাণে 'আমরে বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার'-এর উপর সীমাবদ্ধ করে ইরশাদ হয়েছে–

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

সমস্ত উম্মত হতে তোমরা উত্তম উম্মত, যাদেরকে সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করে যাও আর অসৎ কাজে বাধা দিতে থাক। *[আলে ইমরান : ১১০]*

কোথাও উম্মতের উন্নতি ও উচ্চ মর্যাদার কারণ 'আমরে বিল মারুফ ও নাহি আনীল মুনকার'কে নির্ধারণ করেছেন।

ইরশাদ হয়েছে–

النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ ۡ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ

উম্মি নবী, যার সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদের নির্দেশ দেন সৎ কাজের, বারণ করেন অসৎ কর্ম থেকে। *[সূরা আরাফ : ১৫৭]*

## সৎকর্মের নেযাম

শরীয়তের এ সকল মামুরাত, মারুফাত বা আদেশসূচক কর্মগুলো যেগুলো নেক কর্মের অন্তর্ভুক্ত, শরীয়তের পরিভাষায় সেই কর্মগুলোকে বির্ (সৎ কর্ম) বলে। আর যে সকল মানহিয়াত, মুনকারাত বা নিষিদ্ধ কর্ম, যেগুলো পরিহারযোগ্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত, তা থেকে বেঁচে থাকার পারিভাষিক নাম তাকওয়া। তাই পুরো শরীয়তের সারাংশ হলো বির্ ও তাকওয়া, যার উপর মানুষের সৎ কর্মের নেযাম প্রতিষ্ঠিত। যদি নেকী বা কল্যাণের কর্মগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়, তাহলে কল্যাণ অর্জনের নেযাম এলোমেলো হয়ে যাবে, যাকে শরীয়তের পরিভাষায় গোনাহ বলে। আর এই গোনাহ বা পাপই হলো সকল অসৎ কাজের উৎস বা মূল। আর যদি তাকওয়াকে বন্ধ করে দেয়া হয়, তাহলে মন্দ প্রতিরোধের নেযাম ওলট-পালট হয়ে যাবে। তার পারিভাষিক নাম উদওয়ান বা সীমালঙ্ঘন।

আল্লাহ তায়ালার নির্ধারণ করা সীমানা অতিক্রম করা সকল ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারী সামানের মূল উৎস। সুতরাং কোন মানুষই শুধু নেকীর কর্ম দ্বারা সফলকাম হতে পারবে না, যতক্ষণ তাকওয়াবিরোধী কর্মকাণ্ড পরিহার না করে। আর কোন মানুষ শুধু তাকওয়াবিরোধ বস্তু পরিহার করে কামিয়াব হতে পারবে না, যতক্ষণ তার মধ্যে নেক কর্ম ও তার কার্যকারিতা না থাকে। এখন যেহেতু বির্ ও তাকওয়া, নেক কর্ম ইখতেয়ার করা এবং খারাপ কর্ম পরিহার করা, এই হ্যাঁবাচক ও নাবাচক আমলের সমষ্টিগত শব্দ থেকে দীন ও তাহযীব-তামাদ্দুনের নেযাম মজবুত হয়, এ কারণে ইসলামী শরীয়ত এ

দুটোর মধ্যে পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা করার এবং তার বিপরীত গোনাহ ও সীমালংঘনমূলক কর্মে সাহায্য-সহযোগিতা না করার দাওয়াত দিয়েছে। আল-কুরআন পূর্ণ শরীয়তের এই বুনিয়াদী তাফসীর অর্থাৎ পূর্ণ শরীয়তের আমর ও নাহির এই নেযামকে এ দুটি পরিপূরক ও আশ্চর্যবোধক বাক্যে ব্যক্ত করেছে, যা দ্বারা এই প্রকারগুলোর পারিভাষিক নামও নির্ধারণ হয়ে যায়।

وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى ۖ وَ لَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

সৎ কর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।
*[সূরা মায়েদা : ২]*

কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, বির্ ও তাকওয়ার পালনীয় ও বর্জনীয় কর্মগুলোর শুধু শাব্দিক ধাতুগত সৌন্দর্য এবং উন্নতি দ্বারা মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত স্বয়ং মানুষের মধ্যেও বির্ ও তাকওয়া গ্রহণ না করে এবং তা দ্বারা প্রভাব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার যোগ্যতা না থাকে। আর তার মধ্যে এমন শক্তি না থাকে, যা এ বির্ ও তাকওয়া অর্জনের প্রতি ধাবিত থাকবে আর তা সহ্য করবে, যা দ্বারা মানুষের আত্মায় সৎকর্ম ও তাকওয়ার রঙ আহরণ করতে পারে। অন্যথায় যদি ভিতরগত যোগ্যতা ব্যতীতই সৎকর্ম ও তাকওয়ার খেতাব শুদ্ধ হতো অথবা শুধু সৎকর্ম ও তাকওয়ার শরয়ী নেযামের সৌন্দর্য ও উত্তমতাই আত্মাসমূহ তাদেরকে স্থান দিয়ে দিত, তাহলে অন্যান্য প্রাণীদের কেন শরয়ী মুকাল্লাফ হতে দূরে রাখা হয়েছে? তাদেরকে সৎকর্ম ও তাকওয়ার মুকাল্লাফ না বানানোর পিছনে এ ছাড়া আর কী কারণ হতে পারে যে, তাদের মধ্যে সৎ কর্মী ও মুত্তাকি, নেককার ও পরহেজগার হওয়ার অথবা সৎকর্ম ও তাকওয়ার কবুল করার কোন শক্তি ও যোগ্যতা বিদ্যমান নেই। শুধু এ কারণেই বির্ ও তাকওয়ার শরয়ী নেযাম উচ্চতর ও মজবুত হওয়া তাদের জন্য প্রয়োজন নেই, তাদের কাজে লাগেনি। এ জন্য কুদরতিভাবে এই ফলাফল বের হয়ে আসে যে, যদি আল্লাহ মানুষকে বির্ ও তাকওয়ার মুকাল্লাফ স্থির করেন, তাহলে জরুরি হলো তার মধ্যে বির্ ও তাকওয়ার নেযাম কবুল করার মত শক্তিও থাকতে হবে, যার উপর ভিত্তি করে বির্ ও তাকওয়ার নেযাম কার্যকরী হবে। আর মানুষ সৎকর্মী, মুত্তাকি, নেককার ও পরহেজগার হবে।

তেমনিভাবে মানুষের মাঝে গোনাহ ও সীমালঙ্ঘনের যোগ্যতা থাকাও জরুরি, যা দ্বারা সে গোনাহ ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে লিপ্ত হতে পারে; এমনকি হয়েও যায়। আর শরীয়ত তাকে এই খারাপ কর্ম থেকে বাধা দান করবে। যদি তার মধ্যে গোনাহ করার মাদ্দা না হতো, তাহলে সে কখনও গোনাহ ও সীমালংঘন করত না। আর এই অবস্থায় সে গোনাহ ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে লিপ্ত হবে না। এ কথা তো স্পষ্ট যে, যেমনভাবে এ আদেশ করা হাকীমসুলভ, হেকমতপূর্ণ নয়, তেমনিভাবে গোনাহ ও সীমা লঙ্ঘনের মাদ্দা ব্যতীত মানুষকে গোনাহ না করার আদেশ করা বেহুদা ও অনর্থক, যা থেকে মহান আল্লাহ মুক্ত। তাই জরুরি হলো, মানুষের ভিতরেও গোনাহ ও সীমালঙ্ঘনের মাদ্দা থাকবে এবং সে গোনাহে লিপ্ত হতে পারে আবার হয়েও থাকে। তারপর তাকে তা থেকে বাধা দেয়া হলে আর সে তা থেকে নিজ ইচ্ছায় ফিরে এলে এই বাধা দেয়া হবে শরীয়তের জন্য হেকমতপূর্ণ কাজ। আর তাতে বাধাদানকারী ভাল কর্মের প্রতিদান ও সাওয়াব পাবে।

## ঈমান ও আমানত

উল্লিখিত উসূল জানার পর বোঝা যায়, মানুষের মধ্যে সৎকর্মগুলোকে বহন করে বা সহ্য করে এমনকি সেই শক্তি সৎকর্মের উৎস, যা থেকে সৎকর্ম প্রকাশ পায়, শরীয়তের পরিভাষায় তাকে আমানত বলে। আর যে শক্তি তাকওয়ার ভার বহন করে এবং তা দ্বারা মুত্তাকিসূচক মন্দ পরিহার প্রকাশ পায়, শরীয়তের পরিভাষায় তাকে হায়া বলে। সুতরাং আমানত ভাল কাজের আদেশ ও ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টির মাদ্দার নাম। আর হায়া হলো অসৎ কর্ম হতে সংকোচন হওয়ার মাদ্দার নাম। সুতরাং ঈমান ও তার সকল আমলি শাখাসমূহ ইবাদত, আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ ইত্যাদি বাস্তবে আমানতের কাঁধে ভর করে সামনে বাড়ে। যদি আমানত না থাকে অর্থাৎ অন্তরে সৎ কাজের প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনার মাদ্দা-ই না থাকে, তাহলে মানুষ না পারে ঈমান গ্রহণ করতে, না পারে নেক কাজ করতে, না পারে দীন গ্রহণ করতে, না পারে সাধু হতে।

সুতরাং আমানতের এই বৈশিষ্ট্য হলো রঙশিল্পে ফিটকিরির মতো। ফিটকিরি হলো সব ধরনের রঙের জমিন বা ক্ষেত্র। যদি রঙে ফিটকিরি না দেয়া হয়, তাহলে রঙ কাপড়ে ছড়ায় না, রঙ উজ্জ্বলও হয় না। অথবা আতর বিক্রেতার নিকট তিলের সাদা তেলের মতো, যা সব ধরনের সুগন্ধির জন্য জমিনস্বরূপ,

যা গোলাপ, চামেলি ও কেওড়াসহ সব ধরনের সুগন্ধিকে গ্রহণ করে নেয়, আপন করে নেয় আর বিভিন্ন আতর তৈরি হয়ে যায়। যদি এ জমিন (তিলের তেল) না হয়, তাহলে কোন ধরনের আতর তৈরি হবে না। তেমনিভাবে আমানত হলো জমিন ঈমান ও ঈমানিয়াতের, যার উপর ঈমানের রঙ ছিটানো হয় বা ঈমান ও ঈমানিয়াতের সুগন্ধি একত্রিত হয়। এখন যদি অন্তরে আমানতের মাদ্দা-ই না থাকে, তাহলে ঈমান আসবে না, ঈমানিয়াতও আসবে না। তাই তো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَّا أَمَانَةَ لَهُ

যার মধ্যে আমানত নেই তার ঈমান নেই।

সুতরাং ঈমান ও ঈমানিয়াতকে উত্তম ও পছন্দনীয় কর্ম বোঝাবার শক্তি এবং তাকে আকর্ষণকারী শক্তি মূলত আমানতেরই শক্তি। আমানতের বিপরীত হলো খেয়ানত, যার অর্থ হলো ভাল কর্মের আগ্রহ না করা, সৎ কর্মকে ভাল মনে না করা এবং অন্তরে কবুল না করা ইত্যাদি। সবশেষে খেলাধুলা এবং অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত থাকা ও জীবনকে ধ্বংস করে দেয়া।

এমন খেয়ানতের শক্তি, যা ভাল কর্মগুলোকে ধ্বংস করে দেয়, শরীয়তের পরিভাষায় তাকে ফেতনা বলে, যা বাস্তবে আমানতের বিপরীত। সুতরাং আমানত, ঈমান, আমলে সালেহকে আকর্ষণ করে উৎসাহ দেয় আর ফেতনা তাদের প্রতিহত করে। ফেতনার নির্যাস হলো বদ আমলি ও খেয়ানত। আর সাধারণত খেয়ানত হয়ে থাকে সৎকর্মে। অসৎ কর্মকে দূর করার নাম খেয়ানত নয়। খেয়ানত হলো ঈমানের পথে এবং সুন্দর মুয়ামালা ও মুয়াশারাতে ছিদ্র বের করা এবং ভয়-ভীতি সৃষ্টি করা, যার অপর নাম ফেতনা। অতএব বির বা সৎ হওয়ার শক্তির মাদ্দার নাম হলো আমানত এবং প্রত্যেক নেক কাজকে দূর করার বা ধ্বংস করার না ফেতনা। উপরের দুটি মাদ্দা-ই মানুষের ভিতর বিদ্যমান।

শরীয়ত আমানতের মাদ্দাকে আলোকিত করা এবং ফেতনার মাদ্দাকে সমূলে উৎপাটন করার জন্য এসেছে। জিহাদ মানুষের গলা কাটার জন্য রাখা হয়; বরং ফেতনা ফাসাদ দূর করার জন্য রাখা হয়েছে, যাতে কোন ফেতনাবাজ দল ইসলামের সুন্দর সঠিক নেযামকে নষ্ট না করতে পারে।

এটি আলাদা কথা যে, ফেতনার মূল উৎপাটন এবং বাধা প্রদান মানুষের হাতেই হয়ে থাকে। আবার এই ফেতনাগুলোর নিধনের দায়িত্ব মানুষের স্কন্ধেই চাপিয়ে দেওয়া হয়। কারণ, আসল মাকসাদ তো ফেতনা দূর করা

– মানুষ হত্যা করা নয়। সুতরাং ফেতনাবাজ মানুষ যদি ফেতনা পরিহার করে তা থেকে ফিরে আসে, তাহলে যুদ্ধ ততক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যাবে। যুদ্ধের প্রয়োজন হবে না। অতএব আমানত (বিশ্বস্ততা) হলো, সৎকর্মকে উত্তম মনে করার শক্তি আর ফেতনা হলো সেগুলোকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করার শক্তি।

## লজ্জাশীলতা ও বেহায়াপনা

তাকওয়াকে কার্যকরী করার জন্য যে শক্তি মানুষের অভ্যন্তরে রয়েছে, তাহলো হায়া বা লজ্জা, যে কারণে মানুষ মন্দ কাজে লিপ্ত হতে সংকোচ বোধ করে এবং তা হতে বিরত থাকে, যার ফলে মন্দ দূর হয়ে যায়। যদি হায়ার মাদ্দা (ধাতু মূল) না থাকে, তাহলে মন্দ কর্ম হতে বেঁচে থাকার কোন উপায় থাকে না। সুতরাং মুনকারাতকে খারাপ প্রমাণিতকারক এবং তা হতে রক্ষাকারক শক্তিকে হায়া বলে। হায়া না থাকলে মানুষ মন্দকে মন্দ মনে করে না। তাই তা থেকে বেঁচে থাকতে পারে না। এ জন্য বলা হয়েছে–

إِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

যখন তোমার হায়া না থাকে, তখন যা ইচ্ছা তা-ই করতে পার।

আর হাদীসে হায়াকে 'হায়ার সবটুকুই ভালো' বলা হয়েছে। এ কারণে হায়াকে ঈমানের বড় শাখা নির্ধারণ করা হয়েছে যে, ঈমানবিরোধী কর্মকাণ্ড হতে বেঁচে থাকা ও ফিরে আসা এই শক্তি ছাড়া সম্ভব নয়।

হায়ার বিপরীত হলো ফাহেশ বা বেহায়াপনা, যা প্রতিটি মন্দ কর্মে, লজ্জাহীনতা, আত্মমর্যাদাহীনতাকে কাজে লাগায়, ব্যবহার করে, যার ফলে লজ্জাশীল কর্মের নেযাম লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে। যিনা, মদপান, জুয়া খেলা, চুরি-ডাকাতি, স্বেচ্ছায় মিথ্যা বলা, গাল-মন্দ করা ইত্যাদি সকল মন্দের উপর আগ্রহ-উৎসাহ এবং সেগুলোতে লিপ্ত হয় এ বেহায়া শক্তির কারণে। সুতরাং হায়া মুনকারাত (নিষিদ্ধ কর্ম)কে দূর করে আর বেহায়াপনা মুনকারাতকে কাছে টানে। সুতরাং শরয়ী মুনকারাতের উৎসস্থল ও উৎপত্তিস্থল হলো বেহায়াপনা আর তা থেকে বেঁচে থাকার উৎসমূল হলো হায়া।

## আলোচনার সারসংক্ষেপ

সারকথা, সৎকর্ম অর্থাৎ আমরে মারুফের উৎসাহ ও পালনের মূল উৎস হলো আমানত বা বিশ্বস্ততা। আর সেগুলোর বিপরীত আর্জি বা আবেদন এবং ওলট-পালট করার মূল উৎস হলো ফেতনা। সকল অসৎ কর্ম অর্থাৎ মুনকারাত হতে বেঁচে থাকার মূর উৎস হলো হায়া। আর সেগুলোতে লিপ্ত হওয়া ও সেগুলোর মূল উৎস হলো ফাহেশ বা বেহায়াপনা। সুতরাং আমানত, ফেতনা, হায়া ও ফাহেশ এ চারটি শক্তি, যেগুলোর সাথে মারুফ, মুনকার, বির (সৎ কর্ম) ও তাকওয়ার সম্পর্ক। প্রথম দুটির সম্পর্ক সৎ কর্ম করা এবং পরিহার করা উভয়ের সাথে। আর শেষ দুটির সম্পর্ক হলো তাকওয়াপরিপন্থী বস্তু পরিহার করা এবং সেগুলোতে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার সাথে। এ জন্য আল্লাহপ্রদত্ত শরীয়তে কাজ হলো, শরীয়ত আদম সন্তানের তাহযীব-তামাদ্দুন ও ইসলাহ (শুদ্ধি)-এর জিম্মাদার হয়ে নাযিল হয়েছে। সে সৎকর্মের আদেশ করে আমনতের শক্তিকে মজবুত করবে। আর তার বিপরীত ফেতনাকে বিদায় করবে এবং তাকওয়ার বর্জনীয় বস্তুকে নিষিদ্ধ করে হায়ার শক্তিকে দৃঢ় করবে এবং তার বিপরীত ফাহেশকে চিরতরে বিদায় করবে। এটি-ই হলো আসল ইনসাফ ও অনুগ্রহ।

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ○

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ন্যায়-নীতি, সদাচরণ, নিকটাত্মীয়দের দান-খয়রাতের নির্দেশ দেন আর অশ্লীলতা, অসঙ্গতি ও সীমালংঘন করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। *[সূরা নাহল : ৯০]*

## বির্ ও তাকওয়ার মাধ্যমে বাতেনী পরিবর্তন

সুতরাং আমরে বিল মারুফ বা আমরে বিল বির মূলত আমানতের শক্তির উপর ভর করে প্রতিক্রিয়াশীল হয়, যা দ্বারা মানুষ প্রথমে আমীন বা বিশ্বস্ত হয়। তারপর তা থেকে ঈমানদার হয় আর ঈমানদার হয়ে মামুন হয়ে যায়, যার থেকে ভাল ও সৎ উপকরণ আত্মপ্রকাশ করে; ফলে ফেতনা নির্মূল হয়ে যায়। আর নাহি আনিল মুনকার বা হেদায়েত ও তাকওয়া মূলত হায়ার

শক্তির উপর ভর করে ক্রিয়াশীল হয়, যার দ্বারা মানুষ লজ্জাশীল হয় আর লজ্জাশীল হয়ে মন্দ ও নিষিদ্ধ কর্মগুলোকে ঘৃণা করতে থাকে, যার ফলে খারাপ উপকরণ নির্মূল হয়ে পড়ে আর ঈমানদারির প্রতিবন্ধক দূর হয়ে ঈমান ও সৎকর্মের রাস্তা পরিষ্কার হয়।

মোটকথা, বির ও তাকওয়ার কর্মসমূহের ধারাবাহিকতা পেশ করার পূর্বে, মানুষের ঐ চারটি ভিতরগত মাদ্দা ও শক্তিসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানা জরুরি ছিল, যাতে এ কথা জানা থাকে যে, শরীয়তের নেযাম বির ও তাকওয়া এবং বর্জনীয় কর্মগুলো মানুষের কোন শক্তির উপর ভর করে ক্রিয়াশীল হয়। কোন শক্তিরসমূহ আন্দোলিত করে এবং কোন ক্ষমতাগুলোকে পরাস্ত করে। আর ইসলাহ বা (শুদ্ধি)র এ ইতিবাচক ও নেতিবাচক আমল দ্বারা মানুষের ভিতর কী-কী পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, যা দ্বারা তার আত্মা প্রস্তুত হয় এবং বিগড়ে যায়।

এখন করণীয় ও বর্জনীয় বা বির ও তাকওয়ার (আদেশসূচক ও নিষেধসূচক আহকাম নেক ও পরহেযগারী) বিধানমূলক নকশার, আমলি রীতি-নীতিগুলোর দিকে নজর দিলে তায়াল্লুক মাআল্লাহর বিবরণীতে ঈমান বিল্লাহ, ইখলাস লিল্লাহ, যিকরুল্লাহ, তাযাক্কুর বি আইয়ামিল্লাহ (শাস্তি ও অনুগ্রহের দিন) তেলাওয়াতে কালামুল্লাহ, তায়জীমু শায়াইরিল্লাহ (ইসলামী নিদর্শনগুলোর সম্মান) জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এবং হুজুর মাআল্লাহ অর্থাৎ নামায, দোয়া, মুজাহাদা, মোরাকাবা ইত্যাদি। অপরদিকে তায়াল্লুক মাআলখালক বা সৃষ্টির সাথে সম্পর্কের দিকে নজর দিলে দেখা যাবে, খেদমাতে খালকিল্লাহ (সৃষ্টির সেবা) ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ, ইহসান লিল্লাহ, ইতয়াম লি ওয়াজহিল্লাহ (আল্লাহর ওয়াস্তে খাওয়ানো) ইখওয়াতু ফিল্লাহ (ভ্রাতৃত্ববোধ) এবং আন নাসহু লি দীনিল্লাহ অর্থাৎ বনী আদমের প্রতি হিতকামনা, আদল ও ইনসাফ, ওয়াফায়ে আহাদ (অঙ্গীকার পূরণ) ও ইফায়ে আহাদ (চুক্তি পূরণ) ইত্যাদি সবগুলোই সৎ কর্মের অংশ, যেগুলো পালনে মানুষ উচ্চ পর্যায়ের গ্রহণযোগ্যতা এবং আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির প্রিয়ভাজন হয়, আল্লাহর নিকট তার ইজ্জত সম্মান বৃদ্ধি পায়। আর মানুষের কাছে তার ক্ষমতা ও মর্যাদা স্বীকৃত হয়ে যায়, যার ফরে সে দুনিয়া ও আখেরাতে উচ্চ পদ ও মাকামের অধিকারী হয়ে নেককার ও উত্তম মানুষের দলভুক্ত হতে পারে। কিন্তু সৎকর্মের এ লম্বা-চওড়া সূচি ঐ পর্যন্ত কার্যকরী ও প্রতিক্রিয়াশীল হবে না, যতক্ষণ-না মানুষের নফস হতে অহংকার ও তার মন্দ স্বভাবগুলো দূর হবে, যা সৎ কর্মগুলোর পক্ষে হলাহলতুল্য ও শক্তিশালী প্রতিবন্ধক

পর্যায়ের, যা মানুষকে কোনভাবেই উন্নতি লাভ করতে দেয় না। উদাহরণস্বরূপ যতক্ষণ মানুষের আত্মা হতে জৈবিক শক্তির খারাবীগুলো দূর না হবে– লোভ, ভালবাসা, কামনা-বাসনা, মাতাল হয়ে মজাদার আহারাদিতে মত্ত থাকা, মানবিক খায়েশ, আরাম আয়েশ ও সর্বদা নেতাগিরির রোগ-জীবাণু বের না করা হবে বা মর্যাদা লাভের মন্দ স্বভাবগুলোকে দূর না করা হবে; যেমন– কামনা-বাসনা, নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, লোকদেখানো স্বভাব, আমিত্ব, নেতৃত্ব ও ক্ষমতার লোভ দূর না হবে।

## নফসের দোষ দূর করা ব্যতীত মালেকানার কল্যাণ স্থিরতা লাভ করে না

নির্যাস বের হলো, একদিকে নারী, ধনদৌলত ও মান-মর্যাদার নেশা, অপরদিকে নফস ও নফসের কামনা-বাসনা, নিজ ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, নিজস্ব মতামত ইত্যাদির সওদা মানুষে মাথা হতে বের বরা না হয় বা কম হলেও সেগুলো পরিত্যাগের অভ্যাস বানানো না হয়, ঐ পর্যন্ত মানুষের উপর সৎ কর্মের রঙ পরিলক্ষিত হবে না। যদি ভাসা-ভাসা হয়ও, তা মজবুত হবে না, ভালভাবে লাগবে না। আর ঘটনাক্রমে লেগে গেলেই পাকাপোক্ত হবে না; একবার ধোলাই করার দ্বারাই মুছে যাবে। অতএব আত্মার মধ্যে রূহানিয়াত (আধ্যাত্মিকতা) ও মিলকিয়্যাত (মালেকানা)র কল্যাণ ঐ পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে না, যতক্ষণ না আত্মার ভিতর হতে নফসের সৃষ্টিগত খারাবীকে খুঁড়ে-খুঁড়ে বের করে নিক্ষেপ করা হয়। অন্য শব্দে এভাবে বলা যায় যে, সৎ কর্মের বার্নিশ দ্বারা ঐ পর্যন্ত চমক ও উজ্জ্বলতা আসতে পারে না, যতক্ষণ না তা থেকে তাকওয়াবর্জিত নিজস্ব রঙ এবং আমিত্বের রঙ ফেলে দেয়া হয় আর ঐ পর্যন্ত অন্তরের আয়নায় আল্লাহর নূর প্রতিবিম্বিত হতে পারে না, যতক্ষণ না তাকে পরিষ্কার করে স্বচ্ছ করা হয়। অন্তর পরিষ্কার করলে আয়নার মতো হয়, দোস্তের সৌন্দর্য অন্তরে দেখা যায় আয়নার মতো।

## ইবাদতি বর্ষের শুরু ও শেষ

এজন্য শরীয়ত তার কর্মের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত করণীয় ও বর্জনীয়র সম্পর্ক মিশিয়ে রেখেছে আর সৎ কর্মগুলোকে কখনও তাকওয়ামুক্ত থাকতে দেয়নি। সুতরাং শরীয়তের শুরু হয়েছে কুরআন নাযিলের দ্বারা আর কুরআন নাযিল শুরু হয়েছে রমযান মাসে। এ কারণে মাহে রমযান কেমন যেন শরীয়ত ও

তার ইবাদতসমূহের শুরু বছর। তা একেবারেই এমন, যেমন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, কল-কারখানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক কার্যক্রম শুরু নির্ধারণ হয় বিশেষ কোন নামে। সেই মাস থেকে তাদের কাজকর্ম শুরু হয়। আর রেজিস্ট্রার খাতাসহ অন্যান্য খাত শুরু হয় সেই মাস হতে। উদাহরণস্বরূপ ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোতে বার্ষিক হিসাব-নিকাশ সাধারণত মহররম থেকে শুরু করে যিলহজে খতম করা হয়। আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাবর্ষ শুরু হয় সাধারণত শাওয়াল মাস হতে আর শেষ হয় রমযানে। আর অফিসিয়াল কার্যক্রমের বছর শুরু হয় জানুয়ারি হতে এবং শেষ হয় ডিসেম্বর মাসে। এমনিভাবে ইসলামী শরীয়তের দীনি ও ইবাদতি বছর শুরু হয় মাহে রমযানে আর শেষ হয় শাবান মাসে। কারণ, কুরআন যেহেতু শরীয়তের ভিত্তি আর তা নাযিল হয়েছে মাহে রমযানে।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ

রমযান মাস হলো এমন মাস, যাতে কুরআন নাযিল হয়েছে।

এ জন্য কেমন যেন রমযান মাস বার্ষিক ইবাদত শুরুর কেন্দ্রবিন্দু, যার সাথে মানুষের ঈমান তরতাজা হওয়ার সম্পর্ক আর শাবান মাস বছরের শেষ মাস, যা ঈমানি যৌবনের সর্বোচ্চ সীমানা। এ জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, শাবান মাসে জীবনের শেষ বিদায়ের ঘোষণা অদৃশ্য জগতে হয়ে যায়, যা প্রকৃতপক্ষে আমল বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘোষণা যে, আমলের সম্পর্ক জীবনেরই সাথে। বরং জীবন দেয়া-ই হয়েছে আমলের জন্য। এ কারণে যখন জীবন খতম হয়ে যাবে, তখন মানুষের আমল, রিযিক ও উপার্জন ইত্যাদি বন্ধ হয়ে যাবে। এ কারণে প্রতি বছর পিছনের রিযিকের হিসাব শেষ করে নতুন বছরের জন্য দৈহিক খাদ্যের হিসাব নির্দারণ করে শাবান মাসে ঘোষণা করা হয়। সুতরাং শাবান মাস আনুগত্য খতম এবং আমল বন্ধ হওয়ার ঘোষণার মাস হিসেবে সাব্যস্ত হলো। এ কারণে শাবান হলো শেষ মাস যেমন রমযান ছিল শুরু মাস।

## মাহে রমযান হলো নেকসমূহের কেন্দ্রীয় যোগাযোগ

মাহে রমযানে সৎ কর্ম ও তাকওয়াকে পরস্পর এমনভাবে মিলানো হয় যে, তারা একে অপর হতে পৃথক হতে পারে না। সুতরাং রমযানের চাঁদ দেখামাত্রই প্রথম রাত হতেই রমযানের শুরু দুটো জিনিস দ্বারা করা হয়। সেগুলো সৎকর্মের প্রাণতুল্য। আর তাহলো তেলাওয়াতে কুরআন ও তারাবীর

নামায। এ দুটি এমন বস্তু, যা মানুষের আত্মাকে আল্লাহর নৈকট্য এবং তাঁর সাথে মিলনের দৌলত সহজে অর্জন করে দেয়। তারাবীর নামায দ্বারা তো সর্বোচ্চ নৈকট্য অর্জন হয়। কারণ, কুরআনের নস ও হাদীসের ব্যাখ্যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সিজদাই হলো পরিপূর্ণ নৈকট্যের মাধ্যম। আর এটিই নামাযের কর্মসমূহের মূল মাকসাদ।

কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

সিজদা কর এবং নিকটবর্তী হয়ে যাও।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهٖ وَهُوَ سَاجِدٌ

নিঃসন্দেহে বান্দা তার রবের অতি নিকটবর্তী হয় তখন, যখন সে সিজদায় থাকে।

কুরব অর্থ শুধু সংযোগ স্থাপনই নয়; বরং মিলনও। কারণ, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে সুস্পষ্ট রয়েছে যে, সিজদা অবস্থায় মানুষের মাথা আল্লাহ তায়ালার কুদরতি পায়ে থাকে। সুতরাং পূর্ণ নৈকট্য ও অবস্থিতি তো নামায দ্বারা অর্জন হয়। তারপর এই পূর্ণ নৈকট্যের পূর্ণতাও ফলদায়ক হয় দৈনিক চল্লিশ সিজদা দ্বারা। কারণ, বিশ রাকাতে চল্লিশ সিজদা হয় আর চল্লিশ সংখ্যাটি কোন বস্তুর পূর্ণতা লাভে বিশেষ দখল রয়েছে।

হযরত মূসা আ.কে তাওরাত কিতাব দেয়ার সময় হলে তাঁকে চল্লিশ দিনের চিল্লা করিয়ে গায়েবের সাথে সম্পর্কের তাকমিল ও শক্তিশালী করানো হয়েছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, অন্তর হতে হেকমাতের ঝর্ণার ছিদ্র বা নালা বের হয়। অর্থাৎ আত্মার বিশেষ এক জ্ঞানের পূর্ণতার জন্য চল্লিশ দিনের ইখলাসপূর্ণ আমল নির্ধারণ করেছেন, যার দ্বারা হযরত সুফিয়ায়ে কেরাম চিল্লা দেয়ার বিধান বের করেছেন।

মোটকথা, চল্লিশ সংখ্যাটির অবস্থা ও ধ্যান-ধারণার পূর্ণতার ক্ষেত্রে বিশেষ দখল রয়েছে। এ কারণেই রমযানের তারাবীতে ধারাবাহিকভাবে প্রতিদিন চল্লিশ সিজদা করানো হয়েছে।

## আল্লাহ ও বান্দার মাঝে বাতেনী সম্পর্ক

তারপর এ পূর্ণ নৈকট্যকে বেকার ছেড়ে দেয়া হয় না বরং তার সাথে পূর্ণ মিলনের রাস্তা কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে করা হয়েছে। কারণ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে কুরআনুল কারীমকে আল্লাহর বাতেনী বস্তু বলা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে–

تَبَرَّكْ بِالْقُرْاٰنِ فَاِنَّهٗ كَلَامُ اللّٰهِ خَرَجَ مِنْهُ

কুরআন দ্বারা বরকত হাসিল কর। কারণ, তা আল্লাহর কালাম, যা তার সত্তা হতে বের হয়ে এসেছে।

এতে প্রমাণিত হয়, কুরআন শরীফ আল্লাহ তায়ালার বাতেন থেকে বের হওয়া বস্তু, যা তেলাওয়াতের মাধ্যমে আমাদের ভিতরে পৌঁছে যায়। অর্থাৎ তাঁর বাতেন থেকে প্রবাহিত হয়ে আমাদের বাতেনে পৌঁছে। ফলে আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মাঝে বাতেনী সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

## পরিপূর্ণ মিলন

এদিকে অন্য এক হাদীসে তেলাওয়াতে কুরআনকে মুহাদাসা মাআল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর সাথে কথোপকথন বলা হয়েছে। আর এ কথা সুস্পষ্ট যে, মুতাকাল্লিম (বক্তা) ও মুখাতাব (সম্বোধিত ব্যক্তি) পরস্পর কথা বলে নিজেদের মনের ভাবকে একে অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়, যাকে ইলমী নৈকট্যের সর্বোচ্চ মঞ্জিল বলা উচিত।

সুতরাং তেলাওয়াতে কুরআন দ্বারা আমাদের ও তাঁর বাতেনের সম্পর্কের শান এমন হয় যে, তা হতে বেশি মিল ও মিলন অন্য কোন উপায়ে হতে পারে না। কারণ, শারীরিক মিলন ও সাক্ষাৎ তো শুধু শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মিলন পর্যন্তই হয়ে থাকে। আর এক শরীর তো অন্য শরীরের সাথে পুরোপুরি খাপ খায় না। কেমন যেন শারীরিক মিলন উপরে উপরে হয়ে থাকে, গভীর হয় না। আর এমন মিলন দ্বারা স্বাদ-মজা যদিও হয়, তা হয় হালকা ও অস্থায়ী। কিন্তু রূহানি মিলন! তার চেয়ে বেশি হলো ইলমী মিলন, যাতে রূহের মিলন হয় রূহের সাথে। আর তা এমন পূর্ণ মিলন যে, শারীরক মিলন তো তার আসল স্থানেই আছে, রূহানী মিলনও পর্যন্ত তার মোকাবেলা করতে পারে না। তারপর এ মিল ও মিলনকে যদি দেখা হয়, তাহলে দেখা যাবে, এ মিলনও

মাধ্যমমাত্র। আসল মাকসাদ তো হলো কবুল – উপস্থিতি নয়। যদি উপস্থিতি হয় কিন্তু কবুল না হয়, তাহলে এই উপস্থিতি বেকার। বাদশাহর নিকট উপস্থিতি তো শাগরেদ ও নিম্নমানের কর্মচারীদেরও হয়ে থাকে; কিন্তু কবুল হয় না। প্রধানমন্ত্রী ও রাজসভাসদদের মিলন শুধু ওয়াসূলই হয় না; বরং কবুলও হয়।

## কবুলিয়্যাত বা গ্রহণযোগ্যতার স্বীকৃতি

তারাবীর তেলাওয়াতে যেহেতু সূরায়ে ফাতিহার তেলাওয়াত আবশ্যক ও প্রতি রাকাতেই জরুরি; চাই মাধ্যম ব্যতীত হোক বা ইমামের মাধ্যমে হোক। তার প্রতিটি আয়াতের সাথে সাথে আল্লাহর পক্ষ হতে কবুলিয়্যাতের স্বীকৃতি ও ঘোষণা দেয়া হয়। বান্দা যখন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ পাঠ করে, তখন আল্লাহর পক্ষ হতে উত্তর দেয়া হয় حمدنى عبدى বান্দা আমার প্রশংসা করছে। আর যখন الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করা হয়, তখন উত্তর হয় اثنى على عبدى আমার বান্দা আমার গুণ-কীর্তন করছে। যখন পাঠ করা হয় مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ তখন সাথে সাথে উত্তর আসে مجدنى عبدى আমার বান্দা আমার বুযুর্গী বর্ণনা করেছে। আর যখন পাঠ করা হয় اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ তখন উত্তর আসে هذا بينى وبين عبدى এই মুআমালা আমার ও বান্দার মাঝে। আর যখন প্রার্থনা করে এবং اِهْدِنَا থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করে, তখন সাথে সাথে বলা হয় ولعبدى ما سأل আমার বান্দার জন্যই সে যা কিছু প্রার্থনা করেছে। অতএব সাথে সাথে স্বীকার ও স্বীকৃতি এবং বান্দাকে নিজের সম্বোধন করে উক্ত কথাগুলো পুনর্ব্যক্ত করা-ই কবুল হওয়ার আলামত, যার জন্য ওয়াসূল আশা করে থাকে।

## মানবিক উন্নতির পূর্ণতার কেন্দ্রবিন্দু

সুতরাং তারাবীহ ও তেলাওয়াতে প্রাথমিক স্তর হলো কুরব (নৈকট্য) ও সংযোগ, যা নামায দ্বারা অর্জন হয়। তারপর কুরব দ্বারা ওয়াসূল ও মিলন হয়, যা তেলাওয়াতে কুরআন দ্বারা অর্জন হয়। তারপর ওয়াসূল হতে কবুল ও রেজামন্দী অর্জন হয়, যা বিশেষ তেলাওয়াত কথপোকথন দ্বারা হাসিল হয়।

মোটকথা, তারাবীহ ও তেলাওয়াত দ্বারা হক তায়ালার সাথে ওঠা-বসা,

মুয়ানাকা এবং কথোপকথন ও উভয়ের রাজি-খুশির দৌলত অর্জন হয়, যার উর্ধ্বে উন্নতি ও পূর্ণতার আর কোন মাকাম বা স্তর নেই। কিন্তু বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, যেখানে মাহে রমযানের রাত্রিতে নামায ও তেলাওয়াত দ্বারা ওয়াসূল বা কবুলের স্বাদ ও মজা দেয়া হয় আর সেখানে ঐ মোবারকবাদের দিনের বেলার আত্মার কামনা-বাসনা এবং মানবিক সকল প্রকার স্বাদ-মজাকেও শক্তি হতে পরিত্যাগ করানো হয়। পানাহার ত্যাগ, স্ত্রী সহবাসও বন্ধ, এমনকি উল্লিখিত বস্তুগুলো থেকে কাল্পনিক স্বাদ গ্রহণ করাও নিন্দনীয়। কেন? শুধু এ কারণে যে, রমযানের রাতে যে অসাধারণ ওয়াসূল ও কবুলের স্বাদ, যা সৎকর্মের মধ্য হতে তারাবীহ ও তেলাওয়াত কর্ম দ্বারা অর্জন হয়, সেগুলো ঐ তাকওয়া-বিবর্জিত বস্তু পরিহার করা ছাড়া সহজে অর্জন হওয়া অসম্ভব ছিল।

সুতরাং রমযান মাসে সারা দিন রোযার মাধ্যমে যে সম্মিলিত বর্জন-অর্জন হয়, তা দ্বারা আত্মাকে ঘষে-মেজে পরিষ্কার করা হয়। আর রাতে এ পরিষ্কার পাত্রে তেলাওয়াত ও তারাবীহর সমন্বয়ে যে সমষ্টিগত সৎ কর্মের বার্নিশ করা হয়, যা দ্বারা আত্মা উজ্জ্বল ও আলোকিত হয়ে ওঠে এবং তাতে নৈকট্য, সংযোগ এবং কবুল-মিলনের আলো দ্বারা আল্লাহর নূর প্রতিবিম্বিত হতে থাকে। কেমন যেন মানুষের আত্মায় রহমানের কুদরতি আত্মা দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং রমযান মাস যেমনভাবে সৎকর্মের মাস, তেমনিভাবে তাতে সীমালঙ্ঘন হতে বাঁচারও তাওফিক জুটে।

## রোযা ও মাহে রোযার উপকারিতা

কুরআনুল কারীম যখন রমযানের রোযার কথা বর্ণনা করে, তখন তাকওয়াকে তার বড় উপকারী বস্তু হিসেবে বর্ণনা করে–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযাকে ফরজ করা হয়েছে। যেমনিভাবে তোমাদের পূর্বপুরুষদের উপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পার। *[বাকারা : ১৮৩]*

আর যখন স্বয়ং মাহে রমযানের কথা বর্ণনা করে, যাতে দিনের সাথে রাতও

শামিল, তখন কুরআন নাযিলের হাওয়ালা দিয়ে মাহে রমযানের বড় উপকারিতা নূরে হেদায়েত, নূরে দালায়েল এবং নূরে মারেফাত প্রকাশ করেছে, যেগুলো বাস্তবে মানুষের আত্মার উজ্জ্বলতা ও বার্নিশের সবচেয়ে উন্নত সামগ্রী।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْٓ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰی وَالْفُرْقَانِ

রমযান মাসই হলো সেই মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সৎ পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। *[সূরা বাকারা : ১৮৫]*

কেমন যেন রোযার নির্যাস হলো তাকওয়া আর মাসের নির্যাস বির বা সৎকর্ম। এমনিভাবে কুরআনুল কারীম দ্বারা মাহে রমযান সৎকর্ম ও তাকওয়ার মাস হিসেবে প্রমাণিত হলো, যা দ্বারা গোনাহ ও সীমালঙ্ঘনই শুধু দূর হয়নি বরং গোনাহ ও সীমালঙ্ঘনের ঝর্ণাও শুকিয়ে যায়, উৎসস্থল বন্ধ হয়ে যায়, নফসের পানাহার বন্ধ হয়ে যায় এবং শয়তানকে বন্দি করা হয়, যেগুলো বান্দাকে গোনাহ ও সীমালঙ্ঘনে উৎসাহ দেয়। একটি জ্ঞানী দুশমন হিসেবে আর অপরটি আহমক দুশমন হিসেবে। প্রকাশ থাকে যে, উভয় ধরনের দুশমন বন্দি হয়ে যাওয়ার পর গোনাহ ও সীমালঙ্ঘন হতে বেঁচে থাকা কুদরতি উপায়ে হয়ে থাকে।

## সিয়াম ও কিয়ামের পরস্পর সম্পর্ক

এ জন্য রোযা ও তেলাওয়াতে তারাবীহ অর্থাৎ সিয়াম ও কিয়ামের সম্পর্ক এবং পরস্পর একে অপরের মিলনে সুস্পষ্ট হলো যে, একটি তাখলিয়্যাহ (খালিকরণ)-এর মাকাম। অর্থাৎ রোযা মানুষকে নফসের নাপাকি হতে পবিত্র করে। অপরটি তাহলিয়্যাহ (পূর্ণকরণ)-এর মাকাম। অর্থাৎ কুরআন ও তারাবীহ মানুষের নফসকে উজ্জ্বল ও নূরানী বানায়। তাই কিয়ামত দিবসে সিয়াম ও কুরআনের সুপারিশকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর বর্ণিত হাদীসে বন্ধু ও তার অনুরূপ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

হাদীসের সারসংক্ষেপ হলো, কিয়ামত দিবসে সিয়াম ও কুরআন উভয়ে মিলে বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে আল্লাহ! আমি সারাদিন এ

বান্দাকে পানাহার ও মানবিক খায়েশ ও স্বাদ উপভোগ হতে বঞ্চিত রেখেছি। তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল করে নাও। কুরআন বলবে, হে আল্লা! আমি এ বান্দাকে রাতে ঘুম ও আরাম হতে বঞ্চিত রেখেছি, তুমি তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করে নাও। এ কথা তো সুস্পষ্ট যে, তাদের সুপারিশের শেষ পরিণাম সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হওয়া ব্যতীত অন্য কিছু হতে পারে না। কারণ, কুরআন হলো আল্লাহর কালাম ও তাঁর সিফাত। তাই তার সুপারিশ মানে আল্লাহর এক সিফাতের সুপারিশ। আর সিফাত তো জাত বা সত্তা হতে পৃথক কিছু নয়। বিধায় এভাবে বলা যেতে পারে যে, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিজেই নিজের দরবারে সুপারিশ করবেন। কে আছে তাঁর সুপারিশ ফেরত দিবে? আর তিনি নিজেইবা কিভাবে ফেরত দিবেন। যখন আল্লাহ স্বয়ং নিজের কাছে প্রার্থনা করেন, তখন নিজ দোয়া তিনি কেমন ফেরত দিবেন।

এদিকে আল্লাহ তায়ালা সকল ইবাদতের মধ্য হতে রোযাকে নিজের এবং নিজের বস্তু বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং বলেছেন, আমি নিজ হাতে তার প্রতিদান দিব। তাই কুরআন ও রোযার সুপারিশ অগ্রাহ্য হওয়ার কোন কারণ নেই। এতে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, শরীয়ত নিজের বার্ষিক ইবাদতের শুরু করণীয় ও বর্জনীয় উভয় ধরনের কর্ম দ্বারা করেছেন, যা মানুষের শিক্ষা-দীক্ষার দুটি ডানা। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, দিনের বেলায় বর্জনীয় কর্মকে আসল বা মূল হিসেবে রাখা হয়েছে আর করণীয়কে তার অধীন করা হয়েছে। অপরদিকে রাতের বেলায় করণীয়কে মূল হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং বর্জনীয় তার অধীনে প্রয়োজন মাফিক এসে যায়, যা তেলাওয়াত ও নামাযের সময় প্রতিষ্ঠিত থাকে। এমনিভাবে তার রাতগুলো দিনের আলো হতে কম নয়; বরং দিন-রাত সমান সত্যায়নকারী।

## ঈদের চাঁদ

যখন রমযানের নির্ধারিত দিনগুলো এমনভাবে পূর্ণ হলো যে, দিনের বেলায় বর্জনীয় কর্মে ব্যস্ত আর রাতে করণীয় কর্মে লিপ্ত, তখন ঈদের চাঁদ পূর্ণ ইবাদতের আনন্দদায়ক পয়গাম নিয়ে দিগন্তে দৃষ্টিগোচর হয়। কেমন যেন আল্লাহর পক্ষ হতে আকাশ থেকে জানিয়ে দো হয়, হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ঐ ফরজ পূর্ণ করেছ, যা রমযানের চাঁদ তোমাদের উপর আনয়ন করেছিল। তোমরা নিজেদের দিবসগুলোকে মানবিক স্বাদ (খাবার, পান ও স্ত্রী

সহবাস) হতে বাঁচিয়ে রেখে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য ও মিলনের স্বাদকে প্রাধান্য দিয়েছ এবং নিজেদের রাতগুলোকে অনর্থক কথাবার্তা ও কিসসা-কাহিনীতে ব্যয় করা ব্যতীত ভাল কথাবার্তা ও সুন্দর কিসা-কাহিনী বলা-শোনার মধ্যে লিপ্ত রেখেছ, এ জন্য তোমাদেরকে ঈদের চাঁদের আলোকোজ্জ্বল হরফ দ্বারা মোবারকবাদ দেয়া হচ্ছে, তোমরা সফলকাম হয়েছ এবং আসল গন্তব্যে পৌঁছে গেছ। এ জন্য বান্দার উপর ফরজ হতে পারে, নিজের সম্মান-মর্যাদা প্রদানকারী ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী পরওয়ারদেগারের শুকরিয়া আদায় করা নিজের জান-মাল দ্বারা। সুতরাং ঈদের দিনের সকাল হতেই প্রথমে সাদকায়ে ফিতর আদায় করবে মাল-সম্পদ দ্বারা, তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে ঈদের সালাত আদায় করে জান ও অন্তর দ্বারা নিজের মুহসিন ও নেয়ামত প্রদানকারী পরওয়াদেগারের শুকরিয়া আদায় কর যে, তিনি ত্রিশ দিনের এ তুচ্ছ ও নগণ্য কুরবানী ও ত্যাগ কবুল করেছেন। কুরবানী ও ত্যাগের সময়কালে তো বিশেষভাবে নৈকট্য ও মিলনের স্বাদ দ্বারা উপকৃত করেছেনই। আর ত্যাগের মাস পূর্ণ হওয়ার পর হেলালি শব্দ দ্বারা নিজের আনন্দের সাধারণ ঘোষণা দিয়েছেন।

## রমযানের পরিশিষ্ট

সুতরাং ঈদ হলো বাস্তবে রমযানের করণীয় ও বর্জনীয় কর্মের একটি কার্যকরী শুকরিয়া, যা বান্দার পক্ষ হতে আল্লাহ তায়ালার সমীপে পেশ করা হয়। এ শুকরিয়ার ফলে আল্লাহর কৃত ওয়াদা অনুযায়ী যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তাহলে আমি তোমাদের নেয়ামত বৃদ্ধি করব) নেয়ামত বৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় ছয় ঈদ অর্থাৎ শাওয়ালের রোযাকে বৃদ্ধি করা হয়েছে, যাকে রমযান তো বলা যাবে না, তবে রমযানের পরিশিষ্ট বলা হবে। কারণ, রমযানের সময়কাল হলো পূর্ণ এক মাস, যা মানানসই ও মধ্যম সময়, যাতে কম ও বেশি নেই এবং তা বছর হতে কম ও সপ্তাহ হতে বেশি একটি মাধ্যম সময়। যদি তাতে একদিন বৃদ্ধি হতো, তাহলে দ্বিতীয় মাস যুক্ত হওয়ার কারণে রমযানের সময়কে দ্বি-মাসিক বলা হতো। রোযা এক মাসের স্থলে দুমাস হলে তা নিশ্চিতভাবে তবিয়তের উপর কষ্টদায়ক হতো। সময়ও মধ্যম থাকতো না। আর ভাঙ্গনের ফলে সময়ের সীমাবদ্ধতা হারিয়ে যেতো। এ কারণে রোযার এক মাস পূর্ণ করিয়ে মাঝে একদিন আনন্দ-ফুর্তি ও খাবার-পানের জন্য দিয়ে রমযানের পরিশিষ্ট হিসেবে আরো ছয়টি রোযা বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর সেগুলোতে আল্লাহর অপরিসীম অনুগ্রহ দ্বারা বান্দাকে

ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, যাতে কোন জোর জবরদস্তি নেই যে, বান্দার উপর বোঝা হয়ে যাবে। আর আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর শোকরিয়া জ্ঞাপন, তাঁর নেয়ামত বৃদ্ধির ওয়াদাও পূর্ণ হয়ে যাবে। কেমন যেন এভাবেই বার্ষিক ইবাদতের শুরু ৩৬ রোযা ও ৩০ রাতের তারাবীহ দ্বারা করেছেন। অর্থাৎ ৩৬ বর্জনীয় এবং ৩০ করণীয় কর্ম দ্বারা মানুষের বার্ষিক ইবাদতের মাস শুরু হয়।

## ইবাদতের শুরু বিন্দু সকল ইবাদতকে বেষ্টন করে নেয়

চিন্তা করলে দেখা যাবে, রমযান মাসে ইবাদতের জমা করা পুঁজি শুধু রমযান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং সারা বছর এই পুঁজি তাওফিক ও বারাকাতে কাজে লাগে। এ জমা করা পুঁজি যদি রমযান মাসে জমা করা না হতো, তাহলে পুরো বছর ইবাদত হতে অপরিচিত এবং বাতেনি বরকতসমূহ হতে বঞ্চিত অবস্থায় অতিবাহিত হতো। কারণ, এ বিধানগতভাবে প্রত্যেক বস্তু শুরুতেই তার শেষ অবস্থা ও মধ্য অবস্থা লুকায়িত থাকে। পরে আস্তে আস্তে ঐ শুরু বিন্দু ছড়িয়ে প্রসারিত হয়ে মধ্য হতে অতিক্রম করে শেষে গিয়ে পৌঁছয়। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত ঐ শুরু বিন্দুর ফয়েজও কাজ করতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ প্রতিটি শব্দ ও বাক্য এবং দীর্ঘ ইবাদতের সমৃদ্ধি ঐ বর্ণমালায় হয়ে থাকে। গাছের প্রতিটি ডাল, ফুল, ফল পাতার শুরু বিন্দু হলো তার বীজ। আর ঐ বীজের মাদ্দা (মূল ধাতু) ছড়িয়ে প্রসারিত হয়ে ফুল, পাতা ও ফল হতে থাকে। বীজ না হলে ডাল হবে না, হবে না ফল ও পাতা। কেমন যেন সকল ফল, পাতা, ডাল ও ফুল বাস্তবে এ বীজের ফয়েজের কারণে হয়।

সংখ্যার শুরু বিন্দু হলো এক বা একক। এ এক তাকরার হয়ে দুই, তিন, দশ, শত লাখ ইত্যাদি হয়। এক না হলে পরবর্তী সংখ্যাগুলো হবে না। কেমন যেন কোটি, মিলিয়ন, বিলিয়ন ইত্যাদির সংখ্যাগুলো এক্‌ক সংখ্যার সমৃদ্ধির কারণেই হয়ে থাকে। জাতিগতভাবে এগুলোর অস্তিত্ব নেই।

উল্লিখিত বিধানের ভিত্তিতে বোঝা যায়, বার্ষিক ইবাদতে শুরু বিন্দু হলো রমযানুল মোবারক এবং তার করণীয় ও বর্জনীয়। যেমনটি কিছু পূর্বে স্পষ্ট হয়েছে। রমযানের এক অংশের করণীয় ও বর্জনীয় এর পুষ্টি বাস্তবে সারা বছরের ইবাদতের শুরু বিন্দু। সুতরাং এ ইবাদতের মাদ্দাই পুরো বছরের ইবাদতের মাদ্দা, যা শুধু রঙ পরিবর্তন করে বিভিন্ন কর্মে প্রকাশ পেতে থাকে। কেমন যেন সারা বছরের বিভিন্ন ধরনের ইবাদত ও সৎ কর্ম এবং তাকওয়ার বিভিন্ন প্রদর্শনী ঐ মাসের ধৈর্য ও ইস্তেকামাতের ফরেজে হয়ে থাকে। যদি

রমযান মাস না হতো তাহলে সারা বছর তাওফিক ও বারাকাতের দরজা জিরোর কোটায় থাকত। যেমনটি হাদীসের বর্ণনা দ্বারা তার দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

## মাহে রমযানের সংখ্যার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

মনে হয় এ জন্য এ মোবারক মাসের করণীয় ও বর্জনীয়র সংখ্যা এমন কিছু সম্পর্কের জন্য রাখা হয়েছে যে, তা শুধু বরকতস্বরূপ নয় বরং সংখ্যা হিসেবেও পুরো বছরের উপর ছড়িয়ে পড়ে। আর তার প্রতিটি একক অন্য মাসের তুলনায় দশকের সমতুল্য। যেমনটি নবীজি রমযানের শেষ খুতবায় ইরশাদ করেছেন–

يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله تعالى صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه

হে লোক সকল! তোমাদের সামনে এক মহান ও বরকতময় মাস সমাগত, যাতে রয়েছে এমন একটি রাত, যা হাজার মাস হতে উত্তম। আল্লাহ তায়ালা সেই মাসের রোযা ফরজ করেছেন এবং রাত্রিজাগরণ (তারাবীহর নামায)কে সুন্নাত করেছেন। যে ব্যক্তি এ মাসে কোন সৎকর্ম করবে, সে অন্য মাসের ফরজ আদায় করার সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি এ মাসে কোন ফরজ আদায় করবে (যেমন রোযা রাখল) সে অন্যান্য মাসের ৭০টি ফরজ আদায়কারীর সমান সাওয়াব পাবে। *[মিশকাত শরীফ]*

সারকথা, রমযান মাসের নফল অন্য মাসের ফরজ সমতুল্য আর এ মাসের ফরজ অন্য মাসের ৭০ ফরজের সমতুল্য। তা শুধু বরকত হিসেবে নয় বরং প্রতিদান এবং সংখ্যা হিসেবেও এ মাসের আমলের একক অন্য মাসের দশকের সমতুল্য। মাহে রমযানের দিনগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তাতে দিন রয়েছে ত্রিশটি। আর অপরিসীম ক্ষমার অধিকারী শরীয়ত এক নেকীকে দশ নেকীর বরাবর গণ্য করেছে। ইরশাদ হয়েছে–

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا

যে ব্যক্তি একটি নেকী করবে, তার জন্য তার দশ গুণ নেকী থাকবে।

এ বিধানের ভিত্তিতে রমযানের ত্রিশ দিন ৩০x১০=৩০০ দিন হয়। আর এদিকে আবার রমযানের ঈদের পর আরো ছয়টি রোযাকে রমযানের পরিশিষ্ট ও অনুগামী হিসেবে মিলিত করে দেয়া হয়েছে। (তবে অনুগ্রহ ও সহজতা হেতু সেগুলোকে বান্দার ইখতিয়ারাধীন করেছেন এবং সেগুলোকে রমযানের অংশ বানাননি)। উপরে বর্ণিত বিধানমতে ৬x১০=৬০ হয়। তাই রমযান ও তার পরিশিষ্ট মিলে হয় ৩৬০ দিন, যা এক বছরের দিনগুলোর সমপরিমাণ। সারাংশ এই বের হলো যে, রমযানের পুরস্কার ৩৬০ রোযা বছরের ৩৬০ দিনের সমপরিমাণ। তাই আসল রমযান ও তার অনুগামী বা পরিশিষ্ট রোযাগুলো আদায়কারী সারাবছর রোযা আদায়কারী হয়ে সায়েমুদ্দাহ্‌র বনে যায়।

উল্লিখিত বিষয়কে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নের বাক্য দ্বারা ইরশাদ করেছেন, যা সাহাবী হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রা. বর্ণনা করেন–

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

যে ব্যক্তি রমযানের পূর্ণ রোযা আদায় করে, তারপর শাওয়ালের ৬টি রোযাও তার সাথে মিলিয়ে নেয়, তাহলে সে যেন সারা বছর রোযা রাখল। অর্থাৎ সারা বছর রোযা আদায় করার সাওয়াব পাবে। (মুসলিম)।

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

رَمَضَانُ اِلٰى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُمَا

এর রমযান হতে আরেক রমযানের মধ্যবর্তী দিনগুলোর গোনাহের কাফফারা ঐ প্রথম রমযান আদায় করে দেয়। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রমযানের ইবাদত ও আনুগত্যসমূহ এবং ক্ষমাগুলোর ফয়েজ সারা বছর জারি থাকে। আর এ ফয়েজও বিস্তার হয়ে সারা বছরের দিন ও রাতগুলোর ইবাদত এবং তাওফিকের রূপ ধারণ করতে থাকে। শুধু বরকত ও প্রতিক্রিয়া হিসেবে নয় বরং সংখ্যা হিসেবেও।

রমযান হলো বার্ষিক ইবাদতের শুরু বিন্দু তাওফিকের বীজ। এ কারণে তাওফিক ও আনুগত্যের মাদ্দা সারাবছর ইবাদতের ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য পানি সিঞ্চন করে এবং পুরো বছরের উপর ছায়া হয়ে থাকে।

## মাহে রমযান ও হজের মাসগুলোর মাঝে পরস্পর সম্পর্ক

এ কারণে রমযানের দিনগুলো যে বর্জনীয়র (খাবার, পান ও খায়েশ বর্জন) ভূমিকা রাখে, তা শুধু রমযানেই শেষ হয়ে যায় না বরং এই বর্জন দ্বারা আরো অনেক বর্জনীয় বস্তুর লালন-পালন বা তরতাজা হয় এবং তাকওয়ার পরবর্তী মঞ্জিলগুলো সামনে এগুতে থাকে। যদিও তা রমযানে হয়নি; কিন্তু রমযানের বর্জনীয় কর্মের ফলে হয়েছে। মাহে রমযানে আল্লাহকে অন্বেষণকারী আল্লাহ তায়ালার মহব্বতের খাতিরে নিজের আত্মার বড় আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ খাওয়া, পান করা এবং মানবিক স্বাদ উপভোগের মজাদার বস্তুগুলোকে বর্জন করে মানবিক কামনা-বাসনা বর্জনের যোগ্যতা সৃষ্টি করে নেয়। ফলে বর্জনের ধারা খতম হয় না। খাওয়া, পান করা এবং নৈকট্য ও মিলনের স্বাদ ছাড়াও আরো অনেক স্বাদ-মজা রয়েছে, যেগুলোর খায়েশ সর্বদা আত্মার মাঝে দোলায়িত হতে থাকে। ঐগুলো তো শুধু জৈবিক ধারার স্বাদ উপভোগ ছিল, যেগুলোর রমযানে একেবারেই দূর করে ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে দেয়।

কিন্তু তার চেয়ে বেশি কঠিন ও ভয়াবহ ইজ্জত-সমানের স্বাদ, যা মানুষকে অহংকারী বানিয়ে শুধু সৎপথ প্রাপ্ত হতে নয় বরং সৎপথ হতে বিপথগামী করে দেয় এবং নৈকট্য ও মিলনের ধাপগুলোতে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণস্বরূপ মানুষ পোশাক ও তার ফ্যাশনের গর্ব দেখিয়ে অহংকারী হয়। কখনও বাড়ি দ্বারা নিজেকে পদপর্যাদাবান বলানোর চেষ্টা করে, কখনও বংশ ও বন্ধু-বান্ধবের সমাগম করিয়ে নিজের নেতাগিরি ও গর্বের সামগ্রী একত্রিত করে থাকে। কখনও নিজের গাম্ভীর্য ও অর্থবোধক নীরবতা দেখিয়ে নিজের পদমর্যাদা প্রদর্শন করে। কখনও নিজ সম্পদ ও টাকা-পয়সার আধিক্য দ্বারা গৃহহীন, দুস্থদের তুচ্ছতা এবং নিজের শ্রদ্ধা প্রদানের দলিল গ্রহণ করে। কখনও নিজ সৌন্দর্য ও আরাম-আয়েশ এবং সুন্দর দেহ-বডির আত্মম্ভরী হয়ে নিজ ধ্যান-ধারণায় মাতাল হয়ে থাকে। তারপর ঐ ইজ্জত সম্মানের ভাব থেকে অন্যের উপর জুলুম-উৎপীড়ন ইত্যাদির ভিত্তি দাঁড় করায়, যা দ্বারা দুনিয়াতে ফেতনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ে আর দুনিয়া নিরাপত্তা ও সুখ-শান্তি

হতে বঞ্চিত হয়।

মোটকথা, ইজ্জত-সম্মান ও অন্যের উপর বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও সাধারণের মাঝে আলাদা পদমর্যাদা দেখানোর জন্য বিভিন্ন ঢং রয়েছে, যাতে নিমজ্জিত হয়ে একজন অহংকারী মানুষ আল্লাহর নৈকট্য ও মিলনের অধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে যায়। এ জন্য এগুলোর পরিহার ঐ বর্জনীয় কর্মসমূহ হতে বেশি আবশ্যক, যেগুলোর অনুশীলন রমযান মাসে করা হয়েছে। এ কারণে যখনই ঐ মানবিক ও আত্মিক স্বাদের সীমা অতিক্রম হতে মুক্তি পাওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করে রমযান মাস বিদায় হয়, তখনই হজের মাসগুলো শুরু হয়ে যায় আর হজের পয়গাম দিতে থাকে। যেমনভাবে রমযানের চাঁদ ঘোষণা করেছিল, যদি আল্লাহর শাহী দরবারে হাজির হয়ে শাহী মিলনের ইচ্ছা থাকে, তাহলে শাহওয়াতের খায়েশের স্বাদ উপভোগ বর্জন করে পাক-পবিত্র অবস্থায় এবং সেগুলোকে পরিহার করে দরবারে শাহীতে (মসজিদে) তারাবীহ ও তেলাওয়াতের জন্য উপস্থিত হয়ে যাও। তেমনিভাবে সাওয়াল মাসের চাঁদও ঘোষণা করে, যদি নিজ মহল্লা ছেড়ে শাহীঘর অর্থাৎ কাবাতুল্লাহ বা সাইয়্যেদুল মসজিদে উপস্থিতি ও মাহবুবের সাথে একাতিত্বে মোলাকাতের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ইজ্জত-সম্মানের খায়েশকে পরিহার করে ইশক-মহব্বত ও ব্যাকুলতা সৃষ্টি কর এবং মাহবুবে হাকিকী আল্লাহর ঘরের দিকে ধাবিত হও। পূর্বশর্ত হলো, পাগল হয়ে যাও। পদমর্যাদার সামগ্রী ছেড়ে দাও, ইজ্জত-সম্মানের আসবাব পরিহার কর, অহংকার ও গর্বের বস্তুকে মোবারকবাদ জানিয়ে বিদায় দাও। প্রেমাস্পদ ও মাহবুবে হাকিকী আল্লাহর দিকে চলো, সর্বপ্রথম ঘরবাড়ি ও মাতৃভূমি ত্যাগ কর এবং নিজ ঘর ছেড়ে মাহবুবের ঘরের দিকে আগাও। নিজ শহর ছেড়ে আল্লাহর নিরাপদ শহরের দিকে ধাবিত হতে থাক। স্নেহের ও প্রিয় আত্মীয়-স্বজনের ভালবাসা আল্লাহর সাথে মিলনে বাধা; তাকেও ছেড়ে দাও। মুসাফিরখানা ও গরিবানা ইখতেয়ার কর। জাত-বংশের ক্ষমতার উপর ভরসা ছিল; তাকেও মোবারকবাদ জানাও। অসহায়, নিঃসহায় অবস্থায় ঘর হতে বের হও তারপর বের হও তো পাগল, মাতাল ও আশেকের মতো বের হও।

## আশেকী, দরবেশী ও মাতলামী

সর্বপ্রথম গুরুগম্ভীরতার সামগ্রী পোশাক ও তার ফ্যাশনগুলো পরিহার করে ইহরাম বাঁধ। একটি সেলাইবিহীন লুঙ্গি কাধে আর আরেকটি কোমরে পরিধান

করে অর্থাৎ শহীয়ানা, সর্দারীমনা ও দাদাগিরি হাবভাব ছেড়ে ফকির দরবেশের বেশভূষা এবং মিসকিনদের মতো সাজসজ্জা বানাও। কাপড়ে সুগন্ধি লাগানোর ধ্যান থাকার নাযে সুগন্ধির ফিকির করবে। আশেকের তো এমন দেখানো বস্তুর দরকার নেই যদি সে ইশক মহব্বতে ডুবে থাকে। শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ধ্যান-খেয়াল ত্যাগ করো, জীর্ণ-শীর্ণ এলোমেলো অগোছালো থাকবে। আর হজ তো বলে ধুলো-ময়লা ও কাদাযুক্ত থাকাকে। অর্থাৎ পরিষ্কার-পরিচ্ছনতাকে ভিন্ন বস্তু জ্ঞান করে তা হতে বিরত থাকা। শরীরে সাজসজ্জা ও প্রসাধনী ব্যবহারের চিন্তা বাদ দাও। গোছলের পরওয়া নেই, নেই কাট-ছাট ও চুল আছড়ানোর খবর। নেই নখ বড় হওয়ার কোন ফিকির। এমনকি ময়লাযুক্ত শরীরে যদি উকুনও জমে যায়, তবুও সেগুলো ফেলে দেওয়া যাবে না, মারা যাবে না। কারণ, তুমি আশেক হয়ে চলেছ। তোমার প্রাণী হত্যা এবং লুটতরাজ থেকে বাধা প্রদানে সহযোগিতার কী প্রয়োজন। চেহারা মলিন, পা কাদাযুক্ত, মাথা টুপিবিহীন, পা জুতাবিহীন, চুলগুলো এলোমেলো, নেই তাতে সিঁথি ও তেল। তারপর কথার আওয়াজকে সুন্দর করার নেই কোন ফিকির, নেই শব্দচয়নের কোন চিন্তা, আবার সাজানো-গোছানোর কোন পেরেশানি নেই।

অর্থাৎ একেবারেই অতিরিক্ত ও অনর্থক কথা পরিহার কর। যবান থেকে কিছু বের হলে তা হবে লাব্বায়িক লাব্বায়িক, যা দরবারে উপস্থিতির জয়ধ্বনি। মন-মাতানো আকর্ষণকারী আওয়াজ পরিহার কর। লাব্বায়িকের ধ্বনি কখনও নিম্ন হবে, কখনও উচ্চ হবে, কখনো নীরবে হবে, কখনও শোরগোল করে। অর্থাৎ যবানের আওয়াজও আশেকের মতো হবে। ইশক, মাতলামি ও ব্যাকুলতা সৃষ্টি কর। কাফেলার সাথে হলে লাব্বায়িকের আওয়াজ উচ্চ হবে। আর উঁচু ভূমি ও নিচু ভূমিতে চিৎকার করে-করে লাব্বায়িক বলতে থাক, যাতে আওয়াজের সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য মিটে যায়।

মোটকথা, নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা হবে না, হবে না বাক্যালাপ। কথা হবে মাহবুবের আর বাক্যালাপ হবে মাহবুবের ভালবাসা ও ইশকের স্বাদে। অর্থাৎ জিহ্বা ও গলা শুধু মাহবুবের জন্য ওয়াক্‌ফ হবে। মাহবুবের ঘরে এসে পড়লে তো আনন্দে আওয়াজকে উঁচু কর। আনন্দ ও ব্যাকুলতায় কখনও কাবা ঘরে রক্ষিত পাথরে চুমু দাও। কখনও কাবার গিলাফে নিজেকে জড়িয়ে কাঁদো ও চিৎকার কর। কখনও কাবা ঘরের চার পাশে ডানাওয়ালা পতঙ্গের মতো চক্কর লাগাও। কুরবান হয়ে যাও। আবার কখনও আল্লাহর স্মরণে মাথানত করো, কখনওবা ভিখারী সেজে ডাক-চিৎকারে সম্মানিত হও।

কখনও ফরিয়াদ কর, কখনও স্মরণ কর, কখনও নৈকট্যের শোকরিয়া আদায় কর, কখনওবা দূরত্বের অভিযোগ কর। পা থাকবে চক্কর লাগানোতে ব্যস্ত আর জিহ্বা থাকবে ইশকে লিপ্ত। আর চক্কর লাগানোর চলন এক ধরনের হবে না। ফলে চাল-চলনে সৌন্দর্য ও গম্ভীর্য এসে যাবে। যদি কিছু চক্করে স্বাভাবিক চল তো কিছু চক্করে ঘাড় উঁচু করে হেলে-দুলে বুক টান করে চলো।

অর্থাৎ কখনও মাহবুবের দরজায় মিসকিন হয়ে যাও, কখনও মাহবুবের সিপাহী বনে যাও। এগুলো শুধু সিরত-সুরতে হলে হবে না বরং নিজের কোন মর্জি থাকবে না। মাহবুব ও তোমার উভয়ের মর্জি হবে এক ও অভিন্ন। মর্জি হবে আল্লাহর, তাঁর অনুকরণের, যাতে ভিতরগত কোন প্রকার বড়ত্ব, অহংকার না থাকে। আর বাইরেও কোন গর্ব ও অহংকার প্রকাশ না পায়।

## চটকদার উজ্জ্বল-গাম্ভীর্যপূর্ণ সুরতও নিষিদ্ধ

তারপর এই কাফনসদৃশ পোশাক ও তাওয়াফে চক্কর লাগানোর কালে কখনও এক অবস্থা ও এক ধরন থাকবে না যে, তা দ্বারা চটকদার সুরত সৃষ্টি হয়ে যাবে। প্রথম তিন চক্করে যদি কাপড় স্বস্থানে না থাকে, তাহলে চতুর্থ চক্করে তাকে ডান কাঁধের উপর ফেলে দিবে, যাতে কাপড় পরিধান করার ভিতর পারিপাট্য ও সাজসজ্জা সৃষ্টি না হয়। কারণ, এমনটি প্রকৃত আশেকের শানের খেলাফ। অর্থাৎ ইখতিয়ারবহির্ভূত পরিধানও যদি সাজসজ্জা হয়ে যায়, তাহলে তাতেও অসম্পূর্ণতা থাকে। তারপর ঘোরাফেরা ও চক্কর দেয়ার মধ্যে মাতাল ভাব ছিল; কিন্তু হাবভাব ও চাল-চলন ছিল স্বাভাবিক। বিধায় এটাও দূর করতে হবে। যখন সাফা ও মারওয়ায় পৌঁছবে, তখন চালচলনে কখনও ধীরগতি হবে, তখনও হবে দ্রুতগতি, যাতে চলার গতি এক ধরনের না হয়। যেমনভাবে তাওয়াফের ভিতর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল। মোটকথা, আল্লাহর আশেক এমন হবে যে, তার পোশাক, শরীর, সাজসজ্জা, হাবভাব, সুরত, সীরত, কথাবার্তা, আওয়াজ, চাল-চলন ইত্যাদির মধ্যে কোন প্রকার গুরুগম্ভীরতা ভাব অবশিষ্ট থাকবে না।

## সংসারত্যাগী বেদুঈন

তারপর যদিও তুমি মাতৃভূমি ও তার বাসিন্দাদের ভালবাসা ছিড়ে দিয়ে নিরাপদ শহর মক্কায় পৌঁছেছ আর মক্কাও তো আবাদী এলাকা, যাতে নিজের

আপনজন তো নেই; তবে এ শহরবাসীদের সাজসজ্জা, সামগ্রী, তাদের হাঁক-ডাক ও ভালবাসা-সম্প্রীতি শ্রবণশক্তিকে বৃদ্ধি করে এবং তাদের সাথে মেলামেশা, সাক্ষাৎ, দৃষ্টি ও অন্তরের সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করে, যা বন্ধুর মিলনে বাঁধা সৃষ্টি করতে পারে। বিধায় মক্কার বসতি এলাকাও ত্যাগ কর, যাতে বাড়িতে অবস্থান এবং মহল্লার ভালবাসার সৃষ্টি না হয়ে যায়। জঙ্গল ও বিরান ভূমিতে জীবন-যাপন কর, যেখানে কোন ঘর-বাড়ি নেই, নেই সামাজিকতা। নেই দালাল-কোঠা, না আছে সেখানে আরাম-আয়েশের সামান, না আছে সুখ-শান্তির আসবাব।

আরাফাতে বালুকাময়, কঙ্করময় জমিনে ভরদুপুরে রোধের সাগর পাড়ি দাও। কোন কাপড় বা তাঁবু দ্বারা রোধ হতে বাঁচা সম্ভব হলে তো ভালো; অন্যথায় ছায়ার গ্রহণের স্বাদও পরিত্যাগ কর। রোদের জ্বলন-পোড়নকে অগ্রাধিকার দাও, ঠা-া র আরামকে তরক কর। ঘর-বাড়ি ও অবস্থানস্থলের ফিকিরে মত্ত থেক না। বিরান ভূমিতে বসবাসকারী এবং মাঠে ময়দানে অবস্থানকারী হয়ে যাও। বেদুঈনদের ন্যায় দিনের অবস্থান মিনায় হলে রাতে মুজদালিফায়। মিনায় পুরো দিন নয় আবার মুজদালিফায় পুরো রাত নয়। তারপর মুজদালিফায় রাত যাপন এ ফিকির নিয়ে কর যে, সকাল হলেই এখান থেকে প্রস্থান করতে হবে। মুজদালিফাকে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বেই ত্যাগ কর। কেমন যেন আরাফাতের দিনের ন্যায় মুজদালিফার রাতেও চিন্তাহীনভাবে অতিবাহিত কর না। কারণ, একজন আশেকের বিশ্রাম, আরাম-আয়েশ এবং আমোদ-প্রমোদের কী প্রয়োজন?

তারপর মুজদালিফায় অর্ধ বা তৃতীয়াংশ রাত যাপনের পর তাহাজ্জুদে মাহবুবের খেদমতে হাজির হওয়ার প্রতি নজর রেখ। ইবাদত ও আনুগত্য ছাড়া এ ময়দান হতে কংকর, পাথর কুড়িয়ে নাও, যাতে এ ম্যাগজিন দ্বারা আল্লাহর দুশমন এবং স্বয়ং আশেকের পূর্বপুরুষদের দুশমন অভিশপ্ত শয়তানকে আঘাত করতে পার। শয়তান মাহবুবের পথে প্রতিবন্ধক এবং মূর্খ হিতাকাঙ্ক্ষী বনে তোমার সামনে আসে। মুজদালিফা হতে মিনায় এলে সেখানে দু-তিন দিন থাকতে হয়। তাই এখানেও সফরের নিয়ম-নীতি ঠিক রেখ। কোন একস্থানে আরাম-আয়েশের সাথে অবস্থান করবে না। কখনও এখান থেকে পুনরায় মাহবুবের দরজায় উপস্থিত হয়। মাহবুবের ঘরের চতুর্দিকে ডানাওয়ালা পতঙ্গের ন্যায় চক্কর লাগাও। সেখান থেকে ফিরে আসার সময় প্রতিদিন শয়তানের সাথে লড়াই কর যে, শয়তান জান কুরবানীর পথে বাধা সৃষ্টি করে, যাতে শান্তির তালাশে বসে থাকার গাম্ভীর্য ও

নীরবতাও খতম হয়ে যায়। আর তা হলো রমিয়ে জিমার (পাথর নিক্ষেপ) দ্বারা, যাতে সিপাহীমূলক গর্ব মিটে যায় এবং দুনিয়াবাসী দেখতে পারে, তীর-কামান-বন্দুকচালক সিপাহী আজ ছোট-ছোট পাথর নিক্ষেপ করতে ছুটে এসেছে।

প্রথমবার পাথর নিক্ষেপের কাজ হতে ফারেগ হয়েই চেহারার কুদরতি সৌন্দর্যকে মিটিয়ে দাও, যেমনভাবে সেলাই করা কাপড় পরিত্যাগ করে পূর্ণ শরীরের সৌন্দর্যকে মোবারকবাদ জানিয়ে দিয়েছ। আজ মাথার চুল মু-ন করে চেহারার সৌন্দর্যকে শেষ করে দাও। এখন যেহেতু জাহের-বাতেন সর্বপ্রকার স্বাদ ও লোকদেখানো কর্মকাণ্ড নিঃশেষ হয়ে গেছে, কেমন যেন মৃত্যুর পূর্বেই আত্মাকে মৃত্যুঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তার ভিতরগত খায়েশসমূহকে পদদলিত করা হয়েছে।

## জ্ঞান উৎসর্গ

তো এখন সমর এসেছে সরাসরি নিজ আত্মাকেই মাহবুবের পথে উৎসর্গ করে দাও এবং নিজেই নিজের গলায় ছুরি চালিয়ে দাও। সর্বস্ব খুইয়েছ; এখন শুধু প্রাণটা বাকি আছে; তাকেও অর্পণ করতে দেরি কর না। তবে এটি ভিন্ন বিষয় যে, মাহবুবে হাকিকী আল্লাহ তায়ালা নিজ অসীম দয়া ও অনুগ্রহে জান-কুরবানীর মুক্তিপণ জন্তু কুরবানীর মাধ্যমে কবুল করে নিবেন। অন্যথায় এ পথে, এ প্রাণ তো প্রাণ সৃষ্টিকারীর সামনে কোন মূল্যই রাখে না। আর প্রাণ তো তাঁরই দান করা বস্তু। তাহলে সওদা তো অনেক সস্তা হয়ে যায়। অতএব মাহবুবের কৃতজ্ঞতায় তার মর্জি মোতাবেক কুরবানী স্থলে উপস্থিত হয়ে নিজ জানের মুক্তিপণস্বরূপ একটা প্রাণীকে কুরবানী করে দাও। এটাই সর্বশেষ ত্যাগ ও বর্জনীয় কর্ম, যার মাধ্যমে মাহবুবের সাথে মিলনের আকাঙ্ক্ষা করা যায়।

সুতরাং মাহে রমযানের দ্বারা তো জৈবিক স্বাদ ও উপকরণকে পরিহার করানো হয়েছিল। আর হজের মাসগুলোতে ইজ্জত-সম্মানের স্বাদকে পরিহার করার প্লান পেশ করেছে, যা দেশ ত্যাগ, বাসস্থান ত্যাগ, পোশাক ত্যাগ, সাজ-সজ্জা ত্যাগ, আরাম-আয়েশ ত্যাগ, ফ্যাশন ত্যাগ, লৌকিকিতা ত্যাগ, গাম্ভীর্য ত্যাগ, ইজ্জত-মর্যাদা ত্যাগ, আনন্দ-উৎসব ত্যাগ, মাল-সম্পদ ত্যাগ ইত্যাদি ত্যাগের দ্বারা শুরু হয়ে পরিশেষে প্রাণ ত্যাগের মাধ্যমে শেষ হয়।

## হজের দিনগুলোতে মাহে রমযানের স্মরণ

কিন্তু সাথে সাথে ঐ জৈবিক স্বাদ-উপভোগ পরিহার করা হতে চক্ষু বন্ধ করেনি, যা মাহে রমযান শিক্ষা দিয়েছিল। বরং হজের মাসগুলোতে বিশেষ বর্জনের সাথে সাথে রমযানের বর্জনগুলোকে কাজে লাগানোর জন্য কেমন যেন মাহে রমযানের অর্ধাংশকে পুনরায় ফিরিয়ে আনা হলো। অর্থাৎ শাওয়ালের ছয় রোযা, যিলহজের প্রথম দশকের রোযা হজের মাসগুলোতে রাখা হয়েছে, যাতে হজের মাসগুলোতে মানুষ মাহে রমযানকে ভুলে না যায়। এমনকি কিছু বর্ণনায় যিলহজের প্রথম দশকের দিনগুলোকে রমযানের দিনগুলোর উপর প্রাধান্য ও ফযীলত দিয়েছে। যখন উভয় প্রকারের স্বাদ ও তার উপকরণ বন্ধ করা হয়, তখন মানুষ মাহবুবের ঘরে হাজির হওয়ার যোগ্য হয়, যোগ্য হয় হককে কাছে থেকে দেখার।

এতে প্রতীয়মান হয়, মাহে রমযান হলো প্রাথমিক বর্জনীয় বস্তুর মাস। আর হজের মাসগুলো হলো ঐ বর্জনের পূর্ণতারও সর্বশেষ মাস।

## কুরবানীর ঈদের হেকমত

হ্যাঁ; তারপর যেমনভাবে রমযানের করণীয় ও বর্জনীয় কর্মসমূহের পূর্ণতা লাভের পর পহেলা শাওয়ালের ডাবল শোকরিয়া আদায় করা হয়েছিল। আর আর্থিক শোকরিয়া সাদকায়ে ফিতর দ্বারা গরিবদের খেদমত করা হয়েছিল, তেমনিভাবে এখানেই হজের করণীয় ও বর্জনীয় কর্মসমূহের পূর্ণতা, যা যিলহজের ৯ তারিখে হয়, তারপর ১০ যিলহজ একই নিয়মে জান ও হৃদয় দ্বারা ডাবল শুকরিয়া আদায় করা হয়। তারপর ওয়াজিব সাদকা কুরবানী দ্বারা গরিব-আহবাবদের খেদমত করা হয়। ফলে মালের শুকরিয়াও আদায় হয়ে যায়।

## জালাল ও জামাল শানের শুকরিয়া

সুতরাং ইসলাম ধর্মে দুই ঈদের উৎসব র‍্যালি করার জন্য রাখা হয়নি; বরং আনন্দ র‍্যালিকে ধ্বংস করা এবং এ জাতীয় সকল জাতিগত ও মানবিক স্বাদ-খায়েশকে নিঃশেষ করে আধ্যাত্মিক নৈকট্য ও মিলনের শোকরিয়া আদায়ার্থে ঈদ উৎসব রাখা হয়েছে। তবে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, রমযানে বর্জনীয় কর্মের সাথে সৎকর্মের ধারাবাহিকায় নামায (তারাবীহ)-এর কর্ম রাখা হয়েছে

আল্লাহ তায়ালার জ্বালাল ও আজমত (বড়ত্ব)-এর সামনে নিজের গোলামী ও অপারগতা প্রকাশ করার জন্য, যাতে স্বাভাবিকভাবে তাঁর রাজত্ব ও বাদশাহীর সামনে নিজের যিল্লতি, মুহতাজী ও দাসত্বের প্রমাণ পেশ করা হয়। আর হজের মাসগুলোতে বর্জনীয় কর্মের সাথে সাথে সৎকর্মের ধারাবাহিকায় হজের বিধানাবলি রাখা হয়েছে আল্লাহ তায়ালার জামাল ও মাহবুবিয়াতের সামনে নিজের আসক্তি, কৃতজ্ঞতা, ইশক ও মহব্বতের উৎসাহ-উদ্দীপনা পেশ করার জন্য, যাতে স্বাভাবিকভাবে আল্লাহর জামাল ও সৌন্দর্যের সামনে নিজের ইশক ও মহব্বত পেশ করা হয়।

অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, পরিহার করার ধারাবাহিকায় প্রজা ও গোলামকে উপস্থিতির ধারাবাহিকতায় নফসের করণীয় বস্তুর উৎসাহ এবং খায়েশ পরিহার করতে হয়, যা দ্বারা সে খাওয়া, উপার্জন করা, ব্যয় করার কাজ করতে পারে না। অন্যথায় তার খেদমতের সুযোগ কোথায় মিলবে। আর আশেক ও প্রেমিকের শুধু আত্মার খায়েশই নয় বরং একেবারে আত্মাকেই পরিত্যাগ করতে হয়। আর আত্মার ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্রকে ইশকের সাথে হারিয়ে ফেলতে হয়। আর তার প্রচলিত ও স্বভাবগত ইজ্জত-মর্যাদা, অহংকার ও পদমর্যাদা তো অনেক দূরের বস্তু, যাদের কোন মর্যাদাই নেই।

অন্য কথায় এভাবে বুঝ যে, নামায তো শাহী খেদমত আঞ্জাম দেয়ার জন্য সরকারিভাবে শাহী দরবারে উপস্থিতি, যার জন্য সময় ও আরাম-আয়েশের কুরবানীই যথেষ্ট। তবে শাহী আদব ঠিক রেখে। আর হজ ইশকের জোশে শাহী আদব ব্যতীত হরমে স্বয়ং ব্যক্তির উপস্থিতি, যার জন্য জান-মাল উভয়ের কুরবানী আবশ্যক। কিন্তু তা হবে ইশকের আদবের সাথে, যার সারসংক্ষেপ হলো নিজেকে ভুলে যাওয়া ও আনমনা হয়ে চলা।

নামাযে নীরবতা ও গম্ভীরতা উদ্দেশ্য যে, মাবুদের দরবারে ও দফতরে উপস্থিত হতে হয়। আর হজ হতে নীরবতা ও গম্ভীরতা মিটিয়ে দেয়া হয় যে, প্রেমিকের সাজে মাহবুবের দরজায় উপস্থিতি। সুতরাং তেলাওয়াত ও তারাবীহ রমযানের জন্য তো জৈবিক স্বাদ পরিহার করার জন্য দেয়া হয়েছে, যার সম্পর্ক আরাম-আয়েশের সাথে নীরবতা ও গম্ভীরতার সাথে নয়। তাই শুধু সময়ের কুরবানীই যথেষ্ট। কিন্তু মসজিদে হারামে পৌঁছে নৈকট্য ও মিলন অর্জনের জন্য ইজ্জত-মর্যাদা পরিহার করা জরুরি, যার সম্পর্ক ইজ্জত-সম্মান ও জৈবিক চাহিদা, আরাম-আয়েশ, গাম্ভীর্য ও ভয়-ভীতি ইত্যাদি সবগুলোর সাথেই ছিল, যার ফলে আশেকের অসহায় ভাব এবং আনমনা চলা সৃষ্টি হয়। তাই তার জন্য শুধু সময়ের কুরবানীই যথেষ্ট নয় যতক্ষণ না স্বয়ং আত্মাকে

কুরবানী করা হয়।

সুতরাং ঈদুল ফিতর দ্বারা জালাল শানের হকসমূহের শুকরিয়া করা হয়, যার দ্বারা বান্দার প্রকৃত গোলাম হওয়া সহজ হয়। আর ঈদুল আযহা দ্বারা জামাল শানের হকসমূহের শুকরিয়া আদায় করা হয়, যার দ্বারা বান্দার আশেক হওয়া সহজ হয়।

## নামায ও হজ ইসলামের মৌলিক ইবাদত

এতে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সাধারণত আল্লাহ তায়ালা যেমনভাবে বাদশাহের বাদশা এবং মালেক ও হাকীম, তেমনিভাবে তিনি মাহবুব ও মাতলুব (কাম্য) এবং জামীল ও মারগুব (পছন্দনীয়)। আর এ কারণেই যেখানে বান্দার শাহী দরবার মসজিদে আনুগত্য ও মুহতাজীর সাথে উপস্থিত হওয়া জরুরি, এমনিভাবে তার জন্য আল্লাহর শাহী হরম মসজিদে হারামে আশেক ও বশ্যতা স্বীকারকারী হয়ে উপস্থিত হওয়া জরুরী। অর্থাৎ তার ইবাদত পূর্ণ ও কামেল হবে না যদি সেগুলোর মধ্য হতে কোন এক প্রকার ইবাদত অবশিষ্ট থাকে। এ জন্যই তার অর্থ হলো, যদি শরীয়তে হজ না থাকত, তাহলে শরীয়ত অসম্পূর্ণ হত আর জামাল শানের দাবি বিদ্যমানে আসত না।

অতএব যেখানে ইসলামের পূর্ণতা ও সমাপ্তি নামায ও হজ ছাড়া সম্ভব ছিল না, সেখানে মুসলমানের পূর্ণতাও নামায ও হজ আদায় করা ব্যতীত সম্ভব নয়। বিধায় ইসলামে শুধু দুটি বুনিয়াদী ইবাদতকে মৌলিক ধরা হয়– নামায ও হজ। একটি জালানি ইবাদত অপরটি জামালি ইবাদত। আর অপর দুটি ইবাদত রোযা ও যাকাত উভয়টি মৌলিক ইবাদতের অনুগামী ও তাদের ভূমিকা ও পূর্বাভাসা হিসেবে ইবাদত।

যাকাত হলো নামাযের ভূমিকা, যার মাধ্যমে নামায সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ, নামায ও দরবারে উপস্থিতির মাঝে যদি কোন প্রতিবন্ধক হয়, তাহলে সেগুলো হয় ধন-সম্পদ এবং তা হতে সৃষ্ট আরাম আয়েশ ও আনন্দ। এ জন্যই এগুলোকে যাকাত ও সদকার মাধ্যমে পরিত্যাগ করিয়ে অন্তর থেকে সেগুলোর ভালোবাসা বের করা হয়, যাতে প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে উদ্দেশ্যের সৌন্দর্য প্রকাশ পায়।

এদিকে রোযা হলো হজের ভূমিকা। শাহী দরবারে উপস্থিতি এবং বিশেষ নৈকট্যের স্বাদ আস্বাদনে যদি কোন প্রতিবন্ধক হয়, তাহলে সেটি হলো নফস ও তার মানবিক ও জৈবিক চাহিদা। অর্থাৎ ইজ্জত, সম্মান, নেতৃত্ব,

অহংকার, গর্ব ইত্যাদি। এ কারণে রোযা দ্বারা সেগুলোর পরিহার শুরু করা হয় এবং হজের মাসগুলোতে পৌঁছিয়ে সেগুলোকে নিঃশেষ করা হয়, যাতে প্রতিবন্ধক নিঃশেষ হয়ে উদ্দেশ্য অর্জি হয়ে যায়। এ জন্যই হজের মাসগুলোকে রমযানের সাথে পাশাপাশি রাখা হয়েছে, যাতে প্রাথমিক পরিহার শেষ হওয়ার সাথে সাথে সর্বোচ্চ ত্যাগ ও পরিহারের ধারাবাহিকতা পাশাপাশি থাকে।

সুতরাং ইসলামের বুনিয়াদী ইবাদত হলো দুটি– নামায ও হজ। আর অন্য দুটি ইবাদত হলো মৌলিক ইবাদতের ভূমিকা ও পূর্বাভাষ। অর্থাৎ যাকাত ও রোযা। বুনিয়াদী ইবাদতসমূহে মূল অংশ করণীয়, যা তার মূল মাকসাদ বা উদ্দেশ্য। আত্মা সেগুলো দ্বারা সাজানো থাকে। আর ভূমিকা ও পূর্বাভাসমূলক ইবাদত যাকাত ও রোযার মূল অংশ হলো বর্জনীয়। আর তা বুনিয়াদী, যা দ্বারা নফসের মন্দ স্বভাব পরিষ্কার হয়।

## ইজতেমায়ী দীন

ইসলাম যেহেতু ইজতেমায়ী বা সংঘবদ্ধ ধর্ম, বিধায় তার মৌলিক ইবাদত নামায ও হজকে ইজতেমায়ী হিসেবে রাখা হয়েছে। সুতরাং উভয় ইবাদতে আসল হলো ইজতেমা বা সংঘবদ্ধতা। আর উভয়টিতে ইমাম ও আমির বাধ্যতামূলক, যা ইজতেমায়ী ব্যবস্থার জরুরি বৈশিষ্ট্য। আর প্রারম্ভিক ও প্রাথমিক ইবাদত যেহেতু ঐ ইজতেমায়ী ইবাদতের জন্য অন্তর তৈরি করার মাধ্যম আর অন্তর যেহেতু সবার পৃথক পৃথক, সে জন্য এ দুটো ইবাদত (রোযা ও যাকাত)কেও পৃথক-পৃথক রাখা হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেকের সম্পদ ও পরিমাণ পৃথক পৃথক। এ কারণে প্রতিজনের যাকাত, পরিমাণ ও সময়ের দৃষ্টিতে পৃথক পৃথক। এমনিভাবে খাবার পরিহার ও খায়েশ পরিহার সবার আলাদা আলাদা। আবার রোযাও সবার জন্য আলাদা আলাদা।

মোটকথা, ইসলাম ইজতেমায়ী ধর্ম হওয়ার কারণে তার দাবিও ছিল যে, তার বুনিয়াদী ইবাদতগুলো ইজতেমায়ী হবে। আর প্রারম্ভিক ও ভূমিকারূপী ইবাদতগুলোতে ইজতেমা শর্ত হবে না। সারকথা হলো, ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন ও শিক্ষা-দীক্ষার একজন মুসলিমের বার্ষিক ইবাদত করণীয় ও বর্জনীয়, সৎকর্ম ও তাকওয়া দ্বারা সংমিশ্রণ করে রাখা হয়েছে। তার বুনিয়াদী ইবাদতসমূহ হতে দুই ইবাদতকে করণীয় ধরনের রাখা হয়েছে; অর্থাৎ নামায ও হজ। অপর দুটিকে বর্জনীয় শ্রেণীর রাখা হয়েছে; অর্থাৎ রোযা ও যাকাত। ইবাদতি বছরের শুরু মাস রমযানে সৎকর্ম, তেলাওয়াত, তারাবীহ ইত্যাদি

রাখা হয়েছে আবার ঐ মাসেই তাকওয়া (বর্জন) (খাবার ও খায়েশ ত্যাগ) রাখা হয়েছে।

## ইবাদতি বছরের মধ্যবর্তী রোযাগুলোর গুরুত্ব

এমনিভাবে যদি ইবাদতি বছরের মধ্যবর্তী অংশের উদাহরণস্বরূপ হজের মাসগুলোতে সৎকর্ম, তাকওয়া, যিয়ারত, নামায ও তেলাওয়াত ইত্যাদির পুঁজি একত্রিত করা হলে দেখা যাবে, এ মাসগুলোতেও ইজ্জত, মাল ও জৈবিক শক্তি উভয় প্রকারের সর্বোচ্চ বর্জনীয় কর্মগুলোকে একত্রিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে যিলহজের প্রথম দশকের রোযা, বিশেষ করে আরাফাত দিবসের রোযা আলাদা গুরুত্ব রাখে। অথবা হজের মাসগুলোর পরবর্তী মহররম মাসে যেখানে সৎকর্ম, তেলাওয়াত, নামায, যিকির ইত্যাদিকে আমল হিসেবে রাখা হয়েছে আর বর্জনীয় কর্মের ধারাবাহিকতায় আশুরা দিনের রোযা গুরুত্বের সাথে রাখা হয়েছে, যা দ্বারা সারা বছরের গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়। তারপর যেভাবে মধ্যবর্তী মাসগুলোতে সৎকর্ম, বিশেষ করে শুধু ফরজসমূহেই যথেষ্ট করা হয়নি বরং সাধারণত নফল ও মুস্তাহাবসমূহকেও রাখা হয়েছে। তেমনিভাবে তাকওয়ার ধারাবাহিকতায় বিশেষ রোযাগুলো, যেমন আরাফাত দিবসের রোযা, আশুরার রোযা ইত্যাদির যথেষ্ট করেনি বরং প্রতি মাসে আইয়ামে বীজের তিন রোযা (১৩, ১৪, ১৫), প্রতি সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবারের রোযা রাখা হয়েছে, যাতে বছরের মধ্যবর্তী মাসগুলোতে কোন মাসই যেন সৎকর্ম এবং বর্জনীয় কর্ম হতে মুক্ত না থাকে এবং রমযানের স্মরণ করণীয় ও বর্জনীয় উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাজা হতে থাকে।

এমনিভাবে ইবাদতি মাসের শেষ মাস অর্থাৎ শাবান মাসে শবে বরাতের সৎকর্ম নামায, তেলাওয়াত এবং মুজাহাদা ও মোরাকাবা ইত্যাদি আকারে রাখা হয়েছে, যেগুলোর দ্বারা সেই রাতটি উদযাপন করা হয়। তো শবে বরাতের রোযাকে সুন্নাত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং পূর্ব নীতি অনুযায়ী শুধু ঐ বিশেষ কর্ম ও বর্জনের উপরও যথেষ্ট করেনি বরং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভ্যাস ছিল, সৎ কর্মের সাথে সাথে শাবান মাসে বেশি বেশি রোযা রাখতেন, যেন মাসটি করণীয় ও বর্জনীয় কর্মে ভরপুর থাকত, যেগুলোর মধ্যে শবে বরাতের করণীয় এবং তার দিনের বর্জনীয় কর্ম বিশেষভাবে গুরুত্ব রাখে।

## মাস ও বছরের মাঝে সামঞ্জস্য

অতএব বছর, যার শুরুতে রমযান এবং তার করণীয় ও বর্জনীয় কর্ম রয়েছে আর মধ্যবর্তী মাসগুলোতে আশহুরে হজ ও মহররম ইত্যাদির পরিপূরক করণীয় ও বর্জনীয় কর্মগুলো রয়েছে এবং শেষে রয়েছে শাবান মাস ও তার বিশেষ করনীয় ও বর্জনীয় কর্ম, তাহলে তো এ কথা সুস্পষ্ট যে, এমন বছরের বরকত, হেদায়েত ও উজ্জ্বলতার কি পরিসীমা থাকতে পারে! কেননা, যে বস্তুর শুরু-শেষ ও মধ্যম সুস্থ-সঠিক হয়, সেই বস্তু নিশ্চিতভাবে সংরক্ষিত ও মুক্তিপ্রাপ্ত এবং ধ্বংস হতে নিরাপদ।

সুতরাং যেমনিভাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতে মুতাহহারার শুরু, শেষ ও মধ্যবর্তী উল্লেখ করে সমষ্টিগত উম্মতের নাজাত ও ধ্বংস না হওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করে ইরশাদ করেছেন–

كَيْفَ تَهْلِكُ أُمَّةٌ أَنَا أَوَّلُهَا وَالْمَهْدِيُّ وَسْطُهَا وَالْمَسِيْحُ اٰخِرُهَا

এমন উম্মত কিভাবে ধ্বংস হবে, যাদের শুরুতে হলাম আমি আর মধ্যবর্তী সময়ে হলে মাহদী আর শেষে ঈসা।
*[মিশকাত শরফী]*

এমনিভাবে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এমন মুমিন কিভাবে ধ্বংস হবে, যার ইবাদতি বর্ষের শুরু মাস মাহে রমযান মুবারক, মাঝে রয়েছে আশহুরুল হজ ও মহাররমুল হারাম এবং শেষ মাস হলো শাবানে মুয়াযযাম। সুতরাং যে মুমিনের জীবনে এমন বছর অতিবাহিত হতে থাকে আর এভাবে জীবন শেষ হয়ে যায়, তাহলে অবশ্যই তার অন্তরজমিন শুরু, মধ্য ও শেষের দ্বারা ইজ্জত, সম্মান ও জৈবিক চাহিদার বর্জনীয় কর্মের মাধ্যমে আত্মিক ময়লা-আবর্জনা হতে পরিষ্কার ও পবিত্র থাকবে। আর আনুগত্য কর্ম ও গোলামী এবং সৎকর্মের মাধ্যমে নূর ও বরকত দ্বারা আলোকিত হয়ে উঠবে। তার খারাবী দূর হয়ে ফাযায়েল ভরপুর হবে। আর আগুন (জাহান্নাম) হতে বেঁচে যাবে এবং নূর (জান্নাত) দ্বারা সম্মানিত হবে। এগুলোই হলো আসল সফলতা ও কামিয়াবী।

ইরশাদ হয়েছে–

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ○

তারপর যাকে জাহান্নামে থেকে দূরে রাখা হবে এবং

জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে কামিয়াব হবে। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া আর কিছু নয়। *[আলে ইমরান : ১৮৫]*

আশা করি, পাঠকদের নিকট রমযান, ঈদ, মানাসিকে হজ (হজের বিধান) ইত্যাদির হাকিকত ও হেকমত (রহস্য) এবং সেগুলোর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল এক রকম সুস্পষ্ট হয়ে থাকবে, যা উক্ত লাইন ও ইবারতগুলোর উদ্দেশ্য। এ পৃষ্ঠাগুলো বেশি বিস্তারিতকরণের সুযোগ ছিল না বিধায় এতটুকু সংক্ষিপ্ততার উপর যথেষ্ট করা হয়েছে।

সাহাবী হযরত উবাদা ইবনে সামেত রাযি. বলেন, যখন মাহে রমযান আসত, তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদরেকে এই কালিমাগুলোর তালিম দিতেন–

اَللّٰهُمَّ سَلِّمْنِيْ لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْ رَمَضَانَ لِيْ وَسَلِّمْهُ لِيْ مُتَقَبَّلًا

হে আমার আল্লাহ! আমাকে রমযানের জন্য হেফাজত করুন এবং রমযানকে আমার জন্য হেফাজতকারী বানান আর রমযানকে হেফাজত করে আমার জন্য কবুল করে নিন। *[হায়াতুস সাহাবা ৩/ ২০১]*

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا اَللّٰهُمَّ وَ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَّ اَلْحِقْنَا بِالصّٰلِحِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ

হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত কর না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদের অনুগ্রহ দান করো। তুমিই সব কিছুর দাতা। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান করো এবং আমাদেরকে মুত্তাকিদের জন্য আদর্শ বানাও। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ইসলামের উপর মৃত্যু দান করো এবং নেককারদের সাথে মিলিত করো। আমীন। কবুল করো হে জগতসমূহের পালনকর্তা!

# বয়ান : ৪

## তাকওয়ার ফযীলত

সাধারণভাবে দুনিয়াতে অন্যায়, অশ্লীলতা, মারামারি, বিশৃঙ্খলা, ধর্মহীনতা ও ফাসেকী কর্মসমূহ ব্যাপক আকার ধারণ করছে। অপরাধে লিপ্ত হওয়ার কারণ এই নয় যে, পুলিশ ও সামরিক বাহিনী কম; বরং অন্তরে আল্লাহর ভয়-ভীতি নেই। যদি অন্তরে আল্লাহর ভয়-ভীতি থাকত, তাহলে মানুষ গোনাহের কাজে লিপ্ত হওয়ার হিম্মতই করত না– চাই পুলিশ ও সামরিক বাহিনী উপস্থিত থাক বা না থাক। তারপর নির্জনে হলেও সেখানে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ•

وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

## বাস্তব অবস্থাসমূহ

সম্মানিত উপস্থিতি! এখানে আসার পর কিছু বয়ান করব তার অঙ্গীকার করেছিলাম। কিন্তু অসুস্থতার ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে গেল। সর্দি-কাশি ও জ্বর ইত্যাদির কারণে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ায় আমি আপত্তি জানালাম যে, ভাই! আজ বয়ান বন্ধ থাক; পরে দেখা যাবে। সুতরাং আমার ভাই রশীদ বললেন, এখান থেকে ফেরার পথে এক দিন সময় দিবেন, তখন কিছু বয়ান করলেই হবে। তার কথার উত্তরে বললাম, ঠিক আছে এতে কোন অসুবিধা নেই। আজ চিন্তা করলাম, মনে হয়, আমি ভুলে গেছি এবং আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, মজলিস ও মাহফিলের কোন প্রস্তুতি নেই। কিন্তু এখন জানতে পারলাম, সবাই জমায়েত হয়েছেন। তো আমার মনে হঠাৎ একটি বিষয়

ভেসে উঠল। আর মজলিসের সম্মানের তাকাজা হলো, তাদের উদ্দেশে কিছু বলা ও বয়ান করা চাই তা সংক্ষিপ্তই হোক। তাই বেশি সময় ব্যয় না করে সংক্ষিপ্তাকারে কিছু আবেদন করব।

## সালফে সালেহীনদের পথ ও তাকওয়ার অসিয়ত

সালফে সালেহীন অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিঈদের অভ্যাস ছিল, যখন একজন অপরজন হতে বিদায় নিতেন, তখন বলতেন, কিছু নসিহত করুন। ছোটজন তার বড় জনকে নসিহত করতে বলতেন আর বড়জন ছোটজনের নিকট নসিহত চাইতেন। সাধারণত সালফে সালেহীনদের নসিহত হত, আমি তোমাকে তাকওয়া গ্রহণ করার নসিহত করছি। এমনটিই ছিল তাঁদের নিকট ব্যাপক। এ কারণেই আমি উক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করেছি, যার অর্থ হলো–

'যেব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য অসুবিধা হতে নিষ্কৃতির এমন রাস্তা খুলে দেন যে, তার ধারণাও হয় না।'

অসুবিধাং আক্রান্ত হয়ে চতুর্দিকে রাস্তা বন্ধ; তখন গায়েবীভাবে সামান-পত্রের ব্যবস্থা হয় এবং রাস্তা বের হয়ে যায়, যার দরুন অসুবিধা দূর হয়ে যায়।

## তাকওয়ার ফলাফল

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য অসুবিধা হতে নিষ্কৃতির পথ করে দেন।

তাকওয়ার ফলাফলের মধ্য হতে প্রথম ফলাফল এই যে, আল্লাহ তায়ালা মুত্তাকির অসুবিধাসমূহ দূর করে দেন।

দ্বিতীয় অঙ্গীকার হলো এই–

وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

আল্লাহ তায়ালা তাকে এত পরিমাণ রিযিক প্রদান করেন যে, তার ধারণা ও কল্পনাও করা যায় না, যে আমার রিযিক সেখান থেকে পৌঁছবে।

তৃতীয় ওয়াদা করেছেন–

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ

যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তার গোনাহসমূহকে মিটিয়ে দেন।

অর্থাৎ তাকওয়া তার গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়।

চতুর্থ ফলাফল এই বয়ান করেছেন যে–

وَيُعْظِمْ لَهٗٓ اَجْرًا

আল্লাহ তায়ালা তার প্রতিদান ও সাওয়াবকে অনেক গুণে বৃদ্ধি করে দেন।

উক্ত আয়াতে তাকওয়া অবলম্বনকারীর জন্য চারটি ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। অসুবিধায় রাস্তা খুলে দেয়া, ধারণাতীত রিযিক দেয়া, গোনাহ মিটিয়ে দেওয়া, প্রতিদিন বৃদ্ধি করা।

তাকওয়ার শাব্দিক অর্থ তো ভয়-ভীতি, যার নির্যাস হলো, আল্লাহকে ভয় কর এবং ভয়-ভীতি ইখতিয়ার কর। কোন সময় চিন্তামুক্ত হয়ে বসে থেক না। চাই ধনী হও বা গরিব সর্বাবস্থায় আল্লাহর ভয় মানুষের থাকা উচিত।

## তাকওয়া বিশ্বশান্তির জিম্মাদার

চিন্তা করলে বের হয়ে আসবে, যত অন্যায়-অপরাধ রয়েছে, সেগুলো একমাত্র আল্লাহর ভয় দ্বারাই নিঃশেষ হতে পারে। অপরাধকে পুলিশ রুখতে পারবে না, পারবে না সামরিক বাহিনী বা কোন অস্ত্র। যতক্ষণ না অপাধীর অন্তরে আল্লাহর ভয়-ভীতি সৃষ্টি হবে, ততক্ষণ মানুষ অপরাধ হতে বিরত থাকতে পারবে না। যদি পুলিশ, সামরিক বাহিনীর শক্তি দ্বারা অপরাধ বন্ধ করা যেত, তাহলে বর্তমান পৃথিবী, সবচেয়ে বেশি মুত্তাকি হতো। কেননা, বর্তমানে পুলিশ, সামরিক বাহিনী ও হাতিয়ার কোনটাই কম নং; বরং আজ বিশ্বে এমন এমন অস্ত্র রয়েছে, যা পৃথিবীতে পূর্বে ছিল না। তোপ আছে, বোমা আছে।

মোটকথা, এমন এমন অস্ত্র বিদ্যমান রয়েছে, যার প্রতিক্রিয়া অনেক দূর পর্যন্ত যায়। এক একটি বোমা দ্বারা লাখ লাখ মানুষ নিঃশেষ হতে পারে। যদি উল্লিখিত মাধ্যম দ্বারা পৃথিবীতে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত এবং অপরাধ দূর হতো, তাহলে বর্তমান দুনিয়ায় কোন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড অবশিষ্ট থাকত না।

সবাই মুত্তাকি ও পরহেজগার হতো। কিন্তু যত পুলিশ, সামরিক বাহিনী ও অস্ত্র বৃদ্ধি হচ্ছে, তার ডাবলেরও ডবল অপরাধ বৃদ্ধি হচ্ছে এবং ব্যাপকহারে দুনিয়াতে অন্যায়, অপরাধ, মারামারি, বিশৃঙ্খলা, ধর্মহীনতা এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ব্যাপকতা লাভ করছে। আর অপরাধে জড়িয়ে পড়ার কারণ এই নয় যে, পুলিশ কম, সামরিক বাহিনী বা অস্ত্র কম। বরং তার কারণ হলো, অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই। যদি অন্তরে আল্লাহর ভয়-ভীতি থাকে, তাহলে মানুষ অপরাধে লিপ্ত হওয়ার হিম্মত করবে না চাই সেখানে পুলিশ-সেনাবাহিনী থাকুক বা না থাকুক। এমনকি নির্জনে থাকলেও অপরাধে জড়াবে না।

## তাকওয়া ব্যতীত শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়

উদাহরণস্বরূপ আপনার সামনে লাখ টাকার বান্ডিল রাখা আছে। যদি আপনি তা থেকে নিতে চান, তাহলে নিত পারেন। কেননা, সেখানে কোন পুলিশ নেই, নেই সেনাবাহিনীর লোক। কিন্তু তারপরও আপনি কেন সেগুলো উঠিয়ে নেননি। কারণ, আপনার অন্তরে তো আল্লাহর ভয় রয়েছে যে, যদি আমি এমন কাজ করি, তাহলে কিয়ামত দিবসে আল্লাহর দরবারে কী জবাব দেব যখন জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি অপরের সম্পদে কেন অন্যায় হস্তক্ষেপ করেছিলে? তাই সবচেয়ে বড় পুলিশ হলো আল্লাহর ভয়, যা অন্তরে বসে আছে। সেই ভয়ই সকল অপরাধ হতে রক্ষাকারী এবং সকল পাপ-পঙ্কিলতা হতে বাধাদানকারী। অন্যথায় এ পৃথিবীতে অন্য কোন মাধ্যম নেই, যে অপরাধ থেকে বাঁচাবে এবং তা থেকে বাধা দিবে।

ইসলাম আখেরাত সম্পর্কে যে বিশ্বাস পেশ করেছে, তার উদ্দেশ্য হলো, বান্দার ভিতর সর্বদা এই কল্পনা জাগ্রত থাকবে যে, আমাকে আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করতে হবে। আর প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞেস করবেন জীবন কিভাবে অতিবাহিত করেছ? তার উত্তর দিতে হবে। তাই এই আকিদা-বিশ্বাস এমন, যার দ্বারা মানুষ অন্যায় কর্মকাণ্ড ও বেপরোয়া অবস্থা থেকে ফিরতে পারবে। এই আকিদার কারণেই পৃথিবীতে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং প্রতিটি মানুষ অপরাধে জড়িয়ে পড়া হতে বাঁচতে পারে। অন্য কোন উপায় বা মাধ্যম এমন নেই, যা অবলম্বন করে অপরাধ হতে বাঁচতে পারে।

## বাতেনী অনাচারও তাকওয়া দ্বারা নির্মূল হয়

সৃষ্টিগতভাবে মানুষ জীব-জন্তুর মতো। মার-দাঙ্গা, ছিঁড়ে ফেলা ও কেটে ফেলা তার বৈশিষ্ট্য। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে, যখন হযরত আদম (আ.)কে জমিনে অবতরণ করানো হয়েছে এবং হযরত হাওয়া (আ.)কেও পাঠানো হয়েছে, তখন বলা হয়েছে–

اِهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

তোমরা পৃথিবীতে যাও; একে অপরের শত্রুতা তোমাদের ভিতর ঢেলে দেওয়া হবে।

এ জন্যই মানুষ একজন অপরজনের দুশমন; তারা একে অপরের মন্দ কামনা করে। তার অন্তরে কোথাও লোভ রাখা আছে, কোথাও ঈর্ষা রাখা আছে, কোথাও হিংসা রাখা আছে, কোথাও অহংকার রাখা আছে। ঐ অসৎ চরিত্রের ভিত্তিতে যখন মানুষ লোভাতুর হবে, তখন অন্যের সম্পদের প্রতি দৃষ্টি দিবে এবং তা অর্জন করার জন্য চেষ্টা করবে। অবৈধ বা বৈধের পরওয়া করবে না, বেপরওয়াভাবে চুরি-ডাকাতি করবে। কেননা, তার ভিতরে লোভের মাদ্দা রয়েছে। আর যদি মানুষের ভিতর হিংসার মাদ্দা বিদ্যমান থাকে, তাহলে সে অন্যের উন্নতি দেখতে পারবে না। দুনিয়াতে কেউ যদি ইজ্জত-সম্মানে উন্নতি লাভ করে, তাহলে হিংসুকের অন্তরে হিংসা বেড়ে যায় যে, তার ইজ্জত বাড়ল কেন। মানুষ তো এমন চিন্তা কখনও করে না যে, সে তার যোগ্যতা সঠিক মতো ব্যবহার করেছে। তাই আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। আমির এমন যোগ্যতা সৃষ্টি করি। কিন্তু এমনটি হয় না; বরং হয়, উন্নতি ও মর্যাদা তার থাকতে পারবে না চাই আমার অর্জন হোক বা না হোক। এমন হিংসার বৈশিষ্ট্য হলো, মানুষ অন্যের নেয়ামত ধ্বংস হতে দেখলে খুশি হয়। চাই সে নিজে মিসকীনই হোক।

এমনিভাবে অহংকার, লোভ-লালসা ইত্যাদি মন্দ বস্তুর উপর ব্রেক লাগানোর মতো কোন জিনিস যদি থেকে থাকে, তাহলো আল্লাহর ভয় ও তাকওয়া। যদি আল্লাহর ভয়-ভীতি না থাকে, তাহলে মারামারি, চুরি-ডাকাতি ছাড়া মানুষ আর কী করবে। তাতে দুনিয়াজুড়ে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠবে। এগুলোই মানুষের সাধারণ ও সৃষ্টিগত চরিত্র। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা নিজের পক্ষ হতে বিধিবিধান নাযিল করেছেন যে, এমন জিনিস হতে বেঁচে থেকে জীবন যাপন কর। এ কারণেই আদেশ করা হয়েছে, হিংসা দূর কর এবং আত্মদান ও অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার মন মানসিকতা ইখতিয়ার কর। যদি তোমার

কোন ভাইয়ের ধন-সম্পদ অর্জন হতে দেখ; তাহলে এতটুকু আনন্দিত হও যতটুকু তোমার নিজের অর্জন হলে হতে। আর তার ধন-সম্পদকে নিজের মনে করবে। কারো ইজ্জত-সম্মান অর্জন হলে সে ইজ্জত-সম্মান নিজের ইজ্জত-সম্মান জ্ঞান করবে। আল্লাহ না করুন যদি সে বেইজ্জত ও অপদস্থ হয়ে যায়, তাহলে সে আমারই বেইজ্জতি। এ উৎসাহ-উদ্দীপনা দীন ও শরীয়ত সৃষ্টি করেছে যে, হিংসা ছেড়ে দিয়ে আত্মদান ইখতিয়ার কর। লোভ ছেড়ে অল্পেতুষ্টি অবলম্বন কর যে, যতটুকু আল্লাহ তোমাকে দান করেছেন, ততটুকুর উপর খুশি থাক। কৃতজ্ঞতা আদায় করতে থাক; আল্লাহ তাতে বরকত দিবেন।

এমনিভাবে অহংকার থেকে রক্ষা করে দীন নম্র-ভদ্র হওয়ার শিক্ষা দিয়েছে যে, নমনীয় ব্যবহার কর, সবার সামনে ছোট হয়ে যাও যে, তুমি ছোট আর তারা বড়। দাঙ্গা-হাঙ্গামা-যখনই হয় তো তা হয় অহংকার ও গর্বের কারণে। সবাই বলে, আমি বড়, আমি শক্তিশালী। আর নিয়ম হলো, দুজন একস্থানে সংকুলান হয় না; থাকতে পারে না। তাহলে নিশ্চিতভাবে একজনের উন্নতি হবে অপরজন অবনতি হবে। একজন জয়ী হবে অপরজন পরাজিত হবে। আর যদি সবাই বলে, আমি বড় নই; বড় তো অমুক, আমি শক্তিশালী নই; শক্তিশালী তো অমুক; তাহলে হাঙ্গামাটাকিসের হবে? হবে না।

এ কারণে নম্রতা-ভদ্রতা হলো নিরাপত্তার মাধ্যম। আর লড়াই-ঝগড়ার কারণ হলো অহংকার। ঐ সকল বস্তুই মানুষের ভিতর বিদ্যমান আছে। এগুলোর সুচিকিৎসা শুধু দীন করেছে। নবী-রাসূলগণ পৃথিবীতে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, যদি এ পদ্ধতি গ্রহণ কর, তাহলে তোমাদের লোভ দূর হবে। আর যদি এ তরিকা অবলম্বন কর, তাহলে তোমার হিংসা খতম হয়ে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকল নিয়ম-পদ্ধতি দীন ও শরীয়তেরই দেখানো।

## তাকওয়া আখেরাতের হিসাব-নিকাশ হতে মুক্তির মাধ্যম

এই দুটি বুনিয়াদী বিষয়। একটি অন্তরে আল্লাহর ভয়, দ্বিতীয়টি আখেরাত সম্পর্কিত বিশ্বাসে দৃঢ়তা। দুনিয়ায় যা কিছু করছি, তার জন্য আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রতিটির হিসাব হবে। এমনকি হাদীস শরীফে এসেছে, শীতকালে গরম পানি নেয়ামত। এমন অনুগ্রহের খোটা দেয়া হবে যে, আমি শীতকালে তোমাকে গরম পানি দিয়েছিলাম; তুমি তার কী হক আদায় করেছ? গরমকালে ঠা-া পানি

নেয়ামত; তারও হিসাব হবে যে, তুমি ঠা-া পানি ব্যবহার করে কী শুকরিয়া আদায় করেছ? ওখানে প্রতিটি বস্তুর আলাদা আলাদা হিসাব হবে যে, তোমাকে এত দীর্ঘ জীবন দান করেছি; তুমি তা কোথায় কোন কর্মে ব্যয় করেছ? তোমাকে এত এত ধন-সম্পদ দেওয়া হয়েছে; তুমি সেগুলোকে কোথায় ব্যয় করেছ?

প্রতিটি বস্তুর আলাদা-আলাদাভাবে হিসাব হবে। এমন হবে না যে, সকল আদমসন্তানকে একত্রে জিজ্ঞাসা করা হবে আর তারা সকলে মিলে উত্তর দেবে। বরং সকলের পূর্ণ জীবন চোখের সামনে এনে দেয়া হবে। তারপর সেই মোতাবেক হিসাব-কিতাব হবে। উক্ত বিশ্বাস যে মুমিনের অন্তরে থাকবে, সে কোনদিন খেয়ানত ও ধর্মহীন কাজ করার দুঃসাহস দেখাবে না। যখনই এমন দুঃসাহস ও হিম্মত করবে, তখন মনে করতে হবে তার বিশ্বাসে ধস নেমেছে, দুর্বলতা চলে এসেছে আর বিশ্বাস অন্তরে লুকিয়ে পড়েছে, প্রাকাশ্যে নেই। কিন্তু যদি সামনে থাকে, তাহলে অবশ্যই দুঃসাহস হবে না। আর যদি করেই ফেলে, তাহলে সাথে সাথে তাওবার তাওফিক হবে এবং লজ্জিত হবে যে, আমি অনেক বড় অন্যায় করেছি, যার ফলে তাওবা করবে, ইস্তিগফার করবে। এই লজ্জিত হওয়া, তাওবা করা এবং ইস্তেগফার করার কারণ ঐ দুই বুনিয়াদী বস্তু, যা তার অন্তরে রয়েছে।

## সতর্কতা তাকওয়ার প্রথম ধাপ

তাকওয়ার একটি অর্থ হলো ভয় করা যে, মানুষ আল্লাহকে ভয় করে। আর এটিই কেমন যেন অপরাধ বন্ধের পদ্ধতি।

তাকওয়ার আরেক অর্থ ইহতিয়াত বা সতর্কতা। মানুষ সতর্কতার জীবন যাপন করবে, বড় অপরাধ থেকে বাঁচার জন্য ছোট অপরাধ পরিহার করবে যে, আমি যদি অপছন্দনীয় কর্ম করি, তাহলে সম্ভাবনা রয়েছে আগামীতে হারাম কর্ম করব। আর মাকরূহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য কিছু জায়েয বস্তুও পরিত্যাগ করতে হয় পাছে জায়েযে লিপ্ত হয়ে পরে মাকরূহ কর্মে জড়িয়ে যাবে।

শরীয়তের পরিভাষায় তার নাম সাদ্দে-যারায়ে বা মাধ্যম ও অছিলা পরিহার করা, যাতে নাজায়েয পর্যন্ত পৌঁছার আগেই বিরত থাকতে পার।

উদাহরণস্বরূপ যিনা একটা হারাম কর্ম। তা থেকে বাঁচানোর জন্য বলা হয়েছে, গায়রে মাহরাম মহিলাদের প্রতি দৃষ্টি করো না, তাদের সঙ্গ নির্জনে

সাক্ষাত পরিত্যাগ কর। তাদের আওয়াজে কান লাগিয়ো না। এ সকল বস্তু যিনা প্রতিবন্ধকের মাধ্যম। যারা উক্ত কর্মে লিপ্ত হবে, তো সম্ভাবনা রয়েছে তারা বড় গোনাহে লিপ্ত হয়ে যাবে। আসল গোনাহ হতে বাঁচানোর জন্য শরীয়ত এ থেকেই বাধা শুরু করেছে যে, দৃষ্টি দিয়ো না, কান লাগিয়ো না। যদি মহিলা সুগন্ধি লাগায়, তাহলে নাক বন্ধ করে নাও যে, সুঘ্রাণ গ্রহণ করছি না। কেননা, কখনও সুগন্ধিই মাধ্যম হয় তার দিকে আকৃষ্ট হওয়ার। এর নামই ইহতিয়াত বা সতর্কতা। যেমনটি ফুকাহায়ে কেরামগণ লিখেছেন, যদি গায়রে মাহরাম মহিলা অযু করে এবং পানি অতিরিক্ত থেকে যায়, তাহলে সেই পানি দ্বারা অযু করো না। নতুন পানি নিয়ে নাও। কারণ, তার অযুর পানি ব্যবহার করলে সেদিকে খেয়াল যেতে পারে যে, এটা অমুক মহিলার অযুর পানি। এ খেয়াল ও ধারণাকে যদি তার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে অন্তরে ফেতনা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ জন্য শরীয়ত সতর্কতাস্বরূপ হুকুম দিয়েছে, তোমরা এ পানি ব্যবহার করো না, নতুন পানি নাও। কেননা, তা নিজ ধ্যান-খেয়ালকে গান্ধা করে দেবে। খেয়াল গান্ধা হলে ইচ্ছা গান্ধা হবে। আর ইচ্ছা গান্ধা হলে কর্ম নাপাক হয়ে যাবে। এজন্য শুরু ও প্রাথমিক অবস্থা হতেই বাঁচতে হবে।

যিনা কবীরা গোনাহ। আর তার প্রাথমিক ও প্রারম্ভিক মাধ্যমগুলো সগীরা গোনাহ। আর সগীরা গোনাহ হতে এ জন্য বাঁচানো হয়েছে যে, যাতে কবীরা গোনাহ পর্যন্ত পৌঁছতে না পার। এরই নাম সতর্কতার জীবন। চুরি করার ভিতর যা আসল কাজ যা নিষিদ্ধ, তাহলো এই অন্যের সম্পদ তার অনুমতি ব্যতীত উঠিয়ে আনা, হস্তগত করা। শরীয়ত এ কর্ম হতে বাঁচানোর জন্য একটি ধারাবাহিকতা স্থির করেছে যে, কারো ঘরে প্রবেশ করলে তার মাল ও আসবাবের দিকে তাকিয়ো না। কারণ, সম্ভাবনা রয়েছে, চক্ষু ফাঁকি দিয়ে উঠিয়ে নিবে বা চুপে চুপে দেখে নেবে। আর চুরি তো সর্বশেষ কাজ, যা মূলত নিষিদ্ধ। তা থেকে রক্ষা করার জন্য এই দীর্ঘ সূচি পেশ করা হয়েছে। হ্যাঁ, স্বয়ং সম্পদের মালেক যদি নিজে দেখায়, আল্লাহ আমাকে এই নেয়ামত দান করেছেন, তাহলে মানুষ আগ্রহ-উৎসাহ নিয়ে দেখবে এবং শুকরিয়া আদায় করবে এবং আনন্দ প্রকাশ করবে যে, যা কিছু আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন কেমন যেন আমাকে দিয়েছেন। কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে চুপে চুপে উঁকি মেরে দেখা অথবা এই চিন্তা করা যে, কোন স্থানে ধন-সম্পদ আছে এবং এ খেয়াল উদয় হয় যে, যদি সিঁধ কাটা হয়, তাহলে এখান দিয়ে কাটলে উপযুক্ত হবে। সুতরাং সিঁধ কাটার খেয়াল, উঁকি মারা ও চুপে চুপে দেখা

সগীরা গোনাহ। শরীয়ত এই সগীরা গোনাহ হতে বাধা প্রদান করে, যাতে আসল গোনাহ চুরি পর্যন্ত পৌছতে না পারে। তাকেই বলে মাধ্যম বন্ধকরণ, যাতে আসল উদ্দেশ্যে পৌছতে না পারে।

## তাকওয়ার স্তরসমূহ

সাদ্দে যারায়ে বা মাধ্যম বন্ধ করা তাকেই বলে যে, প্রথমেই হালকা থেকে হালকা মাধ্যমকেও ইখতিয়ার করো না, যাতে বড় ও ভারী কর্ম পর্যন্ত পৌছতে না পার। ইসলামী শরীয়ত কবীরা গোনাহের একটা সূচি রেখেছে যে, এগুলো হারাম। উদাহরণস্বরূপ যিনা করা, চুরি করা, বেঈমানি করা ইত্যাদি। এ কর্মগুলোর কিছু আহ্বানকারী ও আসবাব রয়েছে। সেগুলোকে বাধা দেয়া হয়েছে, যাতে আসল উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌছতে না পারে। এখন যদি তাকওয়ার শাব্দিক অর্থ ভয়ও উদ্দেশ্য নেয়া হয়, তাহলে তাও তার স্বস্থানে সঠিক। কেননা, ভয় করা দ্বারাই গোনাহ পরিত্যাগ হয়। আর যদি তাকওয়ার দ্বারা সতর্কতা অর্থ নেয়া হয়, তাহলে তো উত্তম পদ্ধতিতে গোনাহ থেকে হেফাজত হয়ে যাবে। তবে কিছু জায়েয বস্তু পরিত্যাগ হয়ে যায়।

তারপর মানুষের জীবন পবিত্র হয়ে যায়। আর এটি এমন জীবন, যা দুনিয়ার সকল প্রকার অপবিত্রতা ও পচা-গান্ধা হতে পবিত্র। আর মানুষকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিয়ে সর্বকালীন নেয়ামতসম্বলিত জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে এবং এমন জীবন মানুষকে আল্লাহর নৈকট্যশীল বানিয়ে দেয়। কিন্তু এ পর্যায়ের তাকওয়া অর্জনের পূর্ব শর্ত হলো, বাদশাহে হাকিকী আল্লাহ তায়ালার মান-মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হতে হবে। আর এ পর্যায়ের তাকওয়া তো বড়দের নসীব হয়েছে। আমি-আপনি দ্বারা অনেক কষ্টে এতটুকু যেতে পারি যে, নাজায়েয হতে বাঁচার জন্য জায়েয বস্তুগুলোকেও পরিত্যাগ করে দিব। তা অনেক উঁচু স্তরের মাকাম। কিন্তু প্রাথমিক স্তর সবারই প্রয়োজন। তাহলো আল্লাহকে ভয় করো।

## তাকওয়া অর্জন

আল্লাহকে ভয় করার ধরন হলো এমন যে, আল্লাহ তায়ালার শক্তি, নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও অধিকার ইত্যাদিকে কল্পনায় নিয়ে নিবে যে, আল্লাহ যা চান করতে পারেন, যখন চান মৃত্যু দেন, যখন চান জীবন দেন, যখন চান সুস্থতা দেন, যখন চান অসুস্থতা চাপিয়ে দেন, যখন চান নিরাপত্তা দেন, যখন চান

নিরাপত্তা কেড়ে নেন। এগুলো হলো তাঁর শক্তি। তিনি যা চান তা-ই করতে পারেন। মানুষের যখন আল্লাহর এ কুদরতগুলোর ধ্যান হয়, তখন তার মনে ভয় সৃষ্টি হয় যে, আমি অনেক বড় শক্তিশালী আল্লাহর কব্জায় রয়েছি। আমার জানা নেই, আমার সাথে কী আচরণ করা হবে। তখন মানুষ আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব ও জালালের কল্পনা করতে থাকে, যার ফলে ভয় সৃষ্টি হয়ে যায়।

## মূর্খরা তাকওয়ার মাকাম সম্পর্কে অপরিচিত

যদি কেউ একেবারেই অশিক্ষিত ও মূর্খ হয়, তাহলে তার ভিতর কখনও ভয় সৃষ্টি হবে না। কেননা, সে বাদশাহর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার ব্যাপারে ওয়াকিফহাল নয়। একজন গ্রাম্য মানুষ যদি বাদশার দরবারে আসে, তাহলে সে বেশি ভয় পাবে না। কারণ, সে জানে না, বাদশার ইখতিয়ারাধীন কী-কী বস্তু আছে এবং তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কতটুকু। সে তো বাদশাহকে নিজের মতো একজন মানুষ মনে করবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তার দরবারে থরথর করে কাঁপতে থাকেন। কারণ, তিনি বাদশাহর ক্ষমতা-কর্তৃত্ব জানেন। তিনি দৃষ্টি অবনত করে রাখেন। তিনি বেআদবীর ভয়ে এদিক-সেদিক তাকান না।

তো যার ইলম থাকবে এবং আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব, ক্ষমতা, শক্তি ও জালালের পরিচয় জানা থাকবে, তার ভিতরই ভয় সৃষ্টি হবে। আর যে মূর্খ ও অশিক্ষিত, তার ভিতর কিছুই সৃষ্টি হবে না। বর্ণিত আছে বা লোকমুখে শোনা যায়, একবার বাদশাহ আকবর কবিতা আসরের ব্যবস্থা করেন। সেখানে কবিগণ উপস্থিত হয়ে নিজ নিজ কবিতা শোনান। বাদশাহ ঘোষণা দিলেন, যার কবিতা সুন্দর হবে, তাকে পুরস্কার দেয়া হবে। হাজারো কবি কবিতা ও গজল লিখলেন। কবিদের অনেক বড় আসর হয়েছিল। তখন একজন গ্রাম্যলোক ইচ্ছা করল, আমির কিছু ছন্দ একত্রিত করে নিয়ে যাব; তাহলে বাদশাহ আমাকে পুরস্কার দিবেন। তখন এক চৌধুরী সাহেবও কিছু লিখে দরবারে হাজির হলেন। তখন প্রধানমন্ত্রী তাকে গ্রাম্য ভেবে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি লিখে এনেছে। তার সন্দেহ হলো, মনে হয় উল্টা-পাল্টা কিছু লিখে নিয়ে এসেছে। তাই বাদশাহ নারাজ হয়ে তাকে হত্যা না করে ফেলেন। ফলে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম্যলোকটিকে বললেন, চৌধুরী সাহেব, আপনি যা লিখে এনেছেন, তা আমাকে শোনান। গ্রাম্যলোকটি বলল, আচ্ছা শুনুন। চৌধুরী সাহেব যে পঙ্‌তিটি শুনিয়েছিল তা হলো এই–

'গাছের মধ্যে সবচেয়ে বড় গাছ হলো হরীতকি গাছ, যার দাড়ি ও চামড়া ঝুলে থাকে আর তার সবুজ পাতা থাকে এবং লাল-লাল ফল থাকে।'

শেষে বলল– 'আকবর বাদশাহ হারামজাদা।'

এ পঙ্‌ক্তি শুনে প্রধানমন্ত্রী কেঁপে উঠলেন যে, এ হতভাগা নিজের প্রাণ তো হারাবেই; সাথে সাথে আমাকেও পেটাবে। তখন প্রধানমন্ত্রী বললেন, চৌধুরী সাহেব! আপনার কবিতা তো অনেক ভাল; কিন্তু এই শেষ পঙ্‌ক্তিটা (আকবার বাদশাহ হারামজাদা) বাদ দিন। লোকটি বলল, তাহলে কী লিখব? প্রধানমন্ত্রী উত্তর দিলেন, লিখুন–

'আকবার বড় উঁচু মাপের বাদশাহ।'

লোকটি বলল, ঠিক আছে তা-ই বলব।

কবিতার আসর শুরু হলো। কবিরা নিজ নিজ কবিতা ও গজল পাঠ করলেন। ঘোষণা হলো, চৌধুরী সাহেবও দুটি চরণ শোনাবেন। চৌধুরী সাহেব দাঁড়িয়ে দুটি চরণ শোনালেন। আকবার বললেন, চৌধুরী সাহেব! এ পঙ্‌ক্তিটি অত্যন্ত ভাল; কিন্তু শেষের পঙ্‌ক্তিটা হয়নি। বাদশাহ আকবর বুঝলেন, এটি তার তৈরি নয়, তাকে কেউ বলেছে। তখন চৌধুরী সাহেব সেখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর মাকে গালি দিয়ে বলল, এই হারামজাদা বলেছিল এভাবে বলতে; অন্যথায় আমি তো লিখে ছিলাম–

'আকবার বাদশাহ হারামজাদা।'

তখন আকবর বললেন, এই পঙ্‌ক্তিটি খুব ভাল – আগেরটা ভাল নয়। উত্তরে চৌধুরী সাহেব বললেন, জ্বি; আমার বানানো পঙ্‌ক্তি তো এটিই। তারপর সে বাদশাহর পক্ষ হতে অনেক পুরস্কার পেল।

চৌধুরী সাহেব এই পংক্তিটি কেন বলেছিলেন? কারণ, লোকটি তো প্রকৃতভাবে গ্রাম্য ছিল – চৌধুরী ছিল না। সে বাদশাহ আকবরের ইজ্জত-সম্মান ও জালালি তবিয়ত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল না। সে বাদশাহর আযমত ও ক্ষমতা সম্পর্কে জানত না। সে তো গ্রামে বসবাসকারী মানুষ আর গ্রাম্য মানুষরা সাধারণত সাদাসিধে হয়ে থাকে। তাদের ভিতর, চালাকি, ধোঁকাবাজি, দাগাবাজি, ষড়যন্ত্র এমন মন্দ গুনগুলো থাকে না। তাদের জীবন হয় সরল। তারা মনে যা উদয়, তা অকপটে বলে ফেলে।

## আযমত যতখানি তাকওয়া ততখানি

এ কারণে হাদীস শরীফে এসেছে, সাহাবায়ে কেরামগণ অপেক্ষায় থাকতেন, কোন গ্রাম্য ব্যক্তি আসবে এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রশ্ন করবে, যাতে ইলম প্রকাশ পাবে আর আমরা নতুন ইলম হাসিল করতে পারব। সাহাবাদের উপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইজ্জত-সম্মান ও জালালের আযমত প্রবল ছিল। এ জন্য সবার প্রশ্ন করার সাহস হতো না। কারণ, তাঁরা নবওয়াতের শানের ব্যাপারে অবগত ছিলেন। ফলে তাঁদের অন্তরের নবুওয়াতের ভয় ও প্রভাব ছিল। আর গ্রাম মানুষগুলো তো সাদাসিধে হতো। তাদের নবুওয়াতের ভয়-ভীতির কোন খবর থাকত না। তারা যা চায় জিজ্ঞেস করতে পারত এবং মনে যা ইচ্ছে বলে দিত। যেমনটি হাদীস শরীফে এসেছে, একবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনিমতের মাল বণ্টন করছিলেন। তখন একজন গ্রাম্যলোক এল আর তাকে দিতে দেরি হলো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যদের দিচ্ছিলেন। গ্রাম্যলোকটি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে বলল, হে মুহাম্মদ! এ সম্পদ তোমার নয়, তোমার বাবারও নয়। এতে তো আমারও হক রয়েছে। উত্তরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চৌধুরী সাহেব! তুমিও পাবে, চিন্তিত হয়ো না। এ সম্পদ তোমার নয়, তোমার বাবারও নয় এমন ব্যক্তিই বলতে পারে, যার ভিতরে শানে নবুওয়াতের ইলম নেই।

এ জন্যই সাহাবায়ে কেরামগণ অপেক্ষায় থাকতেন, কোন গ্রাম্যলোক আসবে আর রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করবে এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিবেন আর আমাদের নতুন নতুন ইলম হাসিল হবে। কতটুকু জালাল ও আযমত অন্তরে সৃষ্টি হবে, ততটুকু ভয়-ভীতি ও প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আর আল্লাহর আযমত থেকে যতটুকু জাহেল হবে, ততটুকু স্বাধীনও হবে। সে যা চায় তা-ই করতে পারবে।

## তাকওয়ার সর্বোচ্চ মাধ্যম

তাকওয়ার সর্বোচ্চ মাধ্যম হলো নিজের অন্তরে আল্লাহ তায়ালার ভয়-ভীতি সৃষ্টি করা, যাতে অপরাধ থেকে বাঁচা যায়। আর আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করার তরিকা হলো, মনে-মনে এমন কল্পনা করা যে, আল্লাহ হলেন বাদশার বাদশাহ, মালেকুল মূলক; জীবন-মরণ তাঁরই হাতে, সুস্থতা-অসুস্থতা তাঁরই হাতে, ধনি-গরিব তাঁরই কুদরতে। তিনি যা করেন, তাতে কেউ জিজ্ঞেসকারী নেই যে, এটা কেন করেছেন? তিনি সকল কিছু হতে বড়; তাঁর বড় কেউ

নেই। তাই বান্দার ভিতর যখন এমন কল্পনা হবে যে, তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ; যা চান করতে পারেন, তাহলে অন্তরে ভয়-ভীতি ও প্রভাব সৃষ্টি হবে যে, আমি ক্ষমতাহীন নামমাত্র একজন গোলাম। মালেকুল মুলকের সামনে যেন আমার কোন প্রকার বেআদবী না হয়ে যায়; তাহলে অন্তরে ভয়-ভীতি বদ্ধমূল হবে। তাই তাকওয়ার প্রথম স্তর হলো আল্লাহর ভয়; মানে অন্তরে আল্লাহর ভয়-ভীতি সৃষ্টি করে গোনাহ হতে রক্ষা পাওয়া।

## দারিদ্র্য ও সচ্ছলতা সর্বাবস্থায় তাকওয়া জরুরি

আল্লাহর ভয় অন্তরে থাকলে মানুষ সম্পদশালী হয়েও পাপ থেকে বেঁচে থাকবে। এক হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন আর কেমন এক পবিত্র নসিহত বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আপনি আমার বান্দাদের বলে দিন, হে বান্দা! দরিদ্রতা, সচ্ছলতা অবস্থায় আমাকে স্মরণ রাখ; তাহলে আমি তোমাকে তোমার অসুস্থতার সময়ে স্মরণ রাখব।'

এতে বোঝা গেল, সচ্ছলতার অবস্থায় আল্লাহর ভয় জরুরী আবার দরিদ্রতার অবস্থায়ও আল্লাহর ভয় জরুরী। যদি সচ্ছলতার অবস্থায় আল্লাহর ভয় না থাকে, তাহলে তো ভয় রয়েছে ধনীগিরি ছিনিয়ে নেয়ার। আর গরীব অবস্থায় আল্লাহর ভয়ভীতি থাকলে সম্ভাবনা রয়েছে সে ধনী হয়ে যাবে। ধনী-গরীব তো আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে চান ধনী বানান, যাকে চান গরীব বানান, ধন-সম্পদ নিয়ে নেন। যাকে দেয়া ভাল মনে করেন, তাকে দেন। তবে দেন এত পরিমাণ যতটুকু আল্লাহ তায়ালার হেকমাত ও মাসলেহাত অনুমতি দেয়। নাউযুবিল্লাহ এতে কোন স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্ব নেই যে, তিনি কাউকে লাখপতি বানান আবার কাউকে গরীব বানান।

## অন্তরের অবস্থা অনুপাতে সম্পদ বণ্টন

প্রকৃতি ও স্বভাব সৃষ্টিকারী আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন যে, কাকে এ বস্তু দেয়া ভাল আর কাকে এ বস্তু না দেয়া ভাল। তাকে ধনী বানানো মাসলেহাত আর অমুককে গরীব বানানো মাসলেহাত। মানুষের অন্তরের অবস্থা তিনিই ভাল জানেন, যিনি তা সৃষ্টি করেছেন। কতো মানুষ তো এমন যে, যদি তার হাতে দু-চার পয়সা আসে, তাহলে সে নিজে-নিজে ঘর থেকে বের হয়ে যায় এবং অহংকার ও গর্ববোধ করতে থাকে আর অন্যদের তুচ্ছ জ্ঞান করতে

থাকে। এমন ব্যক্তিদের দুনিয়ার ধন-সম্পদ দেয়া হলে দুনিয়াতে জুলুমের কারখানা খুলে যাবে। আর কিছু মানুষ তো এমন যে, যদি তাদের হাতে লাখ টাকাও আসে, তাহলে তারা মানুষই থাকবে – বেপরোয়া হবে না। তারপরও তার মধ্যে পূর্ণ দীনদারী থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে ধন-সম্পদ দান করায় উন্নতি দান করেন, তাকে সম্পদ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তো আল্লাহ যাকে সম্পদ দান করেন, তিনি জানেন তাকে কোন মাসলেহাতের কারণে দেয়া হয়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَّكُوْنَ كُفْرًا

কখনও ক্ষুধা ও দরিদ্রতা কুফুরীর কারণ হয়। আর মানুষ আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে থাকে এবং ঈমান হারা হতে থাকে।

তাকে টাকা-পয়সা দেয়া হয় তার ঈমান হেফাজতের জন্য। আর কতক তো এমন আছে যে, যদি তাকে দু-চার পয়সা দেয়া হয় তাহলে সে অহংকারে নিজ অবস্থান হতে বের হয়ে যায়; তাকে গরীব রাখা হয় যাতে সে নিজ অবস্থানে থাকতে পারে। এতে প্রতীয়মান হয়, ধনী হওয়া ও গরীব হওয়া তা আল্লাহর পক্ষ হতে হয়। যাকে যেমন প্রকৃতি ও স্বভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে সেই অনুযায়ী ধন-সম্পদ দেওয়া হয়।

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

পার্থিব জীবনে আমিই তাদের জীবনোপকরণ বণ্টন করে দিয়েছি।

আর মর্যাদাও আমিই প্রতিষ্ঠিত করি। কতককে উঁচু মর্যাদা দান করি আবার কতককে নিচু করি। তো এখন উঁচুওয়ালাদের কাজ হলো, তারা নত হবে এবং শোকরিয়া আদায় করবে। আর নিচুওয়ালাদের কাজ হলো, তারা ধৈর্যের সাথে দু'আ করবে। তাতে উভয়েই উপকৃত হবে। আল্লাহ উভয়ের জন্য রাস্তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এতে সম্পদশালীরাও মুক্তি পাবে, গরীবরাও নাজাত পাবে।

## বাতেনী দৌলত

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, প্রত্যেকের কিছু না কিছু মর্তবা রয়েছে। কিছু নেয়ামত ধনীরা পাবে আর কিছু গরীবরা পারে। অর্থাৎ গরীব শ্রেণী যেন নিরাশ না হয় যে, আমরা তো কিছুই পেলাম না। বরং তাদেরকে বাড়তি

আরো বস্তু দেয়া হয়েছে।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, একবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকার ফাযায়েল বর্ণনা করছিলেন যে, তোমরা সদকা দাও, যাকাত দাও, দীনের কাজ এগুলো দ্বারা পরিচালিত হয়। সে (ধনী) অনেক দীনি কাজ করে, তার ধন-সম্পদ পরকালে অছিলা হবে, অনেক মর্যাদা অর্জন করবে। এমন ফযিলতের কথা শুনে গরীবদের অন্তর ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হলো। তারা বলতে লাগল, হে আল্লাহর রাসূল! সম্পদশালীরা তো অনেক ভাল আছে। তারা দুনিয়াতে অনেক সাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করছে আর পরকালেও তাদের মর্যাদা বেশি; তারা আরাম-আয়েশে থাকবে। অপরদিকে আমরা দুনিয়াতে মসিবতে লিপ্ত আছি, কষ্ট-ক্লেশ বহন করছি আবার আখেরাতে আমাদের জন্য কিছুই নেই। এই সম্পদশালী লোকেরা অগ্রগামী হয়ে গেল আর আমরা পিছনে রয়ে গেলাম। তাঁরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে এসে দরখাস্ত করল, হে আল্লাহর রাসূল!

سَبَقَ الْمُفْتَرِضُوْنَ

সম্পদশালীরা তো জিতে গেল আমাদের উপর;
দুনিয়াতেও, আখেরাতেও!

তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তোমরা কি আল্লাহ তায়ালার এ ফয়সালার উপর রাজী নও যে, সম্পদশালীরা তাদের সম্পদের হিসাব দিতে থাকবে আর তোমরা তাদের পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে? তারা বলল, ব্যস, হে আল্লাহর রাসূল, তা আমাদের জন্য যথেষ্ট। আমাদের সম্পদের প্রয়োজন নেই।

তো অনেক দৌলত গরীবদের দান করা হয়েছে। এমন কথা নেই যে, শুধু ধনীদের দৌলত দেয়া হয়েছে। কাউকে দুনিয়াতে আবার কাউকে আখেরাতে দেওয়া হয়েছে। তাই সবাই বরাবর। এটি আল্লাহর হেকমাত যে, কাউকে দুনিয়াতে বাড়িয়ে দিয়েছেন। তবে অনুগ্রহ সবার উপর ব্যাপকভাবে থাকে। যদিও কারো জাহেরি নেয়ামত বাড়িয়ে দেন, কাহারো বাতেনী নেয়াম বাড়িয়ে দেন। অনেক সময় বাতেনী নেয়ামত ধন-সম্পদ থেকেও বেড়ে যায়। যদি ঈমানের দৌলত মজবুত হয়, তাহলে তাওয়াক্কুলের দৌলতও মজবুত হয়, দৃঢ় হয়। তখন হাজারো সম্পদ তার নিচে চাপা পড়ে যায় আর ঐ দৌলত সবচেয়ে উপরে উঠে যায়।

## মারেফত শ্রেষ্ঠ সম্পদ

কোন এক আল্লাহওয়ালা এক শহরে পৌছলেন। শহরটি ছিল বড়। তার কিল্লা ছিল বন্ধ। তিনি দেখলেন, শহরের সবগুলো ফটক বন্ধ আর হাজার-হাজার মালবোঝাই গাড়ি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আবার হাজার-হাজার গাড়ি ভিতরে আটকা পড়ে আছে। সময়টি দিনের বেলা। শহরে সম্পূর্ণরূপে আমদানি-রফতানি বন্ধ। তিনি দিশেহারা হয়ে পড়লেন যে, এত বড় বাণিজ্যিক শহর, যেখানে লাখ লাখ ব্যবসায়ী রয়েছে আর শহরের দরজা বন্ধ! তিনি লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, ভাই! এ শহরের দরজাগুলো বন্ধ কেন? লোকেরা উত্তর দিল, সাহেব! বাদশার বাজপাখি হারিয়ে গেছে; তাই বাদশাহ বলেছেন, শহরের সবগুলো দরজা বন্ধ করে দিতে, যাতে পাখিটা বাইরে না যেতে পারে। তারপর তালাশ করতে থাক।

বুযুর্গ বিমূঢ় হয়ে পড়লেন যে, বাদশাহ তো বড়ই বেকুফ! একটি পাখির জন্য শহরের সবগুলো দরজা বন্ধ! তো পাখি উড়ে ছাদের উপর দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে না? মনে মনে বললেন, বড় বেকুফ বাদশাহ! আর আল্লাহর কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহ! তোমার কুদরত যে, তুমি একটা বেকুফকে বাদশাহ বানালে, যার এতটুকু জ্ঞান নেই যে, প্রাণীকে আটকানোর জন্য জাল পেতে রাখতে হয়! তাকে তুমি রাজত্ব দিলে আর আমি এমন ফযীলতওয়ালা হয়েও ঠিকানাহীনভাবে ঘুরছি। যার ভিতর ইলম আছে, মারেফাত আছে, যোগ্যতা আছে,তাকে কেউ জিজ্ঞেসকারীও নেই। এক ওয়াক্ত খাবার পায় তো অন্য ওয়াক্ত ক্ষুধায় থাকে। তো যার মধ্যে ঐ দৌলত বিদ্যমান আছে, সে ঠিকানাবিহীন ঘুরবে আর যে এমন আহম্মক ও বেকুফ সে রাজসিংহাসনে বসবে এ তো আপনার আশ্চর্য কুদরত!

বুযর্গ কেমন যেন এমন একটি প্রশ্ন ও সন্দেহ আল্লাহর দরবারে পেশ করলেন। উপর থেকে উত্তর এল, আমি ভালই করেছি। তুমি কি রাজি আছ, আমি তোমার নিকট হতে ইলম, মারেফাত ও ঈমান ছিনিয়ে নিয়ে বাদশাহকে দিয়ে দেব আর তার সমস্ত বাদশাহী তোমাকে দিয়ে দেব? বুযুর্গ বললেন, না; আমি এর জন্য প্রস্তুত নই।

এতে প্রমাণিত হলো, বুযুর্গের ঈমানি শক্তি তাওয়াক্কুলের শক্তি বেশি ছিল ধন-দৌলত হতে। অন্যথায় রাজি হয়ে যেতেন যে, আমি ইলমও দিলাম, ঈমানও দিলাম, আপনি আমাকে সিংহাসন দিন। না, তিনি রাজি হলেন না বরং সিংহাসনের উপর লাথি মারলেন এবং ঈমান, ইলম ও মারেফাত ত্যাগ

করলেন না।

এতে প্রতীয়মান হয়, ঈমান অনেক বড় সম্পদ। যদি আল্লাহ তায়ালা কাউকে উভয় নেয়ামত দিয়ে দেন যে, মাল-সম্পদও দিয়েছেন এবং ঈমানি শক্তিও দান করেছেন আর তার আল্লাহর উপর ভরসাও আছে, তাহলে তার নিকট আল্লাহ তায়ালা দীন ও দুনিয়া উভয়টিও জমা করেছেন। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে চান দান করেন। সুতরাং দুনিয়ার ধন-সম্পদ একটি নেয়ামত এবং দীনি দৌলত তার চেয়ে বড় নেয়ামত। যদি উভয়টা একত্রিত হয়ে যায়, তাহলে সকল নেয়ামত হতে তা হবে উন্নত ও বড় নেয়ামত।

## সবর ও শোকর মর্যাদা উন্নতির মাধ্যম

উভয়ের বাঁচার প্রক্রিয়া হলো এই যে, সম্পদের অধিকারী হয়ে যেন অহংকার না করে, সর্বদা শুকরিয়া আদায় করে। কারণ, সে যা কিছু লাভ করেছে, তা তার প্রাপ্য নয়, বরং তা শুধু আল্লাহর দান। আল্লাহর উপর কারো হক নেই। যখন অনুগ্রহে কিছু মিলবে, তখন শুকরিয়া আদায় ওয়াজিব হয়। সুতরাং কিছু লাভ হলে শোকর আদায় করতে হবে। আর যাকে গরীবী দেয়া হয়েছে, অভাব দেওয়া হয়েছে, তা তিনি ইনসাফের দ্বারাই দিয়েছেন। হেকমত ও ইনসাফের এমন দাবি ছিল যে, তাকে যেন এ অবস্থায় রাখা হয়, যাতে সে সবর করে। কারণ, উভয় রাস্তাই জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। সবর নিজ রাস্তা দ্বারা জান্নাতে পৌঁছাবে আর শোকর নিজ রাস্তা দ্বারা জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে। উভয়টিই কামিয়াবি। আর আল্লাহপ্রেমিকরা শোকর ও সবর উভয় গুণে গুণান্বিত হন।

আকসাম নামে একজন বড় আলেম ছিলেন, যিনি নাহু শাস্ত্রের বড় ইমাম ছিলেন। তিনি অত্যন্ত কুশ্রী ছিলেন। কুশ্রীর যত আলামত হতে পারে সবগুলোর সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। দেহের রঙ ছিল কাল, দাঁত ছিল বড় বড়। চক্ষুদ্বয় ছিল একেবারে ছোট ছোট, গায়ের রং ছিল নীল। চোখের ভ্রূ ছিল লাগালাগিভাবে। আবার দাঁতের রঙ ছিল হলুদ। মোটকথা, কুশ্রীর যত আলামত আছে, তার সবগুলোর সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। আর ইলমের অবস্থা ছিল অনেক উন্নত মানের।

তাঁর বিবাহ এমন একজন সুন্দরী মহিলার সাথে হয়েছিল, যার তুলনা অনেক দূর পর্যন্ত অন্য কেউ ছিল না। যখন তারা স্বামী-স্ত্রী সামনাসামনি বসতেন, তখন মনে হতো রোদ আর ছায়া। একদিকে রোদ আর অপরদিকে ছায়া।

একদিকে আলো আর অপর দিকে অন্ধকার।

তিনি সামনাসামনি বসে স্ত্রীকে বলতেন, তুমি অবশ্যই জান্নাতি আর আমিও জান্নাতি। স্ত্রী বলতেন, কী কারণে? তিনি বলতেন, আমি তো এ জন্য জান্নাতি যে, আমি তোমার মত সুন্দরী স্ত্রী পেয়ে রাত-দিন শুকরিয়া আদায় করি। এই শোকরের রাস্তা দ্বারা আমি জান্নাতে পৌঁছে যাব। আর তুমি এ জন্য জান্নাতী যে, তুমি আমার মতো কুশ্রী স্বামী পেয়েও রাত-দিন সবর করছ যে, আমি কোন মসিবতে পড়লাম। এ কারণে তুমি সবরের রাস্তা দ্বারা জান্নাতে পৌঁছে যাবে। তাই আমিও জান্নাতি, তুমিও জান্নাতি।

এর ভিত্তিতে ধনবানদের জন্য আল্লাহ তায়ালা শোকরের রাস্তা রেখেছেন এবং অঙ্গীকার করেছেন–

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّكُمْ

তোমরা যতটুকু শুকরিয়া আদায় করবে, আমির তত পরিমাণ নেয়ামত বৃদ্ধি করব।

তাই শোকর হলো সম্পদশালীর জন্য দারাজাত বুলন্দির মাধ্যম।

গরিব ও মিসকিনদের ব্যাপারে হুকুম হলো, তুমি কোন সম্পদশালীর সম্পদের প্রতি নজর করবে না। শুধু আমার প্রতি দৃষ্টি রাখবে এবং সবর ইখতিয়ার করবে। তোমার জানা নেই, আমি তোমার জন্য কী পরিমাণ সম্পদ জমা করে রেখেছি। মন খারাপ করার প্রয়োজন নেই, তা অচিরেই পেয়ে যাবে। সহীহ হাদীসে আছে, যদি কোন ব্যক্তি প্রার্থনা করে, হে আল্লাহ! আমাকে রিযিক দাও, আমাকে ধন-সম্পদ দাও। সে ক্ষুধার্ত থাকে আর অবস্থা এমন যে, দু'আ কবুল হয় না। মাস চলে যাচ্ছে, বছর চলে যাচ্ছে, এমনকি জীবন অতিবাহিত হয়ে গেল। এখন সে বলে, আমার ভাগ্যে কিছুই নেই। চাইতে চাইতে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম; কিন্তু কিছুই মিলল না। কেয়ামতের দিন যখন হাশরের ময়দানে পৌঁছবে, তখন দেখবে, সাওয়াব ও প্রতিদানের বড় বড় স্তূপ হয়ে আছে। হাজারো, লাখো মানুষের এত পরিমাণ নেয়ামত মিলেনি, যা তার একার মিলেছে।

তখন সে বলবে, হে আল্লাহ! এই নেয়ামতসমূহ কোথা হতে এলা; আমি তো এমন কোন আমল করিনি? উত্তরে আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তুমি কি দোয়া করতে না? ঐ দোয়াগুলোকে আমি লালন-পালন করে বাড়িয়েছি। এগুলো তোমার ঐ দোয়ার ফলাফল। দুনিয়াতে তোমাকে দিয়ে দেওয়া হলে এমনিতেই শেষ হয়ে যেত। এ কারণে আমি তোমার দোয়াগুলোকে একত্রিত

করেছি। এখন তুমি অনন্তকাল আরাম-আয়েশ কর, তোমার জন্য সর্বোচ্চ মর্যাদা।

তো গরিবদের জন্য নিরাশ হওয়ার কারণ নেই আর ধনীদের জন্যও অকৃতজ্ঞ হওয়ার সুযোগ নেই। ধনীদের জন্য শুকরিয়া ওয়াজিব আর গরিবদের জন্য সবর ওয়াজিব। আর উভয়েরই আল্লাহর উপর ভরসা করা ওয়াজিব। যদি আল্লাহ আমাকে দেন তো আমার কোন হক নেই। তিনি শুধু নিজ দয়া ও অনুগ্রহে দিয়েছেন। আর তাকে দেননি তো তিনি কোন জুলুম করেননি; বরং ইনসাফ করেছেন; যে কারণে তিনি দেননি। ইনশাআল্লাহ উভয়ই সফলকাম। বাকি যার যতটুকু লাভ হয়, ততটুকুই তার দয়া ও অনুগ্রহ। কারো কোন হক আল্লাহর উপর নেই যে, সে আল্লাহকে অপারগ করার, আল্লাহর উপর কারো জবরদস্তি চলে?

আমি তাকওয়া ও তার ফযিলতের ধারাবাহিকতার একটি কথা পেশ করলাম। হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর। আমীন। দোয়া করবেন, আল্লাহ যেন আমাকে নেক কাজের তাওফিক দান করেন এবং খাতেমা বিল খায়ের করেন এবং নেককারদের সাথী বানান। হে রব! তুমি কবুল কর।

# বয়ান : ৫

## ইসলামে ঈদের ধারণা

ঈদের সারসংক্ষেপ হলো আল্লাহর যিকির, রবের ইবাদত, আল্লাহর সৃষ্টির খেদমত, সামাজিকতা রক্ষা, আখেরাত ভুলে না যাওয়া, জীবিতদের পাশাপাশি মৃতদের সাথেও আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখা আর এই সবগুলোর ব্যাপারে ঈমানকে মাপকাঠি নির্ধারণ করা; লৌকিকতা বা পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য না থাকা– যাতে করে সৃষ্টির সাথে আল্লাহর সম্পর্ক সত্যিকারভাবে প্রমাণিত হতে থাকে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ: وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: اَلْعِيْدُ لِمَنْ خَافَ الْوَعِيْدَ لَا لِمَنْ لَبِسَ الْجَدِيْدَ.

## ঈদ মুসলমানদের সাধারণ সমাবেশ

সম্মানিত উপস্থিতি!

পৃথিবীর সকল জাতি-গোষ্ঠীর আনন্দ-উৎসব রয়েছে। তারা যথাসম্ভব শানদারভাবে তা উদযাপন করে থাকে। পারসিকদের নওরোজ ও মেহেরজান নামক উৎসব রয়েছে, ঈসায়ীদের বা বড়দিন ইত্যাদি নামে ধর্মীয় উৎসব রয়েছে। আর হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের হোলি, দেয়ালি ইত্যাদি ইত্যাদি নামে হাজার-হাজার উৎসব এবং বার্ষিক মেলা রয়েছে।

মুসলমানদের আল্লাহ তায়ালা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামে দুটি ঈদ বা উৎসব দান করেছেন। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, বিশ্বের অন্যান্য জাতির নিকট উৎসব মানে আনন্দ র‍্যালি উদযাপন অথবা জাতীয়তা দৃঢ় ও মজবুতকরণ বা অনুসরণযোগ্য কোন ব্যক্তির স্মরণ নবায়ন ইত্যাদি। আর ইসলাম ধর্মে ঈদ ও উৎসবের অর্থ হলো, ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহকে স্মরণ করা এবং আল্লাহমুখী

ও তার নৈকট্য অর্জন করা এবং আল্লাহর নামে এতিম, মিসকিন ও গরিবদের সাহায্য-সহযোগিতা করা, যাতে মুসলিমদের একতার প্রকাশ অভ্যাস ও ইবাদতগত উভয়ভাবে হয়ে যায়। সুতরাং যদি ধর্মীয় নামগুলোর ধারাবাহিকতায় প্রত্যেক ধর্মের নামের বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর আলোকপাত করলে দেখা যায়, হিন্দু ধর্মের ব্যবহৃত শব্দগুলোর দ্বারা দেশাত্মবোধ প্রকাশ পায়। ঈসায়ীদের শব্দ দ্বারা একজন বড় পথপ্রদর্শকের ব্যক্তিত্ব ভেসে ওঠে। ইহুদীদের শব্দ দ্বারা জাতীয়তা ফুটে ওঠে এবং পারসিকদের শব্দ দ্বারা একটি রাষ্ট্রের ধ্যান-ধারণা মনে উদয় হয়, যেগুলোর নির্যাস হলো সীমাবদ্ধতা।

অন্যদিকে ইসলামী পরিভাষাগত শব্দগুলো দ্বারা দেশ, মাতৃভূমি, রাজত্ব, জাতি ও ব্যক্তিত্ব কোনটাই প্রকাশ পায় না। বরং আল্লাহর আনুগত্য, মালেকুল মুলকের প্রেম ও উৎসাহ-উদ্দীপনার দিকে ইঙ্গিত করে, যা পরিষ্কার ইঙ্গিত করে যে, দুনিয়ার মানবরচিত ধর্মগুলো বংশ, জাতি, মাতৃভূমি এবং ব্যক্তিপূজা ইত্যাদির সীমা অতিক্রম করতে পারে না। কিন্তু ইসলাম নিজস্ব সাদাসিধে শিরোনামগুলোর দ্বারা ঐ সমস্ত সীমাবদ্ধতা চুরমার করে এক বিশ্বজয়ী পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে। তা হলো আল্লাহর আনুগত্য। কেননা, আল্লাহ নিজে অসীম ও প্রশস্ততার অধিকারী। এ জন্য আল্লাহর আনুগত্যে জীবন আবাদকারী জাতি নিজেদের মুসলিম পরিচয় দিয়ে, ইবাদতগোজার বনে, গাইরুল্লাহর ইবাদত পরিত্যাগ করে কেমন যেন ঘোষণা করে যে, তারা এমন সত্তার সাথে সম্পর্ক রাখে, যিনি অসীম উদারতার অধিকারী, যার অসীম প্রশস্ততায় কেউ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না।

## দু-রাকাত নামাযের হেকমত

ঠিক এমনিভাবে উৎসবের কর্মসূচিগুলোতে নিজেদের উৎসব দ্বারা প্রতিটি জাতি যদি এ ঘোষণা দেয় যে, তারা আনন্দর‍্যালিতে লিপ্ত হয়ে নিজেদের মন-মানসিকতার অনুসরণ করে বা কোন বড় ব্যক্তিত্বের জন্মবার্ষিকী পালন করে তারা তার সম্মান প্রদর্শন করতে চায়, যা তাদের অন্তরে ঐ ব্যক্তির আবেগ রয়েছে। কেমন যেন তা নিজেদের ব্যক্তিগত মনোবিশ্বাসের অনুসারী। অথবা কোন মাতৃভূমি ও জাতির নাম আলোকিত করে নামজাদা করে নিজেদেরকে তার অনুগত ও অনুসারী বানাতে চায়। আর মুসলিম জাতি ঈদের আনন্দ-অনুষ্ঠানে আল্লাহর নামে দু-রাকাত নামায আদায় করে এবং তার নামে কুরবানী দিয়ে দুস্থ-দরিদ্রের মাঝে সদকায়ে ফিত্‌র ও সদকায়ে কুরবানী বণ্টন

করে। যেন তারা শুধু আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁর বড়ত্বকে দুনিয়াবাসীর সামনে পেশ করতে চায়।

## ফিতরা ও কুরবানীর হেকমত

অন্যদিকে দুনিয়ার দরিদ্র কাঙাল মানুষদের এ খুশির দিনে সাদকা-খয়রাত দিয়ে বলতে চায় যে, তারা একটি আন্তর্জাতিক জাতি, যাকে কোন বংশ ভাগ করতে পারে না, পারে না কোন দেশ তাদের বিভক্ত করতে। আর না কোন ব্যক্তিত্বের মনোবিশ্বাস তাদেরকে আল্লাহর বিশ্বাস হতে রুখতে পারে। আর তার নামই বড় সামাজিকতা, যাকে নিয়ে ইসলাম দুনিয়াতে এসেছে এবং যার ঘোষণা ইসলাম নিজের নাম ও কাম দ্বারা আস্তে-আস্তে করেছে।

## ঈদের আত্মা

অতএব, ইসলামী উৎসব জাতীয়তা বা ব্যক্তিগত কল্পনাসমূহের প্রতিবিম্ব ও প্রতিচ্ছবি নয়; বরং সাধারণ ঐক্যের বাহক। আর এই একতা দেশ, জাতি, বংশ-গোষ্ঠী, ব্যক্তির কল্পনা দ্বারা তৈরি হয় না; বরং এ সকলের চেয়ে উন্নত এবং উন্নতত সত্তার অধিকারী মহান আল্লাহর সাথে সম্পর্কের দ্বারাই হতে পারে। তাই ঐ উৎসবগুলোর আত্মা তাঁরই নাম ও আযমতকে নির্ধারণ করা হয়। তাই ঈদের নামায আদায়ান্তে মুসলমান যখন ঈদগাহে যায়, তখন রঙ ছিটিয়ে বা ব্যক্তিত্ব ও জাতীয়তার জয়ধ্বনি দিয়ে বেড়ায় না; বরং

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

বাক্যটি বলতে থাকে।

রোযার ঈদে আস্তে-আস্তে এবং কুরবানী ঈদে উচ্চ আওয়াজে ঈদ উৎসব পালনের জন্য রওনা হয়। তো আল্লাহর বড়ত্ব, আল্লাহর আযমত, আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা দিতে-দিতে যাওয়া হয়। তাতে কোন শোরগোল নেই, নেই কোন খারাবী, হয় না কোন হাঙ্গামা এবং তাতে কোন মেলা-উৎসবের শান নেই। বরং মহাপবিত্র আল্লাহর প্রশংসা ও পূত-পবিত্র ফেরেশতাদের কাতারের ন্যায় আল্লাহর তাসবীহ এবং রবের পবিত্রতা বর্ণনা করতে করতে যাত্রা করে ঈদগাহে। সেখানে পৌঁছার পরও তাসবীহ-তাহলীল জারি রাখে। তারপর ইমাম সাহেব সবার সামনে যান এবং নামাযের তাহরীমা বাঁধেন, পিছনে সকল মুকতাদী উচ্চ আওয়াজে তাকবীর বলে। কুরআন

তেলাওয়াত হয়। সকল মুকতাদী নীরবতা ও খুশু-খুজুর সাথে তেলাওয়াত শোনার প্রতি মনোনিবেশ করে। রুকু-সিজদা দ্বারা নিজ প্রতিপালকের সামনে দাসত্বের প্রমাণ পেশ করে। পরিশেষে সালাম ফিরিয়ে পুনরায় তাকবীরের ধ্বনি উঁচু হতে থাকে।

## বিশাল সমাবেশ

ঈদের নামায সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে ইমাম সাহেব খতীব হিসেবে লোকসম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেন এবং মিম্বরে দাঁড়িয়ে ওয়াজ-নসিহত ও আল্লাহ তায়ালার বিধিবিধান শোনান। ইমাম সাহেবের খুতবাকে সকল মুকতাদী আযমত ও কবুল করার নিয়তে শ্রবণ করে। মানুষ ইবাদত হতে ফারেগ হয়ে বাড়ির দিকে ফিরে। এ খুশির সময়ে যখন সর্বত্র মানুষের আনাগোনা এবং মনের ভিতর শুধু আনন্দ আর আনন্দ ও খুশিতে ভরপুর, তখন সম্ভাবনা ছিল, নফসের মধ্যে দুনিয়াদারীর আগ্রহ-উৎসাহ মিশ্রিত হয়ে যাবে। তাই উৎসব উদযাপনকারীদের জন্য সুন্নাত করে দেয়া হয়েছে, কবরস্তানে গিয়ে মৃত ভাইদের আত্মার সাথে সাক্ষাৎ করবে। তাদের জন্য সাওয়াব পাঠাবে, তাদের কবরের নিকট যাবে, যাতে তাদের আখেরাতের বাড়ি-ঘর দেখে আখেরাতের স্মরণ তাজা হয়ে যায়। আর দুনিয়ার এ আনন্দের সময়েও আখেরাতের স্মরণ হতে গাফেল না হয়।

অন্য শব্দে এভাবে বলা যায় যে, মুসলমানরা যে মহাসমাবেশ আয়োজন করেছে, তার সীমা-পরিসীমা শুধু দুনিয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং আমলে বরযখের লাখো-কোটি মানুষও এ সমাবেশের সদস্য। আর তারা তা হতে দৃষ্টি ফেরাতে পারে না। কেমন যেন সে এক বড় মহা সম্মেলনের ভিত্তি করেছে, যা দুনিয়া অতিক্রম করে আলমে বরযখে, তা থেকে আলমে হাশরে গিয়ে পৌঁছে, যাতে শুধু দুনিয়ার এক শতাব্দির লোকই থাকবে না; বরং হযরত আদম (আ.)-এর সমস্ত সন্তান-সন্ততির সকল সদস্যই একত্র হবে।

## উভয় জগৎব্যাপী সমাবেশ

সুতরাং যারা মুসলমানদের নিকট শুনে এবং তাদের সম্মেলন দেখে সম্মেলন করার চিন্তা-ভাবনা করে, তারা বেশির চেয়ে বেশি তৎকালীন পৃথিবীর রাষ্ট্র ও গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক কায়েম করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে যে কওমী একতার জন্য দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে, তা শুধু ঈদের কর্মগুলোর

দ্বারা-ই হয়ে থাকে। কেমন যেন ঈদের সম্মেলন একটি বিশাল ও ব্যাপক সম্মেলন, যার একতার সম্পর্ক ইহজগত অতিক্রম করে পরজগতের ঐ সমস্ত মানুষের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হয়, যারা পূত-পবিত্র মানুষ, যারা ঈমানের সাথে এ জগত অতিক্রম করে পরজগতে পৌঁছেছে। তারা শুধু দুনিয়াবাসী ভাই ভাই জয়ধ্বনি দেয়। তাই এ ইজতেমা সকলের অংশগ্রহণের কারণে উভয় জগতব্যাপী হয়ে গেল। আল্লাহর নাম হতে বেশি প্রশস্ত ও সম্প্রসারিত আর কোন বস্তু নেই। এ কারণে ঈদের জন্য যেমনভাবে দুনিয়াতে ঈমানদার হওয়ার শর্ত লাগানো হয়েছে, তেমনি আখেরাতের বাসিন্দাদের সাথে মুলাকাত করার শর্তও হলো ঈমানদার হওয়া। আর ঈমানের অর্থ হলো আল্লাহর জাত, সিফাত, করণীয়, আদেশ, নিষেধ ও তার কানুনগুলোকে মানা, গ্রহণ করা। কেননা, এগুলো ব্যতীত এ প্রশস্ততা ও ঐক্যবদ্ধতা কায়েম হতে পারে না। কারণ, ঈমানের চেয়ে বেশি প্রশস্ত সম্পর্ক এবং মাপকাঠি অন্য কোনো বস্তু হতে পারে না।

## ভাগ্যবান জাতি

ঈদ তো উৎসবের দিন। তবে উৎসব শব্দের দ্বারা তাকে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির উৎসবের দিন হিসেবে দেখা যাবে না। কারণ, তার অসাধারণ ব্যাপকতা অন্যান্য পাত্রে কোনভাবেই সংকুলান হবে না।

সুতরাং ভাগ্যবান ঐ জাতি, যাদেরকে এমন উৎসবের দিন দেওয়া হয়েছে আর সুনসান ঐ জনগোষ্ঠীর, যারা এ উৎসবের দিনগুলোতে শরয়ী সীমারেখা ও শর্ত মোতাবেক সে সমস্ত উৎসবে অংশগ্রহণ করে। ঈদের উৎসব হলো আল্লাহর ইবাদত এবং সৃষ্টির খেদমত। শুধু নতুন কাপড় ও অহংকারী পোশাক পরিধান, আতর-সুগন্ধি এবং মিষ্টিদ্রব্য আহার করার নাম ঈদ নয়। এ কারণেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

اَلْعِيْدُ لِمَنْ خَافَ الْوَعِيْدَ لَا لِمَنْ لَبِسَ الْجَدِيْدَ

> ঈদ হলো তাদের জন্য, যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর দিকে ধাবিত হয়। যারা নতুন কাপড় পড়ে তাদের জন্য নয়।

## ঈদ হলো আসল ও বুনিয়াদী বস্তু

ঈদের নির্যাস হলো আল্লাহর যিকির, রবের যিকির, আল্লাহর সৃষ্টিজীবের সেবা, আত্মার সম্মেলন, দুনিয়াতে থেকে আল্লাহকে ভুলে না যাওয়া, জীবিতদের সাথে সাথে মৃতদের সাথেও সুসম্পর্ক বজায় রাখা। উল্লিখিত প্রতিটি বিষয়ের রূহ ও মাপকাঠি হিসেবে ঈমানকে নির্ধারণ করা। দুনিয়াদারী ও লোকদেখানো নয়, যাতে আল্লাহর সৃষ্টিজীবের সাথে আমলি ও বুনিয়াদীভাবে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়।

## সারা বছরের জন্য আলোকময় প্রতিক্রিয়া

এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, ইবাদত দু-ধরনের। একটি করণীয়, অপরটি বর্জনীয়। নামায, যাকাত, হজ ইত্যাদি করণীয় ইবাদত। এগুলোতে কিছু কর্ম আদায় করতে হয়। আর বর্জনীয় ইবাদত হলো রোযা, যাতে আহার পরিহার, পানীয় পরিহার ও মানবিক, জৈবিক স্বাদ পরিহার করতে হয়। প্রকাশ থাকে যে, পূর্ণ এক মাস পর্যন্ত আল্লাহর ভালবাসায় দুনিয়ার বিশাল এক অংশকে পরিহার করে থাকা কোন সাধারণ মোজাহাদা নয় বরং তা নফসের একটি বড় ধরনের কুরবানী, যা আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ছাড়া পূর্ণ হতে পারে না। মাহে রমযান সারাদিন এমন মোজাহাদার মাধ্যমে আত্মাকে গঠন করে ধুয়ে মুছে স্বচ্ছতা এনে দেয়। কিন্তু কোন পাত্র শুধু পরিষ্কার হয়ে পড়া এবং ময়লা-কাদা দূর হওয়াই যথেষ্ট নয় যতক্ষণ না তাতে উজ্জ্বলতা ও চমক না আসে। একজন বার্নিশকারক প্রথমে পাত্রকে ঘঁষে। ইট, পাথর দ্বারা ঘর্ষণ করে। এমনকি পা দ্বারাও দলিত করে, যাতে পাত্রের ময়লা পরিষ্কার হয় এবং মরিচিকা দূর হয়ে যায়। কিন্তু শুধু পরিষ্কার করার জন্য পাত্রকে বার্নিশকারীর নিকট পাঠানো হয় না; বরং আসল উদ্দেশ্য হয় তার সাজসজ্জা ও উজ্জ্বলতা, যাতে তার আসল রঙ ফিরে আসে। সুতরাং বার্নিশকারীও পাত্রকে শুধু পরিষ্কার করার উপর যথেষ্ট করে না বরং ঐ পরিষ্কার পাত্রকে আগুন দ্বারা তাপ দেয়। তাপ দিয়ে যখন পরিষ্কার পাত্রে বার্নিশ লাগানো হয়, তখন পাত্রটি রুপার মতো চমকাতে থাকে। আর বার্নিশকারকের নিকট পাত্র পাঠানোর উদ্দেশ্য তখন পূর্ণ হয়।

ঠিক তেমনিভাবে কলবের পাত্রকে পরিষ্কার করার জন্য রমযানের রোযা রাখা হয়েছে, যাতে নফসের প্রেমপ্রীতি ও ভালবাসা নফস থেকে দূর করে রোযা দ্বারা ঘর্ষণ করে দেয়া হয় এবং গায়রুল্লাহর মহব্বত ও ভালবাসা ঐ

অপবিত্রতা থেকে নফসকে পরিষ্কার করা হয়। সুতরাং রোযার এ বর্জনীয় কর্ম নফসের জন্য তেমন কাজ করে, যেমন পাত্র পরিষ্কারের জন্য ইট-পাথর ও মাটি কাজ করে। যখন সারাদিন নফসকে ঘর্ষণ করে তার খাবার দাবার বন্ধ করে তার মানবিক স্বাদ উপভোগের পথসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং এ আমল দ্বারা তার রূহের অপবিত্রতার ময়লা-আবর্জনা বের করে দেয়া হয়। তখন রাতে তার উপর বার্নিশের আসবাব তারাবীহ ও তেলাওয়াতে কুরআন দ্বারা করা হয়, যাতে সারাদিন তাপ দেয়া আত্মার আল্লাহর কালামের বার্নিশ দ্বারা, প্রলেপ দ্বারা স্বচ্ছতা ও উজ্জ্বলতা সৃষ্টি করে ফেলে। ফলে তার আত্মা নূরে ইলাহীর দ্বারা আলোকিত হয়ে ওঠে। এ ত্রিশ দিনের উপার্জন, ঘর্ষণ ও মাজন-মর্দন, তারপর সারা রাতের বার্নিশে এক মাসের মধ্যে মানবাত্মাকে এমন উপযুক্ত বানিয়ে দেয় যে, সে সারা বছর এ আলো হতে লাভবান হতে থাকে এবং ময়লা ও অপবিত্রতা হতে মুক্ত থেকে ঐ নূরানী প্রভাব-প্রতিক্রিয়াকে সারা বছর পর্যন্ত ব্যবহার করে। শর্ত হলো, ঐ মোজাহাদার প্রভাব-প্রতিক্রিয়াকে সারা বছর টিকিয়ে রাখার চেষ্টায় থাকবে।

## ইজতেমায়ী যোগ্যতা অর্জনের কৃতজ্ঞতা

অতএব রমযানের এক মাস সারা বছরের আলোকদানের জিম্মাদর বা কেয়ারটেকার হয়। আর বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সমস্ত প্রতিবিম্বকে দূর করে দেয়, যাতে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে উন্নত পাত্র ও ব্যাপক সামর্থ্যের অধিকারী হতে পারে এবং তার সত্তা ইসলামের বড় ইজতেমার দীর্ঘ ও চওড়া শিকলের একটি শক্তিশালী কড়া হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। পূর্ণ এক মাসের এ কষ্ট এবং তার উপর সংকলিত ইজতেমায়ী যোগ্যতার যে বড় নেয়ামত অর্জন হয়েছে, তা শুধু আল্লাহর সাহায্য ও তাওফিকেই অর্জন হওয়া সম্ভব। তাই এ বড় নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করা বান্দার উপর ফরজ হিসেবে বর্তায়।

সুতরাং আল্লাহ তায়ালা শুকরিয়া আদায় করার পদ্ধতি দুই ঈদকে নির্ধারণ করেছেন, যাতে এদিকে রমযান সফলকাম হয়ে শেষ হয়েছে অপরদিকে তার সাথে সাথে ঈদের চাঁদ আকাশে উঁকি মেরে ঘোষণা করে, হে বান্দারা! তোমরা সফলতার সাথে এই যে মহাসম্মেলনটি আয়োজনের যোগ্যতা লাভ করেছ, তার জন্য আপন মালিকের শুকরিয়া আদায় কর। অন্য শব্দে এভাবে বলা যায় যে, রমযান মাসে তোমাদেরকে যে যোগ্যতা দান করা হয়েছে,

সেগুলোকে ঈদের ময়দানে কার্যে পরিণত করে ঐ যোগ্যতাগুলোকে বাস্তব রূপ দাও এবং আম ইজতেমার প্রকৃতি ও হাকিকী ইজতেমা ঈদের মধ্যে আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া প্রদর্শন করে দেখাও।

## রমযানের হাকিকত

রমযান মাস হলো যোগ্যতা সৃষ্টির মাস, অর্জনের মাস। আর ঈদের মাস ঐ যোগ্যতাবলিকে কার্যে পরিণত করার শুরু মাস, যার ধারাবাহিকতা সারা বছর জারি থাকে। আর মধ্য মাসগুলোতে যদি কিছু কমতি ও অসম্পূর্ণতা দেখা দেয়, তাহলে পরবর্তী রমযান পুনরায় পরবর্তী বছরের জন্য ঐ অসম্পূর্ণতাগুলোকে দূর করে ঐ যোগ্যতাবলিকে নতুনরূপ দান করে, যাতে মুজাহাদার ধারাগুলো নিঃশেষ না হয় আবার ইজতেমায়ী রূহও নিঃশেষ হতে না পারে। আর মানুষের জীবন এ বরকতময় অবস্থায় নিঃশেষ হয়ে যায়।

## একজন মুসলিম একটি উম্মাহর সমান

যখন সে নিজ প্রভুর কাছে যাবে, তখন সে শুধু নিজ নফসের সাথেই মিলিত হবে না বরং তার ইজতেমায়ী সম্পদের এক মহান সাহায্য থাকবে। লাখ লাখ দোয়া থাকবে, যা সেই ইজতেমা থেকে অর্জন হয়েছিল। হাজারো ঈসালে সাওয়াব থাকবে, যা ঈদের সময় মৃতদের পর্যন্ত পৌছানো হয়েছিল। হাজার হাজার বাতেনী হিম্মত থাকবে, যা কাতারবন্দি হওয়ার সময় একজন অপরজনের দিকে তাকানো দ্বারা হয়েছিল। আর ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কের অগণিত আত্মীয় হবে, যা তার জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ ও সাহায্যের কারণ হবে, যাতে এই একজনের উপর যে ইজতেমায়ী যোগ্যতায় এক উম্মত (জাতি) সমতুল্য হয়ে আল্লাহর সকাশে পৌছে যে, তার দিকে আল্লাহর লাখো রহমত মুতাওয়াজ্জহ হবে। আর সে এভাবে নিজ সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে পুরো করে সম্মানের সাথে নিজ মালিকের সাথে মিলিত হবে।

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ○

অতঃপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই সফলকাম হবে। আর দুনিয়াবী জীবন ধোঁকার সামান ছাড়া কিছুই নয়।

# বয়ান : ৬

## ভালবাসা ও সাহচর্য

যে আমাকে মহব্বত করবে, সে আমার আনুগত্য করবে এবং আমার সুন্নাতের অনুসরণ করবে। আর যে আমার সুন্নাতের উপর চলবে সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে। আমার থেকে পৃথক হবে না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালবাসাকে ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করেছেন যে, আমাকে মহব্বত করা এ কথার আলামত যে, সে জান্নাতে আমার বন্ধু হবে।

এ হাদীস দ্বারা জানা যায়, মহব্বতই আসল বা মূল। আর মহব্বতের পরিচয় মিলবে আনুগত্যে ও সুন্নাতের অনুসরণে। যখন এমন হবে, তখন জানা যাবে, সে সত্যিকারের প্রেমিক।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ. وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَنْ جِئْتُ بِهٖ ـ قَالَ اللّٰهُ عز وجل ذكره: فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا○

## সকল বস্তুর হাকিকত

সম্মানিত উপস্থিতি!

দুনিয়ার সকল বস্তু এমনকি আমি-আপনিও দুটি বস্তু দ্বারা গঠিত। একটি আমাদের প্রকাশ্য অংশ, যাকে আমরা শরীর বলি। এটি হলো আকৃতি। উদাহরণস্বরূপ চক্ষু, যা দ্বারা আমরা একে অপরের আকৃতি ও সুরত দেখে চিনতে পারি। তা প্রকাশ্য অংশ ও প্রকাশ্য ছবি। আর তার ভিতরে গোপন একটি হাকিকত বা বাস্তবতা রয়েছে। সেটি-ই বাস্তবে মানুষ। এই প্রকাশ্য আকৃতির নাম মানুষ নয়। মানুষ একটি হাকিকতের নাম, যা তার ভিতর লুকায়িত রয়েছে। তাকে দেখানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা মানুষের এ

প্রকাশ্য বডিকে তৈরি করেছেন, যা মূলত হাকিকত পরিচয়ের মাধ্যম – আসল মাকসাদ নয়।

তারপর প্রশ্ন হলো, মাকসাদ কোথায়? শরীরও উত্তর প্রদান করে যে, মানুষের ভিতরে গোপন একটি বস্তু রয়েছে, যাকে কলব বলে। আর তার মধ্যে সমস্ত হাকিকত গোপনভাবে রয়েছে। তারই নাম ইনসান। ঐ হাকিকতকে যখন আল্লাহ তায়ালা প্রসার করলেন এবং আকৃতি দিলেন, তখন শরীর প্রকাশ পেল, আকৃতি সৃষ্টি হলো। এখন আকৃতি দেখে চেনা যায়, সে অমুক, সে অমুক। অন্যথায় বাস্তবে ইনসান হলো কলব বা আত্মা আর তার ভিতরেই সবকিছু লুকায়িত আছে।

## সমর্থন ও ছিদ্রান্বেষণ

হাদীস শরীফে এসেছে, যখন আল্লাহ তায়ালা হযরত (আ.)কে সৃষ্টি করলেন, প্রথমে তার বডি তৈরি করলেন। এখনও তাতে রূহ দেয়া হয়নি। তখন ফেরেশতারা আদম (আ.)কে দেখে বলত, আল্লাহ তায়ালা তো একটি আশ্চর্য আকৃতি ও অবয়ব বানিয়েছেন! তা তো অনেক ভাল! আর সকল ফেরেশতার অন্তরে তার মহব্বত ও আযমত সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে ইবলিসকে আদেশ করা হলো, তুমি গিয়ে আদমকে দেখে আস। তার অন্তরে পূর্ব থেকেই শত্রুতা লুকায়িত ছিল। সে হযরত আদমকে যিয়ারত করতে তাঁর অবয়বে করল, তার রগ-রেশায় প্রবেশ করল। তারপর বলল, এটা তো কোন আশ্চর্য বস্তু নয়–

نَفْسٌ لَا تَتَمَلَّكُ

তার ভিতরটা ফোকলা, সে নিজেকে নিজে সাহায্য করতে পারবে না যতক্ষণ না বহিরাগত সাহায্য না আসে এবং খাদ্য, বাতাস, গরম বাইরে থেকে প্রবেশ না করে। তার ভিতরে কোন রকম শক্তি নেই। ইবলিস নিজ শয়তানি ও দুশমনি মোতাবেক রিপোর্ট দিল। সমস্ত ফেরেশতাজগত তো তার সমর্থন দিল এবং প্রশংসা করল; কিন্তু অভিশপ্ত ইবলিস এসে তার ছিদ্রান্বেষণ করল। আবার এ কথাও বলল যে, আমি আদমের মূর্তি ভিতরে প্রবেশ করে দেখেছি, তার ভিতরটা একেবারেই খোলা ময়দান। তবে তার মাঝে একটা থলি রয়েছে; তাতেই সবকিছু হবে; আমি সেখানে আমি প্রবেশ করতে পারব না।

এতে ইঙ্গিত ছিল কলবের প্রতি যে, যা কিছু হাকিকত রয়েছে, তা ঐ কলবে

রাখা হয়েছে। আর ইবলিস ঐ হাকিকতে প্রবেশ করতে পারেনি; যেখান পর্যন্ত গিয়ে সে অপারগ হয়ে গেছে।

## দেহজগতের রাজা

সুতরাং মানুষের সবচেয়ে বড় বস্তু হলো কলব বা অন্তর। আর তার অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগলো হলো তার কর্মচারী বা খাদেম। কলবে যে জযবা-বাসনা সৃষ্টি হয়, সকল খাদেম তার মোতাবেক কাজ শুরু করে দেয়। যদি অন্তরে কোন বস্তুকে দেখার আগ্রহ জাগে, তাহলে অন্তর চোখকে অর্ডার করবে না, তুমি অমুক বস্তুটি দেখ। বরং অন্তরে দেখার খেয়াল আসার সাথে সাথে চোখ কাজ শুরু করে দেবে। তেমনিভাবে অন্তরে খেয়াল এল চলার, তখন অন্তরের প্রয়োজন নেই, সে পাকে হুকুম করবে, তুমি হাঁটো। বরং অন্তরের চাহিদা হলেই পা চলতে শুরু করবে। আর দিল যদি কোন জিনিস ধরতে চায়, তাহলে হাতকে হুকুম করার দরকার নেই; বরং অন্তরে জযবা আসার সাথে সাথে হাত নিজের কাজ শুরু করে দিবে। তাই মানুষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হলো খাদেম বা কর্মচারী। আর হুকুমদাতা ও দেহরাজ্যের রাজা হলো কলব। আর কলবেই সবকিছুই রয়েছে।

## কলব আসল, না দেমাগ আসল

এ ব্যাপারে হেকীম ও বর্তমান যুগের ডাক্তারদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে যে, মানুষের মধ্যে দেমাগ আসল, না কলব আসল। ডাক্তারগণ বলেন, মানুষের মধ্যে আসল হলো দেমাগ বা মস্তিষ্ক। কেননা, তার দ্বারাই সকল বস্তু চলে। তাতেই অনুভূতি শক্তি রয়েছে, তাতেই জ্ঞান রয়েছে। আর কলব একটি যন্ত্রমাত্র, যা রক্তের মাধ্যমে দেমাগকে বলে দেয় আর দেমাগের ভিতর কিছু সৃষ্টি হয় বা উদয় হয়।

তারা বলতে চান, কলব বা অন্তর যন্ত্রের কাজ করে থাকে – আসল বা মূল নয়। এটি কিছু হেকীমেরও অভিমত এবং বর্তমান যুগের ডাক্তারদেরও এই ধারণা। কিন্তু আমরা এ কথা বলি না যে, তা একেবারেই ভুল। আবার এ কথাও বলি না যে, তা একেবারেই সত্য। তাতে অনেক শুদ্ধতাও আছে আবার অশুদ্ধতাও আছে।

## আমলের কেন্দ্র হলো কলব বা আত্মা

সুতরাং আমরা এখন সৃষ্টিকর্তার প্রতি ধাবিত হব যে, তিনি কোন বস্তুকে আসল বলেছেন। আল্লাহ হলেন সৃষ্টিকর্তা। তিনিই জানেন, আমি কী তৈরি করেছি এবং কেন তৈরি করেছি। আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ জিনিসগুলোকে সংশোধন করার জন্য এসেছেন। তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, দিল কী, দেমাগ কী, হাত-পা কী। এ কারণে আমরা ফিরে এসেছি সৃষ্টিকর্তার দিকে যে, তাঁকে জিজ্ঞেস করব আসল বস্তু কোনটি। কলব আসল, না দেমাগ আসল? তো শরীয়ত দ্বারা জানা যায়, কলবই আসল। কলবই হাকেম বা বাদশাহ দেহ অঞ্চলের। আর রাজত্ব তারই চলে।

হাদীস শরীফে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছন–

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

> মানুষের দেহে একটি গোস্তের টুকরো রয়েছে। যদি সেটি শুদ্ধ থাকে, তাহলে পূর্ণ মানুষ শুদ্ধ থাকবে। আর যদি সেটি অশুদ্ধ থাকে, তাহলে পূর্ণ মানুষ অশুদ্ধ থাকে। তিনি বলেন, সেই বস্তুটি হলো কলব। তাই মানুষের ভাল-মন্দের কেন্দ্রবিন্দু হলো কলব। কলবের ভিতর নিয়ত সৃষ্টি হয় আর নিয়ত দ্বারা সমস্ত আমল গঠন হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

নিয়ত ভাল তো আমল ভালো। নিয়ত খারাপ হলে আমলও খারাপ হবে। আর নিয়তের কেন্দ্র যেহেতু কলব, তো সকল কর্মের ও আমলের কেন্দ্র মানুষের কলবই। আর বাস্তবে জীবনের চাকা কলবের দ্বারাই চলে।

## হায়াত নির্ভরশীল কলবের উপর

যেমনভাবে আমল নির্ভর করে কলবের উপর, তেমনিভাবে হায়াতও নির্ভর করে কলবের উপর। কেননা, কলব প্রথমে জিন্দা হয়; তারপর হায়াত মস্তিষ্কে

পৌঁছে। এরই ভিত্তিতে হায়াতের নির্ভরশীলতা অন্তরের উপর রাখা হয়েছে। আর হাকীম-ডাক্তারগণও তা স্বীকার করেন। তারা বলেন, মানুষ যে খাবার আহরণ করে, তা প্রথমে পাকস্থলীতে পৌঁছে। পাকস্থলীতে জ্বাল দেয়া হয় এবং পেষা হয় আর পিষে নরম বানিয়ে ফেলে। তার মধ্যে যেগুলো উচ্ছিষ্ট হয়, সেগুলোই অতিরিক্ত, যা নাড়ীভুড়িতে চলে যায় এবং পেশাব-পায়খানা হয়ে বের হয়ে যায়। আর যা পাতলা পদার্থ থাকে, তাকে কলব পাকস্থলী হতে কলিজায় পাঠায়। পাকস্থলী হতে কলিজার দিকে যাবার জন্য চিকন চিকন নালার মতো রগ রয়েছে; সেগুলোর মাধ্যমে খাদ্য কলিজায় পৌঁছে।

কলিজাকে দেহের বাবুর্চি বলা হয়। কলিজায় গরমও আছে, তাপও আছে। এ গরম দ্বারা হারিরা পাকানো হয় এবং অনেক গরম হয়। যখন ঐ হাড়িতে পাকানো হয়, তখন তাতে একাংশ টগবগ করে ফেনার ন্যায় উপরে চলে আসে আর একাংশ নিচে জমা হয় বসে যায়, যাকে তলানি বলে। আর একাংশ মাঝে পানিতে থাকে আর তা বিস্তৃত হতে থাকে। ডাক্তারগণ বলেন, ফেনার ন্যায় উপরের অংশ কফের আকৃতি ধারণ করে। আর নিচের অংশ যা তলানি তা কালো বর্ণ হয়। তাকে পিত্ত বলে আর থলেতে চলে যায়। আর মাঝে যে পাতলা হালকা অংশ থাকে, ডাক্তাররা তাকে হলুদ বর্ণ বলে। তো সাওদা, সুফরা ও বলগাম (কফ)– এ তিনটি অংশকে কলিজায় তৈরি করে এবং পাকায়। আর এ তিন বস্তুর সমন্বয়ে রক্ত তৈরি হয়। তাই কলিজার কাজ হলো রক্ত বানানো আর পাকস্থলীর কাজ ছিল খাদ্যকে পিষে ফেলা। তারপর কলিজা ঐ রক্তকে পাঠায় কলবের দিকে। কলিজা হতে কলবের দিকে অনেকগুলো সূক্ষ্ম রুগ্ন রয়েছে, যেগুলোকে ডাক্তারিবিদ্যার পরিভাষায় শিরা বলে। ঐ সূক্ষ্ম রগ বা শিরা দ্বারা রক্ত কলব পর্যন্ত পৌঁছে। আর কলবের আকৃতি হলো মুড়ির মতো, যে উপরে পাতলা, মাঝে মোটা আবার নিচেও পাতলা।

উপরের অংশকে বাতনে আলা বা উপরের পেট বলে। আর নিচের অংশকে বাতনে সাফেল বা নিচের পেট বলে। এগুলোর ভিতর হালকা-পাতলা রক্ত প্রবেশ করে আর কলবের গরম তাপ কলিজার চেয়ে বেশি। আর অন্তর পুনরায় এ সূক্ষ্ম জওহার (মূল ধাতু)কে পাকায় আর তাতে তা থেকে একটা সূক্ষ্ম ভাপ, গরম তাপ ওঠে, যা চোখে দেখা যায় না। এ বাষ্প শিরা ও চর্বিতে ছড়িয়ে পড়ে। এমন অবস্থাকে ডাক্তারি বিদ্যার পরিভাষায় রূহে হায়ওয়ানী বা হায়াতের আত্মা বলে। এ রূহের কারণে মানুষের ভিতরে অনুভব ও অনুভূতি, জ্ঞান-বুদ্ধি ও জীবন রয়েছে। ডাক্তারি পরিভাষায় তো তাকে রূহে হাইয়ুয়ানী

বলে। আর শরীয়তের পরিভাষায় তাকে রূহে নাসামাহ (জীবনদাতা রূহ) বলে এবং তাকে নফসও বলে। নফস অর্থ হলো ফুঁ দেয়া ও প্রসারিত হওয়া আর নফস যেহেতু সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে এ ভিত্তিতে তাকে নফসও বলে। এতে প্রমাণিত হলো, কলবই মানবজীবনের বা হায়াতের কেন্দ্রবিন্দু। আর সেই কলবই রূহে হায়ওয়ানী সৃষ্টি করে, যার ফলে মানুষের দেহে অনুভূতি, গরমী ইত্যাদি শক্তিগুলো সৃষ্টি হয়। অতএব একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, দেহের ভিতর কলবই হলো আসল বা মূল আর কলবের সম্পর্ক দেমাগের সাথে নয় এবং জীবনও নির্ভর করে অন্তরেরই উপর। আবার আমলের উৎসাহ-উদ্দীপনাও অন্তর বা কলব হতে আন্দোলিত হয়। আর মহব্বত ও শত্রুতার সম্পর্ক দিলের সাথে। এক কথায় তার সাথে হাজারো মোয়ামালা জড়িত আছে।

## মস্তিষ্ক কলবের অনুগামী

ইসলামী শরীয়তের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের মধ্যে আসল বস্তুটি হলো কলব বা অন্তর– মস্তিষ্ক নয়। মস্তিষ্ক হলো কলবে অনুগামী। তবে একথা ঠিক যে কলবের ভিতর যে ইলম ও উপলব্ধি শক্তি রয়েছে, তা সমষ্টিগত ও সংক্ষিপ্ত। মস্তিষ্কে যাওয়ার পর তার বিস্তার লাভ করে এবং বিস্তৃত হয়ে শাখা-প্রশাখা বের হয়। তারপর মানুষ তা থেকে নিজেদের মতবাদ ও চিন্তা-চেতনা কায়েম করে আর সেগুলো থেকে প্রোগ্রাম তৈরি হয়। তো কলব হলো ইলমে এজমালির স্থান। তা মস্তিষ্কে এসে তাফসিল বা প্রসার লাভ করে। আর তাফসিল যেহেতু ইজমালের হয়ে থাকে বিধায় মস্তিষ্ক কলবের অনুগামী– তার উল্টোটি নয়। এটিই শরীয়তের উদ্দেশ্য। এ কারণে ইসলামী শরীয়তের আলোচ্য বিষয় ও মাকসাদ হলো কলবের ইসলাহ বা পরিশুদ্ধি। যদি কলব ঠিক হয়ে যায়, তাহলে দেমাগ বা মস্তিষ্কও ঠিক হয়ে যাবে, হাত-পাও ঠিক হয়ে যাবে, আখলাক চরিত্রও সঠিক হয়ে যাবে। আর যদি মানুষের কলব বিকৃত হয়ে যায়, তাহলে জীবন, আমল, ইলম, বুদ্ধি, কামালিয়াত কোনটাই ঠিক থাকবে না।

অন্তর জীবিত তো মানুষ জীবিত আর অন্তর মুর্দা তো মানুষ মুর্দা। তাই মানুষের জীবনের ভিত্তি অন্তরের উপর। কেননা, প্রতিটি বস্তু অন্তর দ্বারা পরিচালিত হয়। এ জন্যই ইসলাম অন্তরকে নিজের আলোচ্য বিষয় বানিয়েছে। যদি অন্তর ঠিক হয়, তাহলে শরীয়তের কর্মগুলোও ঠিক হবে এবং

সারা দেহ ঠিক হয়ে যাবে, দেমাগও ঠিক হয়ে যাবে। আর যদি অন্তর বিকৃত হয়ে যায়, তাহলে দেমাগও খারাপ হয়ে যাবে। এমনকি সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খারাপ হয়ে যাবে।

## কলবই বাস্তবে উপলব্ধিকারী

কলব বা অন্তরের কারণেই চোখ দেখে, কান শুনে। এ ব্যাপারে ডাক্তারগণ বলবে, এ সকল দেমাগ বা মস্তিষ্ক দ্বারা হয়। আমি বলি, এসব অন্তর দ্বারা হয়। উদাহরণস্বরূপ আপনি বড় বাজারে গেলেন এবং বড় বড় বিল্ডিং দেখলেন। বড় বড়, সুন্দর সুন্দর দৃশ্য সামনে এল। যখন আপনি সেখান থেকে ফিরে আসতে চাইলেন, তখন আপনার বন্ধু আপনাকে বলল, ভাই! আজ তো আপনি বড় বড়, উঁচু উঁচু বিল্ডিং দেখলেন, এখানে তো উন্নত উন্নত দৃশ্য রয়েছে, বড় বড় প্রশস্ত সুন্দর রাস্তা আছে। শহরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তখন আপনি বললেন, না, আমি তো কিছুই দেখলাম না। তখন বন্ধু বলবে, হে আল্লাহর বান্দা! তোমার চোখ তো খোলা ছিল এবং এগুলোও তোমার দৃষ্টির সামনে ছিল। আর তুমি বলছ, আমি কিছুই দেখলাম না। তখন আপনি বলবেন, উহ হু, আমার ধ্যান-খেয়াল বা অন্তর অন্যদিকে ছিল; তাই আমার খবর হয়নি যে, আমার সামনে কী রয়েছে। এতে জানা গেল, চোখ দেখে না, আসলে দেখে অন্তর। যদি অন্তর খেয়াল না করে, তাহলে চোখের কোন বস্তুই নজরে আসবে না। তেমনিভাবে ঘন্টা বাজছে, আওয়াজও আসছে, আবার সকল মানুষ শুনছেও। কিন্তু আপনার বুঝে আসছে না, মানুষ বলছে অনেকবার ঘন্টা বেজেছে এবং আওয়াজও এসেছে। তখন আপনি বলেন আমি কিছুই শুনিনি। আর অন্যজন বলছে, সবকিছুই শুনেছি। তখন আপনি বলেন, উহ হু আসলে আমার অন্তর অন্যদিকে ছিল, আমার শোনার খেয়ালই আসেনি।

এতেই প্রমাণিত হলো, কান শোনে না, প্রকৃতপক্ষে অন্তরই শোনে। দিল যদি তাওয়াজ্জু দেয়, তাহলে সম্মুখ আওয়াজ কর্ণে প্রবেশ করবে। আর যদি দিল সেদিকে না ফিরে, তাহলে কোন বস্তুই কানে প্রবেশ করবে না। স্বাদ গ্রহণ করাও অন্তরের কাজ। উত্তম থেকে উত্তম খাবার খেলেন। কিন্তু অন্তর অন্যদিকে, তাহলে টক, মিষ্টি বা ঝাল কোনটারই খবর থাকবে না। যদি কেউ টক, মিষ্টির খবর জানতে চায়, তাহলে বলবেন, ভাই! আমার অন্তর তো অন্যদিকে ছিল; তাই আমার কোনই খবর নেই।

স্বাদ আস্বাদনের ব্যাপারে আমার একট মজাদার ঘটনা স্মরণ হলো যে, হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহেব সাহারানপুরী রহ.-এর এক শ্যালক ছিল। নাম তার হাজী মকবুল সাহেব রহ.। তিনি বড় নেককার ছিলেন। তিনি হযরতের নিকট থাকতেন। তিনি হযরতের এখানেই লালিত-পালিত হয়েছেন। ঘটনাক্রমে ধারাবাহিকভাবে চার-পাঁচ দিন বুটের ডাল পাকানো হচ্ছিল। আর মানুষ তো প্রতিদিন লাগাতার মোরগ-পোলাও খাওয়াও দুষ্কর হয়ে যায় যদি খাবার আইটেম পরিবর্তন না হয়।

তিনি তার বোনকে বললেন, সব ডাল শেষ হয়ে শুধু বুটের ডাল রয়ে গেল নাকি? সারা সপ্তাহ শুধু বুটের ডাল আহার করছি, এখন মন ভরে গেছে, অন্য ডাল পাকাও। তিনি পরবর্তী দিন মাশকলাইয়ের ডাল পাকালেন। হাজী মকবুল খাবারের পর বলতে লাগলেন, আজও ঐ বুটের ডালই পাকিয়েছ। তার বোন মাজায় হাত মেরে বললেন, তোমার চোখ কি আছে, না নেই? এগুলো কি বুটের ডাল, না মাশকলাই? তখন তিনি বললেন, আমার খেয়াল ছিল না, তাই আমি মনে করেছি, বুটের ডালই খাচ্ছি। এতে প্রতীয়মান হয় স্বাদ অনুভব করা অন্তর দ্বারা হয়। জিহ্বা স্বাদ আস্বাদন করে না। টক, মিষ্টির স্বাদ, তার উপলব্ধি ও অনুভব সবকিছুর সম্পর্ক অন্তরের সাথে। বিধায় মানুষের দেহে আসল বস্তু হলো অন্তর আর অন্য সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হলো তার অনুগামী।

## ইসলাহের কেন্দ্র হলো কলব

দেমাগ অনেক উন্নত ও বড় বস্তু। কিন্তু দেমাগ তাফসীল (বিস্তারিত) করে ঐ ইলমকে, যা অন্তরের ভিতর পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। কলব নিজের ঐ ইলমে ইজমালীকে দেমাগের সামনে পেশ করে আর দেমাগে সেগুলো চক্কর খেতে থাকে। তারপর চিন্তা-চেতনার রূপ ধারণ করে আর তা থেকে প্রোগ্রাম তৈরি হয় এবং প্রোগ্রাম থেকে সেই ইলমের প্রসার হয়ে দল বা পার্টি হয়। কলব যদি দেমাগে ইলম পেশ না করত, তাহলে চিন্তা-চেতনা হতো না, প্রোগ্রাম হতো না আবার দলও হতো না।

এ কারণেই ইসলামী শরীয়তের দাবি হলো, অন্তর আসল আর দেমাগ হলো তার অনুগামী। হাত-পাও তার অনুগামী, পেট-পিঠও তার অনুগামী। এরই ভিত্তিতে নবী-রাসূগণ ইসলাহের কেন্দ্র দিলকে বানিয়েছেন যে, দিল ঠিক হলে পুরো মানুষ ঠিক হবে। দৃষ্টি ঠিক হয়ে যাবে, কান ঠিক হয়ে যাবে, নাকও ঠিক

হয়ে যাবে। অন্তর বেঠিক হলে সকল বস্তুই বেঠিক হবে। যদি অন্তরে খারাবী থাকে, নিয়ত খারাপ থাকে, তাহলে চোখের দৃষ্টি হারাম স্থানে নিপতিত হবে। আর অন্তরে যদি পবিত্রতা, তাকওয়া ও পরিচ্ছন্নতা থাকে, তাহলে দৃষ্টি হারাম স্থানে পড়বে না। যদি অন্তরে শুদ্ধতা ও তাকওয়া তাকে, তাহলে আজেবাজে কথা ও গান শুনবে না। এমন কি কারও দিকে ফিরেও তাকাবে না। আর যদি অন্তরে আমানতদারি ও তাকওয়া না থাকে, তাহলে তার জন্য জায়েয-নাজায়েয সমান হয়ে যাবে। আজেবাজে কথাও শুনবে, গানও শুনবে, হারাম আওয়াজও শুনবে, হালাল আওয়াজও শুনবে। আর দিলে দীন থাকলে পথ ঠিক থাকবে, ভাল বস্তুর দিকে মন ধাবিত হবে আর খারাপ বস্তু হতে মন সরে যাবে।

## কলবের ফতওয়া

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ فَاِنَّ الْقَلْبَ خَيْرُ الْمُفْتِيْ

তোমার অন্তর থেকে ফতওয়া নাও। কেননা, অন্তরই উত্তম ও ভাল মুফতী।

কোন বিষয় সামনে এলে প্রথমে তোমার দিল থেকে ফতওয়া নাও। কেননা, মানুষের অন্তর মুখলিস হয়ে থাকে। অন্তর বলে দিবে, এ বিষয়টি সঠিক, না ভুল। আপনি কোন বন্ধুর উপর দাবি পেশ করলেন, এ সম্পদগুলো আমার – অমুকের নয়। কিন্তু অন্তর তো জানে, এ সম্পদ আমার নয় – অমুকের। আপনি শুধু নিয়মানুযায়ী মকদ্দমা তৈরি করেছিলেন যে, এ সম্পদ আমার হাতে এসে যাক। তার উপর উকিলদের জেরা হলে সম্ভাবনা আছে, উক্ত সম্পদ আপনার হয়ে যাবে। কিন্তু অন্তর আপনাকে লানত করতে থাকবে, হে কমবখ্‌ত! তুমি অন্যের অধিকার আত্মসাৎ করছ। অন্তর ফতওয়া দিয়েছে, এ জমি আপনার নয়। মানুষ যদি অন্তরের দিকে খেয়াল করে, তাহলে সব কাহিনী এখানেই শেষ হয়ে যাবে। তবে বাস্তবতা হলো, মানুষ মতলবের পেছনে পড়ে থাকে।

একজন আলেম ফতওয়া দিলেন, যা তার মর্জির বিপরীত ছিল। এখন ঐ প্রশ্নের অপর দিক পাল্টিয়ে ফতওয়া পাঠিয়ে দিলেন। এখন ফতওয়ার দ্বিতীয় উত্তর এল। আর এটিও তার মর্জি মোতাবেক হয়নি। তাকে তৃতীয় মুফতীর

নিকট পাঠালেন। তখন যে ফতওয়া এল। তা তার মর্জি মোতাবেক হয়েছে; তাই আমল করেছে। আর যে ফতওয়া মর্জি মোতাবেক হয়নি, তার উপর আমল করেনি। এটা কি শরীয়তের কোন হুকুম হতে পারে? আর একেই কি শরীয়ত পালন বলে? এটা নিজ নফসের অনুসরণ হলো, শরীয়ত মানা হলো না। সে তো নফসের ভিতর যা উদয় হয়, সে মোতাবেক ফতওয়া চায়। এ কারণেই শরীয়ত বলে থাকে, মুফতীদের থেকে ফতওয়া পরে নিতে হবে। প্রথমে অন্তর থেকে ফতওয়া নিতে হবে। কেননা, মানুষের দিল মুখলিস হয়। সে সত্য ফতওয়া দিবে এবং সঠিক পরামর্শ দিবে।

## ঈমান সর্বপ্রথম কলবে পতিত হয়

এতে বোঝা যায়, ইসলামী শরীয়ত অন্তরকে গ্রহণ করেছে এই অর্থে যে, মানুষের গোপন অন্তরে যা কিছু থাকে, তা সত্য। আর আলোচনা করে এবং নফসের চাহিদা ও খায়েশ দ্বারা যে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, অন্তর জানে তা ভুল সিদ্ধান্ত। হাত চুরি করলে অন্তর তাকে ভর্ৎসনা দিতে থাকে, তোমার অধিকার নেই অন্যের মাল চুরি করার। যদি অন্তরের কথা মানা হয়, তাহলে কখনও চুরি করবে না। অন্তর হলো মানুষের আসল। এ কারণে ইসলামী শরীয়ত অন্তরের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে যে, তাকে শুদ্ধ করে নাও। বুনিয়াদ বা মূল সঠিক হয়ে গেলে পূর্ণ মানুষটি ঠিক হয়ে যাবে। এছাড়া মানুষ ঠিক হতে পারে না।

ইসলামী শরীয়ত অন্তরকে ঠিক করার জন্য ঈমান দান করেছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ঈমানের স্থান হলো কলব বা অন্তর। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসাও অন্তরে হয়ে থাকে। সেই মহব্বতই মানুষকে আমল করায়, আমল করতে উদ্বুদ্ধ করে, অন্তরে জযবা-আগ্রহ সৃষ্টি হয়, যে আগ্রহের উপর ভর করে মানুষ চলে। তাই ঈমান প্রথমে মানুষের কলবে নিপতিত হয়। সেখান থেকে উন্নতি লাভ করে অন্যান্য স্থানসমূহে পৌঁছে। তার প্রভাব সর্বাঙ্গে পৌঁছে যায়। তারপর হাত মুমিন হয়ে যায়, কর্ণ মুমিন হয়ে যায় এবং সমস্ত অঙ্গে ঈমানদারি সৃষ্টি হয়ে যায়। আর অন্তরে যদি বেঈমানি প্রবেশ করে, তাহলে হাত-পাও বেঈমান হয়ে যাবে, বেঈমানি কর্মকাণ্ড করবে এবং দেমাগও বেঈমান হয়ে যাবে। কোন কিছু অনুধাবন করলে বেঈমানি অনুধাবন করবে। কেননা, অন্তরের নিয়ত খারাপ। সুতরাং নবীগণ অন্তরকে আসল নির্ধারণ করে তার সংশোধনের দিকে মনোনিবেশ করেন যে, তার ভিতর নূর সৃষ্টি

করতে হবে, যাতে তার মধ্যে অদৃশ্য জগতের বস্তুসমূহ আলোকিত হয়। আর তা তখনই হবে, যখন অন্তরে ঈমান পতিত হবে। আর কলব যেহেতু পবিত্র পাত্র, তাই পবিত্র বস্তু ঈমান তার মধ্যে প্রবেশ করে। তারপর আমলও সে রকম প্রকাশ হয়।

যদি অন্তর খুশি থাকে, তাহলে চেহারায় খুশির প্রভাব-চিহ্ন ফুটে ওঠে। কেননা, খুশি তো বাস্তবে কলবের গুণ। তবে চেহারার দ্বারা প্রকাশ পায়। আর অন্তরে যদি চিন্তা-ভয় থাকে, তাহলে চেহারা দেখে জানা যায়। মানুষ দেখে বলে, আজ তোমাকে বড় চিন্তিত দেখা যাচ্ছে। অন্যথায় চিন্তা গোপন জিনিস। সেগুলো তো চোখে দেখার বস্তু নয়। যেহেতু দিলের প্রভাব-চিহ্ন চেহারায় পরিলক্ষিত হয়, তাই প্রতিজন ব্যক্তি তাকে দেখে বলতে পারে, সে চিন্তিত। আর বাস্তবে সে চিন্তিত হয়ই। তাই চিন্তা ও খুশি, ভালবাসা ও দুশমনি, করা ও না করা এ ধরনের সকল বস্তু দিলের সাথে সম্পর্ক রাখে। দিল ঠিক তো সব ঠিক। যদি অন্তর খারাপ থাকে, তাহলে সব খারাপ। তার কারণে খারাবীর প্রভাব হাত-পায়ে পড়ে। আর যে প্রতিক্রিয়া কলবে পতিত হয়, তা বিস্তৃত হয়ে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশিত হয় ভাল হোক বা মন্দ হোক।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যখন কোন মানুষের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে আর ফেরেশতা আত্মা টেনে বের করতে থাকে, তখন ফেরেশতা তার হাত ও পা শুকতে থাকে, ঘ্রাণ নিতে থাকে এবং দেমাগ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও শুকতে থাকে। তারা মূলত ঈমানের ঘ্রাণ অনুভব করতে চায়। অন্তরে যদি ঈমান থাকে, তাহলে তার প্রতিক্রিয়া-প্রভাব হাত-পায়ে আকর্ষণ করে। হাত থেকে ঘ্রাণ নিলে তারা বুঝতে পারে, ঈমান আছে কি নেই। ঈমানের সুঘ্রাণ আছে কি নেই। আসল সুঘ্রাণের কেন্দ্র তো অন্তর। তবে অন্যান্য অঙ্গে তার প্রভাব পড়ে। যেমনিভাবে সুগন্ধির গুদাম হলো বাগান ও ফুল। কিন্তু কাপড় থেকেও সুঘ্রাণ আসতে থাকে। আর বাগানের সুগন্ধির চিহ্ন ও দাগ হতে যেথায় যেথায় তার বাতাস বা ঘ্রাণ পৌঁছবে, সেগুলোও সুঘ্রাণ হতে থাকবে।

উপরের কথাগুলোর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য এ কথা বোঝানো যে, মানুষের মধ্যে অন্তরই আসল। তাকে শুদ্ধ করতে হবে আর তা শুদ্ধিকরণের প্রথম বুনিয়াদ হলো ঈমান। ঈমান থাকে কলবের ভিতর এবং তার চিহ্ন বা আলামত হাতে-পায়ে আমলের আকৃতিতে প্রকাশ পায়।

## ইসলামের স্থান

উপরের আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্ট হলো, অন্তর হলো ঈমানের স্থান আর হাত-পা ইসলামের স্থান। অর্থাৎ হাত-পায়ে ইসলাম প্রকাশ পায়। ঈমান গোপনীয় বস্তু, যা অন্তরে থাকে আর ইসলাম প্রকাশ্য বস্তু, যা হাতে-পায়ে প্রকাশ পায়। আপনি নামায পড়লে হাতে-পায়ে পড়েন। দর্শকরা জানে, আপনি নামায পড়ছেন। কিন্তু এ কর্মের মূল উৎস হলো কলবের ভিতর। যদি তাতে বিশ্বাস ও মহব্বতের জযবা এবং আল্লাহর প্রেম-অনুরাগ সৃষ্টি না হয়, তাহলে কখনো নামায পড়ত না। এতে প্রতীয়মান হলো, আসলে নামায আদায়কারী হলো অন্তর। আমলের অবয়ব হাত-পায়ে প্রকাশ পায়। ঈমানের স্থান হলো অন্তর, তার আলামত যখন হাত-পায়ে আসে, তখন তা ইসলাম হয়ে যায়। সুতরাং ঈমান হলো গোপন জিনিস আর ইসলাম প্রকাশ্য জিনিস। এ জন্য হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

اَلْاِيْمَانُ سِرٌّ وَالْاِسْلَامُ عَلَانِيَةٌ

ঈমান গোপনীয় বস্তু, যাকে অন্তর গ্রহণ করেছে। আর ইসলাম খোলা বস্তু, যা হাত-পায়ে প্রকাশ পায়।

তো ঐ গোপনীয় বস্তু যতক্ষণ গোপন থাকে, তাকে ঈমান বলে। আর ঐ একই বস্তু যখন হাত-পায়ে আসে, তাকে ইসলাম বলে।

## ঈমানের হাকিকত

ঈমানের অর্থ কী? এবং কিভাবে আমাদের ভিতরে আসে? এবং তার আমলত কী? তাকে কভাবে চেনা যায়? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর শুনে নাও। ঈমানের হাকিকত হলো মহব্বত বা ভালবাসা। যদি আল্লাহর মহব্বত কামেল হয়, তাহলে বলা হবে, তার ঈমান পরিপূর্ণ। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বত যদি অন্তরে বসে যায়, তাহলে বলা হবে, তার ঈমান এসে গেছে। এ কারণে আল-কুরআনে ঘোষণা হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

আর যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহপ্রেমে তারা মুশরিকদের চেয়ে অধিক প্রবল।

যারা ঈমান এনেছে, তাদের মধ্যে আল্লাহর মহব্বত ও ইশক ক্রিয়া করে এবং

প্রবেশ করে। যদি ইশক ও মহব্বত না হতো, তাহলে কখনও ঈমান আসত না। যদি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান আনা হয়, তাহলে তার উদ্দেশ্য হলো, অন্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বত বসে গেছে এবং আল্লাহর মহব্বত জমে গেছে।

তো মহব্বত বাস্তবে ঈমানের দ্বিতীয় নাম। ঈমান নেই তো মহব্বত নেই। মহব্বত নেই তো ঈমান নেই। আসল জিনিস হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত। এই জিনিসই ঈমান তৈরি করে। এই জিনিসই আকিদা দৃঢ় করে। এ কথাটিই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ অন্তরে আমার মহব্বত অধিক না হবে নিজের মা-বাবা সন্তানাদির মহব্বত হতে এবং অন্য কাজের মহব্বত হতে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বত ব্যতীত ঈমান পরিপূর্ণ হয় না।

## ঈমানের আলামত

ঈমানের আলামত হলো, একদিকে তো সন্তানাদির মহব্বত, অন্যদিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত। যখন টক্কর হবে, তখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বতকেই ইখতিয়ার করা এবং সন্তানাদির মহব্বতকে ছেড়ে দেয়া। তাতে বোঝা যাবে, বাস্তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বত বিদ্যমান আছে। আর যদি মানুষ সন্তানাদিকে ইখতিয়ার করে আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহব্বতকে ছেড়ে দেয়, তাহলে বলা হবে, তার রাসূলের মহব্বত নেই বরং সন্তানাদির মহব্বত রয়েছে। তাই টক্কর দেয়ার দ্বারা বোঝা যায়, কার মহব্বত বেশি।

উদাহরণস্বরূপ তুমি লেপের ভিতর ঢুকে সুখের ঘুম ঘুমাচ্ছ। এমতাবস্থায় হঠাৎ মিনার হতে মুয়াযযিন আওয়াজ দিল–

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

নামাযের দিকে আস,/ সফলতার দিকে আস।

তাতে তুমি লাব্বায়িক বলে সাড়া দাওনি। তাহলে বলা হবে, তোমার নফসের মহব্বত প্রবল ও অধিক। আর যদি আরাম ছেড়ে দাঁড়িয়ে যাও এবং অযু করে মসজিদে গিয়ে নামায পড়, তাহলে বলা হয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত প্রবল। তাই টক্কর দেয়ার সময় মানুষ যেদিকে ধাবিত হয়, তাকে সেদিকের মহব্বতের হুকুম লাগানো হবে।

তো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমার মহব্বত সন্তানাদি, মা-বাবা ইত্যাদির মহব্বত থেকে অধিক হবে। যখন মা-বাবা ও আমার মহব্বতের মাঝে টক্কর হয়, তখন আমার মহব্বতকে ইখতিয়ার করবে। মা-বাবাকে ছেড়ে দেবে। আর যখন আমার মহব্বত ও সন্তানাদির মহব্বতের মধ্যে টক্কর হবে, তখন আমার মহব্বতকেই এখতিয়ার করবে। সন্তানাদির মহব্বতকে ছেড়ে দেবে। এ কারণেই হযরত সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে নবীজির মহব্বত ও ভালবাসা এত প্রবল ছিল যে, যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করলেন, তখন সাহাবায়ে কেরামই ঐ মহব্বতের কারণে মাতৃভূমি ছেড়েছেন, বাড়িঘর ছেড়েছেন, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্দব ছেড়েছেন, ধন-সম্পদ জমা-জমি ছেড়েছেন। শুধু আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে থাকার জন্য মক্কার সকল ব্যবসা-বাণিজ্য পরিহার করে মদীনার গরীবি জীবনকে ইখতিয়ার করেছেন।

তাঁদেরকে কোন্ জিনিস বাধ্য করল? তা ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত। এ মহব্বতের কারণে আরাম-আয়েশের সকল সামানা পরিহার করে রিক্ত হয়ে বসবাস করা মেনে নেন, কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ছাড়তে রাজি হননি।

## সিদ্দিকী মাকাম

হাদীস শরীফে একটি চমৎকার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে যে, বদর যুদ্ধে ৩১৩ জন সাহাবী অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে সিদ্দিকে আকবার রাযি.ও ছিলেন। হযরতের ছোট ছেলে যিনি এখনও মুসলমান হননি তিনি বদর যুদ্ধে কাফিরদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধে এসেছিলেন। তিনি ঈমান গ্রহণ করার পর একদিন হযরত সিদ্দিকে আকবার রাযি.কে বলছিলেন, আব্বাজান! বদর যুদ্ধে কয়েকবার এমন অবস্থা হয়েছিল যে, আপনি একেবারেই আমার তলোয়ারের হামলার মুখে এসে পড়েছেন, যদি আমি হামলা করতাম, তাহলে আপনি

কাঁদতেন না। কিন্তু আমি ভাবলাম, আপনি তো আমার পিতা আপনার উপর কিভাবে হামলা করি, তাই আমি এক পাশে সরে গেলাম।

তখন হযরত সিদ্দিকে আকবার রাযি. বললেন, আচ্ছা এমন সুযোগ এসেছে যে তুমি আমি সামনা-সামনি হয়েছি! ছেলে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি টের পাইনি। যদি তুমি আমার হামলার নাগালে আসতে, তাহলে আমি তোমাকে সর্বপ্রথম হত্যা করতাম এ কারণে যে, তুমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুশমন ছিলে। আর রাসূলের মহব্বতের মোকাবেলায় সন্তানের মহব্বত তো কিছুই না। এ কারণে তুমি যদি আমার তলোয়ারের নাগালে আসতে, তাহলে আমি তোমাকে প্রথমে হত্যা করতাম। কারণ, এটি কুফর বিষয় ও ঈমানের বিষয়।

## মহব্বতের আধিক্য

জানা যায়, যখন ঈমান কারো অন্তরে স্থান করে নেয় এবং মহব্বত প্রবল হয়ে যায়, তখন সে নিজেকে মহব্বতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয়। তারপর মাহবুবের (প্রেমাস্পদের) সকল কাজ-কর্মও তার মাহবুব হয়ে যায়। তার মোকাবেলা না সন্তানাদির মহব্বত করতে পারে, না মাতাপিতার মহব্বত। মাতা-পিতার মহব্বতের কোন মূল্যই থাকে না। সকলের মহব্বত নিঃশেষ হয়ে যায় এবং এক মহব্বতই বিজয় লাভ করে।

সাহাবায়ে কেরাম হিজরত করেছেন, ধন-সম্পদ, জমা-জমি ছেড়েছেন, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ করেছেন। এত সব ছিল রাসূলের কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতের ফলাফল। তারা ঐ সকল বস্তুর কোন পরওয়ার করেননি। কেননা, তাদের রাসূলের মহব্বত প্রবল ছিল। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রথম হক হলো তাকে মহব্বত করা। মহব্বত নেই তো ঈমান নেই। আর ঈমান নেই ইসলামও নেই। তো বুনিয়াদী বস্তু হলো মহব্বত। এ কারণে মহব্বতের ব্যাপারে জোরালো তাকিদ দেয়া হয়েছে। এটিই ছিল সাহাবায়ে কেরামের তরিকা আর এটিই পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালার তরিকা হয়েছে।

নিয়ম হলো, যার মহব্বত প্রবল হয়, তার সকল কাজ মাহবুব (প্রিয়) হয়ে যায়। তাঁর চলাফেরা, ওঠাবসা মাহবুব হয়ে যায়। তার পোশাকাদি মাহবুব হয়ে যায়। তার আলোচনা-পর্যালোচনাও মাহবুব হয়ে যায়। শুধু মাহবুবেরই মহব্বত হয় না বরং তার নামের সাথে যে সমস্ত জিনিস সম্পর্কিত, সেগুলোও

মাহবুব হয়ে যায়।

কেউ মজনুকে দেখতে পেল, সে লাইলার বাড়ির প্রতিটি ইটকে চুমু দিচ্ছে। কেউ তাকে বলল, আহম্মক! বেকুফ! তুমি কী করছ! ইটগুলোতে কী আছে এবং এলোকে চুমু দেয়ার দ্বারা লাভ কী? তখন দুটি কবিতাংশ দ্বারা উত্তর দিল–

امر على الديار ديار ليلى

اقبل ذا الجدار وذا الجدار

আমি যখন লাইলার বাড়ির পাশ দিয়ে অতিক্রম করি, তখন কখনও এ দেওয়ালকে চুমু দেই এবং কখনও ইটকে চুমু দেই, কখনও দরজায় চুমু দেই, কখনও তার কলিজাকে চুমু দেই আর আমি কেন চুমু দেই?

وما حب الديار شغفن قلبى

ولكن حب من نزل الديارا

আমার তো ঐ ইটের সাথে মহব্বত নেই। যে সেই ইটে বসে আছে তার সাথে আমার মহব্বত। এ কারণে ঐ ইটের সাথে আমার মহব্বত হয়ে গেছে। তার কুকুরের সাথে মহব্বত হয়ে গেছে। তার পেশাব গ্রহণ করতেও তৈরি আছি।

তাই যখন মহব্বত হয় তো শুধু মাহবুবের সাথেই হয় না বরং যে জিনিস তার নামের সাথে লেগেছে, সেগুলোও মাহবুব হয়ে যায়।

তোমাদের মহব্বত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে। তাই সবুজ গম্বুজও মাহববু হবে আর তার যিয়ারতকে তুমি ইবাদত মনে কর এবং মনে কর যদি একটি নজর গম্বুজে পড়ে যায়, তাহলে দুনিয়াতে ও আখেরাতে সফলতা পেয়ে যাব। এমনটি কেন? আসলে গম্বুজের সবুজতা তো মাহবুব নয়, মাহবুব হলেন তিনি, যিনি সেখানে আরাম করেছেন। আসলে তিনিই মাহবুব। যেহেতু সেই গম্বুজের সাথে তাঁর নাম জড়িত আছে, সে জন্য তা মাহবুব হয়েছে। সবুজ গম্বুজ তো কাছের বিষয়। মানুষ মদিনাকেও মহব্বত করে। কবিদের দিকে নজর করলে দেখা যাবে, তারা মদীনার প্রশংসা করে এবং নাত, গজলে তার প্রশংসা করে থাকে। তার ফাযায়েল বর্ণনা করে।

মদিনা তো শুধু একটা শহর আমাদের এখানের শহরের মতো। আমাদের শহর তো অনেক সুন্দর, মদিনা শহর এতো সুন্দর নয়; তারপরও মহব্বত রয়েছে। কারণ, আসল মহব্বত তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে। এ কারণে সবুজ গম্বুজও মাহবুব হলো। এ মহব্বতের কারণে মসজিদে নববীও মাহবুব হলো, মদিনাও মাহবুব হলো। এ ধারাবাহিকতায় সব জিনিসের মধ্যে মহব্বত পৌঁছে যায়।

আপনি বাইতুল্লাহ শরীফের প্রতিটি ইটকে চুমু দেন কেন? কেননা, বাইতুল্লাহ আল্লাহ তায়ালার তাজাল্লির স্থান। তাই তারও মহব্বত হয়ে গেছে। আর যখন কাবা শরীফ মাহবুব হলো, তখন পূর্ণ মসজিদে হারামই মাহবুব হলো। আর মহব্বত প্রকাশ পায় এমনভাবে যে, আপনি তার সম্মান করেন। তার দিকে ফিরে নামায আদায় করেন। যখন মসজিদে হারাম মাহবুব হলো, তখন মক্কা শরীফও মাহবুব বনে গেল। কেননা, এ শহরে মসজিদে হারাম অবস্থিত; তাই এই শহরও মাহবুব। আর বাইতুল্লাহ যেহেতু হিজাজে অবস্থিত; তাই আমরা তাকে হিজাজে মুকাদ্দাস বলি। আর সারা হিজাজের সাথে যেহেতু মহব্বত হয়েছে; তাই হিজাজের বাসিন্দাদের সাথেও মহব্বত-সম্পর্ক হয়েছে। তার বাসিন্দারা তো তার পড়শী; তাই তারাও মাহবুব হবে। বিধায় যখন মানুষের অন্তরে মহব্বত সৃষ্টি হয়, তখন শুধু মাহবুবই মাহবুব হয় না বরং মাহবুবের কার্যাবলীও মাহবুব হয়ে যায়। চাল-ডাল, পোশাক, খাবারের নিয়ম-কানুন, জীবন-যাপনের নিয়মাবলি ইত্যাদিসহ সকল জিনিস মাহবুব হয়ে যায়। আর যে সমস্ত জিনিস মাহবুবের পছন্দনীয় এবং যারা মাহবুবের মাহবুব, তারা সকলেই মাহবুব হয়ে যায়।

## মহব্বতের আলামত

তারপর মহব্বতের দ্বারাই ইত্তেবায়ে সুন্নাতের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কেননা, মহব্বতের আলামত হলো, যদি মহব্বত থাকে, তাহলে ইত্তেবায়ে সুন্নাত গ্রহণ করবে; অন্যথায় নয়। একমাত্র মহব্বতই উৎসাহী করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতসমূহের অনুসরণ করার। যেমনিভাবে তিনি বসে খাবার খেতেন, সেইভাবে খাবার খাওয়া, যে নিয়মে তিনি আরাম করতেন, সেভাবে আরাম করা, যেমনিভাবে তিনি দুশমনদের সাথে ব্যবহার করতেন, সেভাবে ব্যবহার করা। এ জিনিসগুলোর দ্বারা ইত্তেবায়ে সুন্নাত প্রবল হবে, সুদৃঢ় হবে।

যদি নবীর মহব্বতের জযবা প্রবল হয়, তাহলে বিদ'আতের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে আর সুন্নাতের অনুসরণের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি হবে। কেননা, মাহবুবের সত্তাও মাহবুব আর সত্তা মাহবুব হলে তার কার্যাবলিও মাহবুব হবে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাম-এর কথাবার্তার নিয়ম-কানুনও মাহবুব হবে। প্রতিটি জিনিস মহব্বতের আওতায় চলে আসবে। এরই নাম ইত্তেবায়ে সুন্নাত যে, প্রতিটি শাখা প্রশাখায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা হবে। অনুসরণ করা হবে তার কার্যাবলির, তাতেই রয়েছে খায়ের ও বরকত বা কল্যাণ। এমনকি মুয়ামালা ও মুয়াশারাতের ক্ষেত্রেও যখন রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুসরণ করবে, তখন সিদ্দিকী মাকাম লাভ করতে পারবে।

## শোয়ার সুন্নত তরিকা ও ইচ্ছাশক্তি

উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে, আমাদের শয়নেও আমরা স্বাধীন নই। সেখানেও সুন্নাতের অনুসরণ করতে হয় যে, এমনভাবে শয়ন করো যেমনভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে শয়ন করতেন। শয়ন তো করতেই হবে; কিন্তু তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরিকায় হলে ইবাদত হবে।

মানুষ চার নিয়মের কোন এক নিয়মে শয়ন করে। চিৎ হয়ে, না হয় উপুড় হয়ে, ডান পার্শ্ব হয়ে, না হয় বাম পার্শ্ব হয়ে। এ চার নিয়মে আমাদেরকে স্বাধীন রাখা হয়নি। বরং আমরা সুন্নতের পাবন্দ।

উপুড় হয়ে শয়নকে শরীয়ত পছন্দ করে না। হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা রা. একবার মসজিদে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলেন। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পা দ্বারা সতর্ক করে বলেছিলেন, হে আবু হুরায়রা! উপুড় হয়ে কখনও শয়ন করো না। কেননা, তা জাহান্নামীদের নমুনা। তাদেরকে উপুড় করে টেনে-হেঁচড়ে জাহান্নাকে নিক্ষেপ করা হবে। তাই মুমিনের জন্য উচিত হবে না, সে জাহান্নামীদের নমুনা গ্রহণ করবে এবং তাদের সাদৃশ্য ইখতিয়ার করবে।

তারপর উপুড় হয়ে শয়ন করা সুস্থতার ক্ষেত্রেও ক্ষতিকর। তাতে নাড়ি-ভুড়ি ওলট-পালট হয়ে যায়। এতে সম্ভাবনা রয়েছে, কোন নাড়িতে গিরা লেগে যাবে। ফলে পেটের পীড়া শুরু হয়ে যাবে বা অন্য কোন প্রকার কষ্ট হবে। এ কারণে উপুড় হয়ে শয়নকে শরীয়ত মাকরূহ বলেছে। তবে কেউ যদি

শোওয়ার পর উপুড় হয়ে যায়, তবে তা অন্য কথা। তা তার ইখতিয়ারে নেই। সে তো ইচ্ছা করে উপুড় হয়ে শয়ন করেনি। আর চিৎ হয়ে শয়ন তো জায়েয আছে। শরয়ীভাবে তা নিষিদ্ধ নয়, হারামও নয়। তবে শরীয়ত তা পছন্দ করে না। কেননা, চিৎ হয়ে শয়ন শক্তিহীন হয়ে যাওয়ার আলামত। আর যখন মানুষ দুর্বল হয়ে যায়, তখন সে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। এ কারণে যখন কোন পাহলোয়ান কাউকে চিৎ করে ফেলে, তখন বলা হয়, তাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করা হয়েছে। কেউ এমন বলে না যে, সে সম্পূর্ণরূপে উপুড় হয়ে গেছে। কেননা, যে উপুড় হয়, তার মধ্যে শক্তি থাকে যে, সে হাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু চিৎ হয়ে শয়নকারী একেবারেই শক্তিহীন হয়ে পড়ে। আর মুসলমানদের জন্য দুর্বলদের নমুনা পছন্দ করা উচিত নয়। মুসলমানদের কাজ হবে মজবুত, শক্ত, তারা রোগীদের মতো পড়ে থাকবে না।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ

শক্তিশালী মুসলমান দুর্বল মুসলমান হতে উত্তম।

শক্তি থাকলে জিহাদ করবে, শক্তি থাকলে মোজাহাদা করবে। আর দুর্বল বেচারা শুধু চারপায়াতে বসে থাকবে, শুয়ে থাকবে। আর তা জিহাদেরও কর্ম নয়, মোজাহাদার কর্মও নয়। এক কথায় এমনটি কোন কাজই নয়। তাই তা শরীয়ত পছন্দ করে না বরং শরীয়তের পছন্দনীয় হলো মুমিন প্রতিটি কর্মে বাহাদুরি ও বীরত্ব প্রকাশ করবে।

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, মানুষ যেন মরা-মরা ভাব ও দুর্বলদের ন্যায় না চলে। বরং এমনভাবে চলবে যে, কেউ দেখলে ভাববে, তার ভিতরে প্রাণ আছে, শক্তি আছে, তেজ আছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়ায় আরোহণ করতেন, তখন তিনি রিকাবে পা রেখে আরোহণ করতেন না। কারণ, এটাও এক প্রকার দুর্বলতা যে, মানুষ ঘোড়ার রিকাবে পা রাখা ব্যতীত তাতে আরোহণ করতে পারে না। তাই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘোড়ায় আরোহণ করতেন, তখন লাফ দিয়ে আরোহণ করতেন, যাতে বীরত্ব প্রকাশ পায়।

অতএব ইসলাম মুমিনদের জন্য এমন কোন হরকত পছন্দ করেনি, যার দ্বারা তার থেকে দুর্বলতা প্রকাশ পায়, অপারপগতা প্রকাশ পায়। আর চিৎ হয়ে শয়ন যেহেতু শক্তিহীনতা এবং দুর্বল ও রোগীদের আলামত, তাই জায়েয

তো আছে বটে আর শরীয়ত তাকে নিষিদ্ধও করে না; কিন্তু শরীয়ত এমন শয়নকে পছন্দ করে না।

এখন রয়ে গেল বাম পার্শ্ব হয়ে শয়ন করা। এ ব্যাপারে শরীয়ত বিরোধিতা করে না। তা জায়েয আছে; তবে তা পছন্দনীয় নয়। আর তার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে এই যে, বাম পাশে কলব থাকে। যখন বাম পার্শ্ব করে শোওয়া হয়, তখন কলবের আরাম বেশি হয়। আর কলবের আরাম বেশি হলে ঘুম গভীর হবে আর ঘুম গভীর হলে এতে সম্ভাবনা রয়েছে, তাহাজ্জুদ কাজা হয়ে যাবে, ফজরের নামায কাজা হয়ে যাবে। আর অন্যান্য কর্মসমূহও কাজা হয়ে যাবে। এ জন্যই শরীয়ত পছন্দ করেনি যে, মানুষ এত বেশি আরাম করুক যে, মানুষের সাথে শর্ত লাগিয়ে বাজি ধরে ঘুমিয়ে যাবে। মানুষ সতর্কতার সাথে ঘুমাবে, যাতে যেকোন সময় চোখ খুলতে পারে। মানুষের কলব শক্ত ও মজবুত হোক এবং আরামে ডুবে যেন শক্তিহীন দুর্বল না হয়ে পড়ে, শরীয়ত তো তা-ই পছন্দ করে।

যদি মানুষ শয়নকালে এ ইচ্ছা করে শয়ন করে যে, আমার চোখ ভোর ৬টায় খুলবে, যাতে জামাত কাজা না হয়, তাহলে ঠিক ৬টা বাজার সাথে সাথে অবশ্যই চোখ খুলবে। এমনটি হবে না যে চোখ খুলবে না। পরে ঘুম থেকে ওঠা না ওঠা মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। অলসতা করে না উঠলেও চোখ ঠিকই খুলবে।

তো দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও দৃঢ় ইচ্ছা অবশ্যই কাজে লাগে। এ কারণে শরীয়তে ঘুমের নিয়ম রেখেছে যে, সূরায়ে কাহফের শেষ আয়াতগুলো পড়ে শোবে–

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

উক্ত আয়াতগুলো শেষ পর্যন্ত পড়ে শুয়ে পড়বে।

উক্ত আয়াতগুলোর প্রভাব ও কার্যকারিতা এমন যে, যদি উক্ত আয়াতসমূহ পড়ে এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করে যে, অমুক সময়ে ঘুম থেকে অবশ্যই জাগ্রত হব, তাহলে অবশ্যই চোখ খুলবে। কিন্তু প্রথম বস্তু হলো দৃঢ় ইচ্ছা ও পোক্ত প্রতিজ্ঞা করে শয়ন করতে হবে যে, আমি এতটার সময় ঘুম থেকে উঠব। আর যদি এমন ইচ্ছা করে শয়ন করে যে, আমার কাজ তো শয়ন করা চাই জাগ্রত হই আর না হই, তাহলে সকাল ৮টা বাজার পূর্বে কোন মতেই জাগ্রত হতে পারবে না। মানুষের ইচ্ছার ভিতরে আল্লাহ তায়ালা বড় শক্তি দান করেছেন এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও পোক্ত ইচ্ছায় আল্লাহ তায়ালা অনেক শক্তি প্রদান করেছেন। ইচ্ছা করার সাথে সাথে উক্ত আয়াতগুলো পড়লে অনেক

সাহায্য হবে জাগ্রত হওয়ার ক্ষেত্রে। অতএব শরীয়তের অভিপ্রায় হলো, গভীর ঘুমে কখনও যেয়ো না যে, সারা যিকির, আমল, নামায ঘুমের ভিতর বিলীন হয়ে পড়ে। বিধায় শরীয়ত পছন্দ করেনি যে, মানুষ বাম পার্শ্বে কাত হয়ে গভীর ঘুমে লিপ্ত হবে।

বাকি থাকল ডান পার্শ্বের কথা। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এটি আমার তরিকা এবং সকল নবী-রাসূলের তরিকা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান হাত মাথার নিচে রেখে ঘুমাতেন, যখন মানুষ ডান কাতে শয়ন করে, তখন কলব ঝুলানো থাকে। আর যখন কলব ঝুলানো থাকে, তখন বেশি আরাম অনুভব হয় না। তাই কলব সতর্ক থাকে। আর এমন গভীর ঘুমও আসবে না, যাতে মানুষ ডুবে যাবে। এ কারণে ডান কাতে শয়ন করাকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নত বলেছেন। আর অন্যান্য অবস্থাগুলোকে শরীয়ত নিষিদ্ধ তো করেনি; তবে পছন্দও করেনি। কেননা, শয়নের অন্যসব নিয়মে মুমিনের আসল মাকসাদ ফতুর হয়ে যায়।

আমার বলার উদ্দেশ্য হলো, নামায, রোযা তো স্বস্থানে ইবাদত; কিন্তু সাধারণ জীবনে স্বাধীনতা সৃষ্টি করেনি বরং আল্লাহর কানুনের নিয়মানুবর্তিতা করেছে। শয়ন করবেন তো সেই আকৃতিতে শয়ন করুন, যে তরিকায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুতেন। খেতে বসবেন তো ঐ অবস্থায় বসুন, যেভাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবারের সময় বসতেন। যখন কোন কাজ করবেন তো সেই অবস্থায় করুন, যে অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন।

## ডান দিক থেকে শুরু করা

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, 'তিনি ভালো কাজগুলো সর্বদা ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন।'

যদি মাথায় সিঁথি কাটতেন, তাহলে প্রথমে ডানদিক থেকে কাটতেন। তারপর বাম দিকে কাটতেন। আর জুতা পরিধান করার সময় প্রথমে ডান পা দিতেন তারপর বাম পা দিতেন। যদি পাঞ্জাবি-জুব্বা পরতেন, তাহলে প্রথমে ডান হাত আস্তিনে ঢোকাতেন। তারপর বাম হাত ঢোকাতেন। তেমনিভাবে প্রতিটি ভাল কাজে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্ব প্রথম ডান সাইডকে ইখতিয়ার করতেন। প্রতিটি মুমিনের এমন কাজ করা উচিত যে,

তারা প্রতিটি ভাল কর্মকে ডান সাইড থেকে শুরু করবে।

যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে কোন কিছু আসত এবং তিনি তা বণ্টন করতেন, তাহলে ডান পার্শ্ব থেকে শুরু করতেন। ডান পাশ শেষ হলে বাম পাশের দিকে মনোনিবেশ করতেন। আর প্রতিটি মন্দ ও নিম্নমানের বস্তুর শুরু বাম দিক থেকে শুরু করতেন। নাক পরিষ্কারে বাম হাত ব্যবহার করতেন। ইস্তিঞ্জাকালে বাম হাত ব্যবহার করতেন। এগুলো সুন্নাত। যদি সুন্নাতের উপর আমলে করা হয়, তাহলে আপনার সারাটা দুনিয়া দীনে পরিণত হবে। খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, চাল-চলন ইত্তেবায়ে সুন্নাতের কারণে দীনি কর্মে রূপান্তরিত হয়।

প্রশ্ন হলো, ইত্তেবায়ে সুন্নাত কখন হবে? ইত্তিবায়ে সুন্নাত হয় অধিক মহব্বতের কারণে। যদি মহব্বত প্রবল না হয়, তাহলে মানুষ কখনও ইত্তেবায়ে সুন্নত করবে না। তাই বুঝতে হবে, মহব্বত কোথায় আর ইত্তেবা বা অনুসরণ কোথায়। মহব্বত প্রবল থাকলে পদে পদে স্মরণ থাকবে।

## আকলের মাপকাঠি

হযরত থানুভী রহ.-এর একজন খলিফা সাহারানপুর থেকে কানপুর যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। এক সময় সাহারানপুরের ইক্ষু খুব প্রসিদ্ধ ছিল। সেগুলো অনেক মোলায়েম, মিষ্টি এবং ভাল মানের হতো। কিন্তু কালের বিবর্তনে আজ আর হয় না। সেগুলো হাদিয়াস্বরূপ মানুষ অনেক দূর-দূরান্ত নিয়ে যেত। তিনিও সেখান থেকে ইক্ষু খরিদ করলেন এ নিয়তে যে, কানপুর গিয়ে বন্ধুদের হাদিয়া দিবেন। কিন্তু ইক্ষুগুলোর ওজন চল্লিশ কেজির উপর ছিল, যা এক টিকিটে গাড়িতে বহন করার নিয়ম ছিল না। তাই তিনি মনে মনে স্থির করলেন, ইক্ষুগুলোর জন্য অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করবেন। তিনি বাবুকে (টিকিট মাস্টার) বললেন অতিরিক্ত ভাড়া রাখার জন্য। তখন বাবু দেখলেন, লোকটি নেককার, সাদাসিধে এবং সম্মানিত মানুষ, তাই বললেন, জনাব! আপনার এ মালের ভাড়া দিতে হবে না; আপনি নিয়ে যান। তখন হযরত বললেন, সাহেব! ভাড়া নিয়ে নিন। কারণ, গাড়িতে যখন টিটি আসবে, তখন সে ভাড়া নিয়ে নেবে এবং ভাড়া অতিরিক্ত জরিমানাও আদায় করবে। সেখানে ডাবল দিতে হবে। বাবু বললেন, আমি টিটিকে বলে দেব, সে আপনাকে কিছু বলবে না। তখন তিনি বললেন, সাহেব! যখন আমি গাজিয়াবাদ স্টেশনে নেমে গাড়ি বদল করে দ্বিতীয় গাড়টিতে আরোহণ করব,

তখন অন্য চেকার এসে আমার নিকট হতে জরিমানা আদায় করবে। আমার মাল তো বেশি; এক টিকিটে তো এত পরিমাণ মনে নেয়ার সুযোগ নেই। আর সফরও অনেক দীর্ঘ। তাই আমাকে জরিমানা দিতে হবে অনেক। দেখা যাবে ভাড়া হতে চার গুণ বেশি হয়ে গেছে। আপনি এখান থেকেই ভাড়া নিয়ে নিন। বাবু বললেন, আমি চেকারকে বলে দেব, সে যেন পরবর্তী গাড়ির চেকারকে বলে দেয়; তাহলে সে আপনাকে কিছুই বলবে না।

তখন তিনি বললেন, আচ্ছা আমি যখন কলেবর স্টেশনে নেমে গেট পার হতে যাব, তখন গেটম্যান বলবে, মালের টিকিট কোথায়? আর টিকিট বা রশিদ তো আমার নিকট নেই, তখন সে আমার নিকট হতে ৪ গুণ বেশি জরিমানা আদায় করবে, যা আমার পকেটে নেই। তখন বাবু বললেন, আমি দ্বিতীয় গাড়ির চেকারকে বলে দেব, সে যেন গেটওয়ালাকে বলে দেয়; তাহলে সে আপনাকে কিছু বলবেন। তারপর তিনি বললেন, তারপর কী হবে? বাবু উত্তরে বললেন, তখন আপনি আপনার বাড়ি চলে যাবেন।

তিনি বললেন, কিন্তু বিশ্ব জগতের মালেক আল্লাহ তায়ালা যদি জিজ্ঞেস করেন, তুমি রেলওয়ের হক চুরি করেছ কেন? তখন আমি কি উত্তর দেব? তখন বাবু সাহেব আর কথা বাড়াননি, চুপ হয়ে গেলেন এবং বললেন, লোকটাকে পাগল মনে হয়। ঐ যুগে যারা আল্লাহর নাম নিত, তাদের পাগল বলা হতো।

দুনিয়াদাররা জ্ঞানী-বুদ্ধিমান তাদের বলে, যারা বেইনসাফি বেশি করে, চালাকি বেশি করে, ধোঁকাবাজি বেশি করে। তারা বড় জ্ঞানী, বড় বুদ্ধিজীবী। আর যদি কেউ সাদাসিধে হয় এবং ঈমানদারী ও আমানতদারি প্রকাশ করে, তাহলে তাকে পাগল বলে। বলে, আগেকার যুগের আত্মা তার মধ্যে এসে গেছে। কিন্তু বাস্তবে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান তো সেই ব্যক্তি, যে নিজের আখেরাতকে সামনে রাখে। আর সেই ব্যক্তি জ্ঞানী নয়, যে নিজের পরিণাম ভুলে যায়; পরবর্তীতে মসিবতে পড়ে। মাওলানা রুমি রহ. বলেছেন–

> পাগল ঐ ব্যক্তি যে পাগল হয়নি আর বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি,
> যে বুদ্ধিমান হতে চায় না।

আল্লাহর পথে পাগল হওয়াই উচিত। আর বাস্তবে বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তিই। আর যে ব্যক্তি এ যুগে আল্লাহর নাম বেশি নেবে, সে উপাধি পাবে পাগল, উন্মাদ ইত্যাদির। আর যে ব্যক্তি বেশি চালাকী করবে, সে দুনিয়াবাসীদের নিকট উপাধি পাবে বুদ্ধিমান, বুদ্ধিজীবী। এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

يُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَأَجْلَدَهُ وَأَظْرَفَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ

এক ব্যক্তিকে বলা হবে, সে বড় বুদ্ধিমান, সে বড় জ্ঞানী, সে বড় উন্নত। কিন্তু সে কিভাবে জ্ঞানী হবে, বুদ্ধিমান হবে; অথচ তার অন্তরে সামান্যতম ঈমান নেই।

দুনিয়াবাসী বলবে, বড় জ্ঞানী, বড় বুদ্ধিমান; কিন্তু যেহেতু তার মধ্যে ঈমানের চিহ্নও নেই, তাই যা কিছু হবে, তা হবে স্বার্থপরতা দুনিয়াদারি ও বস্তুবাদ। বিধায় সে বুদ্ধিমান হতে পারে না। শরীয়তের দৃষ্টিতে বুদ্ধিমান সে, যে পরিণাম ভেবে দুনিয়া সম্পর্কে এ ধ্যান-ধারণা লালন করে যে, ভাল-মন্দ যেমনই হোক না কেন চলে যেতে হবে। দুনিয়ায় থাকা যাবে না। সেখানে যে দুঃখ-কষ্ট হবে তা হবে সর্বকালীন আর তা সর্বদা ভোগ করতে হবে, যা ধৈর্যের বাইরে। আর দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে। সুতরাং দুনিয়ার মসিবত ও নেয়ামত কোনটাই যেহেতু অবশিষ্ট থাকবে না, তাই যে ব্যক্তি আখেরাতের দুঃখ-কষ্টের প্রতি নজর করে দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে, সে-ই প্রকৃত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। ইরশাদ হয়েছে–

وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى

আর আখেরাতে আযাব খুব কঠিন ও স্থায়ী।

আর দুনিয়ার মসিবত কঠিনও নয়, আবার স্থায়ীও নয়।

## পথের কষ্ট ও আরাম এবং মঞ্জিলে মাকসাদ

জনাব আকবর রহ. খুবই সুন্দর কথা বলেছেন, উত্তম কথা বলেছেন। বলবেন না কেন? কারণ, তিনি তো যুগের ভাষ্যকার উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। এ ভিত্তিতেই তাঁর কথা হতো হেকমতপূর্ণ। তিনি বলেছেন, 'একটা কাজই সবাইকে করতে হবে। জীবন লাভ করা ও মরা।'

এ কাজ তোমাকেও করতে হবে, আমাকেও করতে হবে এবং সবাইকে করতে হবে। কেননা, সবারই জন্ম হয়, মৃত্যু হয়। তিনি আরো বলেন, আরাম ও কষ্ট এ দুটো অস্থায়ী বস্তু। কষ্ট সর্বদা থাকে না আবার আরামও সর্বদা থাকে না। তিনি বড়ই হেকমতপূর্ণ কথা বলেছেন যে, রাস্তার কষ্ট ও আরামের প্রতি দৃষ্টি রেখ না। কড়া নজর রেখ শেষ পরিণামের উপর। আর তোমার

উদ্দেশ্যস্থলে পৌছার জন্য চেষ্টা করতে থাক। গন্তব্যস্থলে পৌছে মসিবতে লিপ্ত হলে তাতে অসহনীয় কষ্ট হবে। তাই তিনি বলেছেন, রাস্তার কষ্ট আর আরাম শুধু সময় অতিবাহিত হওয়ার নাম।

এখানে আমার মনে একটি সন্দেহ দানা বাঁধছে যে, তিনি বড় হেকমতপূর্ণ কথা বলেছেন যে, রাস্তার কষ্ট ও আরামের প্রতি দৃষ্টিপাত করো না, কিন্তু তিনি তো গন্তব্যস্থল উল্লেখ করেননি। কোথায় যেতে হবে তা বলেননি। এর ভিত্তিতে আরো ২-৩টি কবিতাংশ আমি তার সাথে মিলিয়েছি, আকবার তো রাস্তার ঠিকানা দিয়েছেন আর আমি গন্তব্যস্থলের ঠিকানা বলে দিয়েছি। আমি কিন্তু কবি নই আর কবিতা আবৃতি করা আমার পেশাও নয়। তারপর আকবর রহ. যে বড় মাপের কবিত তার কবিতার সাথে কবিতা মিলানো কেমন যেন মখমলের কাপড়ে পট্টি লাগানো। সুতরাং একটি ছন্দ তৈরি করে আকবর রহ.-এর কবিতাংশের শেষে সংযোজন করলাম। তো দুটো লাইন রাস্তা সম্পর্কে আর শেষের লাইন গন্তব্যস্থল সম্পর্কে। আকবর বলেছেন–

> একটা কাজই সবাইকে করতে হবে– জীবন লাভ করা ও মরা। আর আরাম ও দুঃখ-কষ্ট এতো শুধু সময় পার করা।'

তারপর আমি যোগ করলাম–

> রয়ে গেল ইজ্জত ও মর্যাদার দ্বন্দ্ব। এতো শুধু কল্পনায় পেট ভরা। অর্থাৎ ইজ্জত।

আমরা বলি এ তো শুধু খেয়ালী বস্তু। আর খেয়াল তো অন্যের। আমাদের খেয়াল দ্বারা যদি আমাদের ইজ্জত অর্জই হতো, তাহলে ২৪ ঘণ্টা আমরা এই খেয়ালে বসে থাকতাম যে, আমাদের চেয়ে বড় আর কেউ নেই। কিন্তু মুশকিল হলো, যদি অন্যজন বড় মনে করে, তাহলে ইজ্জত হয়। শুধু খেয়াল বা ধারণা করে বসে থাকলেই ইজ্জত হবে না। আর অন্যের খেয়াল তো আপনার হাতে নেই, আপনার দায়িত্বে নেই। তাহলে যখনই খেয়াল পরিবর্তন হতো, তখনই বেইজ্জত ও লাঞ্ছিত হতো। আজকে খেয়াল হলো যে, অমুক বড় মর্যাদাবান, তার গলায় ফুলের মালা পড়িয়ে দেয়। সে নেতা হয়ে যায়। আর পরের দিন খেয়াল পরিবর্তন হয়ে গেলে ফুলের মালা অন্যজনকে দিবে। প্রথমজনের সব ইজ্জত নিঃশেষ ও বিলীন হয়ে যেত। সুতরাং সে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হতো। তাহলে ইজ্জত-সম্মান কল্পনার বস্তু।

আসল ইজ্জত হলো, যা আল্লাহর নিকট হতে মঞ্জুর হয়। আল্লাহ তায়ালা

ইরশাদ করেন–

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ

ইজ্জত আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য এবং মুমিনদের জন্য।

তাই আসল ইজ্জত হলো, যাতে আল্লাহ তায়ালা মোহর এঁটে দিয়েছেন, যা বিলীন হওয়ার নয়। এ জন্য আমি বলেছি–

খানাদানা এ তো কোন উল্লেখযোগ্য বস্তু নয়। কেননা, তা তো কোন যোগ্যতার বস্তু নয়। কারণ, অন্যান্য প্রাণীজগতও খানাদানা আহার করে। তাই মানুষ যদি আহার করে, তাহলে সে তো কোন কামালিয়াত অর্জন করেনি। কেননা, আহার তো জানোয়াররাও করে থাকে। তাই আহার করা কোন যোগ্যতার কাজ নয়। অতএব এখন বিষয় হলো তিনটি। আকবর রহ. বলেছিলেন, রাস্তার আরাম আয়েশ ও কষ্ট-ক্লেশের পরওয়া কর না। কেননা তা অস্থায়ী বস্তু। আর আমি বলি, খাবার-দাবারের খেয়াল কর না। কেননা তা জানোয়ারের আলামত। ইজ্জত ও বেইজ্জতের খেয়ালও কর না। কেননা, তা খেয়ালী বস্তু বরং মঞ্জিলে মাকসাদ পর্যন্ত পৌছার চেষ্টা কর। আর সর্বশেষ ছন্দে এরই সংবাদ দিয়েছি।

জীবনের মাকসাদ বা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর আনুগত্য বা ইবাদত– দুনিয়ার ফিকিরে মগ্ন হওয়া নয়।

## নাজাত কিসের উপর নির্ভরশীল?

আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য। তা হয়ে গেলে সবকিছু হয়ে যাবে। যে মেহনত-চেষ্টা করে দুনিয়ার ভৌগোলিক জ্ঞান অর্জন করে নেয় এবং এ পথ পাড়িও দিয়েছে, সে বলতে পারে, বাংলাদেশে এতটা গাছ আছে, অমুক শহর এমন অমুক স্থান এ রকম ইত্যাদি। আখেরাতে এদের কোনটাই জিজ্ঞেস করবে না। যদি আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞেস করেন, তুমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সুন্নাতের উপর আমল করেছ? দীনি ইলম কি শিখেছ? তখন আপনি বলবেন, হুজুর! ইবাদত তো করিনি; তবে দুনিয়ার ভৌগোলিক জ্ঞান নিয়ে এসেছি। এ ইলম তো কোন কাজে আসবে না। কেননা, এ জ্ঞান দ্বারা মুক্তি মিলবে না। আপনি বলবেন, আমি জেনে এসেছি, দুনিয়াতে এতটা পাহাড় আছে। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমি তোমাকে দুনিয়াতে পাহাড় গণনা করার জন্য পাঠাইনি। তোমাকে পাঠিয়েছিলাম আনুগত্য ও ইবাদত করার জন্য। আল্লাহর নেযামের

অনুসরণের জন্য পাঠিয়েছিলাম। বলো তুমি কতটুকু ইবাদত করেছ? ভৌগোলিক বিদ্যা, সাইন্স ও আধুনিক শিক্ষায় মুক্তি মিলবে না। বরং মুক্তি মিলবে আনুগত্যে ও ইবাদতে, যা সর্বশেষ ছন্দে বর্ণনা করা হয়েছে।

## মহব্বতের তিক্ততা

আমি বলছিলাম, আসল জিনিস মহব্বত। মহব্বত দ্বারা ঈমান সৃষ্টি হয় আর ঈমানের কারণে হাতে-পায়ে আমল প্রকাশ পায় এবং মানুষের সুন্দর জীবন গঠন হয়। আর মহব্বত দ্বারা সকল কাজ পরিচালিত হয়। মানুষ মহব্বতের কারণে মসিবত সহ্য করে, কষ্ট ভোগ করে। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত প্রবল হওয়ার কারণে এগুলোকে পরওয়া করে না। আল্লাহওয়ালাদের তো জেলে যেতে হয়েছে। তারপরও তাঁরা তার পরওয়া কনেনি। কেননা, আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল শক্তিশালী। অনেক সময় ভুখা থাকতে হয়েছে; কিন্তু এগুলোর পরওয়া করেননি। কেননা, অন্তরে তায়াল্লুক বিদ্যমান ছিল। অন্তর শান্ত ছিল। যদি দিলের তায়াল্লুক আল্লাহর সাথে না হয়, তাহলে মানুষ সর্বদা পেরেশানিতে থাকে। মনে অস্থিরতা থাকে। অন্তর আল্লাহ তায়াল্লুক থেকে মুক্ত হলে লাখ টাকার মালেক হয়েও সর্বদা পেরেশানিতে থাকে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে থাকে। এতে বোঝা গেল, জীবনের স্থিরতা ও প্রশান্তি শুধু আল্লাহর স্মরণেই, অন্য কোন বস্তুতে নেই। কোটি টাকার মালেক হয়েও শান্তিতে নেই; বরং মনে শুধু অশান্তি আর অশান্তি ।ভিতরে সর্বদা অস্থিরতা বিরাজ করে, সম্পদের হেফাজত কিভাবে করব, তা আবার ডাকাতরা না নিয়ে যায়। পাহারাদার কোথায়, পিয়ন কোথায়, যে সেগুলোকে চুরি হওয়া থেকে হেফাজত করবে। কিন্তু আইনগতভাবেও তো চুরি হয়, তা থেকে কিভাবে হেফাজত করবে? অনেক মানুষ আইনের আওতায় থেকেও চুরি করে, ডাকাতি করে।

মোটকথা, অর্থ সর্বদা জানের জন্য মসিবত ডেকে আনে। সর্বদা পেরেশানি আর পেরেশানি। না টাকায় শান্তি আছে, না বিল্ডিংয়ে শান্তি আছে। কোথাও শান্তি নেই। একমাত্র শান্তি পাওয়া যায় আল্লাহর স্মরণে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

শুধু আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তর প্রশান্তি পেতে পারে।

দুনিয়ার স্মরণ দ্বারা প্রশান্তি মিলবে না। দুনিয়া তো ব্যবহারের বস্তু। তাকে খাও, পান কর আর ব্যবহার কর। কিন্তু আসল মাকসাদ বানিয়ো না। এগুলোকে মহব্বত করো না। তার সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বও করো না। দুনিয়াকে বৈধ পন্থায় ব্যবহার কর। ভাল খাবার আহার কর, ভাল বাড়িতে বসবাস কর, কিন্তু বাড়িকে খোদা মনে করো না। পোশাককে কাবা বানিয়ো না, তাকে খাদেম মনে কর। মহব্বতের জন্য একমাত্র আল্লাহ ও তার রাসূলের জাতকে ইখতিয়ার কর। আমাদের জীবন তো এমন যে অন্তর কাজ করবে আর হাত বেকার থাকবে।

হাত-পা কাজে লিপ্ত থাকবে আর দিল লিপ্ত থাকবে খালেক ও মালিকের সাথে। দুনিয়াতে থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য কর, কৃষি কাজ কর। মানুষ যতক্ষণ দুনিয়অতে থাকবে দুনিয়ার সকল কাজকর্ম করবে আর করাও উচিত। কিন্তু অন্তর সর্বদা আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ থাকা উচিত। তাতে ব্যবসায় বরকত হবে আবার সব জিনিস ইবাদতে পরিণত হবে।

তো মূল জিনিস হলো নিয়মের অনুসরণ। আর তা হতে পারে না যতক্ষণ না মহব্বত হবে। তাই মহব্বত আসল ঈমান ও ইসলাম।

মহব্বতে তিতাও মিষ্টি হয়ে যায়। কেননা, মানুষের ধ্যান-খেয়াল মাহবুবের দিকে থাকে– তিক্ততার দিকে থাকে না। তাই তিতাও মিষ্টি হয়ে যায় এবং মাহবুবের সকল কাজও মাহবুব হয়ে যায়।

## অধিক আদব ও শিষ্টাচার

আমাদের দীনি মুরুব্বী হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব রহ. ওলামায়ে দেওবন্দের তরিকতের শায়খ ছিলেন। ১৮৫৭ সালে তিনি ইংরেজদের সাথে জিহাদ করেছেন। তারপর তিনি মক্কা শরীফ হিজরত করেন। সেখানেই তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে। তিনি মক্কায় কোনদিন কালো জুতা পরিধান করেননি। প্রথম প্রথম মানুষ এ ব্যাপারটি তেমন একটা গুরুত্ব দেয়নি; কিন্তু মানুষ যখন কালো রঙের জুতা আনতে শুরু করে, তখন তিনি বলতেন, এ রঙ পরিবর্তন করে আন, সাদা রঙওয়ালা আন, আমি এ জুতা পরিধান করব না। যখন মানুষ জানতে পারল, এটি হযরতের তরিকা, তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করল, হযরত কালো জুতা পরিধানে অসুবিধা কী? তিনি উত্তরে বললেন, বাইতুল্লাহ শরীফের গিলাফের রঙ যেহেতু কালো, তাই আমি কালো রঙ কিভাবে পায়ে ব্যবহার করব? আদবের আধিক্য আমাকে নিষেধ করে কালো জুতা পায়ে

পরিধান করতে। অথচ কালো জুতা পরিধান করা শরীয়তে নিষেধ নেই। তাতে কোন ক্ষতি ও খারাবি নেই। কিন্তু অধিক আদবের কারণে কতক জায়েয কাজকেও পরিহার করে থাকে। কেননা, তখন জায়েয বস্তু ব্যবহারও আদবীভাবে নিষিদ্ধ হয়। যেমনটি হযরত হাজী সাহেব রহ. বলেছেন, আমার লজ্জা লাগে ঐ রঙের জুতা পরিধান করতে, যে রঙ বাইতুল্লাহর গিলাফে রয়েছে।

এখানে জায়েয-নাজায়েযের প্রশ্ন নয়, এখানে অধিক মহব্বতের প্রশ্ন। যেহেতু আল্লাহর মহব্বত ছিল বেশি, তাই কাবা শরীফের মহব্বতও ততোধিক। এ কারণে কাবা শরীফের রঙকে পায়ে লাগাতে ভাল মনে করেননি।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম সাহেব নানুতুবী রহ., যিনি দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি কলির যাচ্ছিলেন হযরত সাবের কলিরী রহ.-এর মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে। কলির রুরকী হতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। তিনি নদীর পাড় দিয়ে যেতেন। এখন তো বাহনের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ঐ যুগে মানুষ সাধারণত পায়ে হেঁটে চলাচল করত। তো হযরত যখন নদীর পাড়ে পৌঁছতেন আর কলির তাঁর সামনে ভেসে উঠত, তখন তিনি জুতা খুলে বগলে নিয়ে নিতেন। তিনি খালি পায়ে সেখানে যেতেন। তাহলে সেখানে জুতা পায়ে যাওয়া কি নাজায়েয ছিল? না বরং মহব্বতের আধিক্য ছিল। হযরত সাবের কলিরী রহ.- এর মহব্বত অন্তরে বদ্ধমূল ছিল।

হযরত নানুতুবী রহ. যখন হজে যান, তখন তাঁর সঙ্গে বড় বড় উলামায়ে কেরাম ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ হযরত গাঙ্গুহী রহ, হযরত ইয়াকুব সাহেব নানুতুবী রহ.সহ আরো অনেক বড় বড় আকাবির ও বুযুর্গগান ছিলেন। সর্বশেষ মঞ্জিল যার পরে মদীনা তাইয়্যেবা একেবারে সামনে চলে আসত এবং হারাম শরীফের মিনারা দেখা যেত, এ শেষ মঞ্জিলের নাম বিরে আলী। সেখানে একটি পাহাড় রয়েছে। সেখানে আরোহণ করলে হারাম শরীফ দেখা যায়। কাফেলা যখন বিরে আলীতে পৌঁছল আর হারাম শরীফের মিনারা নজরে পড়ল, তখন হযরত নানুতুবী রহ. উট থেকে লাফিয়ে পড়লেন। জুতা খুলে উটের কাজওয়ায় রেখে দিলেন এবং খালি পায়ে চলতে শুরু করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইশক ও মহব্বতে ইশকের কবিতা আবৃতি করতে-করতে ব্যাকুল অবস্থায় খালি মাথায় চলছিলেন। আরবের ছোট ছোট পাথরগুলো নখের মতো ধারালো ছিল। সেগুলো কাঁটায় ন্যায় পায়ে বিঁধছিল। তাঁর পা হতে রক্ত ঝরছিল; কিন্তু তিনি ইশক ও মহব্বতের কারণে নিজ হালতে ছিলেন না। তিনি মাতাল অবস্থায় চলছিলেন।

তাঁর দেখাদেখি অন্যরাও উট থেকে নেমে পায়ে হেঁটে চলতে শুরু করলে হযরত গাঙ্গুহি রহ. বললেন, এ আহম্মকরা কেন নিচে নেমে পায়ে হেঁটে চলছে। হযরত তো ইশক ও মহব্বতে ডুবে আছেন। তাঁর অনুসরণ কতটুকু করতে পারবে। তাই তারা ১০ কদম ২০ কদম কেউ ১০০ কদম অত্রিকম করে থেমে গেছেন এবং উটের উপর আরোহণ করেছেন। কেননা, ধারালো পাথরের উপর চলা খুবই দুষ্কর। কিন্তু যিনি নিজ অবস্থায় নেই, তিনি তো মাজুর, তাঁর তো কোন খবর নেই চাই তার গায়ে তীরের আঘাত লাগুক বা তলোয়ারের আঘাত লাগুক। কিন্তু যার হুশ ও ইন্দ্রিয়শক্তি ঠিকঠাক আছে, সে তো এভাবে চলতে পারবে না। তাই দেখা যায়, কেউ ৫০ কদম কেউ ১০০ কদম চলে বসে পড়েছেন। কিন্তু হযরত মসজিদে হারাম পর্যন্ত পায়ে হেঁটে চলছেন। আর তাঁর পাদ্বয়ে পাথর বিঁধে-বিঁধে রক্তরঞ্জিত হয়ে গেছে। মহব্বতে তিতাও মিষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ মহব্বতের কারণে তিক্ততাও মিষ্টতায় পরিবর্তন হয়ে যায় আর মানুষ তাকে খুশিতে বরণ করে নেয়।

## সুগভীর ভালবাসা

উহুদ যুদ্ধ শুরু হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ পাহাড়ের এক ঘাঁটিতে ৪০ জন তীরন্দাজ মোতায়েন করেন। তাঁদের উপর হুকুম হলো পাহাড়ে বসে থাকার। হুকুম হলো জয়-পরাজয় যা-ই হোক এখান থেকে নড়া যাবে না অনুমতি ছাড়া। সাহাবারা সেখানে বসে আছেন আর এদিকে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। তাঁরা ভাবলেন, শুধু শুধু বসে না থেকে একটা কিছু করলে ভাল হয়। তখন কেউ কেউ বললেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আমাদের আদেশ করেছেন শুধু বসে থাকার জন্য। কতক বললেন, এভাবে বসে থাকার চেয়ে ইবাদতে মশগুল হওয়া ভাল হবে। তাই তাঁরা ভেবে-চিন্তে নফলের নিয়ত করে নফল নামায শুরু করে দিলেন। তারা বিন্যাস করে নিলেন, চারজন নামায পড়বে আর বাকিরা পাহারা দিবে। এ নিয়মে তারা সারা রাত নফল নামায় পড়তে থাকেন।

মক্কার কাফিররা লক্ষ্য করল, সাহাবারা বসে আছে। তারা তাদের উপর তীরবৃষ্টি চালাল। যারা নামাযরত ছিলেন, তাঁরা ছিলেন অগ্রভাগে। তাই তাঁদের কারো গর্দানে, কারো পিঠে, কারো পেটে, কারো বগলে তীর এসে বিদ্ধ হলো। এতে সারা গায়ের কাপড় রক্তাক্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু যারা নামাযরত ছিলেন, তারা কিছুই বুঝতে পারেননি, তারা নামাযেই ডুবে

ছিলেন। তাঁদের না আছে তীরের আঘাতের খবর, না আছে বল্লমের আঘাতের খবর। যখন শেষ রাতে নামায হতে সালাম ফিরিয়ে ফারেগ হলেন, তখন দেখতে পেলেন, তাঁদের জামা ও শরীর রক্তাক্ত। তাঁরা তখন দেখতে পেল তাদের সারা বদন চালনী হয়ে গেছে, তাদের পেটে, পিঠে, বুকে, হাতে ও পায়ে তীর বিদ্ধ হয়ে আছে। তাঁরা জানতে পারলেন, মক্কার মুশরিকরা তীর নিক্ষেপ করেছে।

তাঁদের মহব্বত ও ইশক এত বেশি ছিল যে, তাঁদের তীর-বল্লমের আঘাতের কোন রকম খবর হয়নি। তাঁরা নামাযে ডুবে আছেন। ডুবে আছেন আল্লাহর ইবাদতে। তো এমন হালত হলে মানুষ সকল প্রকার তিক্ততা সইতে পারে। যখন মহব্বত প্রবল হয়, তখন না থাকে আঘাতে পরওয়া, না থাকে তলোয়ার ও বল্লমের আঘাতের পরওয়া। আল্লাহওয়ালাদের হালত এমনই হয়ে থাকে। যখন আল্লাহর মহব্বত ও নবীজীর মহব্বত গালেব হয়, তখন আরাম-আয়েশ কোন কিছুর পরওয়া থাকে না ।

## মহব্বতের পাত্র

ইতিপূর্বে আমি বর্ণনা করেছি, বুনিয়াদী বস্তু হলো মহব্বত আর মহব্বতের পাত্র বা স্থান হলো অন্তর। যখন অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত সৃষ্টি হবে, তখন হাতে, পায়ে এবং সারা দেহে তার আলামত প্রকাশ পাবে। আর নেক কাজও প্রকাশ পাবে। যদি অন্তরে মহব্বত না থাকে, তাহলে ঈমানও আসবে না, আমলও প্রকাশ পাবে না। মুসলিম শুধু নামেই থাকবে, কাজে ইসলাম থাকবে না। যখন দিলে ঈমান থাকবে, তখন কাজেও ইসলাম প্রকাশ পাবে। তাই আমাদের শুধু নামে মুসলিম হলে চলবে না বরং কাজে-কর্মেও মুসলমান হতে হবে। অন্তরে থাকবে মহব্বতের খায়েশ আর হাতে-পায়ে থাকবে আমল। এই আমলই সাক্ষী দিবে, ঈমান এমন একটি বস্তু, যা অন্তরে লুকায়িত আছে।

## মহব্বতের দাবির প্রমাণ

কিয়ামত দিবসে যখন মানুষ মুমিন হওয়ার দাবি করবে, তখন তাদের নিকট হতে দলিল-প্রমাণ তলব করা হবে। কেননা, দাবি দলিল উপস্থাপন ছাড়া গ্রহণযোগ্য হয় না। এ ভিত্তিতে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার ঈমানের প্রমাণ কী? সে বলবে, আমি নামায পড়েছি, রোযা রেখেছি, যাকাত

দিয়েছি, হজ করেছি। এগুলো হলো ঈমানের প্রমাণ। তারপর তার মুক্তি মিলবে। কিন্তু আপনি যদি নিজেকে মুমিন বলে দাবি করেন আর দলিল তলব করা হয়, তখন আপনার যদি নামায, রোযা, যাকাত, হজ্ব কোনটাই না থাকে, তাহলে আপনার দাবি দলিল-প্রমাণ ছাড়া থেকে যাবে। আর এমন দাবি সেখানে গ্রহণযোগ্য হবে না। তার দাবিকে মিথ্যা আখ্যায়িত করা হবে। বলবে, তুমি মিথ্যা বলেছ। তোমার ভিতর ঈমান কোথায়? যদি ঈমান থাকত, তাহলে তার আলামত হাত ও পায়ে প্রকাশ পেত। সুতরাং কোন আলমত যেহেতু প্রকাশ পায়নি, তাই তোমার অন্তরে কিছুই নেই। বিধায় তুমি অনেক বেইজ্জতি হবে এবং বলা হবে, তোমার কৃতকর্মের কারণে তুমি শাস্তি ভোগ করতে থাক। তারপর কিয়ামতের শাস্তি ভোগ করবে, জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। এ জন্যই যখন দাবি করবে, সাথে সাথে দলিলও প্রস্তুত করবে।

আনুগত্য, ইবাদত ও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করা চাই। কবুল করা আর না করা আল্লাহর কাজ। আমাদের কাজ হলো ঈমানের প্রমাণ পেশ করা। আর আমল করে গর্ব না করা যে, আমি এত এত ইবাদত করেছি। বরং বলতে হবে, আমি কিছুই করিনি; যা কিছু করেছি তা সবই আল্লাহর দয়া ও করুণা।

## বড়দের বড় কথা

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব রহ.-এর পিতা হযরত আব্দুর রহীম সাহেব রহ. বড় আল্লাহওয়ালা আলেম ছিলেন। তিনি দিবা-রাত্রি সর্বদা আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে মশগুল থাকতেন। মানুষ তাকে বলল, হযরত আপনি এত কষ্ট কেন উপভোগ করেন, সারারাত যিকির, সারাদিন যিকির; এতো মেহনত কেন করেন? যখন আমরা এ প্রশ্ন পড়লাম, তখন মনে করলাম, হযরত হয়তো এর উত্তর দিবেন যে, আল্লাহ যেন আমার উপর রাজি-খুশি হয়ে যান, তাই ইবাদত করি। কিন্তু তিনি এমন উত্তর দেননি। বরং উত্তর দিলেন অন্য একটি। হযরত এমন উত্তর দিয়েছেন, যেখানে আমাদের যেহেন পৌঁছবে না। তিনি তাঁর মর্যাদা ও শান অনুযায়ী উত্তর দিয়েছেন। কেননা, বড়দের কথা বড়ই হয়। হযরত প্রশ্নকারীদের উত্তর দিলেন, আমি দিন-রাত ইবাদত করি এ জন্য যে আমাকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে ইবাদতের জন্য। অর্থাৎ আমার জীবনের মাকসাদই হলো ইবাদত করা। রাজি হওয়া-না হওয়া আল্লাহর কাজ।

রাজি হওয়া বা নারাজ হওয়া আল্লাহর কাজ। আমরা কে যে, তাঁর কাজে দখল দিব। আমাদের কাজ তো হবে এমন, যে কাজের জন্য আমাদের তৈরি করা হয়েছে। আর আমাদের তো সৃষ্টি করা হয়েছে আনুগত্য ও ইবাদতের জন্য। সুতরাং আমরা আমাদের কাজ করে যাব। যদি তিনি রাজি হন, তাহলে তা তার অনুগ্রহ। আর নারাজ হলে আমাদের কাজ তো এর উপযুক্ত নয় যে, তার দ্বারে আপত্তি জানাতে পারি। তোমরা আল্লাহর কাজে দখল দিয়ো না, শুধু নিজেদের কাজ করতে থাক।

নিজের কাজ কর; অন্যের কাজ করো না। নিজের কাজে লিপ্ত থাক; কবুল করা না করা আল্লাহর কাজ।

## আমল মিশ্রিত মহব্বত

হযরত ইয়াহইহা ইবনে আকসাম রহ. অনেক বড় মাপের আলেম ছিলেন। তাঁর ইন্তিকালের পর কিছু আল্লাহওয়ালা তাঁকে স্বপ্নে দেখেন। আর স্বপ্নটি ছিল কাশ্‌ফ পর্যায়ের। তারা দেখলেন, তিনি আল্লাহর সামনে উপবিষ্ট আছেন। আল্লাহ বললেন, হে ইয়াহইয়া! তুমি আমার জন্য কী নিয়ে এসেছ? তিনি জবাব দিলেন, হে আল্লাহ! আমি ৫৫ বার হজ করেছি। আল্লাহ বললেন, একটিও কবুল হয়নি। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমি ১৫২ বার কুরআন খতম করেছি। আল্লাহ তায়ালা বললেন, একবারও কবুল হয়নি। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমি এতো এতো নামায পড়েছি। আল্লাহ বলেন, আমি একটিও কবুল করিনি। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমি সারা জীবনের আমল উল্লেখ করলাম। আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমি একটিও কবুল করিনি। তুমি বলো কী নিয়ে এসেছ? তিনি অপারগ হয়ে পরিশেষে বললেন, হে আল্লাহ! শুধু তোমার রহমতের অছিলা নিয়ে এসেছি। আর কিছুই নিয়ে আসিনি। আল্লাহ বললেন, এবার তুমি ঠিক বলেছ। আমার রহমত তোমার জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে। যাও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

তাই আমলের সাথে সাথে আল্লাহর রেজামন্দী এবং আল্লাহর রহমতের ভরসা ও আশা রাখা উচিত। আমলের উপর অহংকার ও গর্ব করা উচিৎ নয়। যে আমলের মধ্যে মহব্বত মিশ্রিত না হয় এবং রহমতের আশা না থাকে, এই আমল গ্রহণযোগ্য নয়। এ জন্য আমি আরজ করেছিলাম, আসল বস্তু হলো মহব্বত। তারপর আমলের মর্যাদা। মহব্বতের কারণেই আমল সৃষ্টি হয় এবং আমলই মহব্বতের আলামত। আর আমল দ্বারা জানা যায় অন্তরে মহব্বত আছে কি-না।

## সর্বকালীন সাহচর্য : নববী সুসংবাদ

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন–

مَنْ اَحَبَّنِیْ فَقَدْ اَطَاعَنِیْ وَمَنْ اَطَاعَنِیْ كَانَ مَعِیْ فِی الْجَنَّةِ

যে আমাকে মহব্বত করে, সে আমার অনুগ্রত্য করে এবং আমার সুন্নতসমূহের অনুসরণ করে। আর যে আমার সুন্নাতের অনুসরণ করবে, সে আমার সাথে একসঙ্গে জান্নাতে থাকবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহব্বতকে বুনিয়াদ নির্ধারণ করেছেন যে, আমাকে মহব্বত করার আলমত হলো, সে আমার আনুগত্য করছে। আর আমার আনুগত্য করা আলামত হলো সে জান্নাতে আমার সাথী হবে।

উক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা গেল, মহব্বত তো আসল তবে তার পরিচয়ের আলামত হলো আনুগত্য ও ইত্তেবায়ে সুন্নত। যদি ইত্তেবায়ে সুন্নাত হয়, তাহলে বোঝা যাবে, সে সত্যিকার মহব্বত করে। এ জন্যই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

কোন মানুষ পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমাকে সে তার সন্তানাদি, মাতাপিতা ও সকল মানুষের চেয়ে বেশি মহব্বত করে।

যখন দুই মহব্বতে টক্কর হবে, তখন আমার মহব্বতকে প্রাধান্য দাও। তাহলে বলা হবে কামেল মুমিন। আর মহব্বতই আসল বস্তু।

## মহব্বত ও খায়েশের সংঘাত

এক হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَنْ جِئْتُ بِهٖ

তোমাদের মধ্য হতে কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তার নফসের খায়েশ আমার আনীত শরীয়তের আনুগত্যকারী হবে।

একদিকে শরীয়ত আর অপরদিকে নফসের খায়েশ। যদি নফসের খায়েশকে প্রাধান্য দেয়া হয়, তাহলে বলা হবে, সে খায়েশের গোলাম। আল্লাহর গোলাম নয়। কেননা, সে নিজের খায়েশকে আল্লাহর মর্জির উপর প্রাধান্য দিয়েছে; তাই সে নফসের খায়েশের অনুসারী। যদি আল্লাহর মর্জির অনুসারী হতো, তাহলে আল্লাহর মর্জিকে প্রাধান্য দিত। তাই তো নবীজী বলেছেন, সে প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না। আল্লাহর শরীয়তের অনুসারী হওয়া উচিত। যা কিছু করবে অনুগত থেকে করবে। নামায পড়লে আনুগত্যের সাথে পড়বে, রোযা আদায় করলে আনুগত্যের সাথে করবে। শয়ন ও জাগরণ সবই আনুগত্যের সাথে করবে। পানাহারও আনুগত্যের সাথে করবে।

মোটকথা, সারা জীবনে শুধু আনুগত্য আর আনুগত্য। যখনই তার ঈমানে পূর্ণতা হাসিল হবে, তখনই তাকে কামেল মুমিন বলা হবে।

## গোনাহের আত্মপ্রকাশ এবং মহব্বতের দবি

মানুষ হিসেবে তাদের গোনাহ হতে পারে। গোনাহ থেকে বিরত থাকতে পারে একমাত্র নবী-রাসূলগণ। তারা গোনাহ হতে মাসুম। আমরা তো দিনে-রাতে হাজারো গোনাহে লিপ্ত থাকি এবং অবশ্যই গোনাহ হয়ে যাবে। সাথে সাথে তাওবা করে নিবে। তাহলে শরীয়তের অনুসরণে কোন বিঘ্নতা সৃষ্টি হবে না। পুনরায় শরীয়তের ইত্তেবা করতে থাকবে।

আবার গোনাহ হয়ে গেলে এই বলে তাওবা করে নিবে। হে আল্লাহ! আমি আর গোনাহ করব না বলে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হবে। তারপর পুনরায় শরীয়তের কর্মে লিপ্ত হবে। ইত্তেবায়ে সুন্নতের অর্থ কখনও এমন নয় যে, তার থেকে কোন সময় গোনাহ প্রকাশ পাবে না, কখনও ভুল হবে না। গোনাহ না হওয়ার শান নবী-রাসূলগণের। আর আমাদের থেকে গোনাহ প্রকাশও পায় আবার আমরা গোনাহের কাজও করি। কিন্তু তার সমাধান হলো গোনাহ প্রকাশ হওয়ার সাথে তাওবা করে নেয়া। তাই হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

গোনাহ থেকে তাওবাকারী ব্যক্তি এমন যেন সে গোনাই করেনি।

তাওবা করার সাথে সাথে তার আমলনামা পরিষ্কার হয়ে যায়। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি গোনাহের পর তাওবা করে, তার গোনাহ

অবশিষ্ট থাকে না। এ কারণে যখনই গোনাহ হয়ে পড়ে, তখনই সাথে সাথে তাওবা করে পবিত্র হয়ে যাও। এ কাজ মুমিনের শান এবং পূর্ণ মহব্বত ও ঈমানের শান। সুতরাং দু'আ করবেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন তাঁর রেজামন্দি নসীব করেন এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর্য দান করেন ও নিজের নেককার বান্দাদের মাঝে শামিল করে নেন। আর আমাদের সবাইকে পূর্ণ ঈমানের সাথে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার তাওফিক দান করেন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

# বয়ান : ৭

## আধুনিক শিক্ষা

কলেজ-ভার্সিটিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা বলতে যা বোঝায়, তা হলো জাগতিক শিক্ষা। এগুলোই তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা। তবে এগুলোর সর্বশেষ মাকসাদ হলো আল্লাহর মারেফাত বা পরিচয় লাভ। শুধু আরাম ও বিলাসিতার জন্য ইসলাম ঐ জাগতিক বস্তুগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করেনি। কারণ, আরাম ও ভোগ-বিলাসিতা কোন স্থায়ী বস্তু নয়, বরং কয়েক দিনের উপভোগমাত্র। মানুষ দুনিয়াতে এসেছে একজন মুসাফির সেজে। তাকে পাড়ি দিতে হবে একটি স্থায়ী মঞ্জিলে মাকসাদ পর্যন্ত। এখন সে যদি তার আসল মঞ্জিলকে খুইয়ে ফেলে, তাহলে সে জগতের হাকিকত বোঝেনি, জগতটা তো হলো আসল মঞ্জিলে পৌঁছার মাধ্যম। আর রাস্তায় চলতে যেহেতু রাস্তার পরিস্থিতি, খানা-খন্দ, বাধা-বিঘ্ন জানা থাকা আবশ্যক হয়, অন্যথায় গন্তব্যে পৌঁছা সম্ভব হয় না, এ জন্য দুনিয়ার বিস্ময়কর বস্তুগুলো দেখা এবং বোঝা উভয়টাই আবশ্যক। আর এটি এমন পথ, যার উপর চলে মানুষ নিজ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর মারেফাত লাভ করতে সক্ষম হয়।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.



اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ. وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ• اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا وَ مِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيْضٌ وَّ حُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَ غَرَابِيْبُ سُوْدٌ○ وَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَآبِّ وَ الْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ○

## অপার আনন্দ

সম্মানিত সুধী! আমার ইচ্ছা ছিল, শুধু কলেজে নির্মাণাধীন নতুন বিল্ডিং পরিদর্শন করে আনন্দ প্রকাশ করা। শুধু এ উদ্দেশ্যেই উপস্থিত হয়েছিলাম। মাহফিলের কল্পনা এবং সেখানে বয়ান করার ধারণা মনে কখনও উদয় হয়নি। এখন যেহেতু মাহফিলের ব্যবস্থা হয়ে গেছে, তো মাহফিলের প্রয়োজন কিছু না কিছু পূরণ করতে হয়। আর দায়িত্বশীলগণ নিজের মহব্বত ও ইখলাস দ্বারা যে ব্যবস্থাপনা করেছেন, তার সম্মান তো অবশ্যই করতে হয়।

বাস্তবতা হলো, কলেজের নতুন বিল্ডিংয়ে উপস্থিত হয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আবার এতে মতানৈক্যপূর্ণ মুসলমানদের ঐক্যের আশা ও উৎসাহ প্রকাশ পেয়েছে। তাতেও অত্যন্ত খুশি হলাম।

## অদৃশ্য নির্মাণের নিদর্শন

প্রকাশ্য নির্মাণ, যা ইট-পাথর দ্বারা, বালু-সিমেন্ট মিশিয়ে করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতার প্রতি লক্ষ করলে দেখা যাবে, তা দ্বারা ইলমের ভিত্তি রাখা হয়েছে। আর এ নির্মাণ প্রকৃতপক্ষে ইলমের নির্মাণ। শিক্ষাগৃহ নির্মাণ বাস্তবে ইলমের জন্য হয়। তাই বাহ্যিক নির্মাণ মূলত অদৃশ্য নির্মাণের নিদর্শন, যা তার ভিতর কার্যকর করা হয়। বাহ্যিক নির্মাণ দ্বারা ডাইস ও ছক গঠন করা হয় আর অদৃশ্য নির্মাণ দ্বারা অন্তর গঠন করা হয়। এ প্রকাশ্য গঠনে মানবিক চরিত্র ও উৎসাহ উদ্দীপনা শুদ্ধ করা হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি সুন্দর উদ্যোগ ও মহৎ ও বরকতময় কর্ম।

## ইলমের প্রকারভেদ

হযরত ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, ইলম বা জ্ঞান দুই প্রকার। দীনি ইলম ও শারীরিক ইলম। অর্থাৎ আল্লাহপ্রদত্ত ইলম দু-রকম। একটি দীনি ইলম, যাকে ইলমে শরীয়ত বলে। আর অপরটি দেহসম্পর্কিত ইলম, যার সম্পর্ক মানবদেহের প্রকাশ্যমান অঙ্গগুলোর সাথে এবং সেগুলোর রোগ-ব্যাধির সাথে। কিন্তু বাস্তবে দুটো ইলমই শরীয়তের অংশ। ইসলামী শরীয়ত যেমনভাবে শরীয়ত ও দীনি ইলমের প্রতি তাওয়াজ্জুহ (মনোযোগ) করে, তেমনিভাবে শারীরিক ও জীবন-যাপনের প্রয়োজনীয় ইলমের প্রতিও। উদাহরণস্বরূপ সাইন্স, দর্শন ইত্যাদির প্রতি তাওয়াজ্জুহ করে থাকে।

পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, দীনি ইলম হলো আসল লক্ষ্য আর শারীরিক ইলম হলো তার উছিলা বা মাধ্যম। তবে উভয় ইলমের উদ্দেশ্য অভিন্ন। অর্থাৎ আল্লাহর মারেফাত বা পরিচয়। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

رَأْسُ الْعِلْمِ مَعْرِفَةُ اللهِ

ইলমের মূল হলো আল্লাহর মারেফাত।

অর্থাৎ– ইলমের মূল বস্তু ও নির্যাস হলো আল্লাহর পরিচয়।

কবি বলেন–

যে ইলম সত্যপথ প্রদর্শন করে না, বাস্তবে তা মূর্খতা। এমন ইলমকে রূপকার্থে ইলম বলা যায়; কিন্তু প্রকৃত ইলম বলা যায় না।

## দীনি ইলমের পাশাপাশি জাগতিক ইলমের প্রয়োজনীয়তা

যেমনি হাকিকতের ইলম অর্জন আবশ্যক, তেমনিভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক, জাগতিক, ভৌগোলিক ইত্যাদি ইলমসমূহকে অর্জন করা আবশ্যক। যেগুলোকে বর্তমানে সাইন্স, দর্শন, কলা, গণিত, জ্যোতিষ ইত্যাদি নামে পরিচিত। আর কুরআনুল কারীমে যে আয়াত রয়েছে– انما يخشى الله من عباده العلماء একে এ অর্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা যে আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করে। অর্থাৎ ডর-ভয় তাদেরই অন্তরে। এখানে উলামা দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু ফিকাহবিদ আলেমগণই নন, যারা জায়েয-নাজায়েয, হালাল-হারামের মাসয়ালা বিষয়ে ওয়াকিফহাল, বরং কুরআনের সেই নিদর্শনসমূহেও জ্ঞাত হতে হবে, যা জীবন যাপনের প্রয়োজনে দরকার হয়। কুরআনে তারকা, গ্রহ, উপগ্রহের আলোচনা রয়েছে। ভূমিতে গোপন খনিজ সম্পদের আলোচনাও রয়েছে। রয়েছে মধ্য আকাশের আলোচনা এবং বিভিন্ন স্থানে সেগুলোর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

## সুরক্ষিত ও শক্তিশালী নেযামের সাক্ষ্য

প্রকৃতপক্ষে ঐ সবের উদ্দেশ্য হলো, মারেফাতে ইলাহী বা আল্লাহর পরিচয়। কেননা, নিদর্শন দেখে নিদর্শনওয়ালার পরিচয় জানা যায়। কোথাও ধোঁয়া দেখলে বোঝা যায়, সেখানে আগুন রয়েছে, অন্যথায় ধোঁয়া থাকত না। কোথাও আর্দ্রতা, শীতলতা অনুভব হলে মনে বিশ্বাস জাগে, নিকটে কোথাও নদী-নালা আছে, অন্যথায় শীতলতা অনুভব হতো না। তো নিদর্শন দেখে, নিদর্শনওয়ালার পরিচয় নিরুপণ করা যায়। এ জগতের সুরক্ষিত নেযাম এবং বিস্ময়কর ও বিরল ইন্তিজাম দেখে অন্তর নিজে নিজে সাক্ষী হয় এবং সাক্ষ্য দেয়, অনেক বড় একজন কারিগর ও হাকিম রয়েছেন, যিনি এ বিশ্বজগতের নেযাম নির্মাণ করেছেন এবং এ বিস্ময়কর কুদরত প্রদর্শন করেছেন। এ শুধু প্রাকৃতি ও তার নড়াচড়ার নাম নয়। কেননা, মাদ্দা নিজেই অন্ধ ও বধির; তার তো নিজেরই খবর নেই; অন্যের খবর রাখবে কিভাবে।

তাই সুস্পষ্ট কথা হলো, একটি অন্ধ বধির ও বিকলাঙ্গ বস্তু কোন সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় নেযাম তৈরি করতে সক্ষম নয়। আর মাদ্দার হরকতও এমন যে, তা হরকতকারী ব্যতীত সংগঠিত হতে পারে না। হরকত একটি সিফাত বা বিশেষণমাত্র। তা বিশেষিত ছাড়া হয় না। যদি জাত-সত্তা বিদ্যমান না হয়, তাহলে সিফাত অর্থাৎ নড়াচড়া পাওয়া যাবে না। আর মাদ্দা যেহেতু বিকলাঙ্গ ও জড়বস্তু, তাই নড়াচড়া সম্পর্ক যদি মাদ্দার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, তাহলে বিস্ময়কর বস্তু ও পৃথিবীর নেযামে নতুন নতুন বস্তুর সৃষ্টি হতো না। যতক্ষণ তাতে আল্লাহর ইলম ও তাঁর কুদরত শামিল না হয়। বিস্ময়কর বস্তুর প্রতি কুরআ'নে ইঙ্গিত করেছে। যেমন আধ্যাত্মিক বিস্ময়কর বস্তু, যেগুলোকে হাকিকত বিশেষজ্ঞ আরেফ বিল্লাহগণ প্রকাশ করেছেন এবং মারেফাত ও অন্তরদৃষ্টি দ্বারা আল্লাহর জাতের সন্ধান করেছেন।

## পূর্ববর্তীদের ফাউন্ডেশনের ওপর পরবর্তীদের নির্মাণ

এমনিভাবে মাদ্দিয়াতের (প্রকৃতির) মধ্যেও বিস্ময়কর বস্তু রাখা হয়েছে, যা আস্তে-আস্তে প্রকাশ পায় আর প্রকাশিত হচ্ছেও। যেমন– কুরআনে বিস্ময়কর বিষয়গুলো নবুওয়াতের সময়কালে প্রকাশ পেয়েছে। এগুলো উসূলের মর্যাদা রাখে। সেগুলোর জটিলতা নিরসন করেছেন সাহাবায়ে কেরাম। তারপর তাবেঈগণ। পরবর্তীতে এতে শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি হয়েছে। তাবেঈদের পর তাবেঈ তাবেঈনগণ সেদিকে মনোযোগ দিয়েছেন এবং সেই বিস্ময়কর বস্তু থেকে ইলমী বিস্ময়কর বস্তু বের করেছেন। এ সম্পর্কে বহু পা-ুলিপি প্রকাশ পেয়েছে। ভূমি থেকে মধ্য আকাশে এবং আকাশসমূহ পর্যন্ত। আর ভূমির গভীরে এবং আকাশের উচ্চতায় কুদরতি বিস্ময়কর বস্তুগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। দ্বিতীয় প্রকার আয়াতসমূহে হাকিকতে এলাহীর বর্ণনা করা হয়েছে এবং তৃতীয় প্রকার আয়াতসমূহে আল্লাহর বিধানাবলির বর্ণনা করা হয়েছে। আর চতুর্থ প্রকার আয়াতসমূহে কিসসা, নসিহত এবং দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে, নসিহত লাভ করে।

## শরীয়তের হাকিকত ও জগতের বিস্ময়কর বস্তুসমূহে পরস্পর সম্পর্ক

উদ্দেশ্য হলো এমন যে, কোন স্কুল ও কলেজে শুধু এক ধরনের বিষয় থাকা যথেষ্ট নয়। কেননা, ইসলামী শরীয়ত এবং তার হাকিকতের সম্পর্ক

বিশ্বজগতের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যদি কুদরতের বিস্ময়কর বস্তু দেখে মনোনিবেশ না করা হয়, তাহলে তা দ্বারা এটা উদ্দেশ্য হয় যে, আমরা দ্বিতীয় প্রকারের আয়াতগুলো বুঝতে পারব না, যেগুলোতে প্রাকৃতিক জগতের প্রতি মনোনিবেশ করা হয়েছে। আর উলামায়ে কেরাম এগুলো পর্যবেক্ষণ করেছেন। দীনি ও শারীরিক ইলম প্রতিটিতে বিভিন্ন দিক রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দেহের বিবিন্ন ধরনের প্রয়োজন রয়েছে। সবগুলো মিলে একটি ইলমের রূপ ধারণ করেছে। যদি দেহে কোন অসুস্থতা দেখা দেয়, তাহলে তার চিকিৎসার নিয়ম-পদ্ধতি কী হবে? তার জন্য ইলমে তিব বা ডাক্তারি বিদ্যা রয়েছে, যা দ্বারা আসল দেহের চিকিৎসা করা হয়। যদি তা সুস্থ না হয়, তাহলে দেহ যে আধ্যাত্মিক ভ্রমণ করেছে, তা করতে পারবে না। কারণ, ভ্রমণের জন্য দেহ হলো বাহনস্বরূপ। যদি বাহন চলতে না পারে, তাহলে শরয়ী কর্মগুলোও সমাপ্ত করা যাবে না, সম্পাদন করা যাবে না, যাতে ঐ ইলমসমূহকে সংকলন করা হয়েছে যার মধ্যে বিস্ময়কর বস্তুগুলো ও হাকিকতে ইলাহী ছিল। এমনিভাবে বিশ্বজগত সম্পর্কে পূর্বপুরুষদের সাদাসিধা বিশ্লেষণ ছিল। এ সাদাসিধা গবেষণার উপর পরবর্তীগণ আরো উন্নতি সাধন করেছেন, যেগুলোর ভিতর থেকে আরো বিস্ময়কর বস্তু বের করেছেন। আস্তে আস্তে যুগ ও শতাব্দি অতিবাহিত হওয়ার পর এখন তাতে এত পরিমাণ শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি হয়েছে যে, মানুষ এখন শুধু ভূমিতে নেই বরং মধ্য আকাশে ভ্রমণ করছে। পরবর্তীতে মধ্য আকাশ পাড়ি দিয়ে আকাশের নিকটবর্তী হয়ে গেছে। এমনকি চাঁদের দেশেও পা রেখেছে। তো মধ্য আকাশের বিস্ময়কর বস্তগুলো কুরআনের আলোকে সুস্পষ্ট। এত কিছু করতে সম্ভব হয়েছে পূর্বপুরষদের বিশ্লেষণ ও গবেষণার ভিত্তির উপর ভর করে। যদি পূর্বে বুনিয়াদ বা ভিত্তি রাখা না হতো, তাহলে পরবর্তীতে নির্মাণ করা সম্ভব হতো না। যেমনভাবে আল্লাহর হাকিকত সম্পর্কেও পূর্বপুরুষরা বুনিয়াদ রেখেছিলেন। তাতে পরবর্তীরা নির্মাণ করেছেন। ফলে নতুন-নতুন হাকিকত প্রকাশ পেয়েছে।

এমনিভাবে প্রাকৃতিক হাকিকতের ব্যাপারে যা কিছু হয়েছে ও হবে, এগুলোও মূলত পূর্বপুরুষদের উছিলা ও দান এবং তাদের চিন্তা-গবেষণার ফসল। তাঁরাই বুনিয়াদ কায়েম করেছিলেন। আর আমরা তাতে শুধু ওয়াল দাঁড় করিয়েছি এবং ছাদ তৈরি করেছি। তারপর একতলা, দোতলা ও তিনতলা নির্মাণ করেছি। যদি তাঁরা বুনিয়াদ না রাখতেন, তাহলে আজও এ নির্মাণ সম্ভব হতো না।

## উভয় ইলমের মূল বিষয়বস্তু

উপরের আলোচনা দ্বারা বোঝা যায়, উভয় ইলমের আসল উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভ। আর ঐ সকল নিদর্শনাবলি ও প্রতিক্রিয়াগুলো প্রমাণ করে হাকিকী প্রতিক্রিয়াশীল আল্লাহর মারেফাতের উপর। ফলে তার প্রতি ধাবিত হয় এবং তার নিয়মানুযায়ী চলে। এ জন্য কুরআন শরীফে প্রায় ২ শত আয়াত নাযিল হয়েছে বিশ্বজগতের বিস্ময়কর বস্তুগুলোর বর্ণনা নিয়ে। তারপর ডাক্তারি বিদ্যার মধ্যে হাজারো হাকিকত রয়েছে, যা মানুষসৃষ্টি সম্পর্কিত। কিভাবে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে, আল্লাহর কোন বিস্ময়কর বস্তু থেকে তাদেরকে প্রকাশ করেছেন এ সমস্ত বিষয় সামনে না থাকলে শরীয়তের অনেক হাকিকত প্রকাশ পাবে না, যেগুলোর ভিত্তি এ ডাক্তারি বিদ্যার বিশ্লেষণ প্রকাশ করার উপর। মানুষের সর্বপ্রথম দেহের জন্য যে জিনিস প্রয়োজন, তাহলো তা সুস্থতা ও শুদ্ধতা। আর তা ইলমে তিবের উপর নির্ভরশীল। তাই দেহের জন্য ইলমে তিব জরুরি।

এ ইলমে তিব নবী-রাসূলদের উপরও নাযিল হয়েছে। ওহীর মাধ্যমে এগুলোর উসূল, নিয়ম-কানুন বর্ণিত হয়েছে। তারপর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা সেগুলোকে আরো প্রসারিত করেছেন। তেমনি দেহের অন্যান্য অঙ্গগুলো উদাহরণস্বরূপ দেহ আবৃত করার কাহিনী। তার জন্য কাপড় বুনন করা ও তৈরি করা। তেমনিভাবে বাড়ির ফার্নিচার, যা মানুষের অনেক প্রয়োজন হয়। খাওয়ায়, পান করায় ও বসবাসে। বাড়ি প্রস্তুত করা সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে ঐ সমস্ত বিষয়াবলির প্রতি মনোনিবেশ করেছে। আর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দানসমূহের মধ্য বাসস্থানকে গণ্য করে ইরশাদ করেছেন–

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَ مِنْ اَصْوَافِهَا وَ اَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّ مَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ○

আল্লাহ তায়ালা করে দিয়েছেন তোমাদের গৃহকে বাসস্থানের জায়গা এবং চতুষ্পদ প্রাণীর চামড়া দ্বারা করেছেন তোমাদের তাঁবুর ব্যবস্থা। তোমরা এগুলোকে সফরকালে ও অবস্থানকালে পাও। ভেড়ার পশম, উটের চুল ও ছাগলের লোম দ্বারা কত আসবাব ও ব্যবহারসামগ্রী তৈরি করেছেন এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।

অর্থাৎ কাপড়ের ঘর, ইট-পাথরের ঘর, পাহাড়ের ঘর দেয়া হয়েছে, যাতে তোমরা তাতে শান্তিতে বসবাস করতে পার। এমনিভাবে আল-কুরআনে প্রতিটি বস্তুর কথা আলোচনা হয়েছে। আহার ও পানের বস্তু হোক, চাই পোশাক হোক। জীবন যাপনের নিয়মাবলি ও সুস্থ-অসুস্থসহ আরো অনেক বস্তু ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। আর প্রতিটি বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন আলোচ্য বিষয় রয়েছে। সেগুলোর আহকামও ভিন্ন ভিন্ন। আবার সেগুলোর প্রাসঙ্গিক বিষয়ও ভিন্ন ভিন্ন। অবস্থানও ভিন্ন ভিন্ন। তো কলেজের মধ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা বলতে জগতবিষয়ক শিক্ষাকে বোঝায়। তবে সাথে সাথে আরো প্রয়োজন যে তার সর্বশেষ উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর মারেফাত। ইসলাম ঐ সকল বস্তুর প্রতি মনোনিবেশ করেছে শুধু আরাম-আয়েশের জন্য নয়। কেননা, আরাম-আয়েশ কোন স্থায়ী বস্তু নয়, বরং অস্থায়ী; শুধু কয়েক দিনের জন্য।

## মঞ্জিলে মাকসুদ ও এই বিশ্বজগতের হাকিকত

মানুষ দুনিয়ায় এসেছে মুসাফিরের ন্যায়। তাকে এক দিন আসল মঞ্জিল পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। যদি সে আসল মঞ্জিল নষ্ট করে ফেলে, তাহলে বুঝতে হবে, সে বিশ্বজগতের হাকিকত বোঝেনি। দুনিয়াটা হলো রাস্তা ও মহাসড়ক। আর রাস্তায় চলতে তার উঁচু-নিচু, পাহাড়-পর্বত জানা থাকা জরুরি; তাছাড়া মানুষ রাস্তায় চলতে পারবে না, মঞ্জিলে মাকসুদে পৌঁছতে পারবে না। এ কারণেই দুনিয়ার বিস্ময়কর বস্তুগুলো দেখা, জানা ও বোঝা জরুরি। কারণ, এটি সেই রাস্তা, যার উপর দিয়ে চলে মানুষ তাঁর আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে পারে। তো আমাদের জন্য পরকালে যা কিছু রয়েছে, সেগুলো দুনিয়া থেকেই তৈরি হয়, অর্জন হয়। এমন মনে করা ভুল যে, আখেরাতের বাসস্থান ভিন্ন, দুনিয়ার বাসস্থান ভিন্ন। বরং এই দুনিয়া থেকেই আখেরাত বের হয় এবঙ দুনিয়া হতেই এমন আমলের সৃষ্টি হয়, যা দ্বারা মানুষ নিজ সৃষ্টিকর্তা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। উদাহরণস্বরূপ সম্পদ উপার্জন করবে। আর সম্পদ দ্বারা যাকাত-সদকা দেবে এবং অন্যান্য ভাল কর্মগুলো সমাধান করবে। তো ধন-সম্পদ থেকে তার আখেরাত বের হলো। যদি সম্পদ না থাকত, তাহলে আখেরাতের বাসস্থান কিভাবে নির্মাণ হতো?

এমনিভাবে অন্যান্য জিনিসও। যেমন– দেহের সুস্থতা। যদি দেহ সুস্থ না থাকে, তাহলে আখেরাতের কর্মগুলো কিভাবে সম্পাদন হবে? এ কারণে

দুনিয়াকে আখেরাতের মহাসড়ক বলা হয়েছে। তাই দুনিয়ার রাস্তার উঁচু-নিচু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া জরুরি এবং বাসস্থানের নিয়ম-কানুন জানাও আবশ্যক।

## মনুষ্যত্বের সর্বপ্রথম বুনিয়াদ

বিল্ডিং তৈরি হয় মানুষের জন্য আর মানুষ তৈরি হয় চরিত্র দ্বারা। যতক্ষণ তার কীর্তি-কর্ম, চাল-চলন ভাল না হবে, উন্নত না হবে এবং তার চারিত্রিক হালত উন্নত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মানুষ হতে পারবে না। মানুষ ভাল ও সুন্দর কাপড়ের নাম নয়। মানুষ ভাল কীর্তির নাম, সুন্দর চালচলনের নাম। সর্বপ্রথম বস্তু হলো মনুষ্যত্ব। আর মনুষ্যত্বের সর্বপ্রথম ভিত্তি হলো প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। অর্থাৎ সবাই ভাই ভাই হিসেবে বসবাস করবে এবং মানুষ একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। একে অপরের কল্যাণ কামনায় প্রস্তুত থাকবে। তাদের মধ্যে ত্যাগ ও কুরবানীর মানসিকতা থাকবে যে, আমি নিজে কষ্ট সহ্য করব; কিন্তু আমার ভাইকে কষ্টের ভিতর ফেলব না। অন্যকে কষ্টে ফেলে নিজে আরাম করা মনুষ্যত্বের গুণ নয়। আবার এমনটি বাস্তবে আরাম নয় বরং তার নাম মতলব বা স্বার্থপরতা।

## মারেফাতে ইলাহী

উল্লিখিত সকল বিষয়াবলির উদ্দেশ্য হলো মারেফাতে ইলাহী আর মারেফাতে ইলাহী অর্জনই হতে পারে না যতক্ষণ না মারেফাতে নাফস হয়, সে নিজেকে চিন্তা না পারে। এ সম্পর্কে সুফিয়ায়ে কেরামদের প্রসিদ্ধ বাণী রয়েছে–

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

যে নিজেকে চিনতে পারল, সে তার প্রভুকে চিনতে পারল।

অর্থাৎ– যে ব্যক্তি নিজের আত্মাকে চিনতে পেরেছে, তার আল্লাহ তায়ালার মারেফাত হাসিল হবে। এ বিষয়ে একটি ভিন্ন ইলম বিদ্যমান রয়েছে, যাকে ইলমুন নাফস বা আত্মার জ্ঞান বলে, যা দ্বারা আত্মার উত্থান-পতন, উর্ধ্ব-নিম্ন ইত্যাদির পরিচয় লাভ হয়। ফলে জানা যায়, কী-কী বস্তু নফসের ভিতর গোপন রয়েছে। ঐ ইলম দ্বারা নফসের দুর্বলতাসমূহ ও মানুষের স্বভাব ও তবিয়ত বুঝতে সহজ হয়। এ জন্য ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলো অর্জই করা উপকারী। যদি দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক হয় এবং কোন ইলম ও বিষয়বস্তুকে উসূল বানাতে কোন প্রকার ফাসাদ সৃষ্টি না হয়, তাহলে সেই ইলমকে কাজে

লাগানো যায়।

তাই মুসলমানদের জানা উচিত, তারা সেই ইলমগুলো অর্জই করবে এবং আসল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ঐ ইলমকে আসল উদ্দেশ্যে পৌছার মাধ্যম বানাবে।

## সম্মিলিত উদ্যোগ

অনেক আনন্দিত ও খুশি হলাম এ কথা ভেবে যে, মুসলমানদের ঐক্য ও নিজেদের হিম্মত ও আসবাবের প্রশস্ততা এত বড় একটি নির্মাণ কায়েম করতে পেরেছে। এতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, তারা নিজেদের আধ্যাত্মিক নির্মাণও উন্নত দেখতে চায়। নিয়ে যেতে চায় মনুষ্যত্ব ও ইলমের নির্মাণকে অনেক উর্ধ্বে। আল্লাহ তায়ালা যেন তাদের প্রতিজ্ঞাসমূহে বরকত দান করেন। আমীন। আর তাদের যা-যা উদ্দেশ্য রয়েছে, সেগুলোকে পূরণ করেন। এ প্রতিষ্ঠান দ্বারা শুধু চুক্তিবদ্ধ লোকদের নয় বরং তার আশপাশের এলাকার সমস্ত মানুষদের তাওফিক দান করেন, যেন তারাও তা থেকে লাভ হতে পারে। আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাধারণত সবার জন্য উন্মুক্ত হয়ে থাকে। ইলম বা জ্ঞান নির্দিষ্ট জাতি, গোষ্ঠীর জন্য মিরাসী সম্পদ নয় বরং সকল মানুষের জন্য একটি সম্মিলিত পুঁজি। মুসলিম হোক, অমুসলিম হোক যে কোন ধর্মের হোক না কেন ইলম সকলের জন্য সম্মিলিত সম্পদ।

কোন স্কুল, কলেজ তো এ জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তা দ্বারা আদম সন্তানের উপকার হবে। চাই সে যে কোন জাতি-গোষ্ঠীর লোক হোক। তাই আনন্দের বিষয় হলো, ঐক্যবদ্ধভাবে এমন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমার মেধায় যতটুকু এসেছে, তা থেকে এতটুকু বলতে পারি যে, তার প্রতিষ্ঠা কোন জাতি-গোষ্ঠীর সাথে খাস নয় বরং ধর্ম, জাতি, বর্ণ ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য সমান উপকারী হবে। আর তার প্রয়োজনও রয়েছে। দু'আ করি, যেন আল্লাহ তায়ালা তাদের মাকসাদে হাসনাহ (সৎ উদ্দেশ্যগুলো) পূরণ করেন এবং তারা তাতে সফলকাম হতে পারেন। আমীন।

## শাহের সাহচর্য

পরিশেষে আমি কলেজের দায়িত্বশীলদের কৃতজ্ঞতা আদায় করছি, তারা আমার মতো নগণ্যকে স্মরণ করেছেন। আমার পরিচয় তো শুধু এতটুকু যে, আমি দারুল উলুমের একজন ছাত্র। এছাড়া আমার কোন ভিত্তি নেই, নেই

কোন পরিচয়। যদি কোন কাজের কাজ হয়, তাহলে তা বাস্তবে আকাবিরদের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও বুযুর্গদের তাসিরের কারণে।

তো বাস্তবতা হলো, আমাদের ব্যক্তিগত কোন ইজ্জত নেই। তবে বড়দের একটি জামাত, যারা বুযুর্গ ছিলেন, তাদের ব্যক্তিত্ব ছিল অনেক উঁচু মাপের। তাঁদের অনুসরণ ও নেসবত অনেক বড় মূল্যমান বস্তু। আর অণুর তো কোন গ্রহণযোগ্যতাই নেই।

## নেসবতের আযমত

কিন্তু এর নেসবত যেহেতু সূর্যের সাথে আর এ নেসবত অনেক বড় নেসবত, তাই তার অনেক মর্যাদা রয়েছে। আমি বলে থাকি–

'বুযুর্গদের সাথে নেসবত অনেক দামি বস্তু, এতে সূর্যের অণু নিচে নেমে আসে।'

আমরা তো নিম্নমানের বস্তু, নগণ্য বস্তু। কিন্তু নেসবত অনেক বড় দামি বস্তুর সাথে। কেউ যদি নেসবতের পরিধিতে প্রবেশ করে, তাকে বড় দেখা যাবে; কিন্তু মূলত বড়ত্ব বুযুর্গদের। আমাদের নিজস্ব কোন বড়ত্ব নেই। মুখলিস বুযুর্গদের একটি জামাত, যারা সত্যবাদী ছিলেন তাদের সততা আজও পর্যন্ত চলে আসছে। ইখলাস দ্বারা যে রূহ তারা নিক্ষেপ করেছেন, তা এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, তার চমক ও আলোতে যারাই এসেছে, তারাই আলোকিত হয়েছেন। যার ফলে ইলমওয়ালা, ইজ্জতওয়ালা ও কামালওয়ালা তৈরি হয়েছে।

তো আমাদের এ পরিচয় ছাড়া অন্য কোন পরিচয় নেই শুধু দারুল উলুম দেওবন্দ এবং সেখানকার বুযুর্গদের নেসবত ছাড়া। আজ আপনারা যতটুকু সম্মান-মর্যাদা প্রদান করেছেন, তা মূলত তাদেরই দিয়েছেন। আমি তো শুধু একটা মাধ্যম মাত্র। আমি তো বুঝি, এ সম্মান ঐ বুযুর্গদের প্রতি যাচ্ছে। যা কিছু ভাল ও উঁচুমাপের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর মাধ্যম প্রয়োজন। আর আমার মাধ্যমে ঐ কথাগুলো তাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে।

পরিশেষে আবারও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, আপনারা আমাকে স্মরণ করেছেন এবং নিজের কিছু ধ্যান-ধারণা ব্যক্ত করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

# বয়ান : ৮

## সৌভাগ্যের মারকাজ

এককালে দারুল উলুম দেওবন্দের অবস্থা এমন ছিল যে, মুহতামিম থেকে শুরু করে দারোয়ান পর্যন্ত সবাই আহলে নেসবত আল্লাহওয়ালা ছিলেন। হাজী আবদুল্লাহ সাহেব রহ. নামে একজন দারোয়ান ছিলেন। তিনি লেখাপড়া কিছুই জানতেন না; কিন্তু সাহেবে নেসবত বুযুর্গ ছিলেন।

দারুল উলুমে সুবহে সাদিকের সময় ঘণ্টা বাজানো হতো আর ঘণ্টা বাজানোর দায়িত্ব জনাব হাজী আবদুল্লাহ সাহেব রহ.-এর উপর ছিল। তিনি প্রথম বাড়িটা দেওয়ার সময় সুবহানাল্লাহ বলতেন। দ্বিতীয়টার সময় আলহামদুলিল্লাহ, তৃতীয়টার সময় আল্লাহু আকবার-এর ধ্বনি তুলতেন। তারপর নিম্নের শেরটি এক আজিব ভঙ্গিতে আবৃত্তি করতেন–

یہ چمن یونہی رہیگا اور ہزاروں بلبلیں :: اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی

এ বাগান এখানেই থাকবে, আর হাজারো বুলবুল নিজ নিজ গান গেয়ে উড়ে চলে যাবে আপন ঠিকানায়।

এ শেরে এমন দৃশ্যের অবতারণা হতো যে, যে-ই শুনত, সে-ই অজ্ঞাতে কেঁদে ফেলত।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.



اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ. وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا.

اَمَّا بَعْدُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْهُوْمَانِ لَا يَشْبَعَانِ: مَنْهُوْمٌ فِي الْعِلْمِ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ وَمَنْهُوْمٌ فِي الدُّنْيَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَا.

## শুরুর কথা

সম্মানিত উপস্থিতি, সম্মানিত মুসলিম ভাইয়েরা! আমি আপনাদের দাওয়াতে তো হাজির হয়েছি; কিন্তু মনে মনে ভাবছি, আপনাদের সামনে কী বলব। কেননা, যা কিছু বলব, তা তো আপনারা সবাই জানেন। আর আমার ভিতর এমন কোন নতুন ইলম নেই, যা আপনাদের জানা নেই।

আপনারা অবগত আছেন, দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো ইলম। ইলমের আলো সবচেয়ে বড় আলো। সূর্যের আলোতে যখন তাপ আসে, তখন তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তা দ্বারা শুধু রং ও সুরতের ইলম হয়। আর ইলমে দীনের আলো দ্বারা ইসলাম ও কুফরের পার্থক্য বোঝা যায়। সুন্নাত ও বিদয়াতের মাঝে পার্থক্য শিখায়, হক-বাতিলের পরিচয়ের মাধ্যম হয়।

এটি নবীদের উছিলা ও তাঁদের জুতার দান এবং তাঁদের হাজারো-লাখো অনুগ্রহ যে, তাঁরা ইলমের আলো পেশ করেছেন, যা আমাদের ভাল-মন্দ, নেক-বদের মাঝে পার্থক্যকরণের মাধ্যম হয়েছে।

## অর্জনকৃত বস্তু পুনরায় অর্জন করা

আপনাদের এ বিষয়টি জানা আছে যে, ইলম কখনো তালিম ছাড়া অর্জন হয় না। আর আপনারা তো সবাই তালিমে লিপ্ত ও দরসে উপস্থিত, মুতালায়া (পাঠপূর্ব অধ্যয়ন) ও পরস্পর তাকরার-মুযাকারা (পর্যালোচনা) ইত্যাদিতে রত রয়েছেন। মোটকথা রাতদিন সর্বদা ইলম অর্জনে ব্যস্ত আছেন। তাই ইলম সম্পর্কে নসিহত করা তাহসিলে হাসিল তথা অর্জনকৃত বস্তু পুনরায় অর্জন করার পর্যায়ভুক্ত। আর যদি আমল বিষয়ে কিছু বলি, তাহলে আপনারা বলবেন, ইলম অর্জন করা-ই সবচেয়ে বড় ইবাদত। এ কারণে যখন ফকীহদের মাঝে আলোচনা হলো, অধিক নফল পড়া উত্তম, না অধিক ইলম অর্জন করা উত্তম, তখন অধিকাংশ ফকীহ অধিক ইলম অর্জনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আপনারা ইলম অর্জনে লিপ্ত আছেন, যা সবচেয়ে বড় অর্জন। এছাড়া ফরজসমূহ এবং অন্যান্য আমলেও আপনাদের পক্ষ হতে কোন কমতি নেই। নামাযের জন্য আপনারা ঝাঁকে ঝাঁকে আসেন। সর্বদা মসজিদ ভরপুর দেখা যায়। দারুল উলুমের মসজিদ তো আপনাদের দ্বারা ভরপুর থাকে, আবার শহরের অন্যান্য মজিদগুলোও আপনাদের দ্বারা আবাদ হয়। তাই আমল সম্পর্কে কিছু পেশ করলে আপনারা বলবেন, আমল তো আমরা করছি-ই।

আর চরিত্রগত অবস্থা যতটুকু থাকার দরকার, তা তো ঠিকই আছে। তবে এ কথা তো অবশ্যই সঠিক যে, যদি আমরা পূর্বপুরুষদের চরিত্রের সাথে তুলনা করি, তাহলে আমাদের কমতি হবে। কিন্তু বর্তমান সময়ে অন্যান্য মানুষের চরিত্র ও চালচলনের প্রতি দৃষ্টি দিলে আমি আপনাদের চরিত্র দেখে শুধু খুশিই হইনি বরং এ কথা বলতে বাধ্য যে, এই চরিত্রহীনতার যুগেও আপনাদের চরিত্র পৃথক একটা শান রক্ষা করে চলছে। এ কারণে এ সম্পর্কে কিছু বললে সেগুলো উপকার থেকে খালি হতো। আর নীতিগত ও প্রকারগত কিছু সঠিক পরিধি ছিল, যেগুলোর ব্যাপারে কিছু বলা যেত। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানিতে এ সকল বস্তুই আপনাদের আগে থেকে অর্জন করা আছে। এখনও আমার বুঝে আসছে না, কোন বিষয়টি আপনাদের সামনে পেশ করব, যা আপনাদের উপকার দেবে।

## ভাগ্যবঞ্চিতের অবস্থা

হযরত মাওলানা গাঙ্গুহী রহ.-এর ঘটনা ও বাণী মনে পড়ল যে, তিনি যখন হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব রহ.-এর হাতে বাইয়াত হয়ে ফিরে আসেন, তারপর অনেক দিন পর্যন্ত তিনি কোন চিঠিপত্র আদান-প্রদান করেননি। পরিশেষে স্বয়ং হাজী সাহেব রহ. মাওলানা গাঙ্গুহী রহ.-এর নিকট চিঠি লিখলেন যে, সকল শাগরেদ মুরিদদের পক্ষ হতে সবসময় পত্র আসছে, যার ফলে তাদের হালত জানতে পারছি। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলো; আপনার কোন পত্র পাইনি। ফলে আপনার অবস্থা জানতে পারিনি। আপনি আপনার অবস্থা লিখে পাঠান, যাতে আমি বুঝতে পারি।

হযরত গাঙ্গুহী রহ. উত্তর লিখলেন। তিনি শুরু করলেন এভাবে। হযরত! ভাগ্যাহতের তো কোন হালই (অবস্থা) নেই। যদি হতো, তাহলে জানাতাম। পরে লিখলেন, তবে হযরতের জুতার বদৌলতে আমার ভিতর তিনটি জিনিস পেয়েছি–

এক. শরয়ী কর্মগুলো আমার তবিয়ত হয়ে গেছে, আমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। কেমন যেন নামায, রোযা এবং অন্যান্য ইবাদতসমূহ আদায় করার জন্য আমি এমন বাধ্য যেমন ক্ষুধার সময় খাবার এবং পিপাসার সময় পানির জন্য বাধ্য হই।

দুই. প্রশংসা ও নিন্দা সমান মনে হয়। কেউ হাজারো প্রশংসা করলে, হাজারো নিন্দা করলে নফসে কোন প্রকার পরিবর্তন সৃষ্টি হয় না। কেমন যেন কোন মাখলুক কিছু বলছে এতে কোন পরওয়া হয় না। আবার প্রতিক্রিয়াও হয় না।

তিন. শরীয়তের নসসমূহের মধ্যে কোথাও কোন প্রকার বিরোধ মনে হয় না। বিরোধ তো দূরের কথা, এমনভাবে পছন্দ হয় যে, প্রতিটি বিধানই আপন স্থানে সঠিক বলে প্রতিভাত হয়।

## সৌভাগ্যের কেন্দ্রবিন্দু

শরয়ী কার্যাবলি তবিয়ী কার্যাবলিতে পরিণত হয় আমলি শক্তি দ্বারা। আর মানুষের প্রশংসা ও নিন্দা সমান মনে হওয়া চারিত্রিক শক্তির তাকাজা। আমলি শক্তির শেষ সীমা হলো, মানুষের মধ্যে আনুগত্যের উৎসাহ-উদ্দীপনা এমন পর্যায়ে সৃষ্টি হওয়া যে, তাছাড়া তার ভাল লাগে না, মনে প্রশান্তি আসে

না। আর চারিত্রিক শক্তির পরিসীমা হলো, এমন পর্যায়ের অমুখাপেক্ষিতা সৃষ্টি হওয়া, যার ফলে মানুষের প্রশংসা ও নিন্দা এক মনে হতে থাকে।

এমনিভাবে ইলমী শক্তির পরিসীমা হলো কুরআন, সুন্নাতের প্রতিটি বিষয় নিজ-নিজ স্থানে একেবারেই সুস্থ ও সঠিক মনে হবে। আর ইসলামী শরীয়ত একটি বাগানের মতো মনে হবে। নেককার মানুষের জন্য উক্ত তিনটি গুণে গুণান্বিত হওয়া অতি জরুরি। এক. ইলমী শক্তি, দুই. আমলি শক্তি, তিন. আকলাকি (চারিত্রিক) শক্তি।

এমন এমন স্থান আছে, যেগুলো ইলমী, আমলি ও আখলাকি শক্তিসমূহের মার্কায, যেখানে এমন এমন ব্যক্তিত্ববর্গ তৈরি হয়েছেন, যারা সর্বদিক দিয়ে পরিপূর্ণ ছিলেন। আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি যে, এমন মুকাম্মাল ব্যক্তিবর্গের সুরত-সীরত দেখেছি। আর কয়েকজন থেকে তো কিছু উপকৃতও হয়েছি। আমার শ্রদ্ধাভাজন হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ.। আল্লাহু আকবার! তিনি ভ্রাম্যমাণ কুতুবখানা ছিলেন। ইত্তেবায়ে সুন্নাতের অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁর আমল দেখে মাসয়ালা বের করা যেত। তেমনই ছিলেন হযরত শাইখুল হিন্দু মাহমুদুল হাসান দেওবন্দি রহ.। এ সমস্ত হযরতদের দরবারে যিয়ারতের সাথে সাথে তাঁদের থেকে কিছু উপকার লাভ করার সুযোগ হয়েছে। সম্মানিত ওস্তাদ হযরত থানুভী রহ.-এর যিয়ারতও আমার নসীব হয়েছে।এবং তাওফিক মোতাবেক ইস্তিফাদাও লাভ করেছি। এটি এমন জায়গা, যেখানকার প্রতিটি ব্যক্তিত্ব পুরো জাতির সমতুল্য। হযরত থানুভী রহ. দেশের আনাচে-কানাচে ওয়াজ-নসিহত করেছেন এবং প্রায় হাজারখানিক কিতাব লিখেছেন। অনেক উলামায়ে কেরাম মিলে যদি বসে যায়, তাহলে এমন কাজ অনেক কষ্টে হবে। আল্লাহ তাঁর নিকট থেকে এমন এমন কাজ নিয়েছেন, যা একদল বা গোষ্ঠী মিলে করা অসম্ভব না হলেও দুষ্কর তো অবশ্যই।

## বুযুর্গদের জায়গা বুযুর্গদের স্থলাভিষিক্ত হয়

এটি কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, ঐ বুযুর্গদের আসর এ জায়গায় থাকবে না। সাধারণ একটি ফুল কাপড়ে স্পর্শ করার ফলে কাপড় সুগন্ধ হয়ে পড়ে। আর কাপড় থেকে অনেক সময় পর্যন্ত সুগন্ধি আসতে থাকে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিদওয়ান গাছের নিচে চৌদ্দশত সাহাবীর বাইয়াত নিয়েছিলেন। নবীজির সামান্য অবস্থানের কারণে সেই স্থানটি

সম্মানিত ও বরকতময় হয়েছিল। হযরত সাহাবায়ে কেরামই বরকতসমূহ অনুভব করতেন। তাঁরা সেই গাছের নিচে বসতেন এবং সেখানে দু'আ করতেন। পরবর্তীতে হযরত উমর ফারুক রা. বললেন, এ যুগ তো খাইরুল কুরুন (সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ)। এ গাছের প্রতি মানুষের যে ভক্তি রয়েছে, এতে সম্ভাবনা আছে, ভবিষ্যতে এমন প্রজন্ম আসবে, যারা বিশ্বাসে বাড়াবাড়ি করবে। তারা বিদয়াত ও শিরক শুরু করবে। তাই তিনি গাছটি কেটে ফেলার হুকুম দিলেন।

আমার এ ঘটনা বলার উদ্দেশ্য হলো, বুযুর্গদের দ্বারা জায়গাও বুযুর্গ (সম্মানিত) হয়ে যাওয়ার বাণীটি নিতান্তই সত্য। সুতরাং এই ইদারা যেখানে আকাবির, আউলিয়া এবং সর্বজনস্বীকৃত কুতুব ও অলীগণ বসবাস করেছেন, তাদের পবিত্র আসরসমূহ হতে এ ইদারা (প্রতিষ্ঠান) কখনও খালি হতে পারে না। মোটকথা, আপনারা এমন এক ইদারার অবস্থান করছেন, যেখানে নানা রকমের নেসবত এবং নিষ্কলুষতা ও পবিত্রতা অর্জিত হয়েছে। যে বরকতসমূহ এখানে মিলবে, তা অন্য কোন স্থানে পাওয়া যাবে না। দারুল উলুমের অনেক স্থান সম্পর্কে আকাবিরদের কাশ্‌ফ রয়েছে।

নাওদারা বিল্ডিং সম্পর্কে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব রহ.-এর কাশ্‌ফ রয়েছে যে, আরশ থেকে একটি ধারাবাহিক রশি নাওদারার দরসগাহে পৌছে। সুতরাং অভিজ্ঞতা হলো, এ স্থানে বসে পড়ালেখা করলে যেমন বুঝে আসে, অন্যস্থানে তেমন বুঝে আসে না। আর নাওদারাহর সম্মুখে যেখানে জানাযা রাখা হয়, তার সম্পর্কে মাওলানা ইয়াকুব সাহেব রহ.-এর কাশ্‌ফ রয়েছে, যার জানাযার নামায এখানে হয়, সে ক্ষমা লাভ করে।

## ইলহামী বিদ্যাপীঠ

ভাইয়েরা! এই মাদরাসা ইলহামী মাদরাসা। এর শুরুটাও হয়েছে ইলহামীভাবে। এর নির্মাণ ও বিল্ডিংগুলোও ইলহামী। আর এখানে ছাত্রদের ভর্তিও ইলহামী। বরং কিছু ঘটনা থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, এর আসাতিযাদের নিয়োগ-বিয়োগও বিশেষভাবে নির্ধারিত। এ মাদরাসার খেদমত সবার ভাগ্যে জোটে না। এ মাদরাসার ভিত্তি অন্যান্য মাদরাসাসমূহের মত প্রথাগত পরামর্শক্রমে প্রতিষ্ঠা হয়নি। বরং যুগের আকাবির মাশায়েখদের সম্মিলিত পরামর্শক্রমে হয়েছে।

আমি বুযুর্গদের থেকে শুনেছি, দারুল উলুমের ভিত্তি স্থাপনের সময় কারো

কাশ্‌ফ হয়েছিল, এখানে একটি দীনি মাদরাসা স্থাপন করা হোক। কেউ স্বপ্নে দেখেছেন, এখানে একটি মাদরাসা স্থাপন করা প্রয়োজন। কারো মনে এল্‌কা হয়েছে, এখন হিন্দুস্তানের ইসলামের হেফাজত দীনি ইদারা দ্বারা হতে পারে। এমনিভাবে নির্মাণ করার সময় বুনিয়াদ খনন করার জন্য কিছু আলামত লাগানো হয়। এখন যতটুকু বাউন্ডারি রয়েছে, তার অর্ধেকের উপর নিশানা লাগানো হয়েছিল।

## ইলহামী মুহতামিম

দারুল উলুমের সর্বপ্রথম মুহতামিম হযরত শাহ রফিউদ্দীন সাহেব রহ., যিনি দুনিয়াত্যাগী এবং অত্যন্ত শক্তিশালী নেসবতওয়ালা বুযুর্গ ছিলেন। তিনি লিখতেও পারতেন না, আবার কিতাবও পড়তে পারতেন না। হযরত কাসেম নানুতুবী রহ. তাঁকে ডেকে আনলেন এবং মুহতামিম-এর দায়িত্ব পেশ করলেন। তিনি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বললেন, আমি তো লেখাও জানি না, পড়াও জানি না; আমাকে মুহতামিম বানিয়ে কী হবে। হযরত নানুতুবী (রহ) বললেন, না; আল্লাহর পক্ষ হতে এমনটিই নির্ধারণ মনে হয় যে, আপনিই মুহতামিম-এর দায়িত্ব পালন করবেন। তারপর তিনি গ্রহণ করলেন।

## ইলহামী ছাত্র

হযরত শাহ রফিউদ্দীন রহ. একদিন স্বপ্নে দেখলেন, মৌলসরি এলাকায় একটি কূপের কিনারায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনেছেন এবং দুধ বণ্টন করছেন। আর দুধ গ্রহণকারীদের মধ্যে কারো হাতে কলম, কারো হাতে জগ, কারে হাতে পেয়ালা, আবার যার কোন পাত্র নেই সে আজলা ভরে পান করছে।

হযরত যখন সজাগ হলেন, তখন এ স্বপ্ন মুরাকাবা করলেন যে, আমি কী দেখলাম। তারপর কিছুক্ষণ মুরাকাবা করে ফলাফল বের করলেন, এ দুধ হলো ইলমের মিছাল। আর ইলম বণ্টনকারী হলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি ইলম বণ্টন করছেন আর ছাত্ররা তাদের শান অনুযায়ী ইলম অর্জই করছে।

মানুষ এ ঘটনা জানতে পারল এমনভাবে যে, এককবার হযরত শাহ

রফিউদ্দীন সাহেব রহ. মৌলসরি এলাকায় দাঁড়ানো ছিলেন। তখন এক ছাত্র ঝুলের পেয়ালা নিয়ে হযরতের সামনে আসে এবং তাকে নিক্ষেপ করে বলে, এতে না আছে তেল-ঘি, না আছে মসলা, মনে হয় মুফতী সাহেব ফতওয়া দিয়ে দিবেন, তা দ্বারা অযু জায়েয আছে। এমনই কি আপনার মুহতামিমগিরি?

যখন সে চলে গেল, তখন তিনি বললেন, সে কি দেওবন্দ মাদরাসার ছাত্র? মানুষ বলল, হযরত! সে দেওবন্দের ছাত্র। বোডিংয়ে তার নামে খানা জারি আছে এবং বোডিংয়ের খাতায় তার নাম আছে। তিনি বললেন, না, এ লোক মাদরাসার ছাত্র হতে পারে না। পরে যাচাই করে দেখা গেল, তার নামে আরেকজন ছাত্র ছিল। খানাটা তার ছিল। কিন্তু নামের মিল থাকার কারণে ভুলে খানার টিকিট সে পেয়ে গিয়েছিল। তখন ছাত্ররা হযরতের নিকট এসে বলল, হযরত আপনি যা বলেছেন, তাই ঠিক হলো। কিন্তু আপনি এ কিভাবে জানতে পারলেন? তারপর তিনি দুধের ঘটনা বর্ণনা করলেন। তারপর একটি আশ্চর্যজনক কথা বললেন যে, যখন শাওয়াল মাসে ছাত্ররা ভর্তি হয়, তখন আমি প্রতিজনকে দেখে চিনতে পারি, সে ঐ দুধপানের অনুষ্ঠানে ছিল। আর এ ছাত্রটির প্রতি আমি তিনবার দৃষ্টি দিলাম। তখন আমার মনে হলো, সে ঐ মজলিসে উপস্থিত ছিল না। তাই বলা যায়, এটি ইলহামী মাদরাসা। তার শুরুও ইলহামীভাবে হয়েছে এবং তার ছাত্র নির্বাচনও ইলহামীভাবেই হয়েছে।

## ইলহামী ভিত্তি স্থাপন

এ মাদরাসার ভিত্তি স্থাপন ইলহামীভাবে হয়েছে। ভিত্তি স্থাপনের জন্য মানুষ যে দাগ ও নিশানা লাগিয়েছিল, তাতে তখনও কাজ শুরু হয়নি। তখন হযরত শাহ রফিউদ্দীন রহ. স্বপ্নে দেখলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করেছেন; তাঁর হাতে লাঠি মোবারক রয়েছে।

তিনি বললেন, এ বাউন্ডারি যথেষ্ট নয়। তারপর তিনি মাওলানা সির আহমাদ সাহেবের দরসগাহ হতে নিশানা এঁকে দিলেন। হযরত শাহ রফিউদ্দীন সাহেব রহ. ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখতে পেলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লাগানো দাগ হুবহু বিদ্যমান রয়েছে। তারপর শাহ সাহেব রহ. বললেন, কারো সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন নেই; বুনিয়াদ এ নিশানার উপর খনন করা হোক।

## হাকায়েক ও কাইফিয়্যাতের পার্থক্য

আপনারা এমন একটি স্থানে অবস্থান করছেন, যেখানে হাজারো বুযুর্গের নেসবত রয়েছে। ঐক্যবদ্ধভাবে এবং অন্তর্দৃষ্টি ব্যতীতই ঐ সকল নেসবত কাজ করে চলছে। এ জন্য আমি এখন বলেছি, যে ইলম ও খায়ের-বরকত এ স্থানে রয়েছে, তা অন্য কোথাও নেই। অন্যস্থানে কিতাব এক, শব্দ এক; কিন্তু হাকিকত ও বর্ণনাভঙ্গি ভিন্ন। আমি মিশকাত শরীফ কিতাবটি আমার সম্মানিত পিতা মাওলানা হাফেজ আহমাদ সাহেব রহ.-এর নিকট অধ্যয়ন করেছি। তিনি যখন আলমে বরযখ, মৃত্যু, কিয়ামত, হাশর, নশর, সম্পর্কিত হাদীসে শরীফে পৌঁছতেন এবং তাকরীর ও ব্যাখ্যা শুরু করতেন, তখন মনে হতো, কেয়ামতের ময়দান আমার সামনে, এই কবর, এই হিসাব, নিকাশ, এই আযাব ও সাওয়াব। এমন আন্দায ও কাইফিয়াতে (অবস্থায়) তালিম হতো যে, আমার অনুভব হতো, ঐ হালত আমার উপর এখনই পতিত হচ্ছে।

## নেসবতসমূহের বাগান

এককালে দারুল উলুম দেওবন্দের অবস্থা এমন ছিল যে, মুহতামিম থেকে শুরু করে দারোয়ান পর্যন্ত সবাই আহলে নেসবত আল্লাহওয়ালা ছিলেন। হাজী আবদুল্লাহ সাহেব রহ. নামে একজন দারোয়ান ছিলেন। তিনি লেখাপড়া কিছুই জানতেন না; কিন্তু সাহেবে নেসবত বুযুর্গ ছিলেন।

দারুল উলুমে সুবহে সাদিকের সময় বেল বাজানো হতো আর বেল বাজানোর দায়িত্ব জনাব হাজী আবদুল্লাহ সাহেব রহ.-এর উপর ছিল। তিনি প্রথম বাড়িটা দেয়ার সময় সুবহানাল্লাহ বলতেন। দ্বিতীয়টার সময় আলহামদুলিল্লাহ, তৃতীয়টার সময় আল্লাহু আকবার-এর নারা লাগাতেন। তারপর নিম্নের ছন্দটি এক আজীব ভঙ্গিতে প্রকাশ করতেন–

یہ چمن یونہی رہیگا اور ہزاروں بلبلیں
اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی

এ বাগান এখানেই থাকবে, আর হাজারো বুলবুল নিজ
নিজ ঘ্রাণ নিয়ে উড়ে চলে যাবে আপন ঠিকানায়।

এ ছন্দে এমন দৃশ্যের অবতারণা হতো যে, যে-ই ছন্দ শুনত, সে-ই অনিচ্ছায় কেঁদে ফেলত।

মোটকথা, এটি দৃষ্টান্তমূলক জায়গা; তাতে অগণিত নেসবত রয়েছে। এতে

সর্বনিম্ন ছাত্রদেরও কিছু না কিছু হাসিল হয়। এ স্থানে থেকে বঞ্চিত থাকার প্রশ্নই ওঠে না। তো ভাই, যদি নেসবত সম্পর্কে কিছু বলতে হয়, তাহলে আল্লাহর অনুগ্রহে তাও সেখানে বিদ্যমান আছে বলা যাবে।

## ইলম বাড়ানো

কিন্তু হ্যাঁ, উক্ত কথাগুলোর সাথে আরো একটি কথা রয়ে গেছে। আর তাহলো এই যে, একটি তো আসল বা মূল ইলম, যা আপনারা অর্জন করছেন। আর তা আট-দশ বছরে অর্জন হয়ে যায়। কিন্তু এটুকুতে যথেষ্ট করতে নেই বরং ইলম বৃদ্ধির জন্য সর্বদা চেষ্টা করা জরুরি। যেমনভাবে আসল ইলম প্রয়োজন, তেমনিভাবে অতিরিক্ত ইলমও প্রয়োজন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন– হে আল্লাহ! আপনি আমার বিদ্যা বাড়িয়ে দিন।

অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এত পরিমাণ ইলম দেয়া হয়েছিল, যা বিশ্বজগতের অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। ইলম্ যেহেতু মানুষের সিফাত নয় বরং আল্লাহ তায়ালার সিফাত আর তিনি তো জানতেন, আল্লাহর সকল সিফাতই অসীম। তাই যতটুকু ইলম অর্জন হবে, তত পরিমাণ মূর্খতা দূরীভূত হবে এবং সামনের জীবন দীর্ঘ মনে হবে।

হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. মৃত্যুরোগে আক্রান্ত। ডাক্তারগণ কঠিনভাবে নিষেধ করে দিলেন, হুজুর! আপনি অধ্যয়ন করবেন না। কিন্তু যখন ডাক্তার চলে যেতেন, তিনি তখন সাথে সাথে মুতালায়ায় লিপ্ত হয়ে যেতেন। মানুষ বলত, হযরত! ডাক্তার তো আপনাকে নিষধ করেছেন। তখন তিনি বলতেন, ভাই, কী করব; এ মুতালায়ার রোগের কোন চিকিৎসা নেই। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র কয়েক ঘণ্টা মুতালাআবিহীন হতো। তার সম্পর্কে এ কথা বলা অতিরঞ্জিত হবে না যে, তিনিই সর্বোচ্চ মুতালায়াকারী। তিনি সর্বদা ইলম বৃদ্ধির ফিকিরে লেগে থাকতেন। এছাড়া আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন প্রখর মেধা ও স্মৃতিশক্তি দান করেছিলেন যে, কোন বিষয় একবার দেখলে সারা জীবনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত।

তিনি একবার সবক পড়ানোর সময় বলেছিলেন, একবার যা দেখি তা আর ভুলি না। নেসাবভুক্ত প্রসিদ্ধ কিতাবাদী তো দূরের বিষয়, নিসাববিহীন দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য কিতাবগুলোর রেফারেন্স দিতেন পৃষ্ঠা ও লাইনসহ কেমন যেন তিনি ঐ সমস্ত কিতাবাদী গত রাত্রে মুতালায়া করেছেন। এত পরিমাণ

মুখস্থশক্তি থাকার সত্ত্বেও তিনি ফাতহুল বারী কিতাবটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ১৩ বার মুতালায়া করেছেন। এখন চিন্তা করে দেখা যেতে পারে, যার একবার পড়লেই বছরের পর বছর মুখস্থ থাকে, তিনি যদি তেরবার মুতালায়া করেন, তাহলে তারপর তার কি অবস্থা হতে পারে।

তিনি হাদীসের দর্‌স দান করতেন। কিন্তু বাস্তবে তার দরসে সকল বিষয়ে আলোচনা হতো। আফসোস, শত আফসোস! আমি তার দরসের তাকরীর ও ব্যাখ্যাগুলো হেফাজত করতে পারিনি।

## ইলমের ধ্যান : সর্বদা একটিই ফিকির

তো ভাই! মানুষের মেহনত দ্বারা ইলম অর্জন হয়, ধ্যান (সারাক্ষণ একই ফিকির) দ্বারা অর্জন হয়। এই ধ্যান সৃষ্টি হওয়া উচিত যে, আমাকে ইলম অর্জন করতেই হবে এবং তাকে চক্রবৃদ্ধি করে বাড়াতেই হবে। যখন ধ্যান সৃষ্টি হয়ে যাবে, তখন বেশি বেশি কিতাব দেখার আগ্রহ হবে আর যখন আপনার কিতাব দেখার অভ্যাস হয়ে যাবে, তখন আপনার মধ্যে বোধশক্তি সৃষ্টি হবে। আর যখন বোধশক্তি সৃষ্টি হয়ে যাবে, তখন আপনি কোন বস্তুর শুধু হুকুম জানার উপর যথেষ্ট মনে করতেন না বরং তার হেকমতও জানার চেষ্টা করবেন। আর যখন হেকমত জানতে পারবেন, তখন আরো উর্ধ্বে উঠে তার ইল্লত (কারণ) জানার খায়েশ সৃষ্টি হবে। আর যখন ইল্লত জানা হয়ে যাবে, তখন আপনি এতটুকুর উপর তুষ্ট হবেন না বরং তখন আপনি এ জানার চেষ্টা করবেন যে, এ ইল্লতের সম্পর্ক আল্লাহ তায়ালার কোন সিফাতের সাথে।

## ইলম ও আমলের সনদ

আমি আপনাদের আরো একটি কথা বলে দেব। আপনারা ইলম অর্জনের জন্য যেমনভাবে মেহনত করেন, মুজাহাদা করেন, কষ্ট সহ্য করেন; তেমনিভাবে আপনার আমলি ও আখলাকি শক্তি মজবুত ও দৃঢ় হবে না, ইলম কাজে লাগবে না যতক্ষণ না তার সাথে সাথে আমলের ধারাবাহিকতাকে যুক্ত করা হয়। একজন আলেমের মধ্যে যদি অহংকার হয়, হিংসা থাকে, শত্রুতা গুণ থাকে কিনা থাকে, সম্পদ ও ইজ্জতের লোভ থাকে, তাহলে সে নিজেও বেইজ্জতি হবে, ইলমকেও বেইজ্জত করে ছাড়বে। আমাদের আকাবির আসলাফগণ যখন ইলম শিখতেন, তখন ইলম শেখার পর পৃথকভাবে

আমলও শিখতেন। স্বয়ং দারুল উলুমে অর্ধ শতাব্দি কাল এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন শায়খে কামেলের নিকট হতে অনুমতি না মিলত, ততক্ষণ দারুল উলুম নিজে ইলমী সনদ দিত না। কেমন যেন ইলম ও আমল উভয়ের সমন্বয়ের নাম সনদ।

## ইলম ও ভয়ভীতি

আমি আপনাদের সামনে যে হাদীসটি পড়েছিলাম অর্থাৎ তাতে না কোন তালেবে ইলম কখনও তৃপ্ত হতে পারে, না কোন দুনিয়াদার তৃপ্ত হতে পারে। তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, না কোন সম্পদ তালাশকারী কোন প্রকার তুষ্ট হতে পারে না, কোন তালেবে ইলম তুষ্ট হতে পারে। বরং তাদের লালসা বেড়েই চলে। যদি কারো হাতে একশত টাকা থাকে, তাহলে সে দুশত টাকা অর্জনের লোভ করে, দুশত টাকা অর্জন হলে চারশত টাকা অর্জনে লোভ জাগে। তেমনিভাবে কোন তালেব ইলম যদি একশত মাসয়ালা জানতে পারে, তাহলে সে দুশত মাসয়ালা জানার চেষ্টায় থাকে। যখন ইলম তালাশ করা ঐ স্তর পর্যন্ত পৌছে যাবে, তখন স্বয়ং ইলমই আমলকে আহ্বান করবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

যে পরিমাণ ইলম বাড়তে থাকবে, সে পরিমাণ আল্লাহর ভয়-ভীতি বাড়তে থাকবে।

আর যখন ভয়-ভীতি বাড়বে তখন অতি অবশ্যই আনুগত্যের দিকে ধাবিত হবে। কেননা ইলমের লাওয়াজেম (অবশ্যকীয় বস্তু) হলো আমল।

## দিশারী তৈরি হওয়ার কাল

এখন আপনার ইলম অন্বেষণের সময়। আপনার এখন অন্যদের নেগরানীতে আছেন। আর এখানে অবস্থান করে আপনি পুণ্যবান হচ্ছেন। কিন্তু এখান থেকে যাওয়ার পর আপনি নিজেই অন্যের নেগরান হবেন। আর নিজেকেই মুসলেহ (সংশোধনকারী) হতে হবে। তারপর আপনাদের বিভিন্ন মাসআরা (সমস্যা) আসবে, সেই মোতাবেক আপনাদেরকে কৌশল অবলম্বন করতে হবে। দেশ ও জাতির অবস্থা আপনার সামনে থাকবে। আপনাকে দেখতে হবে, এ সময় জাতির মধ্যে কী ব্যাধি ও কী অপূর্ণতা রয়েছে। এগুলোর কারণ

কী-কী? এবং সেগুলোকে দূরীকরণে কী-কী কৌশল অবলম্বন করতে হবে? এমনিভাবে এ ইদারা থেকে বের হওয়ার পর আপনার শিরক ও বিদয়াতের মোকাবেলার ক্ষেত্র থাকবে, ইহুদী ও খ্রিষ্টবাদের মোকাবেলা করতে হবে। আপনি যদি ঐ সমস্ত কর্মের জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ না করেন এবং মেহনত ও চেষ্টা করে এখনই মাঠ প্রস্তুত না করেন, তাহলে আগত ভবিষ্যতে আপনাকে যে সকল পেরেশানির স্বীকার হতে হবে তা সুস্পষ্ট।

আমার ইচ্ছা হলো, আপনি এখান থেকে শুধু আলেম ও সালেহ হয়েই বের হবেন না; বরং ওস্তাদ ও মুসলেহ হয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করবেন। কেননা, জাতি অপেক্ষায় আছে, আমাদের সন্তান দারুল উলুম দেওবন্দে পড়তে গেছে। সে এসে আমাদের ইসলাহ (সংশোধন) করবে। আমাদেরকে ভুল পথ থেকে সরিয়ে সঠিক পথে আনবে। আর আমাদের পেরেশানি লাঘব হবে। বিধায় ঐ সকল বস্তুর ব্যাপারে প্রথমে নিজেই চিন্তা করতে হবে এবং সেগুলোর সমাধান বের করতে হবে। নিজ ওস্তাদদের প্রশ্ন করে বুঝে নিতে হবে। এখান থেকে চলে যাওয়ার পর এমন সুযোগ মিলবে না এবং এমন ওস্তাদও পাবেন না। এ কারণে আমি আপনাদের সামনে কথাগুলো পেশ করলাম।

## খুলুস ও মহব্বতের শুকরিয়া

আমি আপনাদের মহব্বত ও খুলুস-এর শুকরিয়া আদায় করছি। শুধু শুকরিয়া নয়। কেননা, এটি তো আজ সাময়িক এবং প্রথাগত হয়ে পড়েছে, আমি আপনাদের জন্য অন্তরের খুলুস থেকে দু'আ করি, আল্লাহ তায়ালা যেন আপনাদের ইলমে নাফে (উপকারী জ্ঞান) ও আমলে সালেহর তাওফিক দান করেন।

আমি তো কোন কিছু নই। তবে আমার একটা পরিচয় ও নেসবত রয়েছে ঐ বুযুর্গদের সাথে, যাদের উছিলায় আমি ও আপনারা এখানে বিদ্যমান।

# বয়ান : ৯

## দারুল উলুম দেওবন্দের স্বাতন্ত্র্য

দীন ও ইলমে দীনের প্রতি মুসলিম জাতির অমনোযোগিতার যুগেও দারুল উলুম দেওবন্দ টিকে থাকা এবং দিন দিন উন্নতি লাভ করা এর আলামত যে, তা আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্যে টিকে আছে। তাই দেখা যায়, যে বছর মাদরাসাবিরোধিরা চেষ্টা করেছে মাদরাসায় চাঁদা না আসার, সেই বছর অন্য বছরগুলোর তুলনায় অধিক দান ও চাঁদা এসেছে। ফলে বিরুদ্ধবাদীদের লজ্জিত হতে হয়েছে। ঘটনা হলো, বর্তমান ফেতনা-ফাসাদের যুগে দারুল উলুম দেওবন্দ টিকে আছে কোন আসবাবের উপর নির্ভর করে নয়, বরং টিকে আছে মহান আল্লাহর গায়েবী সাহায্যে এবং দিন দিন উন্নতি লাভ করছে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ. وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ• وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ؕ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَ لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ۝

## যে অভাব পূরণ হবার নয়

সম্মানিত উপস্থিতি ও স্নেহের ছাত্র ভাইয়েরা!

অনুষ্ঠানে আরবী বক্তৃতা ও কবিতা পাঠের পর হযরত মাওলানা সায়্যিদ আহমদ মাদানী রহ.-এর আলোচনা ছিল। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় হলো, তিনি এখন এখানে উপস্থিত নেই। তিনি উপস্থিত থাকলে আমাদের সকলের অনেক উপকার হতো। আমাদের তিনি তাঁর মূল্যবান নসিহত দ্বারা ধন্য করতেন। আমি মাওলানাকে বলেছিলাম, যদি আপনি নির্ধারিত তারিখে পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত না হতে পারেন, তাহলে প্রয়োজনে তারিখ পরিবর্তন করব। তিনি তা পছন্দ করলেন না। বরং বললেন, উপস্থিত থাকার

জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করব।

সম্মানিত উপস্থিতি! হযরতের অনুপস্থিতির ফলে অনুষ্ঠানটি মনে হচ্ছে ভরপুর হয়নি, কেমন যেন বিশেষ অভাব অনুধাবন হচ্ছে। আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ উদ্দেশ্য হলো পুরষ্কার বিতরণ এবং ছাত্রদের আনন্দ প্রদান। আর যে বিভাগের ছাত্রদের পুরস্কৃত করা হচ্ছে, সেই বিভাগের প্রধান হলেন হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.।

## অতিথিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা

অনুষ্ঠান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কিছুকথা বলতে হয়। আমি দারুল উলুমের পক্ষ থেকে আগত মেহমানগণের শুকরিয়া আদায় করছি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কারণ, তাঁরা ভীষণ গরম ও প্রচ- তাপদাহের মৌসুমে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। বিশেষ করে যারা দিল্লি থেকে এসেছেন, তারা হলেন ব্যস্ত ব্যবসায়ী মানুষ। তাঁরা নিজেদের ব্যবসার কার্যাবলি ছেড়ে দিয়ে আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। তাই তাঁরা আমাদের শুকরিয়া পাওয়ার বেশি হকদার। কারণ, তারা এখানে এসেছেন কোন ধন-সম্পদ পাওয়ার তামান্নায় নয়; বরং তারা এসেছেন দারুল উলুমের মহব্বতের টানে।

এ বছর জলসা অনুষ্ঠিত হওয়ার কিছু প্রতিবন্ধকতা ছিল। ধারণা করেছিলাম, জলসা হবে না। কেউ কেউ বলল, সময় যেহেতু স্বল্প, তাই দাওয়াত ও প্রচার-প্রসার সংক্ষিপ্তাকারে করা হোক। আজ দারুল উলুমকে পরিচয় করার ইচ্ছা নেই। আর এখন দারুল উলুমও পরিচয়ের মুহতাজ নয়। এমনিতেই সারা বিশ্ব তাকে এক নামে চিনে।

## দারুল উলুমের ভিত্তিগত বৈশিষ্ট্য

তবে এতটুকু বলা প্রয়োজন মনে করি যে, দারুল উলুমের ভিত্তি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজ পর্যন্ত যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলো কিছু চিন্তাশীল ব্যক্তির চিন্তা ও পরস্পর পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্তে পৌঁছে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু দারুল উলুমের ভিত্তি বা প্রতিষ্ঠা একেবারেই ভিন্ন। দারুল উলুম দেওবন্দ হলো গায়েবী ইলহাম এবং আল্লাহওয়ালাদের দিলের কাশ্‌ফ ও বাসনার ফলাফল। আমি নির্ভরযোগ্য

সূত্রে বড়দের থেকে শুনেছি, সে যুগে যত আল্লাহওয়ালা ও বুযুর্গ ছিলেন, সবার অন্তরে একই কাশ্‌ফ হয়েছিল।

মোটকথা, প্রত্যেক বুযুর্গই নিজ নিজ কাশ্‌ফ ও আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে ইলহাম হওয়ার কথা প্রকাশ করেছেন। আর এর ভিত্তিতেই দারুল উলুম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দারুল উলুমের ভিত্তি ইলহামীভাবে হয়েছে, প্রথাগত ও জাগতিক অনুভবযোগ্যভাবে হয়নি। দারুল উলুমের প্রথম মুহতামিম ছিলেন হযরত মাওলানা রফিউদ্দীন সাহেব রহ.। তিনি যদিও উম্মি ছিলেন কিন্তু সাহেবেহাল এবং কামেল বুযুর্গ ছিলেন। দারুল উলুমের ভিত্তির জন্য যে এরিয়া খনন করা হয়েছিল, তা ছিল সংক্ষিপ্ত পরিসরে এবং নির্ধারিত। রাতের বেলায় স্বপ্নে হযরত মাওলানা রহ. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত লাভে ধন্য হন। স্বপ্নে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ এরিয়া তো অনেক ছোট ও সংক্ষিপ্ত। এ কথা বলে তিনি নিজ লাঠি মোবারক দ্বারা একটা দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ইশকা অঙ্কন করে বললেন, এই দাগের উপর মাদরাসার ভিত্তি নির্মাণ কর। ভোরবেলা জাগ্রত হওয়ার পর চিহ্নগুলো হুবহু দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি কারো সাথে পরামর্শ করা ব্যতীতই এ চিহ্নগুলোর উপর ভিত্তি খনন করে নির্মাণকাজ শুরু করেছেন। আর এ কথা তো স্পষ্ট যে, যে প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি ইলহামীভাবে হয়েছে, অবশ্যই সেই প্রতিষ্ঠানের অবস্থা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে ভিন্ন হবে।

## দারুল উলুমের ছাত্রদের বৈশিষ্ট্য

দারুল উলুম থেকে যারা ফারেগ হয়ে বের হয়ে যাচ্ছে, তারা আল্লাহকর্তৃক নির্ধারিত। আর যারা এখানে পড়ালেখা করে, তারাও আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে নির্বাচিত। হযরত মাওলানা রফিউদ্দীন সাহেবের যুগে সংঘটিত একটি ঘটনা। এক ছাত্র বোডিং থেকে খানা নিয়ে এসে হযরতের সামনে ঝোলের পেয়ালা উল্টো করে বলতে লাগল, এই ঝোল কি খাওয়ার জন্য, না অযু করার জন্য? এমন কঠিন ও তেজস্বী কথা বলে সে চলে গেল।

হযরত তখন জিজ্ঞেস করলেন, সে কে? অন্যরা উত্তর দিল, হযরত! সে অমুক নামের ছাত্র। তখন তিনি দৃঢ়তার সাথে বললেন, না; সে দারুল উলুমের ছাত্র হতে পারে না। পরে জানা গেল, সে দারুল উলুমের ছাত্র হিসেবে প্রকাশ করে ধোঁকা ও চালাকি করে বোর্ডিং রেজিস্টারে তার নাম যুক্ত করে নেয়।

বাস্তবে সে রেজিস্ট্রারভুক্ত ভর্তিকৃত ছাত্র নয়।

এ ঘটনার পর মানুষ হযরতকে জিজ্ঞেস করেন, জনাব! আপনি কিভাবে এত দৃঢ়তার সাথে বললেন, সে এ মাদরাসার ছাত্র নয়। তখন তিনি বললেন, শোন, এখানে যারা পড়তে আসে এবং আসবে, তাদের সকলের চেহারা আমাকে দেখানো হয়েছে। সুতরাং আমি যখন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলাম, তখন তাকে দেখানো মানুষের চেহারার সাথে মিল পাইনি। এমন চেহারার মানুষ আমাকে দেখানো হয়নি। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেছে, সে কখনও দারুল উলুমের ছাত্র হতে পারে না।

## ইলম অর্জনের বৈশিষ্ট্য

দারুল উলুম দেওবন্দের মৌলসুরী এলাকায় সে কূপ উপস্থিত, তার সম্পর্কে মাওলানা রফিউদ্দীন সাহেব রহ.-এর স্বপ্ন হলো এরূপ। কোন এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন, কূপটি দুধে ভরপুর আর স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেয়ালা দ্বারা দুধ বণ্টন করছেন। কারো হাতে ছোট পাত্র, আবার কারো হাতে বড় পাত্র। সবাই নিজ নিজ পাত্র দুধ দ্বারা ভরে নিয়ে যাচ্ছে।

হযরত পাত্র ছোট বড় হওয়ার তাবির করেছেন এভাবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির ইলমের পাত্র হিসেবে পাত্র বড়-ছোট ছিল। যার যার পাত্র অনুযায়ী ইলম নসিব হবে।

## দারুল উলুমের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার বিশেষত্ব

দারুল উলুম নামের প্রতিষ্ঠানটি নিয়ম-নীতি ও বিধিবিধানও ইলহামীভাবে পরিচালিত। আমার ২৫-২৬ বছর যাবত পরিচালনা বা মুহতামিমির অভিজ্ঞতা রয়েছে। সে বছরগুলোতে আমার এ বিষয়টি অত্যন্ত ভালভাবে অনুধাবন হয়েছে যে, এ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার পিছনে অবশ্যই কোন অদৃশ্য শক্তি রয়েছে। আর তার মূল চালিকাশক্তি বাহ্যিক শ্রম ও চেষ্টার উর্ধ্বে কোন বাতেনী শক্তি রয়েছে, যা তাকে থামিয়ে রেখেছে, ধরে রেখেছে। আমাদের অনেক দুর্বলতা ও বেখেয়ালি রয়েছে। কিন্তু আকাবিরদের ফয়েজ ও বরকতে স্বাভাবিকভাবে কাজ চলছে। অন্যথায় বর্তমান সময়ে ইলমে দীনের প্রতি আগ্রহ-উদ্দীপনা রাখা কেমন যেন পূর্ব যুগের মালামিয়া ফিরকার ন্যায়।

এমনিভাবে আজ যারা তিরস্কার ও ধিক্কার শুনতে আগ্রহী, তারা যেন মৌলভী মাওলানা হয়। দীনের প্রতি অনীহার যুগে যখন মানুষ ইলমে দীন হতে অনেক দূর সরে গেছে। তখনও দারুল উলুম টিকে থাকা এবং দিন দিন তার উন্নতি সাধন হওয়া এ কথার প্রমাণ যে, তা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যে বছর বিরুদ্ধবাদীরা চেষ্টা করেছে মাদরাসার চাঁদা কমানোর জন্য, সেই বছর অন্য বছরের তুলনায় আরও বেশি চাঁদা উসূল হয়েছে। ফলে বিরোধীদের লজ্জা পেতে হয়েছে। এহেন ফেতনার যুগে দারুল উলুম প্রতিষ্ঠিত থাকা বাহ্যিক কোন আসবারের উপর নির্ভর করে নয় বরং অদৃশ্যে এমন শক্তি ও সাহায্য রয়েছে, যা দারুল উলুমকে পরিচালনা করছে।

সম্ভবত ১৩৪৭ হিজরীর প্রথম সন। মৌলভী গুল মোহাম্মদ খান সাহেব– যিনি মাদরাসার হিসাব রক্ষক ও বোডিং ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করতেন– রজব মাসের শেষ তারিখে আমার নিকট এসে বললেন, হুজুর! মাদরাসার তহবিলে এক পয়সাও নেই। পরশু আড়াই হাজার রুপি বেতন হিসেবে বণ্টন করতে হবে। তার কথা শ্রবণ করে আমি বললাম, চিন্তার কোন কারণ নেই; এগুলো যার কাজ তিনিই তা করবেন। মোহাম্মদ খান সাহেব চলে যাওয়ার পর সকল ওস্তাদকে আমার রুমে ডেকে আনলাম এবং সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা দারুল উলুমে কেন পড়ে আছেন? আপনাদের উদ্দেশ্য কী? দীনি খেদমত কি আপনাদের উদ্দেশ্য, না বেতন গ্রহণ করা।

## দারুল উলুম দেওবন্দের ওস্তাদগণের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য

সকল আসাতিজায়ে কেরাম একবাক্যে উত্তর দিলেন, আমাদের উদ্দেশ্য হলো পবিত্র আমানতের নিঃস্বার্থ খেদমত করা, যা আমাদের উপর আকাবিরদের পক্ষ থেকে অর্পণ করা হয়েছে। বেতনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি কখনও নিবিষ্ট নয়। আমি বললাম, যদি বেতন না পান, তাহলে কী করবেন? তারা উত্তর দিলেন, ক্ষুধার্ত থাকব; তবু দরস ও তাদরিসের কাজ চালিয়ে যাব। তখন বললাম, আলহামদুলিল্লাহ। এখন আপনারা নিশ্চিত থাকুন ইনশাআল্লাহ দারুল উলুমও চলবে এবং আপনাদের নির্ধারিত বেতনও চলবে। তহবিলের কোন টাকা-পয়সা নেই। দোয়া করুন, আল্লাহ যেন আকাবিরদের আমানতকে টিকিয়ে রাখার জন্য আমাকে লজ্জিত না করেন। তখন সবাই দীনতা, হীনতা এবং একাগ্রতার সাথে কান্নাকাটি করে আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন। তাতে এমন ফলাফল প্রকাশ পেল যে, এখনও বেতন বণ্টনের

নির্ধারিত সময় হয়নি, তার পূর্বেই আল্লাহ আড়াই হাজার রুপির ব্যবস্থা করে দিলেন। তন্মধ্যে দু-হাজার রুপি এসেছে কলকাতার এক ব্যবসায়ীর পক্ষ থেকে আর বাকি পাঁচশত রুপি এসেছে মিরাটের প্রসিদ্ধ খান সর্দার শেখ রশিদ খান কন্ডাক্টরের পক্ষ হতে। তিনি ঘটনাক্রমে দুহরায়ে দেওয়ান যাওয়ার পথে মাদরাসায় এসে পাঁচশত রুপি দান করে যান।

মোটকথা, দারুল উলুমের ভিত্তি যেমনভাবে আল্লাহর পক্ষ তে নির্মিত, তেমনিভাবে তার কার্যাবলিও আল্লাহর পক্ষ হতে পরিচালিত হয়। আর এমনিভাবেই দারুল উলুম দিন দিন উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে।

অনেক পূর্ব থেকেই ইচ্ছা ছিল পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান খুব জাঁকজমকপূর্ণভাবে আঞ্জাম দিব। দেশের সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিকে দাওয়াত করব এবং অতীত ফারেগীনদের ডাকব। কিন্তু দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি আমাকে বিরত থাকতে বাধ্য করেছে। হয়তো আগামী বছর এ কাজে সফল হব ইনশাআল্লাহ।

## দারুল উলুমের আত্মা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য বস্তু হলো তার রূহ, তার বিল্ডিং নয়। আর শিক্ষা হলো দারুল উলুমের আসল রূহ বা প্রাণ। যদি দারুল উলুম তার মূল উদ্দেশ্য শিক্ষাক্ষেত্রে সফল হয়, তাহলে সে তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করে ফেলেছে। আর জনগণের প্রদত্ত টাকা-পয়সাও কাজে লাগিয়েছে। এর প্রমাণ পরীক্ষার ফলাফল দ্বারা প্রকাশ পাবে, যা এখন আমি আপনাদের সামনে বর্ণনা করব।

এ বছর দারুল উলুমে অতিরিক্ত তিনটি বিভাগ খোলা হয়েছে–

**১. কারিগরি বিভাগ :** তাতে কারিগরি বিদ্যা শিখানো হবে। সাধারণত আলেমদের লালন-পালনের দায়িত্বভার আমজনতার উপর ন্যস্ত। যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেকে ব্যস্ত রাখেন, তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা স্বজাতির উপর ফরজ। তবে যুগের চাহিদা হলো জাতিকে নিজেদের ব্যাপারে আত্মনির্ভর করা। এ শাখায় সাতজন প্রশিক্ষণ কাজ করে দায়িত্ব পালন করেন। এ শাখার দ্বিতীয় অংশ কাজ হলো হস্তলিপি প্রশিক্ষণ। এ শাখার গোড়াপত্তন করা হয়েছিল ১৩৬৪ হিজরী সনে। বর্তমানে চারজন হস্তশিল্পী তাতে দায়িত্ব পালন করছেন। তারা হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।

**২. শরীরচর্চা বিভাগ :** আত্মার খাদ্যের সাথে সাথে শারীরিক খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ শাখা খোলা হয়েছে। এ শাখায় দুজন ওস্তাদ দায়িত্ব পালন

করেন। দিল্লীর বাসিন্দা হাজী মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব আজ সকলবেলা এ শাখা পরিদর্শন করেন এবং শিক্ষার্থীদের মনোরঞ্জনের জন্য ত্রিশ রুপি পুরস্কার হিসেবে তাদের প্রদান করেন।

**৩. ছাত্র সংসদ :** এ বিভাগটি তো অনেক দিন ধরে চলে আসছে। তবে এ বছর তাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হয়েছে বা নিয়মতান্ত্রিক করা হয়েছে। তার কাজের ফলাফল আগামী বছর স্ববিস্তারে দেখা যাবে। এ বিভাগে ৪টি শাখা রয়েছে– ১. আরবী ভাষা চর্চা, ২. উর্দু ভাষা চর্চা, ৩. আরবী বক্তৃতা প্রশিক্ষণ, ৪. উর্দু বক্তৃতা প্রশিক্ষণ।

তালেবে ইলমদের মনোরঞ্জনের জন্য এখন পুরস্কার বিতরণ করা হবে। যাতে পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রদের মাঝে আগ্রহ-উদ্দীপনা ও উৎসহ সৃষ্টি হয়। আর যারা পরাজিত হয়েছে, তারা যেন লজ্জা অনুভব করে ভবিষ্যতে পড়ালেখার প্রতি মনোযোগী হয়। যদিও এ পর্বটি অত্যন্ত নিরানন্দময়; কিন্তু মূলত এটিই হলো শিক্ষার নির্যাস ও মানদণ্ড। আমি আশাবাদী, আপনারা পুরোপুরি মনোযোগ দিয়ে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানটি উপভোগ করবেন।

# বয়ান : ১০

## ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে দারুল উলুম দেওবন্দ

ভারত স্বাধীনতায় উলামাদের ভূমিকা থেকে অনুমান করা যায়, দারুল উলুম দেওবন্দ শুধু লেখাপড়ার ভিতর সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাতে নিম্নোক্ত আন্দোলনগুলোও নিহিত ছিল। দেশ ও জাতির স্বাধীনতা, গোলামী ও দাসত্ব হতে মুক্তি, ধর্মীয় একতা, স্বদেশীয় একতা, জাতীয় স্বকীয়তা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, স্বনির্ভরতা, সামরিক শক্তি অর্জন, জনগণের সাথে সম্পৃক্ততা, বিশেষ ব্যক্তিদের সাথে সুসম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়গুলোও সেখানে বিবেচিত হতো।

আর দারুল উলুমের প্রতিষ্ঠা ছিল একটি 'বিশেষ গবেষণা প্রতিষ্ঠান'-এর প্রতিষ্ঠা।'

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ. وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ:

## স্বাধীনতার আনন্দের পূর্ণতা

আজ ১৫ আগস্ট ১৯৫৭ খ্রি., যা ভারতের স্বাধীনতা দিবস। হিন্দুস্তানের সকল জনগণ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সবাই আনন্দ উদযাপন করছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, স্বাধীনতার আনন্দের চেয়ে বড় কোন আনন্দ নেই। কারণ, স্বাধীনতাই হলো সকল আনন্দের উৎস। এ মহান স্বাধীনতা তো আমাদের হঠাৎ মিলে যায়নি এবং আকাশ হতে বৃষ্টির ন্যায়ও বর্ষিত হয়নি। বরং তার জন্য অনেক দিন, মাস ও বছরের পর বছর ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। অনেককে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলতে হয়েছে। অনেককে জেল-জুলুম সহ্য করতে হয়েছে, অনেককে নিজের শরীরের তাজা রক্ত ঢালতে হয়েছে। আবার অনেককে রক্তে গড়াগড়ি খেয়ে লাশ হতে হয়েছে। এত কিছুর পর আমাদের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। যদিও আজকালের ইতিহাসে আযাদির পার্সেল একসঙ্গে এবং নিরাপদে রাত ১২টার সময় আমাদের কাছে চলে এসে পৌঁছেছে। অথচ এ স্বাধীনতা কত যে দুর্গম ও অন্ধকার সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ভারতবর্ষে পৌঁছেছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। আর কত যে ঝড়-তুফান মাড়াতে হয়েছে এবং কত সংশয়, আতঙ্ক যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আর

সেগুলোকে কত লৌহমানব যে ভেঙ্গে চুরমার করেছে, তারও কোন হিসাব নেই। এমন কিছু জটিল, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের আবর্তে আমাদের স্বাধীনতা দিবসটি জড়িত, যেগুলোকে ভোলা যায় না।

এ জন্য স্বাধীনতার আনন্দের সাথে সাথে যদি ঐ সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, জুলুম-নির্যাতন যে সকল সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ অম্লানবদনে সহ্য করেছেন আর যারা স্বাধীনতার প্রথম পতাকাবাহক, তাদের দাস্তান তুলে ধরা না হলে স্বাধীনতার আনন্দ পরিপূর্ণ অনুভব হবে না, স্বাধীনতা দিবসটি আলোকোজ্জ্বল শানদারও হতে পারে না। কারণ, আমাদের আনন্দ উৎসবের এমারত ঐ সমস্ত নির্যাতিত ব্যক্তিদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি তাঁরা জেল-জুলুম সহ্য না করতেন এবং ফাঁসির কাষ্ঠে না ঝুলতেন, তাহলে স্বাধীনতা দূরের থাক, তার গন্ধও পেতাম না। তাই আমাদের উৎসব তাঁদের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করা ছাড়া পূর্ণতা পাবে না।

## স্বাধীনতার হিরো যাঁরা

এমন উঁচু মর্যাদার অধিকারী অনেক ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, যারা স্ব-স্ব স্থানে নিজের নির্ভীকতা দেখিয়েছেন এবং দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে নিজ ব্যক্তিত্বকে মিটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগের ক্ষেত্র তৈরি করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই হিরো পর্যায়ের। তাদের জীবনবৃত্তান্ত ও আলোচনায় ইতিহাসের পাতা ভরপুর।

এখন আমি একজন নামি-দামি মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা করব, যিনি ১৮৫৭ সনে শামেলী প্রান্তরে সংঘটিত স্বাধীনতা যুদ্ধে সিপাহসালার হিসেবে অংশগ্রহণ করে সামনে থেকে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। তিনি জয়-পরাজয় সামনে রেখে দেশকে স্বাধীন করার জন্য এমন একটি রাজপথ কায়েম করেন, যার ফলে দলে দলে স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ দেশ স্বাধীনে অংশগ্রহণ করতে থাকে। তিনি জাতির দেল, দেমাগ ও মেধাকে এমনভাবে ধোলাই করেন, যার ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা, কলমের স্বাধীনতা, দেশ ও জাতির স্বাধীনতার ভিত্তি হয় তাঁর তারবিয়াত, যা শামেলীর ময়দানের যুদ্ধ ও তীর-তরবারী দ্বারা অর্জন হয়নি। আমি যাঁর কথা বলতে চাচ্ছি, তিনি হলেন দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতুবী, যিনি আপন শায়েখ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ কুদ্দিসা সিররুহুর দেল ও দেমাগের এবং ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে

ইমদাদুল্লাহি যবানের ভূমিকা নিয়ে প্রথমে শামেলির ময়দানে সামনে আসেন এবং সেই যুদ্ধের সমাপ্তির পর ইলম ও আমলে জাতিকে পথ দেখানোর জন্য দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করেন।

## শামেলীর ময়দানের ক্ষতিপূরণ

শামেলীর ময়দান আর দারুল উলুমের ময়দান একই সূত্রে গাঁথা। তবে দুটোর দুটো দিক ছিল। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, একটি হলো তলোয়ার, তীর ও বর্শার ময়দান আর অপরটি কলম ও যবানের ময়দান। শামেলীতে মূল লক্ষ্য ছিল কঠোরতার মাধ্যমে দেশ, জাতি ও ধর্মের স্বাধীনতা অর্জন করা আর দারুল উলুমের মূল উদ্দেশ্য হলো নমনীয়তার মাধ্যমে ইলম, আমল, আখলাক ও সংবিধানিক রং দ্বারা রঙিন করা। শামেলীতে মূল লক্ষ্য অর্জনে ব্যক্তিকে ব্যবহার করা হতো আর দারুল উলুমে ব্যক্তি বানানো হতো। শামেলী হলো যুদ্ধপ্রান্তর নামে পরিচিত আর দারুল উলুম মাদরাসা ও পাঠাগার নামে পরিচিত। সেখানে কলব ও দেমাগের ইঙ্গিতে হাত ও পা কাজ করে আর এখানে স্বয়ং কলব ও দেমাগ নিজেই কার্য পরিচালনা করে।

মোটকথা, হযরত নানুতুবী রহ. শামেলী যুদ্ধের ফলাফল সামনে রেখে দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার বিধিবিধান ও কার্যাবলিকে এমনভাবে সুবিন্যস্ত করেন, যার ফলে শামেলী যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হবে। আর যে পরিকল্পনা তত সময়ে সফলতা লাভ করতে পারেনি, তা এখন লাভ হবে।

## সরকারি প্রভাবমুক্তির কৌশল

হযরত নানুতুবী রহ. দারুল উলুম দেওবন্দ এমনকি ১৮৫৭ সালের পর সকল দীনি প্রতিষ্ঠানের জন্য আট মূলনীতির একটি প্রাতিষ্ঠানিক সংবিধান তৈরি করেন, যাকে 'উসূলে হাশতেগানা' বলে, যা দারুল উলুমের মূল ভিত্তি ছিল। তার আট দফার সংবিধানে এমন কিছু গণতান্ত্রিক বিধান সংযোজন করেন, যেগুলো সময়ের দাবি ছিল। একদিক থেকে এগুলো ছিল একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জন্য, অপরদিকে ছিল সর্বসাধারণকে সাথে সম্পর্ক রাখার রূহ বা আত্মা। সেগুলোকে তিনি মেধা থেকে বের করে কাগজে লেখেন। তিনি তার অষ্ট বিধান দ্বারা জাতিকে সরকার ও তার মন্ত্রীপরিষদ থেকে প্রভাবমুক্ত করে, নিজপায়ে দাঁড়ানোর ইচ্ছা রাখেন। কারণ, যে জাতি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, তারা সর্বদা অন্যের দয়ার উপর জীবন যাপন করে, তারা হয় পরনির্ভর। একে

কেউ জীবন বলে না। এ হলে মরণ বা অর্থহীন জীবন।

১৮৫৭ সালের পর তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, যদি জাতির মাঝে দেশ ও রাজনীতির পাশাপাশি জ্ঞান ও চরিত্র, মন ও চিন্তা-চেতনায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও স্বাধীনতা না থাকে, তাহলে জাতির ভিত্তি ধ্বংস হয়ে যাবে। ফলে তারা কখনও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করতে পারবে না। তাই হযরত নানুতুবী রহ.-এর নিকট জাতির রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দাসত্ব হতে মুক্তির একমাত্র কৌশল ছিল এই অষ্ট বিধান, যা দীনি শিক্ষার পথ ধরে বৃহৎ ঐক্যের লাইনের উপর তুলে দিবে।

আর যখন এমনটি সম্ভব ছিল যে, শিক্ষা-দিক্ষার নিয়মনীতিকে ব্যক্তিগত নীতির পরিবর্তে সামাজিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করা, যাতে একদিকে জনশক্তি সঙ্গী হবে, অপরদিকে শিক্ষা ও শিক্ষানীতির লালন-পালনে ধর্মীয় নীতির সাথে সাথে সামাজিকতার রুচিও সৃষ্টি হয়।

তিনি অন্তরর্চোখে দেখছিলেন যে সময় মানুষকে উৎসাহিত করছে আর রাষ্ট্রীয় শক্তি সর্বসাধারণের দিকে ধাবিত হচ্ছে। যদি এমন অবস্থা চলতে থাকে, তাহলে জনতার মাঝে ধর্মহীনতার জীবাণু সৃষ্টি হবে। ফলে জাতিসত্তার ধর্মীয় চিহ্ন মুছে যাবে। এমনকি জাতির শেষ চিহ্নটুকুও অবশিষ্ট থাকবে না। এ কারণে তিনি দারুল উলুমের শিক্ষাক্ষেত্রে খালেস দীনি শিক্ষা চালু করেছেন আর তার নেযাম বা নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ধাঁচে, যাতে দীন ও নেযামে দীন উভয়টার সমন্বয়ে জাতির মাঝে দীনি স্বকীয়তার শক্তি সৃষ্টি হবে যে, রাষ্ট্র ও দীন একই জাতের যমজ শিশুর ন্যায় মিলিত, যা পৃথক করা যায় না।

## শামেলী যুদ্ধের দিক পরিবর্তন

হযরত রহ.-এর উসূলে হাশতেগানা দেখে আন্দায করা যায়, তিনি তা লেখার সময় মনে হয় শামেলীর ময়দানে দাঁড়ানো ছিলেন। জাতির পরাজয়ের দৃশ্য তাঁর সামনে ছিল এবং তিনি দেখছিলেন উপনিবেশ রাষ্ট্রযন্ত্র পরাজিত কওমের স্বাধীকারকে পায়ে পিষছে আর কওমের বুনিয়াদী ব্যক্তিত্ব, স্বকীয়তা ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে কেড়ে নিচ্ছে। সাথে সাথে ধর্ম ও জাতীয় ভিত্তিসমূহকে – যেগুলোর উপর জাতির ইজ্জতের ইমারত দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলোকে পদদলিত করছে, যার বিস্তারিত বর্ণনা 'সাওয়ানেহে কাসেমী রহ.' গ্রন্থে রয়েছে, যার ধারাবাহিকতা ১৮৫৭ সালের পূর্বে শুরু হয়েছিল।

হযরত রহ. ১৮৫৭ সালের পরাজয়ের পর অনুভব করলেন, এখন তলোয়ারকে তলোয়ার দ্বারা মোকাবেলা করার সময় নয়। তখন তিনি লোহার তরবারীকে খাপে ঢুকিয়ে শিক্ষার হাতিয়ারকে খাপ থেকে বের করে মোকাবেলার ময়দানে চলে আসেন। কেমন যেন শামেলীর যুদ্ধের এখনও পরিসমাপ্তি ঘটেনি বরং শুধু দিক পরিবর্তন হয়েছে ও অস্ত্রের ধরন পাল্টেছে আর যুদ্ধ এখনও চলছে। এই নীরব যুদ্ধের প্রথম ধাপ কওমের সম্পদ ও তার হেফাজতের জন্য ছিল। তখন তাদের পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা-দীক্ষা না থাকার কারণে। এ কারণে এই নতুন পদক্ষেপে তালিম-তারবিয়াতের রাস্তা হতে পুরনো অশিক্ষা অদীক্ষার কুফলের চিহ্ন ও অনুভব শক্তির দুর্বলতা দূরীকরণ ছিল, যাতে হিম্মতে ঘাটতি না আসে।

## স্বাধীন নেযাম স্থায়ীকরণের ফয়সালা

দ্বিতীয় ধাপ ছিল ধর্মের চারিত্রিক শিক্ষা, অন্তর পরিশোধন, আত্মা পবিত্রকরণ এবং জাতিকে এ শিক্ষা দেয়া ছিল যে, ভালবাসা হবে আল্লাহর জন্য আবার দুশমনি হবে তাও আল্লাহর জন্য হবে, যাতে মানবিক স্বাধীন জীবন সুদৃঢ় হয়। তৃতীয় ধাপ ছিল ইলম, আমল ও চরিত্রকে এমন ধাঁচে তৈরি করা, যাতে ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং দেশ-জাতির স্বাধীনতার জযবায় ভরপুর ছিল, যাতে চিন্তা-গবেষণার সাথে ইখলাস ও ইসার (নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়া) এবং জাতি গঠনে নিজ আত্মা সচল হয়।

দারুল উলুমের সামাজিক জীবনের বুনিয়াদী উসূল হযরত রহ. এমন মুহূর্তে প্রণয়ন করেন, যখন দেশের নব্য দখলদার রাজা-বাদশারা জনসাধারণের আবেগ থেকে দূরে সরে নিজেদেরকে দখলদার শক্তির কোলে নিক্ষেপ করেন। স্বাধীনতা অর্জনের পরিবর্তে তাদের ওয়াফাদারীর ওড়না মাথায় পরেছেন। আর জাতিগত সম্পর্ক থেকে রাষ্ট্রীয় সম্পর্ককে অগ্রাধিকার দিত। তিনি এহেন পরিস্থিতিতে এই আট উসূলের ভিত্তিতে দারুল উলুম দেওবন্দের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং এই ইলমী তানযীম থেকে বিশেষ ব্যক্তিদের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে শক্তিশালী ও উৎসাহিত করেছেন। দেশের উঁচু স্তর হতে সরে যারা হুকুমতের ক্রোড়ে আগ্রগামী হচ্ছিল, তিনি এই উসূলের মাধ্যমে তাদের স্থায়ী স্বাধীনতার নেযাম কায়েম করেন।

এই মৌলনীতি, দারুল উলুম দেওবন্দ ও তার শাখা-প্রশাখা দ্বারা দেশ ও জাতির ইলমী ও দীনি কী খেদমত হয়েছে? ১৮৫৭ সালের পর দেশের প্রতিটি

প্রান্তে এমনকি সারা মুসলিম জাহানের কোণে কোণে ইলম ও আখলাক এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণীর আলো কতটুকু পৌঁছেছে ও বিস্তৃত হয়েছে? এখানে এই সমস্ত বিষয়াবলি আমার আলোচ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য শুধু এ কথা বোঝানো যে, সামাজিক ক্ষেত্রে উক্ত উসূলের প্রতিক্রিয়া কেমন হয়েছে। সমাজে তার কার্যকারিতা কেমন আর দারুল উলুম দ্বারা ইলমী ইদারার রূপে সামাজিক অগ্রগতি ও উন্নতি এবং আমলের ক্ষেত্রে তার ফলাফল কেমন প্রকাশ পেয়েছে তা ব্যক্ত করা।

## নীরব রাহবার আট উসূল

উসূলে হাশ্‌তেগানার সমষ্টি খসড়ার ধারণা নেয়ার জন্য প্রথমে তার মূল অংশ পড়তে হবে। তারপর তার সৃষ্ট স্বাদ, রুচি এবং তা থেকে সৃষ্টি হওয়া প্রতিক্রিয়াসমূহকে দেখতে হবে, বুঝতে হবে। উসূলের মতন, যা হযরত স্বয়ং কলম দ্বারা লিপিবদ্ধ করেছেন, তা দারুল উসূলের ভাণ্ডারে সুরক্ষিত আছে। নিচে তার শিরোনাম দেয়া হলো।

## এমন কিছু উসূল যার উপর এই মাদরাসা ও অন্যান্য মাদরাসার চাঁদার ভিত্তি প্রতীয়মান হয়

এই শিরোনামের পরে নিচে বর্ণিত আটক উসূল লেখা আছে।

১. যথাসম্ভব সর্বদা মাদরাসায় যাতে বেশি চাঁদা আদায় হয়, সেদিকে নজর থাকবে। নিজে চেষ্টা করা এবং অন্যদের দ্বারা করানো। মাদরাসার হীতাকাঙ্ক্ষীদের সর্বদা মাদরাসার ব্যাপারে এমন চিন্তা ফিকির থাকবে।

২. ছাত্রদের পরিমাণমাফিক খাবারের ব্যবস্থা করে অতিরিক্ত খাবার সংগ্রহের ব্যাপারে সর্বদা সচেষ্ট থাকবে।

৩. মাদরাসার পরামর্শদাতাদের সর্বদা মাদরাসার কল্যাণ ও নিয়ম-নীতির প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। নিজ সিদ্ধান্তের পিছনে পড়া যাবে না। আল্লাহ না করুন যদি এমন হয়ে যায় যে, পরামর্শদাতাদের রায় এবং অন্যান্যদের রায় এক না হওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে তা মাদরাসার ভিত্তিমূলে অবনতি নেমে আসবে।

মোটকথা, গভীর অন্তর থেকে পরামর্শ দিয়ে এবং তাতে মাদরাসার কল্যাণের প্রতি খেয়াল রাখবে; নিজের কথার পূজারী হবে না। আর এ জন্য জরুরি

হলো, পরামর্শদাতাদের রায় প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন কিছুর প্রত্যাশী হবে না। আর উপস্থিত সভাসদরা নেক নিয়তে শুনবে অর্থাৎ এমন ধারণা থাকবে যে, যদি অন্যের অভিমত আমার মতামতের বিপরীত হয়, তাহলে আমার মত পরিবর্তন করে তার মতামত মনে-প্রাণে গ্রহণ করে নেব। আর এমন অবস্থা তৈরি জন্য জরুরি হলো মাদরাসার মুহতামিম বা পরিচালক সাহেব পরামর্শের বিষয়বস্তুগুলো পরামর্শদাতাদের থেকে পরামর্শক্রমে ঠিক করবে। চাই তাঁরা এমন মানুষ হোক, যারা সব সময় পরামর্শ দিয়ে থাকে। চাই কোন আগন্তুক হোক, যিনি জ্ঞান ও বুদ্ধি রাখেন এবং ওস্তাদদের কল্যাণকামী হন। আর এটা এ কারণে জরুরি যে, যদি ঘটনাক্রমে কোন কারণে কোন পরামর্শদাতার পরামর্শ নেয়ার সুযোগ না হয় এবং প্রয়োজনমাফিক, কোরাম পূরণ হয় এমন সংখ্যক মুশীর থেকে পরামর্শ নেয়া হয়, তাহলে ঐ ব্যক্তি এ কথা বলতে পারবে না যে, আমাকে কেন জিজ্ঞেস করা হয়নি আবার সে নারাজও হতে পারবে না। হ্যাঁ, মুহতামিম সাহেব যদি কাউকে জিজ্ঞেস না করেন, তাহলে পরামর্শদাতারা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারে।

৪. আর এ বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি যে, মাদরাসার সকল আসাতিযা একই পাত্রে পানি পানকারী হয়ে অর্থাৎ দলবদ্ধ, ঐক্যবদ্ধ থাকবে। চাকরিজীবী, আত্মপূজারী আলেমদের মত নয়। আবার একজন অপরজনকে অপদস্থ করবে না, অপরের কুৎসা রটাবে না। আল্লাহ না করুন, যদি এহেন অবস্থা বিরাজ করে, তাহলে মাদরাসার কল্যাণ হবে না।

৫. সাধারণত পড়ালেখা এমন আন্দাযে হবে, যেভাবে প্রথমে নির্ধারণ করা হয়েছিল অথবা পরবর্তীতে পরামর্শক্রমে যে পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে, সেটুকু পূর্ণ করা চাই। অন্যথায় প্রথমত মাদরাসা খুব একটা আবাদ হবে না আর যদি হয়ও, তাহলে বেশি লাভজনক হবে না।

৬. যতক্ষণ না মাদরাসার আয়-উন্নতির কোন পথ নিশ্চিতরূপে সৃষ্টি না হয়, তাহলে ইশআল্লাহ, আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা সাপেক্ষে স্বাভাবিকভাবে চলবে। আর যদি আয়-উন্নতির কোন রাস্তা নিশ্চিতভাবে খুলে যায় যেমন জায়গীরের ব্যবস্থা অথবা ব্যবসায়ী কারখানা তৈরি বা কোন নির্ভরশীল ধনী ব্যক্তির মৌখিক ওয়াদাকরণ ইত্যাদি, তাহলে এমন মনে হয় যে, ভয় ও আশা যা রুজু ইলাল্লাহর হাত থেকে চলে যাবে এবং গায়েবী সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে এবং প্রতিষ্ঠানের ভিতরে পরস্পর মতানৈকট্য সৃষ্টি হবে। মোটকথা, আমদানি ও নির্মাণ ইত্যাদির মধ্যে এক প্রকার অভাব-অনটনের অনুভূতি রাখবে।

৭. সরকারি অংশীদারিত্ব এবং এমপি, মন্ত্রীদের অংশীদারিত্ব ক্ষতিকর।

৮. যথাসম্ভব এমন মানুষদের চাঁদা বেশি বরকতময় মনে হয়, যারা চাঁদা দ্বারা নিজেদের নাম-কামের আশাবাদী হয় না। মোটকথা, ভালো নিয়তে যারা চাঁদা দেন, তাদের চাঁদা বেশি বরকতময় মনে হয়।

## জনতার প্রতিষ্ঠান এবং তাদের সাথে সম্পর্ক

১. এই উসূলে হাশতেগানার উৎস থেকে হযরত রহ. সর্বপ্রথম এ প্রতিষ্ঠানকে আমজনতার প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দান করেছেন এবং তার দায়দায়িত্ব বা পরিচালনার ভার ন্যস্ত করেছেন জনগণের চাঁদার উপর। অর্থাৎ এ প্রতিষ্ঠান কোন সরকার বা পার্টির নয় বরং জনসাধারণের। তারপর তার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর আবেদন জনগণের উপর রেখেছেন, যার ধারাবাহিকতা কোন মাধ্যম দ্বারা বা ছাড়া কায়েম রাখার জন্য হেদায়েত দিয়েছেন, যাতে কোন সময় বা কোন অবস্থাতেই জনগণের সাহায্য ও তাদের থেকে পৃথক না হয়। তার জনসাধারণের নেক নজর যেন কখনও মাদরাসা থেকে দূরে না চলে যায়। সাথে সাথে বেশি বেশি চাঁদা আদায় করার চেষ্টা ও জারি রাখতে তাকিদ দিয়েছেন। আর বেশির কোন সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়নি, যাতে যে পরিমাণ চাঁদা বাড়বে, সেই পরিমাণ প্রতিষ্ঠানের পরিধিও বৃদ্ধি পাবে এবং জনগণের সাথে বেশি বেশি সম্পর্ক সৃষ্টি হতে থাকবে।

সুতরাং এই মূলনীতি আলোকে প্রতিষ্ঠানের মজলিশে শূরাকে (যারা প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার জিম্মাদার) দাতাদের উকিল এবং সম্পদে সর্বসাধারণের প্রতিনিধি হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে, যার অর্থ হলো সর্বসাধারণ চাঁদা ব্যয় করেন এমনকি মজলিসে শূরার মাধ্যমে তারা সম্পদ ব্যয়ের খাতগুলোর নেগরান ও আনুমোদনকারীও। আর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের সকল কাজ তাঁদের দখলে।

বর্তমান বিশ্বে রাজনীতিবিদ অথবা হুকুমত পরিচালনাকারী গোষ্ঠী বুনিয়াদী উসূল কি তা থেকে ভিন্ন? বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে আন্দোলন করার বুনিয়াদী উসূল, জনগণের সাথে সম্পৃক্ততা ছাড়া আর কী আছে? আর জনগণের সাথে সম্পৃক্ততার প্রক্রিয়া এ ছাড়া অবশিষ্ট থাকে না যে, তাদেরকে কেন্দ্রের সাথে জড়িয়ে তাদের শক্তি দ্বারা কাজ নেয়া হয় এবং তাদের দেয়া চাঁদা দ্বারা প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলকি এগিয়ে নেয়া হয়। খেলাফত কমিটি প্রতিষ্ঠার পর তিনি জনতাকে মেম্বার বা সদস্য বানিয়ে তাদের জন্য একটি ফি নির্ধারণ করেন। কংগ্রেস কমিটি নবায়ন হলে তিনি জনসাধারণ থেকে চারজনকে সদস্য বানিয়ে কাজ পরিচালনা করেছেন। এছাড়া অন্যান্য দল বা পার্টি

প্রতিষ্ঠা হলে তিনি জনগণকে মেম্বার বানিয়ে মেম্বারদের জন্য ফি নির্ধারণ করে জনগণের সাথে সম্পর্ক কায়েম করেন। ফলে আন্দোলনের কাজে অগ্রগতি হয়।

হযরত নানুতুবী রহ. আজ হতে শত বছর পূর্বে যখন জনসাধারণের সাথে সম্পৃক্ততার সিস্টেম সাধারণত নজরে আসেনি, তখন তিনি জনতার প্রতিষ্ঠান কায়েম করে তাদের উপর ফি নির্ধারণ করে জনগণকে চাঁদার নামে ইদারার সাথে সম্পৃক্ত করেছিলেন। পরবর্তীতে এ কর্মপদ্ধতিকে চক্ষুষ্মানরা শুধু মাদরাসায় সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং সংস্থা-কমিটি গঠনেও কাজে লাগিয়েছেন। তাতে পার্থক্য শুধু এটুকু যে, রাজনৈতিক সংস্থার কাজ ছিল রাজনীতি করা আর দারুল উলুমের উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতি এবং দীনদারী উভয়টির সমন্বয়। রাজনৈতিক কমিটি রাজনীতির শিরোনামে কাজ করেছে আর দারুল উলুম নিজ রাজনীতিকে তালিমী লাইনে আগে বাড়িয়েছে। ফলে দেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে দীন ও জাতির স্বাধীনতায় রূহ তৈরি হয়েছে।

অতএব উক্ত প্রাথমিক উসূল, যার দ্বারা চাঁদার মাধ্যমে দেশের আমজনতা ও গ্রাম্য গরিবদের সাথে বেশি বেশি সম্পর্ক সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য ছিল, যাতে একদিকে জনসাধারণ দারুল উলুমকে নিজের প্রতিষ্ঠান মনে করত আর অপরদিকে এ ইলমী ইদারার সাথে জড়িত থেকে তাদের মাঝে ইলমী অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টি হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, প্রতিটি জনগোষ্ঠীতে অধিকাংশই গরিব এবং সাধারণ লোক থাকে আর তারাই সেই জাতি-গোষ্ঠীর শক্তি ও মেরুদ- হয়ে থাকে। এ কারণেই প্রতিটি সামাজিক কর্মের গ্রহণযোগ্য অভিমত জনসাধারণের উপর ন্যস্ত থাকে। এ কারণেই উল্লিখিত উসূলের মাধ্যমে জনসাধারণের অভিমতকে আয়ত্বে নিয়ে বাস্তবে দেশ ও জাতির স্বাধীনতার এক বুনিয়াদী অংশ অর্জন করে ফেলে। আর এটি সামাজিক লাইনের প্রথম পদক্ষেপ ছিল; যা দারুল উলুম প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে অর্জন করতে পেরেছিল।

## সরকারি অনুদানের বিকল্প

২. দ্বিতীয় উসূলের মাঝে জাতির গরিব শ্রেণীর সন্তানদের অর্থাৎ ছাত্রদের খাবারের ব্যবস্থা, লেখাপড়ার ব্যবস্থা ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা ইত্যাদি এবং এগুলোর প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নকে জরুরি মনে করা হয়েছে, যাতে তাদের মনোরঞ্জন এবং জড়িয়ে থাকার মাধ্যমে দেশ ও জাতির সম্পৃক্ততা এ

প্রতিষ্ঠানের সাথে বেড়ে চলেছে। কেমন যেন প্রথম উসূলে যদিও জনগণের সাথে সম্পর্কের মাধ্যম বানানো হয়েছে, যা পঞ্চাশ বছর পর আন্দোলন এবং গণতন্ত্রীদের জন্য ফাউন্ডেশনরূপে কাজ করেছে। আর দ্বিতীয় উসূলে স্বয়ং জনসাধারণকে ইদারার দিকে ধাবিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে, যাতে দুদিক থেকে সম্পর্কের ফলে পরস্পর বন্ধনের বুনিয়াদ দিন দিন দৃঢ় হতে থাকে।

তখনকার যুগের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা জনসাধারণের দান ও তার কালেকশন গরীব ছাত্রদের সাহায্য করাকে ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তির নামে সম্বোধন ও ব্যাখ্যা করত। কারণ, ১৮৫৭ সালের পর দেশে চাঁদাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা একটা নতুন বিষয় ছিল। আর সর্বপ্রথম চাঁদাভিত্তিক মাদরাসা ছিল দারুল উলুম দেওবন্দ, যা ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৮৬৭ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। হযরত নানুতুবী রহ. অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অনুভব করতে পেরেছিলেন, সরকারি সাহায্য-সহযোগিতার সাথে জাতীয় জীবন কখনও সফল হতে পারে না। তবে সরকারি সাহায্যের বিপরীতে জনগণের সাহায্যের বিকল্প নেই। এ কারণে ঐ তিরস্কারকারীদের তিরস্কারকে উপেক্ষা করে তিনি ইংরেজ সরকারের নাকের ডগায় দারুল উলুমকে কওমী সহযোগীর লাইনে আগে বাড়িয়েছেন এবং দিন দিন উন্নতির দিকে নিয়ে গেছেন। কিন্তু যুগের পরিবর্তন, জনগণের সাথে সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বকে অতি তাড়াতাড়ি বুঝিয়ে দিয়েছেন। পরিশেষে ভিক্ষা ও ভিক্ষাবৃত্তির সিস্টেমকে সকল জাতির কর্ণধারদের গ্রহণ করতে হয়েছে। এ কারণে বলা হয়ে থাকে, এ ব্যাপারে দারুল উলুম দেওবন্দ সারা মুলুকের নেতৃত্ব দিয়েছে। আর জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের এই প্রাথমিক উসূল কার্যকরীভাবে দুনিয়ার সামনে তুলে ধরেছে।

## বিশেষ ব্যক্তিবর্গের মনোরঞ্জন

৩. সামাজিক লাইনে রাবেতায়ে আওয়াম (জনসাধারণের সাথে সম্পর্ক)-এর সাথে সাথে বিশেষ ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক ও অতীব জরুরি মনে করা হয়। তাই তিনি তৃতীয় উসূলে বিশেষ ব্যক্তিবর্গের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা রেখেছেন, যার ফলে এই প্রতিষ্ঠানকে ব্যক্তিগত বা একক পরিচালক ভিত্তিক না রেখে শূরার মাধ্যমে পরিচালনার ব্যবস্থা রেখেছেন, যাতে তার কার্যাবলি ব্যক্তি কেন্দ্রিক না হয়ে সমষ্টিগতভাবে পরিচালিত হয়। কেননা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক

কর্মগুলো ব্যক্তির সাথে সাথে নিঃশেষ হয়ে যায় আর সমষ্টিগত কর্মগুলো ব্যক্তির চলে যাওয়ার দ্বারা বন্ধ হয় না বরং চলতে থাকে।

সাথে সাথে বিশেষ পার্সনের ক্ষমতা রদ ও কবুল উভয়টার মাপকাঠিতেও বলে দিয়েছেন যে, শূরা সদস্যদের মুখলিস হওয়ার পাশাপাশি সততা ও স্বার্থত্যাগী হতে হবে আর সামাজিকতার রুচিও থাকবে। নিজ কথার উপর অবিচল থাকবে না এবং নিজ অভিমতের পূজারী হবে না। ফলে কারো অভিমত বিপরীত হলে ওয়াক আউট বা সভা ত্যাগের জযবা চলে আসবে। তাই শূরা সদস্যদের সত্যচারী হতে হবে যে, নিজ রায় প্রকাশে সত্য প্রকাশ পেলে মাথা পেতে মেনে নিবে। সুতরাং একজন স্বাধীনতাপ্রিয় মনুষ তো এমন হবে যে, সত্য রায় প্রকাশে সংকোচ অনুভব করবে না এবং এমন এক রুচির অধিকারী হবে, যে অন্যের অভিমত বুঝে আসার পর মেনে নিতে চিন্তাও করবে না।

প্রকাশ থাকে যে, এই অন্তরের স্বাধীনতার সাথে যারা আযাদীর নিয়মাবলি ও ফরিজা আদায় করে, তাদের দ্বারা আযাদীর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আর এমন আযাদীর পরিবেশে শিক্ষা-দীক্ষাও সঠিক হবে। এই পরিবেশ থেকে শিক্ষা সমাপণ করে যারা বের হবে, তারা হবে স্বাধীনমনা, যা স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টির যোগ্যতা রাখে। সুতরাং তৃতীয় উসূল দ্বারা তিনি ভিতরগত আযাদীর বুনিয়াদ তৈরি করেছেন, যা বহিরাগত আযাদীর প্রথম তাঁবুস্বরূপ। এমনিভবে কেমন যেন আযাদীর আরেকটি ধাপ অর্জিত হলো।

তারপর এ বিশেষ পার্সনের সমতার পরিধি সীমাবদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত করেননি বরং অভিমত ও পরামর্শের দ্বার প্রত্যেক বুদ্ধিমান, মেধাবী, জ্ঞানী ও চিন্তাশীলদের জন্য খোলা রেখেছেন, যারা এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রতি ও তার উদ্দেশ্যের প্রতি দরদী ও মহাব্বতকারী হয়। কেমন যেন তিনি বিশেষ ব্যক্তিদের সাথে সম্পৃক্তার ব্যাপারে জনসম্পৃক্ততাকে উদ্বেগের মধ্যে ছেড়ে দেননি, যাতে এই প্রথিষ্ঠান বা ইদারা কিছু পরামর্শকদের পরামর্শের উপর সীমাবদ্ধ হয়ে দেশের সকল পরামর্শক ও বুদ্ধিজীবীদের চিন্তার সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে না যায়; যা কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষতি এবং ঐক্যবদ্ধ রাজনীতিতে দুর্বলতা ও বাধার কারণ হয়। পরিশেষে রাজনীতির সীমাবদ্ধতা ও একগুয়েমি বা স্বৈরাচার সৃষ্টি হয়ে পক্ষপাত, স্বজনপ্রীতি এবং বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত হওয়ার রোগজীবাণু সৃষ্টি হয়, যার ফলে স্বাধীনতা বাধাগ্রস্ত হয়। সুতরাং উক্ত উসূল দ্বারা আযাদীর রাস্তা হতে একটি ভারী পাথর বা বড় বাধা সরিয়ে দেয়া হয়েছে, যা আযাদীর নিয়ম-নীতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

## ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক একতা

৪. মারকাজ বা কেন্দ্রে মুরব্বী ও কর্মকর্তাদের সাম্প্রদায়িক একতা জরুরি মনে করা হয়, যাতে চিন্তা-চেতনার একতার দ্বারা দলীয় একতা দৃঢ় ও মজবুত থাকে। অন্যথায় মতভেদ ও মতানৈক্য, তারপর তা থেকে আত্মপূজা ও আত্মপ্রশংসীা তৈরি হয় এবং তা দ্বারা অপরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা ও কষ্ট প্রদান করার জীবাণু উত্থিত হয়ে ঐক্য ও অভ্যন্তরীণ সাম্যকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে। ফলে সমাজ ও দেশ পরিচালনায় দলাদলি শুরু হয়, যার পরিণামে গোলামী বা দাসত্বের শিকড়কে আরো মজবুত করে, যা একটি আযাদীপ্রিয় ও স্বাধীনতা অন্বেষণকারী জামাতের জন্য বিষাক্ত ধ্বংসকারী।

এ কারণে নানুতুবী রহ. গোলামী দূরীকরণ উসূল দ্বারা স্বাধীনতার আরেকটি প্রতিবন্ধক দূর করেছেন। অথবা ঐক্যবদ্ধ আযাদীর প্রোগ্রামের আরো একটি গুরুত্ববহ অংশ অর্জন করেছেন, যা দ্বারা আযাদীর মঞ্জিল নিকটতর ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে যায়।

## বিশ্বজনীন বিপ্লবের মানসিক প্রস্তুতি

৫. নেসাব অনুমোদন, পড়ানোর পরিমাণ এবং তালিমের পরিধিকে এই পঞ্চম উসূলের আলোকে এগুলো নির্ধারণের দায়িত্ব শুধু এক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করেননি, যাতে প্রশস্ত ও বিস্তৃত না হয়। আবার সাধারণ মানুষের অভিমত ও আন্দাযগত সিদ্ধান্তের উপর অবিন্যস্তও করেননি, যা বুদ্ধি, মেধা ও যুগচাহিদার বিপরীত হবে। বরং বিশেষ পরামর্শ এবং আহলে ইলম ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অভিমতের উপর ছেড়ে দিয়েছেন, যারা যামানার আলেম, চিন্তাশীল ও বিচক্ষণ এবং অন্যকে কষ্ট দেন না, যাতে তালিম স্বাধীন থাকার সাথে সাথে সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা এবং সময়ের চাহিদার প্রতিও খেয়াল থাকে। প্রকাশ থাকে যে, এমন আবাদপ্রিয় দিল ও দেমাগ যাতে রয়েছে শিক্ষার আলো, তা দ্বারা শুধু আযাদী এবং নিয়ম-কানুন মান্যতাই সৃষ্টি হয়। আর এমন মধ্যমপন্থী ব্যক্তিদের দ্বারা শান্তিময় ইনকিলাবের আশা করা যেতে পারে, যা দেশের সকল জাতি-গোষ্ঠীর নিকট গ্রহণযোগ্য ও উপকারী হবে, যা লাগামহীন মানুষ দ্বারা সম্ভব নয়। আবার দাসত্বপ্রিয় এবং সংকীর্ণমনা মানুষ থেকে আশা করা যায় না। সুতরাং এই পঞ্চম উসূল দ্বারা সাধারণ আযাদী এবং দেশময় ইনকিলাবের মানসিক প্রস্তুতি ও যোগ্যতা সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে, যার দ্বারা আযাদীর গন্তব্যকে অতি

কাছাকাছি নিয়ে আসা হয়েছে।

এ কথায় কোন মতভেদ নেই যে, প্রত্যেক ইনকিলাবপ্রিয় প্রতিষ্ঠান বা ইদারা নিজ ধারার ইনকিলাব অনুযায়ী ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে ব্যক্তি তৈরি করে বা সদস্য তৈরি করে। সংকীর্ণমনারা সংকীর্ণমনা ব্যক্তি তৈরি করে। আর উগ্রবাদী-চরমপন্থী গোষ্ঠীরা, চরমপন্থামিশ্রিত কোর্স প্রতিষ্ঠা করে এবং দিল, দেমাগ ও মেধাকে সংকীর্ণমনা বানায়। পরিণামে যারাই ইনকিলাবে সফল হতে পারে, তারা তাদের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করে। উগ্রবাদী-চরমপন্থী হলে চরমপন্থা বিস্তার করে আর ফেরকাপূজারী হলে ফেরকাপূজা বিস্তার করে।

এ কারণে হযরত রহ. নেসাবকে অলস, কুটিল ও নিরেট আনমনা বা উদাসীন ও গোলামীপ্রিয় উভয় প্রকার মস্তিষ্কওয়ালা মানুষ থেকে পৃথক রেখে মধ্যমপন্থী মানুষ দ্বারা প্রণয়ন করিয়েছেন, যাতে প্রতিটি স্তরের মানুষদের দিল ও দেমাগকে বিস্তৃত করতে পারে। ফলে তাদের দ্বারা মধ্যমপন্থী ইনকিলাব সৃষ্টি হবে, যাতে কোন চরমপন্থা থাকবে না।

## আধ্যাত্মিকতা ও আখলাকের মাধ্যমে আযাদীর মঞ্জিল

৬. দান ও চাঁদার ক্ষেত্রে ধনীদের প্রতি নজর এবং তাদের ওয়াদা-অঙ্গীকার বা জায়গীর প্রদান বা ব্যবসায়িক কারখানা ভিন্ন ভিন্ন আমদানির মাধ্যমের উপর ভরসা রাখার ব্যাপারে এই ষষ্ঠ উলুমের মধ্যে যথেষ্ট ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, যাতে মানসিক ভয় এবং দিল ও দেমাগের বন্ধ্যাত্বের রোগ-জীবাণু লালিত-পালিত বা বাড়তে না পারে আর ইদারা স্বার্থপর মালদারদের জৈবিক উদ্দেশ্যের সংমিশ্রণ থেকে পবিত্র থাকে, যা শুধু যেহেনী বাতেনী নয় বরং বাহ্যিক আজাদীর জন্যও বড় বাধা।

বর্তমানকালে পুঁজি এবং পুঁজিবাদকে খতম করার দাবিতে বিশ্বপরিস্থিতি কি আওয়াজ তুলছে না? আর প্রত্যেক ইনকিলাবী বা আন্দোলনমুখী দল ধন ও সম্পদশালীদের রাস্তা হতে তাড়ানো চেষ্টা করছে না? যখন তারা প্রত্যক্ষ করল, স্বাধীনতা ইনকিলাবে এই ধনী শ্রেণী নিজেদের পুঁজি ও আরামপ্রিয়তার মাধ্যমকে হেফাজত করার খাতিরে ইনকিলাবে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। হযরত নানুতুবী রহ. এ বিষয়টিকে এমন সময় অনুভব করেছিলেন, যখন মজুর ও পুঁজিবাদের মাঝে প্রচলিত প্রজ্ঞার সৃষ্টি হয়নি। তবে সৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল।

হযরত নানুতুবী রহ. নিজ বিচক্ষণতা এবং নিজ মাযহাবের নীতির

আলোকে দেখছিলেন, ইনকিলাব করা কখনও পুঁজিবাদের কাজ নয়। বরং সর্বদা পরিশ্রমী মজদুর শ্রেণীর লোকেরাই ইনকিলাবের ময়দানে এগিয়ে আসবে। এ কারণে তিনি গরিব ও খোদানির্ভর লোকদের, যাদের এই ইদারার মাধ্যমে তৈরি করতে চেয়েছিলেন, তাদেরকে ধনী লোকদের থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বানিয়ে পৃথক করে দেন, যাতে এদিক থেকে গরিব শ্রেণী লোকেরা এ রোগ থেকে বাঁচতে পারে আর ঐদিকে ঐ রোগাক্রান্ত শ্রেণীরাও কোনভাবে পুঁজিবাদের রোগ থেকে নাজাত পেয়ে যাবে। কেননা, এক সুরতে তো তা থেকে অসৎ এবং তার সহকর্মীদের মুখোমুখি করে তাকে খতম করার ছিল আর অপর সুরতে তার থেকে প্রয়োজনমুক্ত হয়ে তাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দেওয়ার ছিল, যাতে সে নিজেই নিজের রোগ বা ত্রুটি চিনে তাকে দূর করার ফিকির করে।

প্রথম সুরতে সফলতা সন্দেহযুক্ত এবং ফাসাদ সৃষ্টি হওয়া সুনিশ্চিত। আর দ্বিতীয় সুরতে গোলমাল এবং দুঃখ-কষ্ট বেশি। তবে কাজ কম। আর দ্বিতীয় সুরতে তার বিপরীত। তাতে কাজ বেশি এবং হাঙ্গামা কম। প্রথম সুরতে পুঁজিবাদীদের আতঙ্কিত ও মোকাবেলা করার দাওয়াত দেয়া হয় আর দ্বিতীয় সুরতে তাদের একপেশে করে নীরবতার সাথে তাদের রাস্তা বন্ধ করে দেয়া হয়। হযরত রহ. ছয় নম্বর উসূলে দ্বিতীয় পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছেন, যে সুরতে খুব নিরাপদে পুঁজিবাদের জানাযাকে সামনে নিয়ে আসা হয়। তার স্বয়ংসম্পূর্ণতার বীজ বপন করে পুঁজিবাদীর আকাঙ্ক্ষার প্রতি তুচ্ছতা ও খারাবী অন্তরসৃষ্টি করে দেওয়া হয়। এ কথা তো স্পষ্ট যে, যারা আত্মনির্ভর হয়ে পুঁজিবাদ মিটাতে চায়, তারা পুঁজিবাদী হওয়ার তামান্না কখনও করতে পারে না। কিন্তু সম্পদের মহব্বতে পুঁজিবাদকে মিটানোর খাহেশ করা প্রকারান্তে এ মালের খাহেশই হয়। সে চায়, সহকর্মীকে নিজ স্থান থেকে হটিয়ে তার স্থান জবর দখল করতে, যাতে পুঁজিবাদ তো নিঃশেষ হতে পারে তবে পুঁজিবাদী নিঃশেষ হবে না। আর এ কথা তো স্পষ্ট যে, দেশের অধিকাংশ মানুষ যারা গরিব শ্রেণী, তারা যখন পুঁজিবাদ থেকে দূরে সরে যাবে, তখন জাতির অধিকংশ থেকে পুঁজিবাদের জযবা উঠে যাবে। আর ধনীর সামনে মুহতাজ ব্যক্তি নিজেই নত হয়ে পড়ে।

এ কারণে তিনি ইদারার আমদানি ও অন্যান্য কাজে এক প্রকার তায়াক্কুল আলাল্লাহ ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার উসূল রেখে ইদারাকে গরিবানা এবং আল্লাহনির্ভর আন্দাজে পরিচালনা করতে চান, যাতে কর্মকর্তাদের মাঝে মাল এবং মালের অহংকার সৃষ্টি না হয়। যাদের মাঝে এ রোগ আছে বা যারা এ রোগের

রোগী, তারা এদিকে ঝুঁকে যাবে। ফলে তাদের অহংকার কমে যায়। এভাবে উক্ত দুই স্তরের মানুষ একজন অপরজনের কাছাকাছি হবে। আর তাদের মাঝে সহকর্মীদের কারণে পরস্পর বিবাদ সৃষ্টি হবে না, যাতে প্রথমত সার্বিক স্বাধীনতা খতম হয়ে যায়; তারপর বাহ্যিক স্বাধীনতার সম্ভাবনাও অনেক দূর চলে যায়। সুতরাং নানুতুবী রহ. এই উসূলের মাধ্যমে আযাদী অর্জন করার আরেকটি ধাপকে এগিয়ে দিলেন। তবে সেটি জাগতিক পন্থায় নয় বরং আধ্যাত্মিক ও আখলাকের মাধ্যমে।

## সরকারি অনুদান গ্রহণ না করার হেকমত

৭. হযরত নানুতুবী রহ. দীনি ইদারার জন্য সরকারি সাহায্য ও অনুদানকে ক্ষতিকর আখ্যায়িত করে তা থেকে বাঁচার হেদায়েত দিয়েছেন। এমনিভাবে ইদারাকে সরকারি হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করে শিক্ষার স্বাধীনতাকে ঠিক রেখেছেন, যা মূল স্বাধীনতার আসল মঞ্জিল। কারণ, অর্থনৈতিক দাসত্ব বা গোলামী পরিশেষে রাজনৈতিক চাপে পড়ে এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টি করে। এ কারণে এই সপ্তম উসূল দ্বারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা হয়েছে।

একেই কি বন্ধুত্ব বর্জন বলে না, যাকে রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে? ১৯২০ সালে খেলাফত আন্দোলন এবং তার পরবর্তী কালে স্বাধীনতা আন্দোলনে মোটা কাপড় বা খদ্দর পরিধান করার রেওয়াজ চালু করে বিদেশী কাপড়ের আমদানি বন্ধ করা হয়। তার ফলে পোশাক শিল্পে অনেক প্রভাব পড়েছে। তবে দেশী শিল্প প্রতিষ্ঠা করে বিদেশী কাপড় সামগ্রীকে কার্যত বয়কট করা হয়নি। আজও তো বিদেশী সামগ্রীর উপর বিভিন্ন ধরনের শর্ত বা বাধ্যবাধকতা আরোপ করে তার আমদানি বাধাগ্রস্ত করছে, যাতে নিজ দেশীয় ব্যবসা ও শিল্প উন্নতি লাভ করে এবং দেশ ও জাতি, প্রতিটি শিল্পে সামগ্রীতে ভিনদেশীয় অর্থনৈতিক গোলামী ও পরনির্ভরশীলতা থেকে বেঁচে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে। আর এছাড়া দেশ ও জাতি নিজ বুনিয়াদ বা ভিত্তিতে মজবুত করতে পারে না। ঠিক তেমনিভাবে এই উসূল দ্বারা ভিন্নদেশী হুকুমতের আমদানিকে বন্ধ রাখা হয়েছে, যারা দেশের স্বাধীনতাকে পদদলিত করত। ফলে এই কওমি ইদারাগুলো নিজ প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে স্বনির্ভর থাকতে পারে। এই ইদারাগুলো যেহেতু কওমি, তাই এগুলো কওমের মাল-সম্পদ দ্বারাই চলবে। তাকে ভিন জাতির

সম্পদ গ্রহণ করে অর্থনৈতিক গোলামিতে পরিণত হওয়া চাই না। ফলে ইদারাগুলো সর্বদা সরকারি হস্তক্ষেপের টার্গেটে থাকবে।

সুতরাং খদ্দর পরিধানে যে অসহযোগিতা এবং বিদেশী কাপড়কে বয়কট করার মাঝে যে ক্ষতি ছিল, সেটিই সরকারি অনুদান থেকে বেঁচে থাকা এবং কওমের সম্পদের উপর সীমাবদ্ধ থাকার মাঝে গোপন ছিল। তাতে শুধু আকৃতিগত এবং প্রকারগত পরিবর্তন রয়েছে। এ জন্যই হযরত নানুতুবী রহ.-এর দূরদর্শী চক্ষু শত বছর পূর্বে এসব কিছু দেখছিল, যা অন্যদের চোখ অনেক দিন পর দেখতে পেয়েছে। আবার পূর্ণরূপে দেখতে পারেনি ও বুঝতে পারেনি।

## পুঁজিবাদ ধ্বংস করা

৮. এই আট নম্বর উসূলে ইদারার কর্মকর্তাদের গরিবমানস থাকতে এবং পুঁজিবাদী হওয়া থেকে বারণ করা হয়েছে। যেমনভাবে ৬ষ্ঠ উসূলে পুঁজিবাদকে নিঃশেষ বা খতম করার কৌশল বলে দেওয়া হয়েছে। কেননা, ৮ম দফার নির্যাস হলো, ইদারা পরিচালনায় গরিব শ্রেণী সাহায্য-সহযোগিতা এবং মৈত্রী ও বন্ধুত্বকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আর এই আন্দাযে গরিবানা হালতে ইদারা পরিচালনা করবে যে, ইদারার জন্য এটিই স্থায়িত্ব ও পোক্ততার সমাগ্রী।

কেমন যেন এ দফার উপকারিতা হলো শিক্ষার ক্ষেত্রে গরীবদের সাথে ভিন্ন একটি বন্ধুত্ব গড়ে তোলা। কিন্তু পুঁজিবাদের মোকাবেলায় সমাজে তারা সংখ্যালঘুর মতো তাদের সহকর্মী ও সমান-সমান হতে পারে না। আর এ কারণেই তাদের মাঝে দূরত্ব ও বিতৃষ্ণা বা ঘৃণা সৃষ্টি হয় এবং তারা তাদের এমনভাবে তুচ্ছ জ্ঞান করে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রয়োজনমাফিক সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে। এর ফলাফল এমনটি হতে পারে যে, যখন সংখ্যাগরিষ্ঠতা পুরোপুরি অল্পেতুষ্টি ও আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসার মাধ্যমে মালদার পুঁজিবাদীদের থেকে পুর্ণরূপে আলাদা হয়ে যায়, তাহলে আপনা-আপনিভাবে পুঁজিবাদীরা তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে যাবে। আর পুঁজিবাদীরা নিজ আগ্রহ ও উৎসাহে নিজের পুঁজিকৃত সম্পদকে মানুষের মাঝে এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করতে আগ্রহী হবে। ফলে পুঁজিবাদীদের পুঞ্জিকৃত সম্পদ নিজ থেকেই বেরিয়ে আসবে আর গরিব ও অনাথ মানুষদের প্রাপ্য বা অধিকার আদায় হয়ে যাবে। এমনিভাবে এ অষ্টম দফা পুঁজিবাদীদের মাথায় একটা

ধ্বংসকারী আঘাত। কিন্তু আনুকুল্য ও আতিথেয়তার পোশাকে যার দ্বারা উভয় দলের দূরত্ব দূর হবে, মিল মহব্বত তৈরি হবে, তাহলো আযাদীর জন্য নিবেদিতপ্রাণ হওয়া। এই কারণেই এ দফার দ্বারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার একটি গুরুত্বপূর্ণ মোর্চা জয়যুক্ত হয়।

## তানযীমে মাদারিস স্বাধীনতার প্রথম ইট

এ ছিল হযরত নানুতুবী রহ.-এর হেকমতপূর্ণ আট উসূলের বিস্তারিত ব্যাখ্যা। তবে গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে তাতে নবম আরেকটি উসূল নজরে আসে। আর সেটি হলো তানযীমে মাদারিসের উসূল। কেননা, হযরত রহ. উপরের শিরোনামে দারুল উলুম এবং অন্যান্য মাদরাসাগুলোকে এই উসূলে হাশতেগানার নিচে জমা করে সকল মাদরাসাকে পরস্পর অংশীদার স্থাপন করেছেন, যা রাবেতায়ে মাসারিসের একটি গ্রহণযোগ্য, বোধগম্য ও ক্রিয়াশীল সুরত। আর এ কথা তো স্পষ্ট যে, মাদরাসাসমূহের সম্পর্কের দ্বারা মাদরাসার ফারেগীন ছাত্রদের মাঝে কুদরতিভাবে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়। এ কারণে তানযীমে মাদারিসের উসূল দ্বারা ইলমী ফুযালা এবং তাদের চিন্তা-চেতনার তানযীম সৃষ্টি হয়ে যায়, যা ইনকিলাব ও আযাদীর প্রথম ভিত হিসেবে পরিগণিত হয়।

হযরত নানুতুবী রহ. এই উসূলে হাশতেগানাকে শুধু দৃষ্টান্তস্বরূপ তৈরি করেননি বরং কার্যকরীরূপে এই উসূলে হাশতেগানার আলোকে তিনি স্বয়ং অনেক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর অনেক মাদরাসা তাঁর ছাত্র ও শাগরেদদের মাধ্যমে কায়েম করিয়েছেনন। ১৮৫৭ সালের পর হযরত রহ.-এর একমাত্র রাজনীতি বা আন্দোলন ছিল স্থানে স্থানে কওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা, যেগুলো সরকারি কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত ও স্বাধীন থাকবে। আর সেই মাদরাসাসমূহ থেকে স্বাধীনমনা নওজোয়ান তৈরি করা হবে।

লর্ড মিকালে যদি এই দাবি নিয়ে দাঁড়ায় যে, আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো এমন নওজোয়ান সৃষ্টি করা, যারা রং ও বংশের দিক থেকে হিন্দুস্থানী হবে; কিন্তু দিল-দেমাগ ও চিন্তা-চেতনায় হবে একজন ইংরেজ, তাহলে কার্যতভাবে এই সমস্ত মাদরাসা থেকে ধ্বনি উঠবে যে, আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো এমন নওজোয়ান তৈরি করা, যারা রঙ ও বংশে তো হবে হিন্দুস্তানী; কিন্তু দিল -দেমাগে ও চিন্তা-চেতনায হবে আরবস্তানী ও হিন্দুস্তানী।

সুতরাং এমন নওজোয়ান তৈরির জন্য যদি দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা হয়ে

থাকে, তাহলে মুরাদাবাদের কাসেমুল উলুম, সাম্বালে মাদরাসায়ে আরাবিয়া, আমজাহায় মাদরাসায়ে জামে মসজিদ এবং গোলাউটে ও থানা ভবনে একই উদ্দেশ্যে মাদরাসা প্রতিষ্ঠি হয়েছে।

মোটকথা, যেখানে যেখানে হযরত রহ. নিজে আগমন করেছিলেন, সেখানে তিনি নিজেই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর যেখানে তিনি যেতে পারেননি, সেখানে তার খাদেম এবং ছাত্র ও শাগরেদদের মাধ্যমে স্বাধীন কওমী মাদরাসা কায়েম করিয়েছেন। ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। পরবর্তীতে উক্ত মাদরাসাগুলোর নমুনায় হাজার হাজার মাদরাসা ভিত্তি লাভ করে। এতে হযরত নানুতুবী রহ. শুধু দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা প্রমাণিত হননি বরং তিনি এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে হিন্দুস্তানের সকল মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রমাণিত হন। তারপর তিনি ঐ সকল মাদরাসাকে একই উসূলে হাশতেগানার সাথে জড়িত করেন, যার প্রকাশ উপরের শিরোনামে রয়েছে। সাথে সাথে তিনি এই মাদরাসাগুলো রূহানী বা আধ্যাত্মিক তানযীমে শামিল করেছেন, যদ্দরুন সেগুলোর পালিত ব্যক্তিরা নিজে মুনাজ্জাম বা সুশৃঙ্খল হয়েছেন এবং একটি তানযীমী রুচি নিয়ে শিক্ষা সমাপন করেছেন।

## জমিয়তে উলামার প্রেক্ষাপট

স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হওয়ার সাথে সাথে মাদরাসাসমূহের অগণিত জামাত নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাতারবন্দী হয়ে যায়। আর তারা জমিয়তে উলামার নামে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দেশ ও জাতির যে শানদার খেদমত করেছেন এবং যে তুলনাহীন নজির পেশ করেছেন, বিশ্ব ইতিহাস তা অস্বীকার করতে পারবে না।

জমিয়তে উলামার সদস্যদের উপর ব্যক্তিগতভাবে দোষ-ত্রুটি সবসময় খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু তার উসূল এবং মাকসাদসমূহ এবং তার অধীনে যদি ঐক্যবদ্ধভাবে উলামায়ে কেরাম অংশগ্রহণ না করতেন, তাহলে স্বাধীনতার স্লোগান উচ্চকিত করা কখনও সম্ভব ছিল না।

ভারতবর্ষের জন্মগত মেজাজই হলো ধর্মীয়। এ কারণে ধর্মীয় স্লোগানে তারা জযবা ও চেষ্টা খুঁজে পায়। আর অলস নিভুনিভু রাজনৈতিক স্লোগানে কর্ণভরপুর আওয়াজ হয় না। এ কারণেই আলেমদের ময়দানে আসা পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ময়দান জনসাধারণ হতে খালি ছিল। আল্লাহ ও তাঁর

রাসূলের স্লোগান উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে মাঠে-ময়দানে জনতার ঢল নামে। আর এ কথা তো সুস্পষ্ট যে ধর্মীয় স্লোগান ধর্মীয় অঙ্গন থেকেই উচ্চারিত হয়, যা তানযীমে মাদারিসের আকৃতিতে সে সময় শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল। যখন জনসাধারণ এ ধরনের প্রচলিত তানযীমের কল্পনায় ছিল না, তখনও উলামায়ে কেরাম তানযীমভুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ।

## জাতির হৃতমর্যাদা পুনরুদ্ধারের মৌলনীতি

এটি সরকারি তানযীম নয়; তবে প্রচলিত সরকারি তানযীম হতে অধিক মজবুত ও শক্তিশালী, যা হযরতের রহ. প্রণয়নকৃত উসূলে হাশতেগানাহ এবং তাঁর কর্মপদ্ধতি থেকে সৃষ্টি হয়েছে, যার উপর রাজনৈতিক মাকসাদের সাথে সাথে দীনি, ধর্মীয় বা গোষ্ঠীগত জযবারও ভিত্তি হতে পারে। যখনই মাদরাসাগত তানযীমকে আনুষ্ঠানিক ও দেশীয়ভাবে জমিয়তের প্লাটফর্মে স্থানে স্থানে প্রকাশ করা হয়েছে, তখনই সর্বসাধারণ দ্বারা রাজনীতির ময়দান ভরপুর হয়ে গেছে। আর জনতার জোশ ও শোরগোলের অভাবনীয় দৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে, যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলে খেলাফত আন্দোলন ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে।

সুতরাং হযরত নানুতুবী রহ. ১৮৫৭ সালে শামেলী যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের কারণে তাদের সকল প্রকার স্বাধীনতা বন্ধ হয়ে যাওয়ার যে দৃশ্য তিনি নিজ চোখে দেখেছেন, তার অব্যর্থ ও অর্থবহ একমাত্র চিকিৎসা হলো, আযাদীর ঐ বুনিয়াদী উসূলগুলো এবং তার বাস্তবায়ন, যেগুলোকে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে তালিমি লাইন থেকে কর্মক্ষেত্রে নিয়ে আসা হয়েছে।

জীবনী গ্রন্থের ইবারাত দ্বারা সুস্পষ্ট[১] বুঝে আসে যে, শুধু বর্তমানকালেই উক্ত নিযামের কার্যকারিতা ও ফলাফল দেখে মানুষ তার সত্যায়নকারী ও প্রভাবিত হয়নি। বরং তাঁর শুরু যুগের মানুষরাও এমনকি তার বিরোধীরাও তাকে মেনে নিতে বাধ্য ছিল, যখন তাকে একটি বিরোধপূর্ণ পরিবেশে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

---

১. তার লেখক হলেন হযরত হাজী ফজলে হক রহ. তিনি প্রথমে দারুল উলূমের মজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন। পরে অনেক দিন মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দেওবন্দের আদিবাসী ছিলেন। হযরত নানুতুবী রহ.-এর বিশেষ শাগরেদ ছিলেন। তিনি নানুতুবী রহ.-এর জীবনী সংগ্রহ করেছেন। এই কিতাবে সাওয়ানেহের কথা বলা হবে। তাদ্বারা হযরত নানুতুবীর সাওয়ানেহ বোঝাবে।

তারা এ কথা স্বীকার করত যে, জাতির হারানো ঐতিহ্য ও মর্যাদা পুনরায় ফিরে পেতে এই উসূলগুলো থেকে উত্তম অর্থবহ ব্যবস্থাপত্র দ্বিতীয়টি আর হতে পারে না। যাদের সামনে দিল্লীর বিলীনতা এবং তার কেন্দ্রিয়তা ধ্বংস হওয়ার কারণে সারা দেশের অবস্থা ও পরিণতিতে ধ্বংস হওয়ার দৃশ্য প্রকাশ্য ছিল।

হযরতের জীবনী লেখক রহ. নেযামে মাদরাসাকে পর্যালোচনা করে লিখেন, উক্ত বুনিয়াদী উসূলের নেযামে তালিম দ্বারা মুসলমানদের পরকালীন ও ইহকালীন যে ফায়দা অর্জন হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে, সেগুলো সূর্যের আলোর ন্যায় সুস্পষ্ট। এমনকি বিরুদ্ধবাদীরাও স্বীকার করে যে, মুসলমানদের নিজেদের সংশোধনের জন্য এবং অন্য জাতির উপর বিজয়ী হওয়ার জন্য (যে উসূল তাদের পরাজিত করল) তা থেকে উত্তম এবং পরীক্ষিত কোন ব্যবস্থাপত্র ও মূলনীতি নেই। পূর্ব যুগে যখন হুকুমত, বাদশাহশাসিত ও শাসনকর্তার নীতিতে পরিচালিত হতো, তখন শুধু রাষ্ট্রীয় বা সরকারিভাবে ইনকিলাব করার ধরন সম্পর্কে দুনিয়াকামী অজ্ঞাত ছিল, জানতো না। তখনও উক্ত উসুরের তাৎপর্য এবং ফলপ্রসূতাকে স্বীকার করা হতো। এমনকি বিরোধীদের পক্ষ থেকেও স্বীকৃতি দেওয়া হতো। বর্তমানকালে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালিয়ে অর্ধ শতাব্দির বিরতিহীন অভিজ্ঞতার পর দেশ যে উসূল বা সংবিধান পর্যন্ত পৌঁছেছে বা উন্নতি সাধন করেছে এবং যাকে ফলো করে দেশ গোলামীর থেকে মুক্তি পেয়েছে, সেগুলো কিছুতেই উক্ত উসূল থেকে আগে বাড়তে পারেনি, যে উসূলগুলো হযরত নানুতুবী রহ. আনুমানিক এক শতাব্দিরও পূর্বে ১৮৫৭ সালের পর দারুল উলুম দেওবন্দ পরিচালনার সময় নিজ কলম দ্বারা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। আর ঐ সময় যখন দেশ ও জাতির অধিকাংশ মোড়ল ও উচ্চ শ্রেণীর মানুষ আপন জীবনকে দখলদার ইংরেজ সংকারের দয়া ও অনুগ্রহের উপর ছিড়ে দিয়েছিল এবং তাদের সাহায্য-সহযোগিতা ও তোষামোদিকেই জীবনের উন্নতির বড় সোপান মনে করত এবং সেই অনুযায়ী কাজ করত।

## জনতার শক্তির উত্থান

হযরত রহ. উল্লিখিত উসূলের ভিত্তিতে দারুল উলুম নামক ইদারাটি এমন মুহূর্তে স্থাপন করেন, যখন দেশের প্রতিষ্ঠিত লোকেরা, অগণিত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা ইদারার ভিত্তি স্থান করেন শুধু এ উদ্দেশেই নয় যে, হুকুমতের ইচ্ছা পূরণ এবং তাদের পূর্ণ তোষামোদিকর্মের সহায়তা ইত্যাদি করবে। বরং

ঐ বুনিয়াদসমূহে, মুজাহিদ, আলেম, উলামা ও দীনদার চিন্তাবিদদের সাথে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও তিরস্কার-ভর্ৎসনামূলক ব্যবহার করতে এবং জনসাধারণকে তাদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও জযবাতেও সংযুক্ত করেছে। কেমন যেন মোল্লাইজমের উত্তানও সাথে সাথে রাখা হয়েছে।

অপরদিকে হযরত নানুতুবী রহ.-এর ঐ বুনিয়াদী উসূলর উপর প্রতিষ্ঠিত নেযামে, যেখানে ভিনদেশী ক্ষমতার পরাজয় ও পতনের ফলাফল গোপন ছিল এবং তাতে তাদের তুচ্ছতা ও ভর্ৎসনার মূলোৎপাটন করে ছুড়ে মারার শক্তিও গোপন ছিল; বরং জনতার সম্পর্ককে দৃঢ় ও মজবুত করা ছিল। আর ১৮৫৭ সালের পর দখলদার শক্তির বিরুদ্ধে মিশনভুক্ত শক্তির স্থলে জনতার শক্তিই বেশি প্রভাবিত হতো, যা হযরত রহ. নিরীক্ষণ করতে চেয়েছিলেন, যাকে ঐ সময়ের বিরোধিরাও মানতেন। আর যখন এই জনতার শক্তি সবটুকুই আলেমদের হাতে ছিল, তাই এতে কোন কারণ থাকার কথা নয় যে, জনতার শক্তি জাগ্রত থাকাকালীন প্রত্যেক দল বা গোষ্ঠী তাদের প্রতি ঝোঁক বেশি, যারা এই জনতার শক্তির কব্জাকারী ছিল এবং তাদের বৈধ পন্থায় পরিচালনা করার পূর্ণ জ্ঞান ছিল।

ফলাফল এমন হলো এবং এমনটিই হওয়ার কথা যে, যারা আলেমদের নিষ্কর্ম, বেকার এবং জাতির বোঝা ইত্যাদি খেতাবে ভূষিত করা হয়েছিল। যখন জনতার আন্দোলন শুরু হলো অথবা জনতার শক্তি দ্বারা দখলদার হুকুমতের শক্তি বিরুদ্ধে জাতিগত যুদ্ধের সূচনা হলো, তখনই ঐ মোল্লাইজমওয়ালা লোকেরা মোল্লাদের দিকে অপারগ হয়ে ঝুঁকতে লাগল। আর সভা-সমাবেশের মঞ্চে ঐ বিদ্রূপ ও ভর্ৎসনার বিশ্বাস, আবেদন ও প্রার্থনার পরিবর্তন হতে থাকল।

আর যে সকল আলেম ১৮৫৭ সালের পর চাঁদা না পাওয়ার ভয়ে মাদরাসার নির্জন কক্ষে চুপ করে বসে গিয়েছিল, তারাই পরিশেষে প্রকাশ্য মঞ্চে এমন শানের সাথে আশ্চর্যজনকভাবে প্রকাশ পেল যে, কোন অভিযোগ-অনুযোগ ছাড়াই তাদের কাজকে মেনে নিল। তারপর জনতার আন্দোলনের অধিকাংশ তাদের অধীন হয়ে আগে বাড়ল।

## সহজ পন্থায় বিপ্লবের মানসিক চিত্র

উসূলে হাশতেগানা থেকে দীক্ষা লাভকারী উলামায়ে কেরাম পরিশেষে দেশ স্বাধীনের পতাকা বহন করে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন। আর যে কাজ

শামেলীর ময়দানে তলোয়ার ও শক্তি দ্বারা পূর্ণ হয়নি, সেই কাজ তারা শান্তির ভাষা ও কলম দ্বারা পূর্ণ করেছেন।

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম সদরুল মুদাররিস (প্রধান শিক্ষক) হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব রহ. যিনি সাত্তা মসজিদের চার উপাদানসমূহ থেকে এক মৌল উপাদান ছিলেন। তিনি হাজী মুহাম্মদ আবেদ সাহেব রহ. এই সংশয় প্রকাশ করার কারণে যে হিন্দুস্তানের হুকুমত এখন এমন ইংরেজদের হাতে চলে গেছে, যারা ভীষণ জ্ঞানী ও শক্তিশালী জাতি। আর তাদের কর্তৃত্ব এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এখন তাদের কর্তৃত্ব থেকে দেশকে মুক্ত করার সম্ভাবনা দেখছি না; বললেন–

'হাজী সাহেব! আপনি কী বলছেন? হিন্দুস্তান পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে? মানুষ ইংরেজদের হুকুমতে নিদ্রা যাবে আর সকালে জাগ্রত হবে অন্য এক হুকুমতে। অর্থাৎ কঠোরতা ও তলোয়ারের মাধ্যমে নয়। যে মাধ্যম হুকুমত পরিবর্তন হওয়ার পরিচিত একটি মাধ্যম মনে করা হয়। বরং অতি সহজ ও নিরাপদ পন্থায় স্বাধীনতা ফিরে আসবে। হযরতের উক্ত কথা দ্বারা এ বিষয়টি পরিষ্কার বুঝে আসে যে, তিনি ১৮৫৭ সালের পর থেকেই নিজ যেহেনে এ কথার খসড়া এঁকে রেখেছেন যে, হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা ফিরে আসবে অতি সহজ ও নিরাপদ উপায়ে। আর হযরত নানুতুবী রহ. এই খসড়া বা চিত্রকে উসূলে হাশতেগানায় দফাগুলোতে তাকে তালিমী রঙ্গে রঙিন করেছেন, যাকে তিনি তখনকার অবস্থা দৃষ্টে বুঝেছিলেন। সাওয়ানেহে মাখতুতার লেখক রহ. তা মেনে নিয়েছেন।

## ইউরোপের পর্যবেক্ষণে হযরত নানুতুবী রহ.-এর উসূলের মূল্য ও মূল্যায়ন

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমার আলোচ্য বিষয় এই নয় যে, দেশ স্বাধীনের পূর্ব আলেমদের কতটুকু ভূমিকা ছিল। এ বিষয়টিকে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মাননীয় মহাসচিব হযরত মাওলানা মোহাম্মদ মিয়া সাহেব রহ. নিজ হস্তে লিপিবদ্ধ কিতাব 'উলামায়ে হিন্দ কা শান্দার মাজী' গ্রন্থে তারিখসহ বিস্তারিত লেখেছেন। এ ব্যাপারে আরো অনেক কলম সৈনিক অনেক লম্বা সামান পুঞ্জিভূত করেছেন। তো আমি এতটুকু বলে চলে যেতে পারব না যে, দেশ স্বাধীনের এ নতুন নকশা বা নমুনা ঐ শামেলী যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদরা তৈরি করেছেন। ১৮৫৭ সালের পর তাদের শীর্ষস্থানে ছিলেন হযরত নানুতুবী

রহ., যাঁর মাঝে স্বাধীনতার জোশ ভিন্নভাবে উতলে উঠত। তিনিই নিজ জোশকে হুশের দ্বারা বদলে উসূলে হাশতেগানার মাধ্যমে আইনী রূপ দান করেছেন, যা তিনি শিক্ষা ও দীক্ষার কেন্দ্র দারুল উলুমের জন্য প্রণয়ন করেছিলেন। দারুল উলুমের ফারেগীনদের মাধ্যমে যারা উসূলে হাশ্‌তেগানার ছায়াতলে লালিত-পালিত হয়ে শিক্ষালাভ করেছেন, উক্ত চেতনা সারাদেশে বিস্তার হতে থাকে। ফলে দেশের বড় একটি অংশের মন-মগজ তৈরি হয়ে গেছে, যাদের প্রভাব জনগণের উপর রয়েছে। আর প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের দ্বারা যখন শত বছর পূর্বের গরম পাতিল উথলে উঠল, তখন আওয়ামী সম্পর্কের কারণে জনমত তৈরি হয়েছিল। তারা সকলে তার চারপাশে এসে জমায়েত হয়ে তাকে ঠা-া করল। জনতাও তাদের পাশে এসে দাঁড়াল।

হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্দী রহ.– তার কথা আমি কোন মাধ্যম ছাড়া শ্রবণ করেছি– বলতেন, আমি হযরত নানুতুবী রহ.-এর উসূলে হাশ্‌তেগানার কদর ও মূল্য ইউরোপ গিয়ে বুঝেছি। বিশেষ করে ইউরোপ ও এশিয়ার বহুসংখ্যক ইনকিলাবের বুনিয়াদ আমি শুধু উসূলে হাশতেগানার আলোকে দেখতে পেয়েছি। আর আমি এ কথা বলতে পারি যে, যদি আমি উসূলের ব্যাখ্যা লিখতে বসি, তাহলে বড়-বড় দুটি গ্রন্থ তৈয়ার করতে পারব।

## স্বাধীনতার অগ্রসেনানীর চূড়ান্ত প্রভাব

স্বাধীনতার অগ্রসৈনিক হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আলী রহ. যখন ১৯২৪ সালে খেলাফত আন্দোলনের কাজে দারুল উলুম দেওবন্দে আগমন করেন, তখন আমার সম্মানিত পিতার মেহমান হিসেবে আমার ঘরে মেহমান হন। তখন তিনি দারুল উলুমের ভিত্তিপ্রস্তরে উসূলে হাশাতেগানা দেখে কেঁদে ফেলেন এবং চূড়ান্তরূপে প্রভাবিত হয়ে নিজ থেকে বলে ফেললেন, এই উসূল তো ইলহামি মনে হয়। তাতে আকল-বুদ্ধির তো কোন দখল নেই।

সুতরাং এই উসূলের দফাগুলোতে তার ফলাফল ও পরিণামের দিকে ইঙ্গিত করতে গিয়ে স্বয়ং নানুতুবী রহ. নিজ কলম দ্বারা গোপন করার রুচি থাকা সত্ত্বেও স্থানে স্থানে কথাগুলো বের হয়ে এসেছে যে, এমন মনে হয়, এমন দেখা যায়, এমন হয়ে যাবে ইত্যাদি, যা দ্বারা এই উসূলগুলো ইলহামী হওয়ার প্রমাণ স্বয়ং উসূলপ্রণেতার পক্ষে থেকেও পাওয়া যায়।

## ১৯৪৭ সালের ইনকিলাবে প্রথম সারির হিরো যারা

উক্ত উসূলের আলোকে যা কিছু হয়েছে, সেগুলোর প্রমাণ হলো ১৯৪৭ সালের ইনকিলাব। উক্ত ইনকিলাবে সুপার হিরো যাদের মনে করা হয়, কুদরতিভাবে তাঁরা হলেন ঐ ব্যক্তিবর্গ, যারা ১৮৫৭ সালে আযাদীর মঞ্চে ছিলেন। যে মঞ্চে স্বাধীনতাপ্রিয় বিভিন্ন স্তরের মানুষ পরে এসে যোগ দিয়েছে আর তারা ১৮৫৭ সালের পরেও উক্ত মঞ্চে ছিল।

হযরত নানুতুবী রহ. ১৮৫৭ সালের পরাজয়ের ক্ষতিপূরণের জন্য দারুল উলুম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ ব্যাপারে হযরত শায়খুর হিন্দু রহ.-এর প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে, যা দারুল উলুমের পাণ্ডুলিপিতে প্রকাশ হয়েছে। তো দারুল উলুম দেওবন্দ এবং তার মৌলিক শিক্ষা-দীক্ষা ১৮৫৭ সালের অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দান করেছে। আর তা বেশি দিনে নয় বরং মাত্র নব্বই বছরে, যা একটি রাষ্ট্রের নয় বরং একজন ব্যক্তির বয়স হয়। বিশাল পরাশক্তি যারা ১৮৫৭ সালে একটি দেশের বৈধ হকদারদের পদদলিত করেছিল, তাদেরকে ১৯৪৭ সালে মিসকিনরূপে এবং অসহায় মজলুম হিসেবে বিতাড়িত করেছিল। ফলে বিছানা পাল্টানোর ন্যায় হিন্দুস্তান হয়ে গেল। ১৯৪৭ সালে ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষের মানুষ রাতে ঘুমালো ইংরেজ শাসনের অধীনে আর সকালে জাগ্রত হলো স্বজাতির হুকুমতের অধীনে। এভাবেই ১৮৫৭ সালের ক্ষতিপূরণ হলো। স্বাধীনতার সাথে সাথে স্বাধীনতার মৌল নকশা পরিবর্তন করে দিল। কেমন যেন তার নকশা পূর্বেই করা ছিল। কিন্তু যে উসূলের যথার্থতা ও সততা মৌল বিষয় স্বাধীনতাকে রাহনুমা করেছে, সেই উসূলই এ বিকৃতি রোধে দায়িত্ব নিতে পারবে। তবে শর্ত হলো পূর্বের নমুনায় উক্ত উসূলের উপর কাজ করতে হবে, ফলো করতে হবে।

তারপর শুধু উসূলই নয়– মাদরাসার কার্যকরী প্রোগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রেও হযরত রহ. সেই প্রতিকারমূলক উসূলের প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। এক সময় তিনি সময়ের তাকাজা অনুয়ারি ছাত্রদের জন্য কৌশলবিদ্যা ও সামরিক প্রশিক্ষণবিদ্যার শাখা চালু করেন, যার দ্বারা ছাত্রদের মাঝে জিহাদের সক্ষমতা বাকি থাকবে এবং এলায়ে কালিমাতুল্লাহর জযবা জারি করার পর কিছু মানুষ বলতে লাগল, এ তো এখন আরবী মাদরাসা রয়নি, বরং যুদ্ধের মাদরাসা হয়ে গেছে। তখন হযরত নানুতুবী রহ. তাদের এ কথার বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ উত্তর পেশ করলেন এবং তাতে তিনি শরয়ী ও সময়ের আহ্বানকে উপস্থাপন করলেন।

## শরয়ী আদালত প্রতিষ্ঠা

অপরদিকে জাতীয় বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করলেন, যাতে মাদরাসার সাথে সম্পৃক্তরা এবং তাদের সাথে আরো যারা সম্পর্ক রাখেন, তাদের সকলের মাঝে ন্যায়নিষ্ঠা ও ইনসাফপছন্দ মানসিকতা কায়েম রাখার সাথে সাথে নিজেদের মাঝে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ নিজেরাই মীমাংসা করা এবং শরয়ী আইনকে জীবনের প্রতিটি মোয়ামেলায় হুকুম বানানোর যোগ্যতা এবং জযবা-উৎসাহ অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং সাওয়ানেহে মাখতুতার লেখক রহ. ঐ লিখিত অঙ্গীকারনামা বর্ণনা করতে গিয়ে একটি দফা লিখেছেন, যাতে তিনি দেওবন্দের বাসিন্দাদের সাথে বিভিন্ন সামাজিক বিষয় সম্পর্কে ওয়াদা করিয়ে দিলেন।

যে সকল মুকাদ্দামা ও মোয়ামালাতে বাদী-বিবাদী উভয়ে মুসলমান হবে, তারা যেন সরকারি কোর্টে না যায়। তাদের বিচারক ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম সাহেব রহ.। সুতরাং হাজার হাজার মামলা যা বছরের বছর কোর্টের অফিসে ফাইলে পড়েছিল, সেগুলো কয়েক মিনিটে ডিসমিস হতে লাগল। উক্ত শরয়ী আদালতকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল সাত্তা মসজিদে। মুকাদ্দামার সংখ্যা যখন বৃদ্ধি হতে লাগল, তখন মামলা ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব দারুল উলুমের সদরুন মুদাররিস হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব রহ.কে ন্যস্ত করলেন এবং তাকে আলাদাভাবে জাতীয় বিচারক হিসেবে নির্বাচন করেন।

এভাবে যখন কাজের অগ্রগতি হতে থাকে, তখন দেওবন্দে সরকারি বিচারকার্যের সৌন্দর্য ঘটতে থাকে আর হযরত নানুতুবী রহ.-এর উদ্দেশ্যই ছিল, দখলদার হুকুমতের শক্তি, দৃঢ়তা ও প্রভাব যেন আস্তে আস্তে দুর্বল হতে থাকে।

## দারুল উলুমে কারিগরি ও প্রকৌশল বিভাগ চালু করার উদ্দেশ্য

হযরত নানুতুবী রহ. দারুল উলুম দেওবন্দে কারিগরি ও প্রকৌশল বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। যেমনটি তাঁর জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, যাতে দারুল উলুমের ফারেগীন ছাত্ররা জীবনোপকরণে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে।

মূলত এ বিভাগটি চালু করা হয়েছিল একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। আর তাহলো, তখনকার শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল এখনকার মতো সরকারি চাকরি

করা। আর সরকারের উদ্দেশ্যই ছিল, স্কুল-কলেজে শিক্ষা লাভ করে সরকারের অধীনে চাকরি করবে এবং চাকরির মাধ্যমে নিজেদের গোলামির শিকড়কে মজবুত করবে। সঠিক অর্থে সরকারি এ পদক্ষেপের বিপরীত হতে পারে যে মানুষ ঐ দাসত্বমিশ্রণ শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে এমন শিক্ষায় শিক্ষিত হবে, যে শিক্ষা মানুষকে আত্মনির্ভর হতে শিখায়। আর জীবন যাপনের যতটুকু জীবনোপকরণ প্রয়োজন তা সরকারি চাকরি থেকে মুক্ত থেকে কারিগরি পেশা ধারণ করে বা জাতীয় কোন চাকরিতে লিপ্ত থেকে জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করে নিবে।

## দারুল উলুমের মাধ্যমে 'হিন্দু-মুসলিম'-এর উত্থান

দারুল উলুমের চাঁদার পরিধি এতটুকু প্রশস্ত ও বিস্তৃত ছিল যে, তাতে অমুসলিমরাও শরীক হতে পারত। দারুল উলুমের প্রাথমিক রিপোর্টে অনেক হিন্দুর চাঁদার কথা লেখা আছে। হযরত নানুতুবী রহ.-এর অনুমতিক্রমে দেশজুড়ে প্রচার করা হবে যে, দেশের সকল মুদ্রণালয় ও প্রেস জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে নিজেদের মুদ্রণকৃত এক একটা কপি দারুল উলুমের পাঠাগারে যেন দান করেন। সুতরাং দারুল উলুমের এ আহ্বানে সর্বপ্রথম যিনি সাড়া দিয়েছেন, তিনি হলেন একজন হিন্দু লোক, তার নাম মুসি নাওয়াল কিশোর, যিনি লক্ষ্ণৌর নাওয়াল কিশোর ছাপাখানার মালেক ছিলেন। তিনি নিজ ছাপাখানার মুদ্রিত সকল মুদ্রণের একটি করে কপি দারুল উলুমে পাঠিয়েছিলেন, যার ফলে দারুল উলুমের মজলিসে শূরার বৈঠক ডেকে তার জন্য শুকরিয়ানামা ও দোয়ার উপঢৌকন পেশ করা হয়েছিল, যে মজলিসে স্বয়ং নানুতুবী রহ.ও উপস্থিত ছিলেন। শুকরিয়ানামার একটি আলাদা অনুমোদনপত্র পাস করে নাওয়াল কিশোর সাহেবের নিকট পাঠানো হয়েছিল, যাতে প্রমাণিত হয়, হযরত রহ. দারুল উলুমকে শুধু আওয়ামী ইদারা নয় বরং এমন সার্বজনীন ইদারা বানাতে চান, যাতে অমুসলিমদের হামদর্দীও শামিল থাকে। কেমন যেন তিনি তা দ্বারা হিন্দু-মুসলিমের ঐক্যের সূচনা করেছেন।

## দারুল উলুম আন্তর্জাকিতার উপাদান

হযরতের জীবনী গ্রন্থের বিশদ বর্ণনা দ্বারা এন বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় যে, তিনি দারুল উলুমভিত্তিক আন্দোলনকে শুধু আন্তঃদেশীয় বানাতে চাননি, যাতে শুধু দেশের সকল জাতি-গোষ্ঠরি সহানুভূতি দারুল উলুম আন্দোলনে শামিল হবে;

বরং তিনি এ আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক দেখতে চেয়েছিলেন এবং এ ইলমী হালকার আত্মীয়তা বহিঃবিশ্বের মুসলমান এবং তাদের হুকুমতের সাথে সম্পর্ক করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং তুর্কী খেলাফত, যাদের প্রভাব সারা মুসলিম জাহানব্যাপী ছিল, তারা অত্যন্ত ধুমধামের সাথে নিজেদের সম্পর্ককে দীনি ও ইলমী মর্যাদার সাথে জড়িত করেন। সুলতান আবদুল হামিদ খান যিনি তুর্কীস্থানের সুলতান ছিলেন তার প্রশংসায় কাসিদা লেখা হয় এবং হিন্দুস্তানী মুসলমানদেরকে তাদের হামদর্দীর জন্য উৎসাহিত করা হয়। এমনকি তুর্কীরা যখন রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, তখন হযরত নানুতুবী রহ. তাদের জন্য চাঁদা উঠানো শুরু করেন। তিনি তার ঘরের সকল আসবাবপত্র এবং তার মুহতারামা স্ত্রীর সকর উপহার সামগ্রী, কাপড়, জেওর, পাত্রসহ সবকিছু তুর্কীদের সাহায্যের জন্য কুরবানী করেন।

## জাতিকে সুসংগঠিত করার নতুন কাঠামো

উপরের বর্ণনা থেকে আন্দায করা যায় যে, দারুল উলুমের আন্দোলনের উদ্দেশ্য শুধু শিক্ষা-দীক্ষায় সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তার অধীনে স্বাধীনতাপ্রিয়তা, দাসত্ব নির্মূল, ধর্মীয় একতা, দেশীয় একতা, জাতির স্বনির্ভরতা, অধীকার প্রতিষ্ঠা, খাদ্য স্বনির্ভরতা, সামরিক শক্তি সঞ্চয়, সর্ব সাধারণের সাথে বন্ধুত্ব, বিশেষ পার্সনের সাথে সুসম্পর্ক ইত্যাদির সম্মিলিত কার্যাবলি ছিল দারুল উলুম আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

হযরত নানুতুবী রহ.-এর প্রণয়নকৃত উসূলে হাশতেগানাহ এবং তার জারি করা কর্মপদ্ধতি দ্বারা প্রমাণিত হয়, দারুল উলুমের ভিত্তি মূলত একটি বিশেষ গবেষণা ও চিন্তা পতিষ্ঠানের ভিত্তি।

সারকথা হলো, হযরত যখন দারুল উলুমের কর্মকর্তা এবং তার পরিচালকদের মধ্যে আত্মনির্ভরতার রূহকে ফুঁকে দিলেন, তখনই তারা হুকুমত থেকে বেপরোয়া ও নির্ভীক হয়ে যায় এবং জাতির গরিব সদস্য ও সর্বসাধারণের সাথে বেশি বেশি সম্পর্ক গড়ার তাকিদ দিতে থাকে। ফলে সর্বসাধারণ থেকে অধিকহারে চাঁদা আসতে থাকে। তারপর ছাত্রদের খাবারের ব্যবস্থা, যারা অধিকাংশ গরিব শ্রেণীর সন্তান ছিল। আর এদিকে সরকারি অনুদান থেকে পুরোপুরি দূরে থাকা এমনকি তা গ্রহণ করা নিষেধ এবং আমির ও জায়গীরদারের উপর ভর করে তাদের অহংকারসুলভ দাম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্য। ফলাফল আর কি হতে পারে

হুকুমতের নাকের ওপর রাবেতায়ে আওয়ামকে দৃঢ় ও মজবুত করা ছাড়া, যাতে দেশের সর্বসাধারণ মাদরাসাকে নিজের সম্পদ মনে করে এবং তার মাকসাদগুলো স্বেচ্ছায় আওয়ামী শক্তি দ্বারা উন্নতির সর্বোচ্চ শিখড়ে পৌঁছায়।

তাই দারুল উলুম যদি শুধু লেখাপড়ার জন্য তৈরি হতো, তাহলে জাতি গঠনের নতুন খসড়া তৈরির কোন প্রয়োজন ছিল না। আর যদি ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষাই আসল মাকসাদ হতো, তাহলে মাদরাসায় সামরিক প্রশিক্ষণ বিভাগ চালু করার কী প্রয়োজন ছিল, যাকে হযরত নানুতুাবী রহ. নিজেই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে কায়েম করেছেন? আবার ধর্মীয় শিক্ষা ইত্যাদি যদি মৌলিক উদ্দেশ্য হতো, তাহলে তিনি মাদরাসায় কারিগরি ও প্রকৌশলী বিভাগ চালু করতেন না, যা শুধু জীবনোপকরণ বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে। আর যদি এটি ধর্মীয় অফিস হয়ে থাকে, তাহলে তিনি তাতে বিচারালয় কায়েম করে মাদরাসার প্রধানকে তার জজ নির্ধারণ করতেন না, যা নিরেট একটি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড।

এমনিভাবে মাদরাসার একমাত্র উদ্দেশ্য যদি হতো ধর্মীয় শিক্ষার খসড়া প্রস্তুতকরণ, তাহলে মাদরাসার দাতাদের মধ্যে অমুসলিম ব্যক্তিদের দান গ্রহণ করা না করার ব্যাপারে অবশ্যই চিন্তা-ভাবনা করা হতো। তাহলে হিন্দু-মুসলমান ও ধর্ম-গোষ্ঠী বাছাই করা ব্যতীত চাঁদা গ্রহণ করা হতো না এবং হিন্দু দাতাদের দোয়া ও শুকরিয়ানামা প্রদান করে তাদের হিম্মত বৃদ্ধি করা হতো না। আবার মাদরাসার কার্যাবলি যদি শুধু কিতাবী দরস-তাদরীস হতো, তাহলে তিনি মাদরাসার উপদেষ্টা বা প্রধান পরিচালক হয়ে রাজকীয় চাঁদার ব্যবস্থার করতেন। তুর্কীস্থানের মুসলিমদের খলিফা জনাব সুলতান আবদুল হামিদ খান সাহেবের প্রশংসা করে কাসিদা লিখে তুর্কী খেলাফতের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করার পরিবেশ তৈরি করতেন না।

অতএব তিনি শুধু দেশের ভিতর বসবাসকারী জাতিসমূহের সাথে বন্ধুত্ব কায়েম করার দাবিদার ছিলেন না, বরং বহির্বিশ্বের সাথেও বন্ধুত্বের বন্ধন বিস্তৃতি করতে চাইতেন। তাঁর এমন চিন্তাধারা দ্বারা এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় যে, দারুল উলুম দেওবন্দ শুধু দরস ও তাদরীস বা পড়া ও পড়ানোন মাদরাসা ছিল না বরং তিনি দারুল উলুমকে সম্মিলিত আন্দোলনের কেন্দ্র হিসেবে কায়েম করেছিলেন, যেখানে সব ধরনের কাজ হতো, যার কার্যাবলীতে ইলম ও আমল, ইহকাল ও পরকাল, দেশ ও জাতি, দীন ও মাযহাব ইত্যাদির বিষয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা একদম সম্মিলিত জযবার পূর্ব উদ্দেশ্য ছিল,

যেগুলো হযরত রহ.-এর প্রশস্ত ও প্রখর মেধা থেকে বের করে মাদরাসার বুনিয়াদী উসূলে লিপিবদ্ধ করেছেন। আর এগুলোর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে দারুল উলুমে শিক্ষা অর্জনকারী ফারেগীনের মাঝে যোগ্যতা অনুসারে বিস্তৃত ও প্রসার হতে থাকে।

## দারুল উলুম প্রতিষ্ঠার মূল পেক্ষাপট

দারুল উলুম দেওবন্দের এ বুনিয়াদী উসূল এবং তার কার্যাবলি ঐ বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা এবং প্রশস্ত নেযামের নিন্দা করে থাকে, যে উসূলগুলোকে হযরত নানুতুবী রহ. ১৮৫৭ সালের পরাজয়ের পর শামেলীর ময়দান থেকে নিয়ে এসেছিলেন। আর হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর কথা অনুযায়ী শামেলী যুদ্ধে পরাজয়ের ক্ষতি পূরণার্থে দারুল উলুম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গভীর ধ্যানে চিন্তা করলে বোঝা যায়, এটি ছিল ঐ আমানতের আদায়, যা হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী রহ. এবং হযরত সৈয়দ আহমাদ শহীদ বেরলবী রহ. থেকে হযরত শাহ আবদুর রহীম রহ.-এর নিকট এবং তাঁর থেকে হযরত মিয়াজী নূর মোহাম্মদ সাহেব জানজানবী রহ.-এর মাধ্যমে হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর পর্যন্ত স্থানান্তরিত হয়। আর হাজী সাহেবের শাগরেদদের মধ্য হতে পরিশেষে পূর্ণ শক্তিমত্তার সাথে হযরত নানুতুাবী রহ.-এর দিল ও দেমাগে মূল ধাতুর ন্যায় বসে গেছে, যাকে স্বয়ং হাজী সাহেব রহ. নিজের যবানকে মাকসাদের তরজুমান বা দোভাষী বলেছিলেন, যার বিস্তারিত বর্ণনা সাওয়ানেহে কাসেমী গ্রন্থে দেখা যায়।

এ কারণেই হযরত হাজী সাহেব রহ.-এর হিজরত করে চলে যাওয়ার পর তার বিশেষ তরজুমান থেকে ঐ হাজী সাহেবওয়ালা জযবা অবশিষ্ট থাকা ও প্রচলন ও প্রসিদ্ধকরণ এবং প্রকাশ ও প্রচার প্রসারের পুরোপুরি আশা করা যায়। আর তাঁরই মতো মহান ব্যক্তি এমন আন্তর্জাতিক ইদারার উসূল ও নেযাম গঠনের কল্পনা করতে পারেন।

## স্বাধীনতার মূলনীতির বিশ্বস্ত ব্যক্তিত্ব

দৃশ্যমান রচনাবলিই উসূলে হাশতেগানার উসূলী ও আমলী (কার্যত) বৈশিষ্ট্য। আর তার সত্তাগত এবং অর্থগত বা সূদশ্যগত সুরতের নাম-চিত্রের নাম দারুল উলুম দেওবন্দ। পরিশেষে যে দারুল উলুম ১৮৫৭ সালের কলঙ্কের ক্ষতিপূরণের ওয়াদা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছে আর আমি এ কথা বলতে

পারি যে, পরিশেষে সমগ্র বিশ্ব তার চিন্তা-চেতনায় ফিরে আসবে। আর দেশ ও জাতির মুক্তির জন্য যে নীরব রাহনুমায়ী (পথ দেখানো) উসূলে হাশতেগানা করেছে, তা কোন ইশতেহার, পোস্টার, চিঠিপত্র, সংবাদপত্র এবং জনতার প্রোপাগা-ার চিৎকারের ময়দানেও পরিলক্ষিত হয় না, করে দেখাতে পারি না।

এ কারণে আজ স্বাধীনতা দিবসে, যখন দুনিয়াবাসী বিভিন্ন ডিজাইনে স্মরণ সভা পালন করছে আর বিভিন্ন রকমের স্মৃতিসৌধ তৈরির পরামর্শ দিচ্ছে, তখন আমি সমুচিত মনি করি, উক্ত উসূলে হাশতেগানার আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে স্মরণসভা বা স্বাধীনতা দিবসটি উদযাপন করবে, যার উপর চলে দুনিয়াবাসী আযাদীর স্থলে পৌছেছে। আর ঐ ব্যক্তিত্বের কর্ম আলোচনা তো অবশ্যই করবে, যাঁর সুপ্রশস্ত এবং সর্বব্যাপী মেধা ঐ আযাদী উসূলের প্রণেতা, যে উসূলের জযবা একে অপর থেকে স্থানান্তরিত হয়ে দেশের সকল মানুষের মন-মস্তিষ্ক স্বাধীনতাপ্রিয় এবং স্বাধীনতা অর্জনকারী হিসেবে তৈরি করতে থাকে, যার ফলে স্বাধীনতা দিবস উদযানের সুযোগ আমরা আজ পেয়েছি।

**মুহাম্মদ তৈয়্যব**

পরিচালক, দারুল উলুম দেওবন্দ

১৫ আগস্ট, ১৯৫৭ সাল।

# বয়ান : ১১

## আকাবিরে দেওবন্দ এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা

আকাবিরে দেওবন্দের তত্ত্বাবধানে ও নেতৃত্বে আযাদী আন্দোলন এমন সময় জারি ছিল, যখন ইংরেজদের বিরোধিতার কল্পনা কোন ঘরের কোণেও ছিল না। তারা শুধু লেখনি বা যবান দ্বারাই করেননি; বরং কর্মের মাধ্যমেও করেছেন। কর্মও সাধারণ ও অস্থায়ী কর্ম নয় বরং এমন ব্যাপক কর্ম দ্বারা করেছেন, যার পরিধিতে ভারতবর্ষের অনেক রাজনীতিক, অনেক বিচারপতি এবং ইংরেজ সেনাবাহিনীর অনেক অফিসার যোগ দিয়েছেন। আর কর্মের শক্তি হিন্দুস্তান অতিক্রম করে রাশিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। মদিনার গভর্নর জনাব জামাল পাশা বলেছিলেন–

'শায়খুল হিন্দের মোটা হাড় আর জীর্ণ-শীর্ণ অবয়বে কী গরম উদ্দীপনা-ই না রাখা হয়েছিল যে, তিনি সারা ইসলামী জগতকে নিজ আয়ত্তে নিয়ে নিয়েছিলেন!'

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ:

## সুস্বাদু ফল অর্জনে মুবারকবাদ[২]

জাতির সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ! উলামায়ে কেরাম ও দারুল উলুমের প্রিয় ছাত্ররা!

আজকের মোবারক দিনটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এক বিশাল সাম্রাজ্য, যার সম্পর্কে এ উক্তি প্রসিদ্ধ ছিল যে, এ সাম্রাজ্যে কখনও সূর্য অস্তমিত হয় না, যার সম্পর্কে এ সাম্রাজ্যেরই একজন অহংকারী ও আত্মগর্বী মুখপাত্র, যার নাম ছিল গেলিদ সেলুন, যে বলেছিল, আমাদের সাম্রাজ্য আজ এত শক্তিধর যে, যদি আকাশও তার উপর ভেঙ্গে পড়তে চায়, তাহলে তাহলে তাকেও আমরা নিজ শিংয়ের আগা দ্বারা প্রতিহত করতে পারব। আকাশ আমাদের রাজ্যের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আজ সেই সাম্রাজ্যেরই আসমান পতিত হওয়া দ্বারা নয়, বরং জমিনের কিছু

---

২. ১৯৪৭ সালে ১৫ ও ১৬ আগস্টে তারাবীর নামায শেষে, মধ্য রাতে দারুল উলূমের ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণ।

অনুকণা ওড়ার দ্বারা এত সহজে নিঃশেষ হয়ে গেল যে, ইতিহাস তার নজির পেশ করতে পারেনি। এ ইনকিলাবের জন্য আমরা সকল ভারতবাসীকে মোবারকবাদ জানাই। সাধারণভাবে পুরো দেশ মোবারকবাদ পাওয়ার উপযুক্ত ওই সকল নওজোয়ান এবং প্রাপ্তবয়স্করা, যাদের কুরবানী ও প্রচেষ্টা স্বাধীনতা নামের সুস্বাদু ফল ভারতবাসীর সামনে এনে রেখেছে।

## আকাবিরে মিল্লাত ও স্বাধীনতার জিহাদ

অকৃতজ্ঞতা ও নিমকহারামি হবে যদি এ মুহূর্তে সেই আকাবিরদের প্রচেষ্টার কথা আলোচনা না করি, যারা মূলত সর্বপ্রথম স্বাধীনতার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। এমন সময় স্থাপন করেছিলেন, যখন ভারতবাসীর দিল ও দেমাগে স্বাধীনতার কল্পনাও ছিল না। আর তাঁরা ছিলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ.-এর জানবাজ শাগরেদদের জামাত, যারা দুশত বছর যাবত স্বাধীনতার প্রচেষ্টায় শুধু কলম ও কালি নয় বরং তলোয়ার ও রক্ত দ্বারা তার রাস্তা পাড়ি দিয়ে এসেছেন। পরিশেষে ১৮৫৭ সালের পর যখন ইংরেজ শক্তি পুরোপুরিভাবে সারা ভারতকে গ্রাস করে নেয় তখন শুধু আকাবিরদের জামাতই স্বাধীনতার কল্পনাকে জিইয়ে রাখেন। অবশেষে এ কল্পনাই সবাইকে স্বাধীনতা পাগল বানিয়ে ছাড়ল।

হযরত রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহীর ভাষ্যমতে দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত কাসেম নানুতুবী রহ. ১৮৫৭ সালে, যিনি উক্ত পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় উদ্যোক্তা এবং সবচেয়ে বেশি অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী ছিলেন। তিনি তাঁর শায়েখ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব রহ.-এর নেতৃত্বে অস্ত্র ধারণ করেন এবং আযাদী আন্দোলনে সিপাহসালার হিসেবে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেননি। এ কারণে বিজয় শামেলীতেই থেমে যায়, দিল্লীর সিংহাসন পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। ফলে দেশ পরাধীনই রয়ে গেল। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয় এ জামাত স্বাধীনতার চেতনা থেকে কখনও বিরত থাকেনি। সেই সময়টা ছিল এমন সময়, যখন ভারতবর্ষের বাসিন্দারা ইংরেজ সরকারের তোষামুদির জন্য কুরবান ছিল। ইংরেজের তুষ্টি অর্জনের জন্য কুরআন শরীফ থেকে জিহাদ সংক্রান্ত আয়াতগুলো তুলে দেয়ার পরামর্শ ও দুরভিসন্ধি চলছিল। দেওবন্দী মতাদর্শী লম্বা পাঞ্জাবি পরিধানকারী মৌলবীদের রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দিয়ে তিরস্কার করা হতো।

কিন্তু স্বাধীনতাপ্রেমিক এ দলটি নিজ ধ্যানে সর্বদায় মত্ত থাকত। হযরত

মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুাবী রহ. দুনিয়া থেকে চলে গেলেন তো তাঁর খাঁটি ও প্রকৃত অনুসারী এবং উপযুক্ত প্রতিনিধি শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান রহ. তাঁর স্থলাভিসিক্ত হন, যিনি তার ইলম ও চিন্তাধারার বৈধ ওয়ারিশ ছিলেন। তিনি স্বাধীনতাপ্রেমিক জামাতের নেতৃত্ব দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনকে এমন মুহূর্ত পর্যন্ত চালু রাখেন, যখন ভারতবাসী ঘরের কোণে বসেও ইংরেজ তাড়ানোর কল্পনা করত না। এই আন্দোলনকে শুধু কলম বা যবানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং কার্যকরিভাবেও করেছেন। আর কাজও সাধারণ ও অস্থায়ী ছিল না বরং এমন বিশ্বব্যাপী ও দীর্ঘস্থায়ী ছিল, যার পরিধিতে হিন্দুস্তানের মুসলিম জাহানের অনেক রাষ্টপ্রধান, রাষ্ট্রের বড় বড় কর্মকর্তা এবং ইংরেজদের সেনাদলের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বা অফিসার এসে যোগ দিয়েছিলেন। আর তাদের কাজের অবস্থা এমন ছিল যে, তা ভারতবর্ষ অতিক্রম করে সুদূর রাশিয়ার সীমান্তে পৌঁছে গেল। মদীনার গভর্নর জনাব জামাল পাশার ভাষ্যমতে– 'শায়খুল হিন্দু রহ.-এর মোটা হাড় ও জীর্ণ-শীর্ণ বদনে কী ধরনের গরম রাখা হয়েছিল যে, তিনি সমগ্র ইসলামী জগতকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে নিলেন!

অতএব, এ বুযুর্গদের ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন কোন সম্মান বা পদমর্যাদা লাভের জন্য ছিল না। মন্ত্রিত্বের আসন অর্জনের জন্যও ছিল না। ছিল না কোন পার্টির শক্তি যোগানোর জন্য। বরং উদ্দেশ্য ছিল একটি অত্যাচারী জাতির কবল থেকে একটি মজলুম দেশ ও জাতিকে উদ্ধার করা এবং ক্ষমতার আমানতকে হকদার জাতির হাতে তুলে দিতে।

## দারুল উলুমের শায়খুল হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী

আকাবিরে দেওবন্দের সর্বদা একই ফিকির ও যিকির ছিল যে, কিভাবে ভারতবর্ষকে ইংরেজদের হাত থেকে মুক্ত করা যায়। আর এ সম্পর্কে তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী ও কাশ্‌ফ ছিল। একদিন তাঁরা স্বাধীনতা সংক্রান্ত নেযাম ও পদ্ধতি বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য সাত্তা মসজিদে জমা হলেন। তখন এক বুযুর্গ, যার নাম ছিল হযরত হাজী মুহাম্মদ আবিদ সাহেব রহ., তিনি ইংরেজদের দখলদারিত্ব ও অস্বাভাবিক শক্তি দেখে বললেন, ইংরেজরা যেভাবে গভীর স্থান করে নিয়েছে, কিভাবে তাদের মূলোৎপাটন করবেন? তাঁর উত্তরে দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম সদরুল মুদাররিস ও শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব রহ. বললেন, হাজী সাহেব! আপনি কেমন ধারণা

করছেন? সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন ভারতবর্ষ চাটাইয়ের মতো সহজেই পাল্টে যাবে। কোন প্রকার যুদ্ধ হবে না। বরং কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই অত্যন্ত আমান ও নিরাপত্তার সাথে ইনকিলাব ঘটে যাবে। রাতে ঘুমাবে ইংরেজ সরকারের অধীনে আর সকালে জাগ্রত হবে অন্য সরকারের অধীনে।

আজ বিশ্ব প্রত্যক্ষ করল, ১৫ আগস্ট রাতে সাধারণ নিয়মানুসারে ১০টা বা ১১টার সময় মানুষ নিদ্রায় গেল, তখন ইংরেজ শাসন ছিল। যখন ১৫ আগস্টের তারিখ শুরু হলো ঠিক ১২টা বেজে ১ মিনিট, তখন অন্যদের শাসন ছিল। সুতরাং মানুষ নিদ্রায় গেল এক সরকারের অধীনে আর জাগ্রত হলো অন্য সরকারের অধীনে। এভাবেই বাস্তবে প্রমাণিত হলো হযরত ইয়াকুব সাহেব রহ.-এর ভবিষ্যদ্বাণী।

## ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রচেষ্টা শুরু করেছে মুসলমানরা

আমি বর্তমান জানবাজ মুক্তিযোদ্ধাদের অমর্যাদা ও অসম্মান করছি না। কিন্তু এ অবস্থা থেকে কখনও সরে আসতে পারব না যে, আজকের স্বাধীনতার সমস্ত প্রচেষ্টা একটি ইমারত বা বিল্ডিংতুল্য, যার প্রথম ভিত্তি আকাবিরে দেওবন্দ স্থাপন করে গেছেন। এ কারণে আমি উচ্চ গলায় বলতে পারি, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার চেষ্টা-প্রচেষ্টার শুরু একমাত্র মুসলমানরাই করেছে। তারাই সর্বপ্রথম স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করে আর বর্তমান মুক্তিযেদ্ধারা তাকে সফলতায় পৌঁছিয়েছে। হযরত শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ফতওয়া দিলেন– 'ভারতবর্ষ এখন দারুল হরব। অর্থাৎ দুশমনকবলিত এলাকা। হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব রহ. ও হযরত কাসেম নানুতুবী সাহেব রহ. উক্ত ফতোয়াকে ব্যবহার করেছেন। আর তাঁরা শাহ আবদুল আযীয রহ.-এর দেয়া ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ঔষধ বিশেষ পদ্ধতিতে নিজেরাও সেবন করেছেন এবং অন্যদের করিয়েছেন।

হযরত শায়খুল হিন্দু রহ. এই ব্যবস্থাপত্রকে উত্তেজক ঔষধ আকারে হেফাজত করে বাজারজাত করেছেন, যাতে সকল অভিজাত ও সাধারণ মানুষ তা ব্যবহার করতে পারে। সুতরাং তাকে সর্বসাধারণ সবাই ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। ফলে তা ব্যাপক আকার ধারণ করল। খেলাফত আন্দোলনের ঔষধও তিক্ত ছিল; কিন্তু সবাই ব্যবহার করেছেন। ফলে তাও ব্যাপক হয়েছিল। সুতরাং ব্যাপকহারে ব্যবহার শুরু হয়ে এবং আযাদীর জযবা মুসলমানদের থেকে অতিক্রম করে দেশের প্রতিটি নাগরিক পর্যন্ত পৌঁছে

গেল। তারাও আযাদী আন্দোলনে শামিল হল। হিন্দু ও মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও কুরবানীর বদৌলতে সুমিষ্ট ফল স্বাধীনতার আকৃতিতে আমাদের সামনে অবস্থিত, যে কারণে আমরা একে অপরকে মোবারকবাদ দিচ্ছি এবং ঐ আকাবিরদের জন্য কল্যাণের দোয়া করছি, যাঁদের বীজ রোপন ও তদারকির ফলে স্বাধীনতার বৃক্ষ তরতাজা হয়ে ফুলে-ফলে ভরে গেছে আর সেই ফল আজ আমরা সবাই আহার করছি। অর্থাৎ স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করছি।

## ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বিশ্বব্যাপী প্রভাব

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সমগ্র মুসলিম জাহানের স্বাধীনতা এ জন্য আমাদের মোবারকবাদের পরিধি বিশাল সুপ্রশস্ত। দেশের স্বাধীনতা তার প্রথম ধাপ। আর তার দ্বিতীয় ধাপ বা অংশ ১৯৪৮ সালের জুন মাসে যা কয়েক মাস পর আসছে। কিন্তু আমাদের ঐ সকল আকাবিরদের উদ্দেশ্য তার চেয়ে আরো উর্ধ্বে ছিল। আমাদের স্বাধীনতার দ্বিতীয় অংশ এবং পবিত্র মূল উদ্দেশ্য পূরণে অপেক্ষা রতে হবে এবং তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এখনও কোমর খোলার সময় হয়নি অর্থাৎ পূর্ণ প্রস্তুতির সময় আসেনি। আমাদের মোবারকবাদ পাওয়ার হকদার পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান উভয় রাষ্ট্র। আমরা পাকিস্তানকে মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে আর হিন্দুস্তানকে মাতৃভূমি হিসেবে ধন্যবাদ জানাই।

## ভারতবাসী মুসলমানদের ভবিষ্যৎ

আমি এ কল্পনা প্রকাশ না করে থাকতে পারছি না যে, বর্তমানে হিন্দুস্তানে মুসলমানরা সাধারণ সংখ্যালঘু হিসেবে বসবাস করবে। আজ স্বাধীনতা উৎযাপন মুহূর্তে তাদের খুশি ও আনন্দের বিষয় হলো যে, জুলুমবাজ ইংরেজদের দুশত বছরের জালেম শক্তির অবসান ঘটেছে, যার জন্য মুসলমানরা উদ্বিগ্ন ছিল।

## হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া

আজ এটি একটি চিন্তার বিষয় যে, তাদের সামাজিক অবস্থান এ দেশে কেমন হবে? এর জন্য তাদের এখন থেকেই পদক্ষেপ নিতে হবে। শরীয়তের

আলোকে শুধু একটি পন্থা-ই আছে যে, তারা নিজেদের মাঝে শরয়ী নেযাম ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের মধ্য হতে একজন ইমাম এবং বিশ্বস্ত নেতা বা আমির নির্বাচিত করে হিন্দুস্তানের মুসলিম জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন না থেকে একতাবদ্ধ হয়ে যাবে এবং ইসলামী কালিমার পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হবে এবং এক আমিরের অধীনে ইসলামী জীবন যাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিবে। শুধু প্রকাশ্যে মুখে মুখে একতা প্রকাশ করলে চলবে না, বরং বাস্তবে মূলত আন্তরিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হবে। এই এক বাক্যেই মুসলমানদের সামাজিক জীবনের সুদীর্ঘ দাস্তান লুকায়িত রয়েছে। তাদের জন্য সর্বপ্রথম কাজ হলো, অতীতের সকল তিক্ত-অতিক্ত ঘটনা ভুলে গিয়ে পরস্পর ভর্ৎসনা-তিরস্কার ও কুৎসা রটনার ধারাবাহিকতা, একে অপরের প্রতি দোষারোপ ও অভিযোগ করার চিন্তা-ফিকির ছেড়ে দিবে। শুধু ভবিষ্যৎকে সামনে রেখে এ চিন্তায় মত্ত থাকতে হবে যে, একতা ধরে রাখার জন্য ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের কী-কী পদ্ধতি হতে পারে সেগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে।

## নতুন হিন্দুস্তানে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা

আমার ধারণামতে এখন পূর্বের চেয়ে বেশি একতাবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। আর পূর্বের চেয়ে এখন ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি। তাই আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারব। আর ঐ দলগুলো যারা হীনম্মন্যতায় ভুগছিল, তারা স্বাধীনতা ইনকিলাবের কারণে বদলে গেল এবং বাস্তবে হিন্দুস্তানের পটপরিবর্তনের কারণে তারাও পরিবর্তন হয়ে গেল। এ কারণে এখন নতুন নতুন দল সৃষ্টি না করে, ইখতেলাফ ও মতানৈক্যের বীজ বপণ না করে জরুরি হলো ঐক্যের ভিত্তি স্থাপন করে নবগঠিত হিন্দুস্তানের সকল নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করা।

পরিশেষে পুনরায় ঐ মোবারকবাদ জ্ঞাপন করি মুসলমানদের জন্য এবং পুরো এশিয়াবাসীর জন্য।

# বয়ান : ১২

## পাকিস্তানের কথা

সমগ্র বিশ্ব এখন শুদ্ধি ও সংস্কার চাচ্ছে। এ অবস্থায় পাকিস্তানেও ধর্মীয় শুদ্ধিকরণ যথেষ্ট প্রয়োজন, যা শুধু হক্কানী আলেমদের দ্বারা সম্ভব। দেশ ভাগাভাগির ফলে শুদ্ধি ও সংস্কারকর্মসমূহে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলো। ইসলাহের রাস্তা কিছুটা বন্ধ হয়ে গেল। ছাত্ররা স্বাভাবিকভাবে দেওবন্দে আসতে পারে না বিধায় দারুল উলুমের ইলমী ফয়েজ পাকিস্তানে পৌঁছা মুশকিল হয়ে পড়ে।

দারুল উলুমের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও তদবিরে ভারত সরকার সীমান্ত খুলে দেয়। তো এখন দারুল উলুমের পক্ষ হতে পাকিস্তান সরকার-প্রধানের নিকট আবেদন, তারাও যেন ছাত্রদের হিন্দুস্তান আসার জন্য সীমান্ত খুলে দেন। আমরা আশাবাদী, এ চেষ্টায় আমরা সফল হব।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.



# পূর্বকথা

হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানীর অনুপ্রেরণায় এবং নায়েবে মুফতী হযরত আহমাদ আলী সাঈদ সাহেব-এর সমর্থনে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইবরাহীম সাহেব সভার সভাপতি নির্ধারিত হলেন। হযরত কারী হিফযুর রহমান সাহেব-এর কেরাত পরিবেশনে সভা আরম্ভ হলো। হযরত হাফেজ আখলাক আহমদ যিনি দারুল ইফতার কেরানী ছিলেন, তিনি মাওলানা মুফতী মাহদী হাসান সাহেবের পক্ষ থেকে তার লিখিত ফার্সি কাসিদা খায়রা মাকদাম পাঠ করে শোনান। দারুল উলুমের ছাত্র মুহাম্মদ হাসিব উর্দু নাত এবং ফজলুর রহমান ইবনে কারী হিফজুর রহমান আরবী কাসিদা পাঠ করে শোনান।

হযরত মাওলানা মাদানী খুতবায়ে মাসনুনাহ পাঠ করার পর ইরশাদ করেন–

অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, আমরা যে স্থানে সমাবেত হয়েছি, তা কোন সাধারণ স্থান নয়। তাযকেরাতুর রশীদ নামক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, হযরত নানুতুবী রহ. স্বপ্নে দেখেছিলেন 'আমি কাবা ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছি। তখন আমার পায়ের নিচ থেকে নালা প্রবাহিত হয়ে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে।' এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দারুল উলুম দেওবন্দ এবং তার শাখা-প্রশাখাসমূহ ছাড়া আর কী হতে পারে! হযরত মাওলানা রফিউদ্দীন সাহেব, যিনি হযরত শাহ আবদুল আযীম রহ.-এর খলিফা ছিলেন। হযরত শাহ আবদুল গনী সাহেব ছাত্রদের মধ্যে হযরত নানুতুাবী রহ. ও হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহি রহ.-এর খলিফাদের মধ্যে হযরত মাওলানা রফিউদ্দিন সাহেব রহ.-এর উপর গর্ব করতেন। সুতরাং তাসাওউফের ক্ষেত্রে মাওলানা রফিউদ্দন রহ.-এর মাকাম অনেক উপরে ছিল।

তিনি একবার স্বপ্ন দেখেন– 'ইলমের চাবিসমূহ আমার হাতে দেয়া হয়েছে।' তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, ইলমের ক্ষেত্রে আমার তেমন কোন অবস্থান নেই; তাহলে এমনটি কেন হলো? কিন্তু যখন তাকে দারুল উলুমের মুহতামিম বানানো হলো, তখন বোঝা গেল, তার মাধ্যমেই দুনিয়াতে ইলমের প্রচার-প্রসার করা হয়েছে।

অপর একটি স্বপ্নে তিনি দেখেছিলেন– 'কাবা শরীফ মাদরাসার আঙিনায়

অবস্থিত আর মানুষ তার তাওয়াফ করছে।' এ স্বপ্ন দ্বারা বোঝা যায়, ইসলামে দারুল উলুমের অবস্থান তেমন পৃথিবীবাসীদের জন্য নূর ও বরকতের ক্ষেত্রে কাবা শরীফ যেমন। কাবা থেকে যেমনভাবে নূর ও বরকত ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি দারুল উলুম দেওবন্দ থেকেও নূর ও বরকত ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের আমলের অবস্থা যদিও অনেক নিম্ন পর্যায়ে; কিন্তু আল্লাহ তায়ালার বড় ইহসান যে, তিনি আমার দ্বারা এই মহান মারকাজের খেদমত নিচ্ছেন। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী রহ.-এর ঐ পা-ুলিপিতে যা এখনও ছাপানো হয়নি, আমি লেখা দেখেছি, যখন বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাঁকে বন্দী করে দিল্লীতে নিয়ে যায়, তখন দেওবন্দ নামক স্থান অতিক্রমকালে তিনি বলেছিলেন- 'এই স্থান হতে ইলমে নবুওয়াতের সুঘ্রাণ আসছে।'

সুতরাং এ জায়গাটি আল্লাহ তায়ালা ইলমে শরীয়ত ও ইলমে নবুওয়াতের জন্য প্রকাশস্থল হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব রহ.-এর নিকট যখন আমাদের মাদরাসার মুহতামিম সাহেবের সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আহমদ সাহেব রহ. আরয করলেন, হযরত! আমাদের মাদরাসার জন্য দোয়া করবেন, তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন, বাহ! তোমাদের মাদরাসার জন্য আমার পূর্ণ সংখ্যা জানা নেই যে, কত রাত এই মাদরাসার জন্য দোয়ার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। আর এখন মাদরাসা তোমাদের হয়ে গেছে। তিনি বললেন, ১৮৫৭ সালের পর আমাদের খেয়াল ছিল, ইলমে শরীয়তের জন্য কোন মার্কায হওয়া উচিত। কিন্তু আমার জানা ছিল না, আল্লাহ তায়ালা এ কাজের জন্য দেওবন্দকে নির্বাচন করবেন। অতএব এ আমাদের সৌভাগ্য যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের থেকেই দারুল উলুমের খেদমত নিচ্ছেন। আকাবিরদের উসিলায় দারুল উলুমের যে মর্যাদা লাভ হয়েছে, তা অন্য কোন স্থানের নসিবে জোটেনি। ইলমে শরীয়তের জন্য আল্লাহ তায়ালা বড়-বড় মার্কাজ নির্বাচন ও নির্ধারণ করেছেন। মক্কা মুকাররমা, মদিনা মুনাওয়ারা, ইরাক, শাম, মিশর, খোরাসান, বোখারা ও সমরকন্দ ইত্যাদি। পরিশেষে দেওবন্দের ভাগ্যে এ দৌলত জুটল। দীনি ইলমসমূহের যে পরিমাণ উন্নতি আপনাদের দেওবন্দে হয়েছে, তা পৃথিবীর কোথাও হয়নি।

এখানকার গ্রামাঞ্চলে ইলমের যে প্রভাব আছে, এমন প্রভাব অন্য এলাকার শহরগুলোতেও নেই।

আমাদের সম্মানিত মুহতামিম সাহেব রহ. বয়সে যদিও আমার ছোট; কিন্তু তার যে খান্দানি নেসবত বা বংশীয় সম্পর্ক ও মর্যাদা রয়েছে, সেই হিসেবে

তিনি আমাদের সকলের সর্দার ও মুরুব্বী। আমাদের আফসোসের শেষ থাকত না যদি তিনি পাকিস্তানে থেকে যেতেন। যদিও এ সফর কোন কারণবশত হয়েছিল। কিন্তু লোকমুখে শুনেছি, হযরত আর ফিরে আসবেন না। তাতে আমরা খুবই দুঃখিত ও ব্যথিত হতাম কিন্তু 'হে কেনান চিন্তা কর না ইউসুফ (আ.) আবার ফিরে আসবেই।'

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর শুকরিয়া যে, আমাদের সদরে মুহতামিম সাহেব রহ. – যিনি হযরত নানুতুবী রহ.-এর চোখের মণি – তাশরিফ এনেছেন। আমরা যেভাবেই তাঁর আগমনের আনন্দ প্রকাশ করি না কেন, তা তার শানে কমই হবে। তাঁর অবস্থান বা বসবাস যদি পাকিস্তানেও হতো, তবুও তাঁর ফয়েজ ও বরকত থেকে বঞ্চিত হতাম না। কিন্তু আমাদের জন্য তা দুশ্চিন্তার কারণ হতো। তাঁর ফুয়ুজের ঝর্ণা আমাদের জন্য কাবার ঝর্ণাতুল্য।

পরিশেষে আমরা তার সকাশে আশাবাদী যে, তিনি তার সফরনামার কারগুজারি শুনিয়ে আমাদেরকে উপকৃত করবেন, যাতে তা ভবিষ্যতে আমাদের কাজে আসে। হযরত মাদানী রহ.-এর বয়ানের পর মৌলভী গোলাম হায়দার ও মৌলভী আবদুল আহাদ সাহেবদ্বয়কে দস্তার প্রদান করা হয়। তারপর হযরত মুহতামিম সাহেব রহ. খুতবায়ে মাসনুনা দেয়ার পর নিম্নবর্ণিত কবিতাংশ পাঠ করে নিজ সফরের কারগুজারি বয়ান করেন।



اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا• اَمَّا بَعْدُ:

## অনেক বড় মুনাফা

সম্মানিত উপস্থিতি!

আমি চিন্তিত যে, আকাবির ও আসাতিজাদের মজলিসে আমার সফরের প্রভাব ও কারগুজারি কিভাবে বর্ণনা করব। বুযুর্গদের এ মজলিসে আমার বাকশক্তি নির্বাক হয়ে যাচ্ছে, কোন কথাই স্মরণে আসছে না, বুঝে আসছে না। আমাকে হুকুম করা হয়েছে, সফরের ঐ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করব, যা প্রত্যেক মানুষ নিজ সফর থেকে নিয়ে আসে। প্রথমত পাকিস্তান সফরের কারণে আমার যে আজিমুশ্বান বা বিরাট উপকার অর্জন হয়েছে, তাহলো ঐ দোয়া, যা বুযুর্গান করেছেন। যদি পাকিস্তান না যেতাম, তাহলে এমন দোয়া লাভ করতে পারতাম না। এতদ্ব্যতীত বুযুর্গদের উৎসাহমূলক বাক্যও হাসিল হতো না। হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ মাহদী হাসান সাহেব নিজ কবিতায় যে প্রভাব-প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন, তা আমার জন্য গর্বের বিষয়। আর আমাদের শায়খুল হাদীস সাহেব সম্পর্কে আমি কী বলব? তিনি তো আমাদের সকলের জন্য ইনশাআল্লাহ নাজাতের উসিলা। হযরত এই অধমের জন্য যে বাক্যগুলো উচ্চারণ করেছেন, আমার বিনীত আরজ, তিনি যেন এ কথাগুলো দ্বারা স্বাক্ষ্য

দেন, যাতে এ বাক্যগুলো ওখানে আমার নাজাতের উসিলা হয় আর এ বাক্যগুলোই আমার নাজাতের দলিল হয়। সেই সময় হযরত মুহতামিম সাহেব অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে কাঁদছিলেন। এ হালত সারা মজলিসের উপর বড় প্রভাব ফেলল। ফলে সকলের অজান্তেই মজলিস চোখের পানিতে ভরে গেল। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর ইরশাদ করেন–

## পাকিস্তান সফরের উদ্দেশ্য

আমি পাকিস্তানে সফর করেছি তিনটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে।

এক. প্রিয় বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মুলাকাত, যার তাকাজা অনেক পূর্ব থেকেই ছিল। সেখানকার মাদরাসাগুলো থেকেও আবেদন ছিল এবং বার্ষিক জলসাগুলোতে শরীক হওয়ার জন্য চিঠিপত্র সর্বদা আসছিল। তাই এবার তাদের আবদার রক্ষার চেষ্টা করেছি। আর সরকারের নিকট অনুমতি নেয়ার সময় সফরের উক্ত উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করেছি।

দুই. দারুল উলুমের ফায়দা ছিল। দারুল উলুম সবসময় আমার সাথে ছিল। সুতরাং এ উদ্দেশ্যে সেখানে সফর করেছি। আবার সাধ্যানুপাতে চেষ্টাও করেছি। আলহামদুলিল্লাহ তার আশানুরূপ ফল ও উপকারিতা হয়েছে।

তিন. তাবলীগ ও ইসলাহ (আত্মশুদ্ধি), যা প্রতিটি মানুষের জন্য ফরজ। আর কুদরতিভাবে তা আমার অন্তরেও ছিল। এ হিসেবে একটি গুরুত্বপুর্ণ সফর ছিল। সুতরাং অনেক স্থানে জলসাগুলোতে ইসলাহে দীনের আলোচনা করেছি। আমি কোন রাজনৈতিক মানুষ ছিলাম না, হবও না। এ কারণে জলসাগুলোতে ব্যাপকভাবে সামাজিক ও চারিত্রিক সংশোধনমূলক ওয়াজ হতো।

## পৃথিবীজুড়ে দীনি অধঃপতন

শুধু হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান নয়, সারা জাহানের দীনি অবস্থা একই। আজ সারা পৃথিবী থেকে সুখ-শান্তি হারিয়ে গেছে। কোথঅও কোন স্বস্তি নেই। আজ সর্বত্রই শুধু অশান্তি, নিরাপত্তাহীনতা, লড়াই ও হাঙ্গামা ইত্যাদির সংবাদ শোনা যায়। শুদ্ধতা ও সততার সংবাদ কোথাও থেকে আসে না, কল্যাণ ও হেদায়েতের সংবাদ কোথাও থেকে পাওয়া যায় না। দীনের সবচেয়ে বড় মার্কাজ বা কেন্দ্র হলো হেজায। স্বয়ং ওখানকার দীনি ও আখলাকি অবস্থাও

খুব একটা ভালো নয়।

তৃতীয়বার যখন আমার হজে যাওয়ার সুযোগ হয়, তখন আমি দেখলাম, আসর নামাযের পর যখন হাজার হাজার মানুষ বাইতুল্লাহর তাওয়াফ ও আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত। তখন অহংকারী পোশাক পরিহিত ভদ্র ফ্যামিলির কিছু যুবক, মসজিদে হারামে ইংরেজি পত্রিকা হাতে দাঁড়িয়ে আছে, যাতে উলঙ্গ ছবি রয়েছে! তারা ওইসব উলঙ্গ ছবির সৌন্দর্য বর্ণনা করছিল এবং ইউরোপ, লন্ডনের কৃষ্টি-কালচার ও তাহজিব-তামাদ্দুন সম্পর্কে আলোচনায় মত্ত ছিল। তাওয়াফে ও যিকিরে লিপ্ত মানুষগুলো তাদের নিকট বোকা মনে হলো এবং তাদের নিকট উলঙ্গ ছবিগুলোর দর্শন বাইতুল্লাহর দর্শনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছিল। আমার খুব অস্বস্তি অনুভব হচ্ছিল এই ভেবে যে, বাইতুল্লাহর সামনে সম্মানিত হারাম শরীফে বসে দোয়া কবুল হওয়ার সময় উলঙ্গ ছবি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে!

আমি মাগরিবের আযান পর্যন্ত কিছুই বললাম না। মাগরিবের আযান হলে নামাযান্তে তাদের আগের অবস্থায় দেখতে পেলাম। তখন বিরক্ত হয়ে বললাম, হে প্রিয় বৎসরা! সারাবিশ্বের মানুষ তোমাদের অনুসরণ ও অনুকরণ করার নিমিত্তে এখানে আসে আর তোমাদের আমলের নমুনা বা মডেল যদি হয় এমন, তাহলে আমাদের অবস্থা কেমন হবে? তোমরা নিজেরা নিজেদের মাকাম ও মর্যাদা বোঝা উচিত। এখানে আসা ব্যক্তিরা তোমাদের কাছ থেকে ইসলামের নতুন বা আদর্শ বুঝতে চায় এবং শিখতে চায়।

মোটকথা, সারাবিশ্বে আজ মানুষের নৈতিক অবস্থা এমন। এমতাবস্থায় পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। অতএব প্রতিটি দেশের মতো পাকিস্তানেরও দীনি ইসলাহ অতীব জরুরি কর্তব্য।

## সংশোধনের দায়িত্ব

সংশোধনের জিম্মাদারী কাকে দেয়া হয়েছে? মুসলমানদের উপর। মুসলমানদের খাইরুল উমাম বলা হয়েছে। যেমন মুসলমানের নবী ইমামুল আম্বিয়া, তেমনি তাঁর উম্মতও ইমামুল উমাম। ইমামের ওযু যদি ভেঙ্গে যায়, তাহলে মুকতাদীর নামায নষ্ট হয়ে যায়। ইমামুল উমাম যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে বাকিদের কথা বলাই বাহুল্য। তারপর মুসলমানদের মধ্য হতে ইসলাহে উম্মতের জন্য বেশি দায়িত্ব হলো উম্মতের আলেমগণের উপর। আফসোস! শত আফসোস যে, মুসলমানরা আজ নিজেদের জিম্মাদারীকে

ভুলে গেছে! যদি তারা নিজেরা সচ্চরিত্রবান হতো, তাহলে অন্যান্য জাতিও তাদের দেখে চরিত্রবান হতো।

## পাকিস্তানে যে সকল ফেতনা প্রকাশ পেয়েছে

ধর্মীয় আবরণে পাকিস্তানে ৩টি ফেতনাবাজ দল মুসলমানদের জন্য ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১. ভণ্ড নবী দাবিদার কাদিয়ানী ফেতনা।

২. শিয়া জাতির ফেতনা এবং

৩. পাশ্চাত্যের নোংড়া ফেতনা।

ভণ্ড কাদিয়ানীরা কোয়েটা ও বেলুচিস্তানকে মার্কাজ বানিয়ে নিয়েছে। তাদের নবগঠিত ধর্মীয় নেতা মির্জা বশির তো ঘোষণাই করে দিয়েছে যে, বেলুচিস্তান শাসন করবে কাদিয়ানীরা। তাই তারা কোয়েটাতে সদর দপ্তর খুলে দিয়েছে, যা মিশর, ইরান ও অন্যান্য মুসলিম জাহানের অধিবাসী কাদিয়ানীদের প্রাণকেন্দ্র বা মুখপাত্র। তারা মুলতানে বিশাল সমাবেশের ঘোষণা করেছে। তাতে ৫০ হাজার কাদিয়ানী জমা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য হলো, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে কাদিয়ানী মতবাদ প্রচার করা। তারা নিজেদের কিছু সদস্যকে বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রে প্রেরণ করে তাদেরকে আরবী ভাষায় পারদর্শী করে তুলেছে। নমুনাস্বরূপ তাদের দ্বারা জনগণের সামনে আরবী ভাষায় বক্তৃতা করিয়ে কাদিয়ানী মতবাদ প্রচার করে থাকে এবং নিজেদের ধর্মের বিভিন্ন কারগুজারি পেশ করে। এভাবে হকপন্থীরা তাদের বাতিল মতবাদ গ্রহণ করছে। অপরদিকে এ সকল আরবী ভাষায় পারদর্শী লোকদের দ্বারা আরব বিশ্বে তাদের মতবাদ প্রচার করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে শিয়া মতবাদের লোকেরা পাকিস্তানের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তাদের নোংরা মতবাদ প্রচার করে যাচ্ছে। ফলে সাদাসিধা সরলমনা জনসাধারণ শিয়া মতবাদ গ্রহণ করছে। এমনিভাবে তারাও ব্যাপক উন্নতি লাভ করছে।

পাশ্চাত্যের ফেতনা। এ ফেতনাকে আধুনিকতা বা অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতা নামেও অবহিত করা হয়ে থাকে, যার মাধ্যমে ধর্মহীনতা ও নির্লজ্জতার বীজ বপণ করা হচ্ছে। তাদের নিকট ধর্মের কোন গুরুত্বই নেই। তারা ধর্মে-কর্মে

বিশ্বাসী নয়। পাশ্চাত্যের ফেতনা দ্বারা ধর্মদ্রোহিতা ও নাস্তিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোটকথা, এহেন পাশ্চাত্য মনোভাবের ফেতনা সারা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

## ফেতনা বন্ধের উপায় ও উপকরণ

এক সময় উক্ত ফেতনাসমূহের উত্থান দারুল উলুমই বন্ধ করেছিল। আজও দারুল উলুমকে এগিয়ে এসে ফেতনা প্রতিরোধ করতে হবে। এদের আড়ালে কমিউনিজম, ক্যাপিটালিজম ইত্যাদি সর্বগ্রাসী রাজনৈতিক ফেতনাও মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। তাদেরও প্রতিরোধ ওলামায়ে আহলে হককেই করতে হবে।

আমি পাকিস্তানের আহলে হক আলেমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, যদি মুসলমানদের চারিত্রিক অবস্থা সংশোধন হয়ে যায়, তাহলে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর অবস্থা এমনিতেই সংশোধন হয়ে যাবে। বরং আপনারা চরিত্র সংশোধন করে নিন; তাহলে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের মধ্যে পরস্পর মুয়ামালাতের অবস্থাও ভাল হয়ে যাবে, উন্নতি লাভ করবে।

একটি হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে–

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, আমি যদি কোন জাতির বদ আমলের কারণে নারাজ হই, তাহলে তাদের বদ আমলের কারণে অন্য জাতির ভিতর তাদের প্রতি দুশমনি ও শত্রুতা স্থাপন করে দেই। আর তারা হিংস্র জল্লাদের ন্যায় পাপিষ্ঠ জাতির উপর জোরপূর্বক চেপে বসে এবং হত্যা-লুণ্ঠণের মাধ্যমে তাদের শাস্তি দিতে থাকে। অতএব তোমাদের যদি এই শাস্তি, অসহায়ত্ব অপছন্দ হয়, তাহলে কোন জাতিকে খারাপ বলো না। আমার সাথে তোমাদের মুয়ামালা ঠিক করে নাও। আমি সকল জাতির অন্তরে তোমাদের ভালবাসা ঢেলে দিব।

তাই আমি অন্য জাতির অবস্থা খারাপ হওয়ার দায় মুসলমানদের উপর আরোপ করি। যদি তারা সংশোধন হয়ে যায়, তাহলে সকল জাতি সংশোধন হয়ে যাবে।

## ইসলাহী কর্মে ভারত-বিভক্তির প্রভাব

বর্তমানে সারা পৃথবীর যেমনভাবে ইসলাহের আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন, তেমনিভাবে ধর্মীয় দিক থেকে পাকিস্তানের বেশি পরিমাণ ইসলাহের

প্রয়োজন, যা উলামায়ে হাক্কানীদের দ্বারাই সম্ভব। বিভক্তির কারণে ইসলাহী কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে এবং ইসলাহের রাস্তা কিছুটা বন্ধ হয়ে গেছে। পাকিস্তান থেকে ছাত্র আসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে দারুল উলুমের ইলমী ফয়েজ ও বরকতে সেখানে পৌছা দুষ্কর হয়ে গেছে। বর্তমানে দারুল উলুমের প্রচেষ্টায় হুকুমত ছাত্রদের জন্য সীমান্ত খুলে দিয়েছে। এখন দারুল উলুমের পক্ষ থেকে পাক সরকারের প্রতি আবেদন, তারাও ইলমপিপাসু ছাত্রদের ভারত আসার রাস্তা খুলে দেন। আশা করি, আমাদের চেষ্টা সফর হবে। আর আমার তো আশা, শুধু ছাত্রদের আসা-যাওয়ার উপর প্রতিবন্ধকতা শিথিল করলে চলবে না, সাথে সাথে মুবাল্লিগ ও দায়ীদের আসা-যাওয়ার ব্যাপারটিও উন্মুক্ত করে দিবে। তাহলে উভয় রাষ্ট্রের সম্পর্ক উন্নয়নে বেশি কার্যকর ও প্রভাব পড়বে। কারণ, মুবাল্লিরা ওখানকার চারিত্রিক অবস্থা পরিশোধন করবেন। আর যে দেশের চরিত্র যত শুদ্ধ হবে, সে দেশ তত উন্নতি লাভ করবে। তেমনিভাবে অন্য রাষ্ট্রগুলো তাদের উপর ভরসা করে সম্পর্ক গড়বে।

## অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক গুণ

বর্তমানে চারিত্রিক অধঃপতনের কারণে সর্বক্ষেত্রেই অধঃপতন পরিলক্ষিত হচ্ছে। অবশ্য গোটা পৃথিবীতে যেখানেই দীনের শোচনীয় অবস্থা বিরাজ করছে, সেখানে এমন আশার আলোও দেখেছি, যা অন্য কোন স্থানে নেই। আর তাহলো সংশোধনের চাহিদা এবং ভালোকে গ্রহণ করার মানসিকতা। অর্থাৎ সেখানকার ছোট-বড় সবার ভিতর সংশোধনের মন-মানসিকতা পেয়েছি। কিন্তু ইসলাহের জন্য সব ধরনের আলেমের প্রয়োজন। একজন খালি মস্তিষ্কওয়ালা সরলমনা মানুষের জন্য শুধু বক্তব্য দ্বারা বোঝানোই যথেষ্ট হবে। একজন যুক্তিবাদীদের জন্য হেকমত ও দলিল উপস্থাপনার প্রয়োজন হবে। একজন কট্টরপন্থী বস্তুবাদীর জন্য আবশ্যকীয় জাওয়াব এবং তাদের উত্থাপিত দলিলের বিপক্ষে দলিল পেশ করে তাদের বোঝাতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন পাকে এ তিনটি স্তরের প্রতি ইঙ্গিত করে ইরশাদ করেছেন–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

সুতরাং যেমন মনমানসিকতার মানুষ হবে তাদেরকে সেইভাবেই বোঝাতে হবে। এ কারণে কর্মপদ্ধতি বণ্টন অতীব জরুরি।

## স্বনির্ভরতার ঘোষণা

উল্লিখিত গুণাবলির সাথে সাথে মুসলিহ (সংশোধনকারী)কে স্বনির্ভর হওয়া অতীব প্রয়োজন। কারণ, ইসলাহী কর্মে যত বাধা-প্রতিবন্ধকতা ও প্রভাবের ক্ষেত্রে যত বাধা হতে পারে, সবগুলোই মুসলিহের লোভ নামক ব্যাধি থেকে সৃষ্টি হয়। শ্রোতারা প্রথমে ভালোভাবে খেয়াল করে, মুসলিহের ভিতর কোন স্বার্থ বা লোভ আছে কিনা। যদি সামান্যতম লোভ-স্বার্থ দেখতে পায়, তাহলে তারা মুসলিহকে ভালো নজরে দেখে না। এ কারণে যেখানে আত্মনির্ভরতা জরুরি, সেখানে তার ঘোষণা করাও জরুরি। তাতে ইসলাহ শুধু লি ওয়াজহিল্লাহ হওয়ার পাশাপাশি অন্তরেও প্রভাব সৃষ্টি করবে। সুতরাং দাওয়াত ও তাবলীগের প্রভাবের জন্য বিশেষ করে স্বনির্ভর হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ কারণে কুরআন শরীফ ঘোষণা করেছে, নবীগণ ওয়াজ ও ইসলাহের সময় বিশেষভাবে আত্মনির্ভরতার ঘোষণা করতেন এবং বলতেন–

وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

তোমাদের কাছে আমি কোন বিনিময় চাই না। আমার কর্মফল আমি আল্লাহর কাছ থেকে নেব।

মোটকথা, পাকিস্তান থেকে যদি ছাত্ররা আসতে থাকে আর ভারত থেকে যদি মুবাল্লিগরা আসতে থাকে, তাহলে উভয় দেশের কাজে বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে, যার নজির পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে।

## আমলে সততার প্রভাব

আনুমানিক আটক বছর পূর্বে জমিয়তে উলামা সিন্ধু শাখার কাউন্সিলে সভাপতিত্ব করার জন্য আমার হায়দারাবাদ যাওয়া হয়েছিল। সভাশেষে সেখানকার হিন্দুরা আমাদের চায়ের দাওয়াত দিল। তাদের দাওয়াত গ্রহণ করা হলো। আসর নামায পর মোটর গাড়ি এলে তাতে আরোহণ করে আমরা শহরের বাইরে তাদের কুটিরে পৌঁছলাম। তখন মাগরিবের নামাযের সময়, নামাযের জন্য আমাদের মন অস্থির ছিল। এ অবস্থা তার আঁচ করতে পেরে বলল, মনে হয় আপনার নামাযের জন্য উদ্বিগ্ন। মসজিদ তো এখান থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে। সেখানে পৌঁছতে-পৌঁছতে নামাযের ওয়াক্ত চলে যাবে। তাই আপনারা কিছু মনে না করলে নামায আমাদের বাড়িতেই পড়ে নিন। আমরা বললাম, আমাদের কোন অসুবিধা নেই, সব জায়গাই আমাদের

মসজিদ।

নামাযের সিদ্ধান্ত হওয়ার পরবর্তী দৃশ্য আরো উপভোগের বিষয় যে, তারা কেউ অযুর পানি আনতে লাগল, কেউ সাদা তোয়ালে কেউবা বিছানা বিছাতে লাগল। আর তারাই আমাদেরকে কেবলা নির্ধারণ করে দিল। আমরা আযান দিয়ে নামায আদায় করলাম এবং তারা সকল পুরুষ, ছেলে, বৃদ্ধ হাত বেধে দাঁড়িয়ে রইল।

যখন আমরা নামায ও নামাযান্তে আমল থেকে ফারেগ হলাম, তখন তারা আমাদের নিকট এল এবং বলতে লাগাল, আমরা কত ভাগ্যবান যে, আমাদের ঘরে ভগবানের নাম উচ্চারিত হচ্ছে।

আমার কাছে তাদের এ কথাগুলো দামি মনে হলো। আমি তাদের বললাম, এটি আপনাদের সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু সাধারণভাবে হিন্দুরা নামায ও মসজিদের ব্যাপারে সম্প্রদায়গত বাড়াবাড়িমূলক ব্যবহার করে। মসজিদ আর বাজনা ইত্যাদির ঝগড়া তো প্রতিনিয়ত হতে থাকে। তারা বলল, মাওলানা সাহেব! মানুষ যেমন, তার সাথে জোড়া মেলাও হয় তেমন। যদি তারা আমাদের চিতায় নামায পড়ে, তাহলে আমরা তাদের সাথে একই ব্যবহার করব।

মোটকথা, যদি মুসলমান দীনের নমুনা হয়ে যায়, তাহলে অটোমেটিক মানুষের দিলে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যাবে। ভুল নমুনা পেশ করে আমরা নিজেরাই লোকদের দীন থেকে সরিয়ে দিচ্ছি। আমরা মুবাল্লিগে দীন হওয়ার পরিবর্তে তাবলীগের প্রতিবন্ধক হচ্ছি। আমাদের আমলের নমুনা দেখে মানুষ বলাবলি করে, ইসলামের অর্থ যদি এ-ই হয়, তাহলে এমন ইসলামকে হাজারবার সালাম জানাই। এমন ইসলামের দরকার নেই।

অতএব, দারুল উলুম ভিত্তিগতভাবেই মুসলিহ। আর মানুষ তার ইসলামী কর্মে প্রভাবান্বিত। বর্তমান সময়ে দারুল উলুমের চারিত্রিক ও দীনি ব্যাপারে বেশি-বেশি ইসলাহী কাজ করা অতীব প্রয়োজন।

## দারুল উলুম দেওবন্দের মর্যাদা

দারুল উলুমের সম্মান এখানে বসে আমাদের অনুভব হবে না। তার বাইরে গিয়ে বোঝা যাবে, দারুল উলুম কেমন নেয়ামত। আমার ফিরে আসার রাস্তায় যখন কিছুটা প্রতিবন্ধক দেখছিলাম, তখন দারুল উলুমের মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সবসময় আমার নজরে ভাসতে লাগল। কারণ, এমন পরিবেশ

তো সব স্থানে পাওয়া যায় না। ঈদুল আযহার নামায আমার করাচীতে আদায় করার সুযোগ হয়েছে। এ কথা তো সুস্পষ্ট যে, ১৪ লাখ জনবসতির শহর করাচীতে ঈদের জামাতের দৃশ্য কত সুন্দর হবে। লাখ মানুষের জমায়েতে এক একস্থানে ঈদের নামায আদায় করে। কিন্তু তারপরও আমি উলামা ও তালাবাদের পরিবেশ খুঁজছিলাম। আমি দারুল উলুমের মতো পরিবেশের ঈদগাহ তালাশ করছিলাম। মাওলানা মুহাম্মদ সাদিক সাহেবের মাদরাসার ঈদের নামায পড়লাম, যেখানে কিছু তালাবা ও উলামার পরিবেশ ছিল। কিন্তু তারপরও অন্তরে পুরোপুরি তৃপ্তি লাভ হলো না। আর ওখানকার লোকেরা আতিথেয়তা কম করেননি। পদে পদে আরামের আসবাব ছিল। জনসাধারণ আমাকে সেখানে দারুল উলুম প্রতিষ্ঠা করতে বললেন এবং তিন লাখ টাকার ফান্ডও পেশ করলেন। তারা সেখানে অবস্থান করার জন্য আমাকে মজবুত দলিলও পেশ করতেন। কিন্তু এত কিছুর পরও আত্মার টান এবং দারুল উলুমের পরিবেশ তালাশ করছিল।

## হযরত মাদানী রহ.-এর রূহানি হস্তক্ষেপ

আমার ফিরে আসার পীড়াপীড়ি দেখে কিছু মানুষ বলছিল, আপনার এখানে অবস্থান না করার কারণ বাস্তবে হযরত মাদানী রহ.-এর রূহানি তাওয়াজ্জুহ, যা তিনি হিন্দুস্তানে বসে বসে করছেন। এ কারণে আপনি পাকিস্তান থেকে চলে যেতে চাচ্ছেন। সুতরাং আমার মনের টান যেভাবেই সৃষ্টি হোক তাতে এমনটি ছিল যে, আমি দেওবন্দে হাজির হব। আলহামদুলিল্লাহ হাজির হয়ে গেছি। আর আল্লাহ আমার মুরুব্বী ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সাক্ষাতে সুযোগ করে দিয়েছেন। তারপরও পাকিস্তানের বুযুর্গ, বন্ধু-বান্ধবদের ভালবাসাযুক্ত মেহমানদারির চিত্র অন্তরে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

তবে এ কথা বলতে পারি যে, এই মুহূর্তের উপস্থিতি সম্পূর্ণ হযরত শায়েখ রহ. এর জাহেরী ও বাতেনী তাওয়াজ্জুহ ও হস্তক্ষেপের দ্বারাই হয়েছে। ফলে দ্বিতীয়বার দারুল উলুমের খেদমত করার সৌভাগ্য নসীব হলো।

## উসমানী জামা

আমার শ্রদ্ধেয় ভাই হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর নাতী হযরত মাওলানা আবদুর রশিদ গাঙ্গুহী সাহেব আমার দারুল উলুমের খেদমতকে উসমানি জামার সাথে তুলনা করে আমাকে পত্র দিয়েছিলেন যে, আপনি স্বেচ্ছায় উসমানি জামা দেহ

থেকে খুলে ফেলবেন না। আমি তার উত্তরে লিখেছিলাম, না; আমি উসমানি জামা খুলিনি। শুধু গোসল করার মুহূর্ত পর্যন্ত খুলে রেখেছি। কেমন যেন ধৌত করার জন্য খুলেছি। তারপর অচীরেই পরে নেব।

## শুকরিয়া জ্ঞাপন

পরিশেষে বলছি, গতকাল থেকে আপনারা আমার প্রতি ভালবাসার যে নজির পেশ করছেন, তা আমার অন্তরের গভীরকে প্রভাবিত করছে। আমি আপনাদের সকলের শুকরিয়া প্রকাশ করছি এবং তাকে নিজের নাজাতের জন্য উসিলা মনে করি। আল্লাহ তায়ালা আপনাদরেকে ছোটদের সাহস দানের তাওফিক নসীব করুন।

# বয়ান : ১৩

## ইসলামী শাসন

ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত জরুরি বিষয়। ফকীহগণ লিখেছেন, যখন দেশে ইসলামী শাসন না থাকে, তখন মুসলমানদের উপর ওয়াজিব হলো নিজেদের মধ্যে একজন আমির বা নেতা নির্ধারণ করবে। সব মোয়ামালা তার কাছে পেশ করবে এবং তার কথা ও কাজের পূর্ণ আনুগত্য করবে। এতে সবাই লাভবান হবে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ• يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا۝

## আনন্দ দিবস

সম্মানিত উপস্থিতি!

বিশেষ করে আমার জন্য আজ দিনটি অত্যন্ত আনন্দের। আজকের মর্যাদপূর্ণ মাহফিলে উপস্থিত হয়েছেন এই এলাকার আমিরে শরীয়ত এবং অন্যান্য বুযুর্গগণ। আমি তাদের সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছি। আবার তাদের ফয়েজ ও বরকত লাভেরও সুযোগ হয়েছে। অন্য কথায় তাঁর প্রজা হওয়ার গৌরব অর্জন করতে পেরেছি। কারণ, আমিরে শরীয়তের সামনে তো সবাই প্রজা-ই হয় চাই তিনি নিজ এলাকার হোন বা অন্য এলাকার হোন।

সুতরাং প্রজা হিসেবে নিজ আমিরের খেদমতে হাজির হওয়া তো আলাদা

সৌভাগ্য ও বরকতের বিষয়। এ কারণে ইমারাতে শরয়ী সম্পর্কে ছাত্রসুলভ কিছু কথা আপনাদের সামনে পেশ করব। বেশিক্ষণ কথা বলতে পারব না। কারণ, শারীরিক দুর্বলতা এবং ইলমের স্বল্পতার সাথে সাথে সকাল থেকে মস্তিষ্কের চাপও সৃষ্টি হয়েছে বলে অনেক ক্লান্তি ও কষ্ট অনুভব করছি।

ডাক্তারদের পক্ষ হতে বলা হয়েছে, ঈশার পর কোন মাহফিলে যাওয়া যাবে না, বক্তৃতা করা যাবে না। কিন্তু বুযুর্গদের হুকুম ডাক্তারি হুকুম থেকে অনেক বড় ও উঁচু। কারণ, ডাক্তার বডির চিকিৎসা করে আর বুযুর্গানে দীন আত্মার চিকিৎসা করেন। আর আত্মা তো কুদরতিভাবে দেহ থেকে উত্তম, তাই ডাক্তারের হুকুমের চেয়ে বুযুর্গানে দীনের হুকুম পালন অধিক আবশ্যকীয় কাজ। এ কারণে হুকুম পালনার্থে কিছু পেশ করা জরুরি ছিল। আমি বেশিক্ষণ সময় দিতে পারব না; শুধু ছাত্রসুলভ কয়েকটি কথা পেশ করব।

## ইসলামের বুনিয়াদ

ইসলাম একটি সুপ্রশস্ত এবং বিশ্বব্যাপী দীন বা জীবনব্যবস্থা। সারা পৃথিবীর সকল জাতির জন্য শান্তি ও মুক্তির পয়গাম। ইসলাম নামক ইমারতটি পাঁচটি খুঁটির উপর দাঁড়িয়ে আছে।

১. ইতেকাদাত।

২. ইবাদত।

৩. আখলাকিয়্যাত।

৪. মুয়ামালাত ও

৫. ইজতেমাইয়্যাত।

## আকাঈদ বা বিশ্বাস

ইসলামের প্রথম শাখাটি হলো আকিদা। মানুষের আকিদা সঠিত হতে হবে। আকিদার ভিত্তি তিনটি বস্তুর উপর। ১. মাবদা-সূচনাস্থল বা উৎসস্থল, ২. মায়াদ-প্রত্যাবর্তনস্থল বা আখেরাত, ৩. নবুওয়াত।

মাবদা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আমরা কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম, আমাদের আসল কী, আমরা কিভাবে দুনিয়াতে প্রকাশ পেলাম। আর মায়াদ দ্বারা উদ্দেশ্য, আমাদের জীবন শেষে যাব কোথায় এবং নবুওয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য

হলো, এই আসা ও যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে করব কী? মাবদা তো স্বয়ং আল্লাহর সত্তা, যার দ্বারা আমরা দুনিয়াতে এসেছি, অস্তিত্ব লাভ করেছি। আমাদের অস্তিত্বে তিনিই আসল। আর মায়াদও তিনি; তাঁর সকাসেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। তিনিই মাবদা, তিনিই মায়াদ। আবার হেদায়েত প্রদানকারীও তিনিই।

মানুষের সর্বপ্রথম ও প্রধান বস্তু হলো আকিদা, যা দ্বারা তাদের অন্তর পরিশুদ্ধ হবে। কেননা, সকল আমল আকিদার উপর নির্ভরশীল। আকিদা অশুদ্ধ হলে আমল এমনিতেই অশুদ্ধ হয়ে যাবে চাই মানুষ তা ভালো নিয়তে করুক। আর আকিদা ঠিক থাকলে সকল আমল নিজে নিজে শুদ্ধ হয়ে যাবে। যখন আমল শুদ্ধ হবে, তখন জীবন শুদ্ধ হয়ে যাবে। আর জীবন শুদ্ধ হলে পরিণামও শুদ্ধ ও সুন্দর হবে। সুতরাং মানুষের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুদ্ধ হওয়ার মৌল ভিত্তি হলো আকিদা শুদ্ধ হওয়া। তাই তো ইসলাম ধর্মে সবচেয়ে বড় ও মজবুত ভিত্তি হলো আকিদা, যা মানুষের অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত।

## ইবাদত

শরীয়তের দ্বিতীয় প্রধান শাখা হলো ইবাদত, যে ঐ আকিদার অধীন আল্লাহকে কিভাবে স্মরণ করবে, কিভাবে ইবাদত করবে। ইবাদত মানে হলো মাবুদের সামনে এমন জিল্লতি গ্রহণ করা, যার পর আর জিল্লতি হতে পারে না। কারণ, আল্লাহ তায়ালা হলেন সর্বোচ্চ ইজ্জতের অধিকারী। ইজ্জতের এমন কোন স্তর নেই, যা তার মধ্যে বিদ্যমান নেই। তিনি যেহেতু সর্বোচ্চ ইজ্জতের অধিকারী, তাই তার সামনে সর্বনিম্ন যিল্লতি পেশ করবে যে, তারপর যিল্লতির কোন স্তর অবশিষ্ট থাকবে না।

তো ইবাদত বলা হয়, সর্বোচ্চ পরাক্রমশালীর সামনে সর্বনিম্ন অপদস্থ হয়ে যাবে। তাঁর ইজ্জতের কোন সীমারেখা নেই, আমাদের যিল্লতের কোন সীমারেখা নেই। এই সর্বনিম্ন যিল্লতি আল্লাহর সামনে তখন হতে পারে যখন বান্দার মধ্যে সর্বোচ্চ মুখাপেক্ষীতা থাকে। কেননা, অমুখাপেক্ষী কখনও কারো সামনে নত হতে পারে না। গিনার (অমুখাপেক্ষিতা) সাথে কেউ কারো সামনে নত হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা হলেন সর্বোচ্চ গনী ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আর মানুষ হলো সর্বনিম্ন যলীল ও অপদস্থ। তাই মানুষের কাজ হলো সর্বদা তাঁর সামনে নত হয়। অন্তর দ্বারা, রূহ দ্বারা, দেহ দ্বারা, কথা দ্বারা, কর্ম দ্বারা অর্থাৎ সার্বিকভাবে নিজের যিল্লতি ও নিচুতা প্রকাশ

করার নাম ইবাদত।

ইবাদত অর্থ শুধু নামায-রোযা নয় বরং ইসলামী কানুন মোতাবেক যিল্লতি ও নিচুতার সাথে আল্লাহ তায়ালার সামনে হাজির হওয়া। তিনি যদি বলেন, ঘরে অমুক কাজ কর, তাহলে তা আমাদের উপর ফরজ। তিনি যদি বলেন, মসজিদে যাও, তাহলে আমাদের জন্য মসজিদে যাওয়া ফরজ। তিনি যদি বলেন, সিংহাসনে আসীন হও, তাহলে আমাদের উপর ফরজ হলো আমির হয়ে বসা। আর তিনি যদি বলেন, অমুকের গোলাম হয়ে যাও, তাহলে আমরা গোলাম হওয়ার জন্য প্রস্তুত।

মোটকথা, যিল্লতি প্রকাশ করার অর্থ হলো, কাজে-কর্মে, কথা-বার্তায়, চলাফেরায়, ওঠা-বসায় সর্বাবস্থায় মানুষ নিজের সর্বনিম্ন নিচুতা, মুখাপেক্ষিতা ও অভাব প্রকাশ করবে। এরই নাম ইবাদত।

## আখলাকিয়্যাত

শরীয়তের তৃতীয় শাখা হলো আখলাকিয়্যাত। ইবাদত ও আকিদা সঠিক হতে পারে না যতক্ষণ না অন্তর পরিশুদ্ধ হয়। আর কলব বা অন্তর হলো আখলাকিয়্যাতের স্থান। সুতরাং যতক্ষণ না মানুষের আখলাক সহীহ হবে অর্থাৎ ধৈর্যের গুণ সৃষ্টি না হবে, লজ্জা, শোকর সৃষ্টি না হবে, দানশীলতা, বীরত্ব সৃষ্টি না হবে, আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা, আল্লাহর প্রতি রুজু হওয়ার মন-মানসিকতা সৃষ্টি না হবে, ততক্ষণ আকিদা দুরস্ত হবে না আর আকিদা দুরস্ত না হলে আমল ও ইবাদত দুরস্ত হবে না। তাই আখলাক হলো সবকিছুর মূল। ইসলাম ধর্মে আখলাক একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। সুতরাং আখলাককে প্রতিপালন করা এবং তাকে উঁচুতে পৌঁছানো অতীব জরুরি।

জন্মগতভাবে মানুষের মধ্যে কিছু বদ আখলাক বা খারাপ স্বভাব থাকে। সেগুলোকে সু-আখলাক দ্বারা বদলাতে হবে। জন্মগতভাবে মানুষের ভিতর লোভ-লালসা, কৃপণতা, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার ও আমিত্ব ইত্যাদি বদ আখলাকগুলো থাকে। এগুলো এমন বস্তু বা মানুষকে সৃষ্টিকূলের সামনে লজ্জিত করে। তাই এগুলোকে দূর করতে হবে। অহংকারের পরিবর্তে বিনয় সৃষ্টি করতে হবে। কৃপণতার পরিবর্তে দানশীলতা সৃষ্টি করতে হবে। স্বার্থপরতার পরিবর্তে নিঃস্বার্থতা আনতে হবে। লোভ-লালসার বদলায় কানায়াত বা অল্পে তুষ্টি সৃষ্টি করতে হবে। আখলাক দুরস্ত হলে আকিদা দুরস্থ হবে। তারপর আমল দুরস্ত হবে। আর আমল দুরস্ত হলে শেষ পরিণাম দুরস্ত

হবে। জীবন ঠিক হলে মরণ ঠিক হবে। তাই আখলাক হলো শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

## মুয়ামালাত

দীন ও শরীয়তের ৪র্থ শাখা হলো মুয়ামালাত। মানুষ একে অপরের সাথে কিরূপ আচরণ করবে। তাদের পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ হবে; তার মীমাংসা কী পদ্ধতিতে হবে। নিজেদের পরস্পর ঝগড়া বাঁধার আশংকা থাকলে তার ফয়সালা কিভাবে হবে। লেনদেন, ধার-করজে পদ্ধতি কী হবে। আমানত রাখা ও আদায় করার নিয়ম কী হবে। ইজারার হুকুম কী, জমিন-ভূমিসংক্রান্ত বিধান কেমন ইত্যাদি সব মুয়ামালাত শাখার অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী শরীয়তে মুয়ামালাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা, যার দ্বারা মানুষের মাঝে পরস্পর সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। যদি আমানতদারী ও দীনদারী না থাকে, তাহলে আবশ্যিকভাবে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি হবে। আর ফাসাদ সৃষ্টি হলে অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হবে। আর নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হলে মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা থাকবে না। সবাই অনিরাপত্তা ও পেরেশানিতে ভুগবে, সর্বদা অস্বস্তিতে থাকবে। এ কারণে মুয়ামালাহ সঠিক থাকা অতীব জরুরি বিষয়। আর এটি ইসলামী শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

## ইজতিমাইয়্যাত

শরীয়তের পঞ্চম শাখা হলো ইজতিমাইয়্যাত। সামাজিক অবস্থা সুন্দর করা, সমাজে একটি সুশৃঙ্খল নীতি থাকবে আর সবাই ওই নীতির উপর জীবন যাপন করবে। তাহলে সমাজে শান্তি বিরাজ করবে। আর যদি একেকজন একেক দিকে থাকে, একজন পশ্চিমে যায় আরেকজন পূর্বে যায়, একজন এদিকে আসে অপরজন সেদিকে যায়, তাহলে সমাজে ঝগড়া-ফাসাদ, খুন-খারাবি লেগেই থাকবে। মানুষ সামাজিক শান্তি অনুভব করতেগ পারবে না। তাই মানুষ যদি একটা নীতি অনুসরণ করে, এক নীতিতে চলে, তাহলে সব বস্তু নিজ নিজ স্থানে বহাল থাকবে। সমাজে কোন প্রকার অশান্তি থাকবে। শরীয়তের উক্ত পাঁচটি শাখা বা ভিত্তি। উক্ত পাঁচটি ভিত্তি একেক স্তরের আলেম পরিচালনা করে আসছেন। প্রতিটি শাখাকে পরিচালনার জন্য লাখ লাখ আলেম দাঁড়িয়ে গেছেন এবং তার পরিচালনা করে নিজেদের কর্তব্য আদায় করছেন।

## দার্শনিকদের ইসলামী খেদমত

শরয়ী ইতিকাদ বা আকিদা-বিশ্বাসকে দলিল দ্বারা প্রমাণিত করার জন্য ইসলামী দার্শনিকদের একটি জামাত সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তারা আকলি (যুক্তিগত) ও নকলি (বর্ণনাগত) দলিল দ্বারা আকাঈদকে সত্য প্রমাণিত করেছেন। তারা যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা আকাঈদকে স্বভাবজাত প্রমাণিত করেছেন। তারা বলেন, সকল আকিদাই মানুষের জন্মগত স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কোন আকিদাই তার বিপরীত বা বিরোধী নয়। কোন আকিদা এমন নেই যে, সেটি যুক্তির বিরোধী আর ইসলাম তাকে জোরপূর্বক মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। বরং ইসলামের সবগুলো আকিদা এমন যে, স্বভাবজাত-জন্মগত শক্তি তাকাজা করে, এটি আকিদায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। ফিতরাত যেগুলোকে সমর্থন করে, সেগুলো আকিদা হওয়ার যোগ্য।

ইসলামী দার্শনিকরা যুক্তি, প্রমাণ, ইন্দ্রিয় শক্তি ও জন্মগত শক্তি প্রতিটি দ্বারা আকিদা প্রমাণিত করে দেখিয়েছেন এবং প্রতিটি আকিদার জন্য হাজার হাজার প্রমাণ পেশ করেছেন। আর এ বিষয়ে বড় বড় গ্রন্থ রচনা করেছেন। আজ দলিল-প্রমাণ দ্বারা মুসলমানদের আকিদা মজবুত ও দৃঢ়তা লাভ করেছে। ফলে কোন জাতিই মুসলমান ও তাদের আকিদার উপর সফল হতে পারে না। মুসলমানরা সর্বদা বিজয়ী থাকে। আল্লাহ তায়ালা মুসলিম দার্শনিকদের উত্তম প্রতিদান দান করুন। তারা ইসলামের আকিদার জগতে দীনি খেদমত করেছেন এবং আকিদা সার্বজনীন ও সুপ্রমাণিত করেছেন যে, এটিই সত্য আর তার বিপরীতগুলো অসত্য ও বাতিল।

## আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের দীনি খেদমত বা অবদান

ফুকাহায়ে ইসলাম এবং আইম্মায়ে মুজতাহিদীন উভয়ে মিলে শরীয়তের দ্বিতীয় শাখা ইবাদতকে সামাল দিয়েছেন, প্রচার-প্রসার ঘটিয়েছেন। তারপর তাদের অধীনে অনেক ইমাম এগিয়ে এসেছেন এবং ফিকাহ এর বড় বড় আকাবিরগণ ফিকাহ শাস্ত্রকে কিতাব আকারে সাজিয়েছেন। অধ্যায় ও পাঠ আকারে মাসয়ালাকে নির্ধারণ নিজ নিজ নিয়মে বিন্যস্ত করেছেন এবং হাজার হাজার কিতাব লিখেছেন। ফলে ফিকাহ একটি ভিন্ন শাস্ত্রে পরিণত হয়েছে। তাতে অনেক শাখা-প্রশাখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মুজতাহিদগণ নিজেদের ফিকাহনীতি অবলম্বনে কুরআন ও হাদীস থেকে হাজারো মাসয়ালা উদ্ভাবন

করেছেন। কোন বিষয়ে উসূলে ফিকহে মতভেদ হলে তার শাখা-প্রশাখার মাসয়ালাতেই মতভেদ হয়েছে। কিন্তু সখর ইমামই সত্য দীনের অনুসারী ছিলেন এবং তাদের চিন্তা-চেতনা ও অভিমত সত্যেই বৃত্তের মাঝেই ঘুরপাক খেয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম শাফিয়ী রহ., ইমাম মালেক রহ. ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.। তাঁদের মধ্যে যে মতপার্থক্য রয়েছে, তা হক ও বাতিল হিসেবে নয়। এমন মতভেদ নয় যে, একজন হক আর অপরজন বাতিল। বরং তাঁদের মধ্যে মতভেদ ছিল শুদ্ধ ও অশুদ্ধের। একজনের কথা শুদ্ধ অপরজনের কথা অশুদ্ধ। তবে তাতে এ কয়েদ যুক্ত থাকত যে, এটি সঠিক; তবে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে আর এটা ভুল; তবে সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হক সর্বদা সকল ইমামের আয়ত্তের মাঝে ঘূর্ণয়মান থাকে। তাঁরা সবাই হেদায়েতের তারকা। তাঁদের যে কাউকে অনুসরণ করা হলে ইনশআল্লাহ নাজাত পাওয়া যাবে। কেউ যদি শাফিয়ী মাযহাব গ্রহণ করে, তাহলে নাজাত পাবে, হানাফি, মালেকী ও হাম্বলী যে কোন মাযহাব গ্রহণ করলে নাজাত পাবে। আর তারা সঠিক পথে আছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেখানো পথেই আছে। কারণ, সবার বুনিয়াদ বা ভিত্তি হলো একটি। আর তা হলো কুরআন ও সুন্নাহ। তবে মাসয়ালা বের করার মূলনীতি সবার আলাদা-আলাদা। তাই মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে।

## ভিন্ন ভিন্ন বিতরণকেন্দ্র

একই শরীয়তের ভিন্ন ভিন্ন মাযহাব থাকা এটি স্বয়ং শরীয়তেরই হেকমত। এ কারণে ইমামদের মতভেদের কারণে উম্মতের মুহাম্মদীর শরীয়ত পালন সহজ হয়ে গেছে। এতোগুলো পথ ও মত বের হয়ে আসছে যে, প্রত্যেক রুচির মানুষেরা তাদের রুচি মোতাবেক পথ গ্রহণ করে হকের উপর চলতে সক্ষম হচ্ছে। যদি একটা বিশাল লম্বা, চওড়া ও গভীর সাগর যাকে আর তা থেকে পানি পান করার ঘাট থাকে যদি একটা, তাহলে হাজার হাজার মাইল সফর করে মানুষে যদি আসে, তাহলে পানি পাবে। অন্যথায় পানি থেকে বঞ্চিত থাকবে। আর সাগর যদি এমন হয় যে, পান করার স্থান ও ঘাট হাজারো রয়েছে, তাহলে যে ঘাটেই পানি পান করতে চায়, সেই পানি সেই স্বাদ ও সেই রুচিই অনুভব করবে শুধু ঘাটের ভিন্নতা আছে। একটা পূর্বদিকে আরেকটি পশ্চিম দিকে। পনি গ্রহণ করা অনেক সহজ হবে। যদি সাগর বড়

থাকে আর ঘাট বেশি থাকে, কারণ, সব ঘাট থেকে পানি পান করতে পারবে। সুতরাং ইসলামী শরীয়ত হলো একটি বিশাল বড় ও গভীর সমুদ্র। তার মাশরাব (পানি পান করা স্থান) অনেক। একটি মাশরাব হানাফি মাযহাব, একটি হলো মালেকী মাযহাব, একটি হাম্বলী মাযহাব এবং একটি হলো শাফেয়ী মাযহাব। উক্ত চারটি মাযহাব কেমন যেন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নির্ধারিত। এই চার মাযহাব সম্পর্কে সুধারণামূলক বা তাকদীরগত হোক কেমন যে আল্লাহ তায়ালা বলছেন, এই চারটি মাযহাব দুনিয়া জুড়ে জারি হবে। অন্যথায় হাজারো মুজতাহিদ রয়েছে তাদের মাযহাব তো জারি হয়নি বরং তা দুনিয়া পরিবর্তনে বিলীন হয়ে গেছে অথচ তাদের প্রত্যেকের ফিকাহ উসূল ভিন্ন ভিন্ন ছিল। যেমন– ইমাম বোখারী রহ. নিজে মুজতাহিদ ছিলেন, ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক, হাম্মাদ ইবনে সালামাহ রহ. সুফিয়ান সাওরী রহ. সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ রহ. প্রমুখ সবাই আলাদা-আলাদা মুজহাহিদ ছিলেন।

## ফুকাহায়ে ইসলাম ও তাঁদের শিষ্টাচার

হযরত ইমাম আবু হানিফা রহ. কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ফিকাহ খুরাসানে প্রসার লাভ করেছে। ফলে খুরাসানবাসী হানাফি মাযহাবের অনুসারী, আফগানিস্তান হানাফি, হিন্দুস্তানের অধিকাংশ এলাকা হানাফি, তুকিস্তান হানাফি। অর্থাৎ যেখানে যেখানে তার ফিকাহ পৌঁছেছে, সেখানেই হানাফি মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা সর্বাধিক পর্যায়ে ছিল তাই আদব ও শিষ্টাচার ও সীমাহীন ছিল। তার প্রমাণ মিলে তার হজের সফরে।

তিনি হজের উদ্দেশ্য মক্কা ও মদীনায় গেলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজায়ে আতহারে হাজিরা দিলেন। সাত দিন পর সেখান থেকে ফিরে আসতে চাইলে মদীনাবাসীরা আসতে দিলেন না। তো তাদের কথায় আরো তিন দিন থাকলেন। দশম দিন তিনি আবার অনুমতি চাইলেন। তারা অনুমতি দিল না। এগারতম দিনে তিনি বললেন, এখন আমার আর শক্তি নেই। মদীনাবাসী হযরতের এ কথা শুনে জিজ্ঞেস করলেন, আমার আর শক্তি নেই এ কথার অর্থ কী? তিনি বললেন, যখন থেকে মদীনায় এসেছি, তখন থেকে পেশাব-পায়খানা করিনি। কারণ, মদীনার পবিত্র জমিনকে নাপাক করা উচিত মনে করি না। এ কারণে বলেছি এখন আমার

আর শক্তি নেই। এ কথা শ্রবণে মদিনাবাসীরা অত্যন্ত ইজ্জত ও সম্মানের সাথে তাঁকে বিদায় জানাল। এমনই ছিল ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর আদব ও সম্মান। তাদের মধ্যে যত পরিমাণ ভালবাসা ছিল, তত পরিমাণ আদব ও ইহতিরাম ছিল।

## ইমাম শাফিয়ী রহ.

তিনি মিশরের গাযা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক জীবনে মিশরে অতিবাহিত করেন। জীবনের অধিকাংশ সময় মক্কা-মদীনায় অবস্থান করেছেন। জীবনের শেষ সময়টুকু মিশরে অতিবাহিত করেন এবং সেখানেই তাঁর ইন্তিকাল হয়। তিনি আজ সেখানেই সমাহিত আছেন। মিশরের প্রায় সবাই শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারী। মক্কা ও মদীনায় ও শাফিয়ী মাযহাবের ফিকাহ চালু আছে। মহব্বত ও আদবের ক্ষেত্রে তাঁর অবস্থা অন্যান্য ইমামদের ন্যায়। সর্বোচ্চ খোদাভীতি ও মহব্বতের অধিকারী ছিলেন। তাকওয়ার সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন ছিলেন এ কথায় বান্দাসুলভ সর্বগুণে গুণান্বিত ছিলেন।

## ইমাম মালেক রহ.

ইমাম মালেক রহ.। তাঁর উপাধি ছিল ইমামু দারুল হিজরাত অর্থাৎ মদীনার ইমাম। মদীনার প্রতি তাঁর দয়া-মায়া ছিল। তিনি মদীনার প্রতিটি ধূলিকণাকে ভালবাসতেন। তাঁর আদবের অবস্থা এই ছিল যে, মদীনায় কখনও জুতা পায়ে দিয়ে হাঁটেননি এই ভয়ে যে হতে পারে রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কদম মোবারক যেখানে পড়েছে সেখানে আমার জুতা লেগে যাবে। তিনি মদীনাতে কোন দিন পেশাব-পায়খানা করেননি। তার জন্য তিনি অনেক দূর যেতেন এবং সেখানে মলত্যাগ করতেন। সকল ইমাম এমনই আদব দেখাতেন মদীনাকে। কেউ কেউ মদীনায় বসবাস করতেন আবার কেউ সেখানে হিজরত করে যেতেন। তাঁদের তামান্না ছিল, মদীনার জমিন আমাকে গ্রহণ করে নিক, যেখানে আমার দাফন হোক। তাঁরা এ ভয়ে নফল হজ পর্যন্ত করতেন না যে, হতে পারে মদীনার বাইরে আমার ইন্তিকাল হয়ে যাবে আর আমি মদীনার জমিন থেকে পৃথক হয়ে যাব।

ইমাম মালেক রহ. একদিন স্বপ্নে দেখলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে তিনি উপস্থিত আছেন। তিনি বললেন, হে

আল্লাহর রাসূল! আমার মন চায় আমার মরণ যেন মদীনাতে হয়। আর আমি যেন জানতে পারি, আমার মৃত্যুর আর কত দিন বাকি আছে। এক বছর, না দু-বছর, যাতে আমি প্রশান্তিতে উমরাহ ও হজ্ব আদায় করতে পারি।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, তখন রাসূলে কালীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে হাত উত্তোলন করলেন যে, তাঁর মোবারক হাতের পাঁচটি আঙ্গুল খোলা ছিল। তখন ইমাম মালেক রহ. এই ভেবে পেরেশান হলেন যে, তাতে পাঁচ দিন উদ্দেশ্য, না পাঁচ মাস, না পাঁচ বছর আমার তো কিছুই বুঝে আসছে না।

ইমাম মালেক রহ.-এর যুগে, সঠিক স্বপ্ন ব্যাখ্যাতা ছিলেন ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সিরীন রহ., যিনি স্বপ্নের তাবির বিষয়ে পৃথক একটি কিতাব রচনা করেছিলেন। তিনি একজন বড় মাপের ইমাম ছিলেন। তিনি যা তাবীর করতেন, তা বাস্তবে পরিণত হতো। এ সম্পর্কে তার অনেক বাস্তব ঘটনা রয়েছে। তিনি একজনকে ইবনে সিরীন রহ. নিকট এই বলে পাঠালেন যে, যাও তার নিকট আমার স্বপ্নে তাবীর জিজ্ঞেস কর। কিন্তু আমার নাম উচ্চারণ করো না।

লোকটি ইবনে সিরীনের নিকট গিয়ে বলল, মদীনার এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল, সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করছে, আমার বয়স আর কত বাকি আছে। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে হাত উঠালেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারছেন না, তা দ্বারা পাঁচ দিন, না পাঁচ মাস, না পাঁচ বছর উদ্দেশ্য। তখন হযরত ইবনে সিরীন রহ. বললেন, এ ধরনের স্বপ্ন তো কোন বড় আলেম দেখতে পারেন। কোন জাহেল তো এমন স্বপ্ন দেখতে পারে না আর জাহেলকে তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিবেন না। এমন উত্তর তো কোন বড় আলেমকে দিবেন। আর মদীনাতে এখন ইমাম মালেক ছাড়া বড় আলেম আর কেউ নেই। তুমি বল, এ স্বপ্ন ইমাম মালেক তো দেখেননি? লোকটি কতক্ষণ নীরব থেকে বলল, আমাকে অনুমতি দিন, আমি গিয়ে তার নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে আসি। তিনি বললেন, যাও আগে অনুমতি নিয়ে আস; তারপর তাবির বলব। লোকটি গিয়ে ইমাম মালেক রহ.কে বলল, হযরত আপনিই যে এ স্বপ্নের দ্রষ্টা তিনি তা বুঝে ফেলেছেন এবং আপনার নামও বলে দিয়েছেন। এখন আমাকে এই বলে পঠিয়েছেন যে, যাও আগে অনুমতি নিয়ে আস; তারপর তাবির বলব। তখন তিনি বললেন, যাও, তাকে গিয়ে বল, মালক ইবনে আনাস রহ. এ স্বপ্ন দেখেছেন।

লোকটি ইবনে সিরীনের নিকট গিয়ে বলল, ইমাম মালেক ইবনে আনাস রহ. স্বয়ং এ স্বপ্ন দেখেছেন। তখন ইবনে সিরীন রহ. বললেন, হ্যাঁ; ইমাম মালেকের মতো মানুষই এমন স্বপ্ন দেখতে পারেন। এছাড়া অন্য কেউ এমন স্বপ্ন দেখতে পারে না।

তারপর তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বললেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইশারা দ্বারা পাঁচ দিন, পাঁচ মাস, পাঁচ বছর কোনটাই উদ্দেশ্য নয়। তার উদ্দেশ্য ঐ পাঁচটি ইলমের কথা বোঝানো, যেগুলোর ইলম আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আর ওই পাঁচটির মধ্য তে মৃত্যু হলো একটি। কারণ, কেউ জানে না সে কখন মরবে, কোথায় মরবে এবং কোথায় তার দাফন হবে।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে পাকে ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ ۖ

নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকটই কেয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষন করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনি তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না, কোন দেশে সে ইন্তিকাল করবে।

উক্ত বিষয়গুলোর ইলম একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে। তিনিই জানেন কেয়ামত কখন হবে আর কেউ তা জানেন না। তবে কেয়ামত অবশ্যই হবে তা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। প্রতিটি মুসলিমের দৃঢ় ঈমান রয়েছে, কেয়ামত হবে। তবে কখন হবে তা কেউ জানে না। এমনকি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানা নেই। সুতরাং হযরত জিবরাইল (আ.) একদিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কেয়ামত কবে হবে। উত্তরে তিনি বললেন, এ ব্যাপারে প্রশ্নকারীর চেয়ে আমার বেশি জ্ঞান নেই। হ্যাঁ, আমার এতটুকু জানা আছে, কেয়ামত অবশ্যই হবে তবে কখন হবে তা জানা নেই। কেয়ামতের ইলম আল্লাহর জন্য খাস।

তো ইমাম ইবনে সিরীন রহ. বললন, এ স্বপ্ন ইমাম মালেকই দেখতে পারেন। স্বপ্নও ইলমী, তার উত্তরও ইলমী। আর হাদীসের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইমাম মালেকই তার সম্বোধিত ব্যক্তি হতে পারেন। ইবনে সিরীন

রহ. লোকটিকে বললেন, যাও, ইমাম মালেককে বলে দাও, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরের উদ্দেশ্য হলো এ কথা বোঝানো যে, মরণ কখন আসবে কোথায় আসবে তার ইলম ঐ পাঁচ ইলমের ন্যায়, যাদের ইলম আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট নেই।

ইমাম মালেক রহ. স্বপ্নের তাবির শুনে প্রশান্তি লাভ করে ঘরে বসে পড়লেন। তিনি তাঁর ঘর থেকে বের হননি মরণ পর্যন্ত। পরিশেষে তিনি মদীনার জমিনে ইন্তিকাল করলেন। তাঁকে বিশ্ব মুসলিমের যিয়ারতগাহ জান্নাতল বাকিতে সমাহিত করা হয়। এ কারণে ইমাম মালেক রহ.-এর উপাধি হয়েছিল ইমামু দারিল হিজরাত। তাঁর মাযহাব আরবের পশ্চিম অংশে বেশি প্রচলিত। সেই দেশগুলোতে মালেকী মাযহাবের লোকদের বসবাস বেশি।

## ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.

হযরত ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. নজদে বসবাস করতেন। এ কারণে নজদদ ও ইয়ামানের লোক অধিকাংশই হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। তারা হাম্বলী ফিকাহের উপর আমল করে।

সকল ইমামই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। যাকেই অনুসরণ করবেন ইনশাআল্লাহ নাজাত পাবেন। তাঁরা সবাই হাক্কানী বা হকপন্থী। ওই বুযুর্গগণ নিজেদের ফিকহী উসূল বা মৌলনীতির মাধ্যমে ইজতিহাদ করে কুরআন ও হাদীস থেকে মাসয়ালা বের করে, দীনের বাগানকে সুসজ্জিত করেছেন। আর একই নিয়ম ও কানুনে ফিকাহকে সাজিয়েছেন, যার অধ্যায়গুলো আলাদা আলাদা বাবুল ইফাদাত, বাবুল মায়াসালাত, বাবুল মুসাকাত, বাবুল মুযারাবাহ, বাবুল আরাদি ইত্যাদি। ফিকাহ এর সমস্ত মাসয়ালা উক্ত অধ্যায়গুলোর ভিতর লুক্কায়িত। তাঁরা সব রকম মাসয়ালা বের করে একত্রিত করেছেন। ইমামদের এ কাজ উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য বড়ই অনুগ্রহ। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের উত্তম প্রতিদিন দান করুন এবং তাদের কবরকে নূরে আলোকিত করুন। যদি তারা মাসয়ালা বের না করতেন, তাহলে ফিকাহের এত মাসয়ালা আমাদের নিকট পৌঁছত না। ফলে দীনের উপর চলা অনেক কষ্টকর ও মুশকিল হতো।

## উরাফায়ে ইসলামের দীনি খেদমত

উরাফায়ে ইসলাম যাদেরকে সুফিয়ায়ে কেরাম বলেও ডাকা হয়। এক কথায় তাঁরা হলেন উচ্চ পর্যায়ের আল্লাহ্ওয়ালা বুযুর্গ। তাঁরা শরীয়তের আখলাকিয়্যাত শাখাকে দেখাশোনা করেন। তারা চুল থেকে চামড়া বের করে মানুষদের সামনে পেশ করেন। অর্থাৎ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম বিষয়কে প্রকাশ করেন। তাঁরা রূহের হেকমত বর্ণনা করেন। তাঁরা বলেন, নফসের ভিতর এতো এতো দূষিত বস্তু আছে আর তার প্রতিকার এই। যদি নফসের মধ্যে এ ধোঁকাবাজি সৃষ্টি হয়, তাহলে তার প্রতিরোধ এমন। নফসের মধ্যে খাহেশ সৃষ্টি হলে তার চিকিৎসা হলো এ রূপ। আর যদি কোন আশা ও চাহিদা সৃষ্টি হয়, তো তার ঔষধ হলো এই।

হযরত সুফিয়ানে কেরামদের উসিলায় মানুষ উক্ত বিষয়গুলোর শিক্ষা পেয়েছে। তাঁরা অন্তরের হেকমতের শিক্ষা দিয়েছেন। তারা মানবাত্মাকে আলোকিত করেছেন আখলাক দ্বারা। তাঁরা-ই আখলাক দ্বারা তাযকিয়ায়ে নাফস (আত্মশুদ্ধ) করেছেন। মানুষকে প্রকৃত মানুষ বানিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের উত্তম বদনা দান করুন।

## উমারায়ে ইসলামের খেদমত

মুসলিম জনপ্রতিনিধিরা বা আমিরগণ শরীয়তের বিশেষ শাখা মুয়ামালাতকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তারা মানুষের লেনদেন ও ঝগড়া-বিবাদ মিটানোর দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সারা বিশ্বের ঝগড়া মিটাবে, মানুষের মামলা মুকাদ্দামার সমাধান দিবে। ফৌজদারি ও দেওয়ানী উভয়টার পৃথক পৃথক করবে। প্রতিটি মুকাদ্দমা সমাধান করবে এবং আলাদা আলাদা আইনগ্রন্থ প্রণয়ন করবে। হাফেজ ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ.-এর এ সম্পর্কে একটি কিতাব রয়েছে। তার নাম 'আসসিয়াসাতুশ শরঈয়্যা'। এ সম্পর্কে আরো অনেক কিতাব রচনা করেছে উলামায়ে কেরাম। কেউ কেউ রাজনীতির উসূলগুলো সুস্পষ্ট করেছেন। কেউ কেউ মামলা-মকদ্দমা সমাধানের উসূল সুস্পষ্ট করেছেন। তাঁরা অনেক উঁচু মাপের কাজকে আঞ্জাম দিয়েছেন এবং মুয়ামালার হাকিকত লোকসমাজে প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে উত্তম বদলা দান করুন।

## খুলাফায়ে ইসলামের দীনি খেদমত

শরীয়তের পঞ্চম শাখাটি পরিচালনা করতেন খলিফাতুল মুসলিমীনগণ। যেমন আবুবকর ছিদ্দিক রা. ও হযরত উমর ফরুক রা.সহ আরো যারা ছিলেন। তবে মূলত তাঁরা জিম্মাদার ছিলেন দেশের শৃঙ্খলার এবং দেশের অধিবাসীদের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ করা। তাঁরা পুরো মুসলিম জাতিকে এক সূতোয় গেঁথে দিয়েছিলেন, যাতে পরস্পর ঝগড়া-ফাসাদ, মারামারি, গালাগালি কুৎসা রটনা ও গোষ্ঠীগত দাঙ্গায় লিপ্ত না হয়।

যদি কেউ সন্দেহে পড়ে, তাহলে মহব্বত ও ভালবাসার সাথে বলে দিবে আর অপরজনও মহব্বতের সাথে তার উত্তর দিবে। যদি বুঝে না আসে, তাহলে নিজেকে অপারগ মনে করবে এবং এমন ধারণা পোষণ করবে যে, হতে পারে আমি ভুলের ভিতর আছে আর সে সত্যের উপর। তবে রায় পেশ করার সময় একথা বলা যে, আমি সত্যের উপর আছি আর সে ভুলের উপর, তাহলে তা হবে নিতান্তই ভুল ধারণা।

## খলিফাদের কর্মপদ্ধতি

সায়্যিদুনা হযরত শায়খ আবদুল কাদির জিলানী রহ. নিজ শাগরেদকে খেলাফত দান করেন। তিনি তখনকার নিয়মানুযায়ী তার মাথায় পাগড়ি বেঁধে দিলেন এবং কিছু উপদেশ দিলেন আর বলে দিলেন, তুমি আমার পক্ষ হতে নায়েব ও খলিফা। তুমি মানুষকে শিক্ষা-দীক্ষা দাও এবং ইসলাহ কর। খলিফা তখন বললেন, বিদায়কালে কিছু নসিহত করুন, যাতে আমি নসিহত মেনে চলতে পারি। তখন তিনি দুটি কথার নসিহত করলেন– 'তুমি নবুওয়াতের দাবিদার হবে না এবং খোদাগিরি দাবি করবে না।'

খলিফা এ কথা শ্রবণে হতবিহ্বল ও পেরেশান হলেন যে, হযরত! আমি আপনার খাদেম, গোলাম, অনেক বছর আপনার সান্নিধ্যে ছিলাম, আমার দ্বারা কি সম্ভব যে, আমি খোদায়ী দাবি করব? আর যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোলামের গোলাম, সে কিভাবে নবী দাবি করবে? তাহলে হযরত রহ. এ কেমন নসিহত করলেন! নসিহত তো হবে এমন যে, সর্বদা ইবাদতে মাশগুল থাক, আখলাকের হেফাজত কর, মাখলুককে ইসলাহ কর ইত্যাদি। আর এমন নসিহত যে খোদায়ী দাবি করো না, নবুওয়াত দাবি করো না এতো আমার দ্বারা হওয়াও সম্ভব নয়। হযরত আপনার নসিহত দ্বারা আমার কোন কিছু বুঝে আসছে না। তখন তিনি বললেন, প্রথমে তার অর্থ

বুঝে নাও; তারপর কথা বুঝে এসে যাবে।

তিনি বললেন, আল্লাহ তো এমন সত্তার নাম, তিনি যা বলেন, তাতে অনড় থাকেন। তিনি জমিন বানাতে চাইলে জমিনই হয়; অন্যকিছু নয়। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা অনুযায়ী অতীব জরুরিভাবে সবকিছু হয়। তার বিপরীত হওয়া সম্ভব নয়। এমন কখনও হবে না যে, তিনি ইচ্ছা করছেন আর তা হয়নি। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

وَإِذَا قَضٰى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ -

তিনি যখন কোন কিছু বানাতে চান, তখন শুধ বলেন হও, তো হয়ে যায়।

তিনি যখন ইচ্ছা করেন জাহান বানাতে, এতে তার কোন কষ্ট করা লাগে না যে, তার জাহান তৈরি উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে। কারণ, তিনি আসবারের মুহতাজ নন। আসবাবের সৃষ্টিকর্তা তো তিনি। তাঁর কাজ হলো এতটুকু বলা যে, হয়ে যাও তো হয়ে যাবে। তো আল্লাহ যা বলেন, যা ইচ্ছা করেন, তা হবেই হবে। তা এক চুলও নড়বে না।

আর নবুওয়াত দাবি করার অর্থ হলো, নবীর শান তো এমন যে, তিনি যা বলবেন তা-ই সত্য। নবীর যবান থেকে মিথ্যা বের হতে পারে না। নবী যা বলবেন, তা অবশ্যই সত্য এবং যা করে দেখাবেন তাও সত্য হবে। অসত্য নবীর মধ্যে থাকা সম্ভব নয়। নবী যা বলবেন, তা নিতান্তই সত্য আর তার বিপরীত নিতান্তই বাতিল ও অসত্য। নবীর বিপরীত কোন কথা বা কাজ সত্য হতে পারে না। যদি তুমি মানুষের নিকট গিয়ে বল, আমি যা বলছি তা-ই সত্য। আর আমার অভিমত এমন সত্য যে, অন্য কেউ ধারে-কাছেও পৌঁছতে পারবে না, তাহলে সেটা প্রকারান্তরে নবুওয়ত দাবি করা হবে। আমি তোমাকে তা থেকে নিষেধ করছি। এখানে নবুওয়াত দাবি করার অর্থ এই নয় যে, তুমি এ কথা বলবে যে, আমি নবী। বরং তার অর্থ হলো এমন যে, নিজের মধ্যে নবীর শান সৃষ্টি করে তুমি লোকদের বলবে, আমি যা বলি তা সত্য আর তার বিপরীত যা আছে সব বাতিল অসত্য। আর যে এমন কথা বলবে যে, আমি যখন ইচ্ছা করেছি, তো তা হবেই। দুনিয়া উল্টে গেলেও, মানুষ আহত-নিহত হলেও আমার ইচ্ছা বাস্তবায়িত হবেই হবে। এমনটি দাবি করা খোদায়ী দাবি করার মতো। এটি আল্লাহর কাজ। তিনি যা বলেন, তাতে অনড় থাকেন আর যা ইচ্ছা করেন, তা বাস্তবায়ন করেন। তাই আমি যে বলেছি, খোদায়ী দাবি করবে না, তার অর্থ হলো তুমি এমন মনে করবে না

যে, আমার ইচ্ছা অনড়; তা হবেই হবে। তার বিপরীত সম্ভব নয়। তাহলে এটাই হবে তোমার জন্য খোদায়ী দাবি। এটাই খোদায়ী দাবির সারকথা।

আর নবুওয়ত দাবির সারকথা হলো, যে কথা তোমার মুখ থেকে বের হবে সে কথার উপর অটল থাকা এই ভেবে যে, তার বিপরীত যা আছে, তা বাতিল। অথচ তা তোমার ব্যাপারে অসম্ভব। উপরে বর্ণিত ক্ষমতাগুলো আল্লাহর জন্য খাস আর এ কথাগুলো নবীর জন্য খাস। তাই তোমাকে বলেছি খোদায়ী দাবি করো না এবং নবুওয়ত দাবি করো না।

হযরত জিলানী রহ. সুন্দর অলংকার সজ্জিত নসিহত করলেন। প্রকাশ্যে তো তা খুব ভীতিকর নসিহত মনে হলো যে, খোদায়ী দাবি না করা এবং নবুওয়াত দাবি না করা। কিন্তু যখন তার ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো, তখন বুঝে এসে গেল। তার ব্যাখ্যা থেকে বোঝা গেল, অনেক মানুষ কথা ও কাজের মাধ্যমে খোদায়ী দাবি করছে। আবার নিজ কথাকে সত্য মনে করে নবুওয়াত দাবি করছে। না হয় তার নিকট কোন ওহী বা ইলহাম আসে যে, তার কথাই সত্য – অন্য কারো নয়। তবে কুরআন ও হাদীস দ্বারা যে মাসয়ালা প্রমাণিত, তার ব্যাপারে এ কথা বলতে পারে যে, এটিই সত্য – অন্যটি ভুল। কিন্তু নিজ রায়ের ব্যাপারে এমনটি বলা যাবে না। জাতির নেযাম বা সংবিধান থাকলে এ সকল ঝগড়ার সমাদান হয়ে যাবে। তারপর হকপন্থীরা বিজয়ী হবে আর যারা অসত্য ও অন্যায়ের দাবিদার তারা পরাজিত হবে। নেযাম ও তানয়ীমের কাজই হলো এমন নেযাম না থাকলে মুয়ামালা সুষ্ঠুভাবে চলে না। নেযাম তৈরির কাজ পরিচালনা করছেন খালিফাগণ। বাস্তবে তারাই দেশ ও জাতির শৃঙ্খলাকরণের জিম্মাদার। তারা সকল উম্মতকে করে এক প্লাটফর্মে একতাবদ্ধ করেছেন।

## শানে নবুওয়াতের হেফাজতকারীদের সম্মান প্রদর্শন আবশ্যক

খলিফাতুল মুসলিমীন জাতিকে তানযীমভুক্ত করার দায়িত্ব পালন করছেন। উমারায়ে ইসলাম জাতির মামলা-মকাদ্দমা ও ঝগড়া-ফ্যাসাদ সমাধান করছেন। উরাফায়ে ইসলাম চরিত্র সংশোধনে নিয়োজিত আছেন। ফুকাহায়ে দীন ইবাদত দুরস্ত করছেন। হুকামায়ে ইসলাম আকিদা সংরক্ষণ করছেন। এ পাঁচ স্তরের আল্লাহওয়ালা আকাবির ইসলাম ধর্মে সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা ইসলামের পাঁচটি শাখাকে দৃঢ় ও মজবুত করেছেন এবং মজবুত বুনিয়াদ বা

মূলনীতি তৈরি করে উম্মতের সামনে পেশ করেছেন।

নির্ধারিত বিষয়ের সাথে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোঝা দরকার। উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তবে আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে পারব না। এ কারণে প্রথমেই আমি বলেছিলাম, ছাত্রসুলভ কিছু আলোচনা করব। তো আমার আলোচনার ধরন ছাত্রদের দরস ও তাদরীসের মতো। যদিও আপনারা প্রচলিত প্রথানুসারে ছাত্র নন; কিন্তু বাস্তবে আপনারা ইলম অন্বেষণকারী ছাত্র। কারণ, মাহফিলে যোগদান করেন তো ইলম অন্বেষণ করার নিয়তে। তাই আপনারাও ছাত্র, আমির ছাত্র। তবে আপনাদের চেয়ে আমার মর্যাদা কম। আজকের মাহফিল দরস ও তাদরীসের নয় এ কথা তো সঠিক; তবে কিছু তো শিখা যাবে। আমার ধারণা, আপনারা আমার বক্তব্য থেকে এতটুকু বুঝতে পেরেছেন যে, শরীয়তের পাঁচটি শাখা আছে আর পাঁচ শাখাকে পাঁচ স্তরের আকাবির উন্নত করেছেন। তাঁরা সবাই সর্বস্তরের মানুষের নিকট সম্মানিত ও মর্যাদার পাত্র।

উমারায়ে ইসলাম আমাদের এক চোখ, উরাফায়ে ইসলাম আমাদের এক চোখ, খুলাফায়ে ইসলামও আমাদের এক চোখ। তাহলে মানুষ কোন চোখ রেখে কোন চোখ বাদ দিবে। কোনটাই তো বাদ দেয়ার মতো নয়। এ কারণে সবাই আমাদের নিকট সম্মানিত ও মর্যাদার পাত্র। আমাদের উচিত সবার সামনে মাথা নত করা, সম্মান প্রদর্শন করা। কেউ যদি শুধু হাদীস বিশারদদের সামনে মাথা নত করে শুধু তাদের সম্মান করে আর ফকীহদের বিরোধিতার করে, তাহলে মূলত তারা খাঁটি উম্মতের পরিচয় দিল না। খাঁটি ও সঠিক উম্মত তারা, যারা ফকীহ, সুফী, আরেফবিল্লাহ, উমারা এবং খলিফাতুল্লাহসহ সবাইকে আবশ্যকীয়ভাবে সম্মান করে, তাঁদের সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়। কারণ, এ পাঁচ স্তরের বুযুর্গ আকাবির রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একেক শানকে উন্নতির সর্বোচ্চ আসনে আসীন করেছেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক শান হলো আকিদা, এক শান ইবাদত, আরেক শান আখলাক, আরেক শান মুয়ামালাত, আরেক শান খেলাফত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ পাঁচটি শান। এতে যারা বিরোধ করে সংঘর্ষ বাঁধাবে, তারা গন্ড মূর্খ ছাড়া আর কী হতে পারে। কারণ, রাসূলের শানে সংঘর্ষ বাঁধানো কোন আহলে ইলমের কাজ নয়। তাদের কাজ এও নয় যে, তারা উম্মতের বিভিন্ন স্তরে সংঘর্ষ সৃষ্টি করবে। তাই উম্মতের দায়িত্ব হলো, তারা সবার সামনে মাথা নত করবে, সবার আনুগত্য করবে এবং সবাইকে সম্মান করা জরুরি মনে করবে।

আরেকটি বিষয় জেনে রাখা প্রয়োজন যে, পূর্বে বর্ণিত প্রত্যেক স্তরের আকাবির কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা মাসয়ালা বিন্যস্ত করেছেন। ইসলামী শরীয়তের সকল মাসয়ালা একটি মালার ন্যায়। প্রতিটি মাসয়ালা একটি সুতায় গাঁথা হয়েছে। প্রতিটি মাসয়ালা শৃঙ্খলিত। শরীয়তের প্রতিটি মাসয়ালা সুবিন্যস্ত মুতির হারের ন্যায়। মুতির মালা থেকে একটি মুতি খসে পড়লে মালাটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কেননা, প্রত্যেকটি কড়া অপরটির সাথে মিলানো। বিধায় শরীয়তের প্রতিটি শাখায় সুবিন্যস্ত ও শৃঙ্খলিত।

## ইমাম বা নেতা ছাড়া একতা সম্ভব নয়

এ কথা সবার জানা আছে যে, নেতা ছাড়া একতা ও শৃঙ্খলা হয় না। উদাহরণস্বরূপ হাজার দানার তাসবীহতে যদি ইমাম না থাকে, যাকে আরবীতে 'আল-কুন্দ' বলে অর্থাৎ তাসবীহর মাঝে লম্বা দানাটি। এটি না থাকলে তাসবীহকে কেউ তাসবীহ বলবে না বরং মালা বলবে। যদি তাসবীহ বানাতে হয়, তাহলে মধ্যস্থলে অবশ্যই একটা গিট দিতে হবে, যাকে আমরা ইমাম বলে জানি। এর ফলে সকল দানা মিলে থাকবে। উক্ত গিট যদি খুলে দেয়া হয়, তাহলে সকল দানা এলোমেলো হয়ে যাবে।

ঝাড়ুতে হাজারো শলা থাকে, একটি শলা আলাদাভাবে ধরে হাতে চিমটি দিলে তা সহজে ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু যদি সবগুলোকে একত্র করে রশি দ্বারা বেধে ঝাড়ু বানিয়ে নেয়া হয়, তাহলে আধা ঘণ্টার ভিতর ঘরের সকল ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করা যাবে। একটি শলা দ্বারা ঝাড়ুর কাজ করা যাবে না। সকল শলাকে মিলিয়ে ময়লা দূর করা যাবে।

শলা মিলানোতে শর্ত হলো তাকে বাঁধতে হবে আর ঝাড়ুর বাঁধনটি হলো ঝাড়ু র ইমাম। যদি তাতে বাঁধন না থাকে, তাহলে এলোমেলো বা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। তা দ্বারা ময়লা-আবর্জনা দূর করা তো দূরে কথা তা নিজেই আবর্জনায় পরিণত হবে। কিন্তু যদি একটি বাঁধন দেয়া হয় এবং সকল শলাকে একটা রশির অধীন বানিয়ে দেয়া হয়, তাহলে সারা ঘর পরিষ্কার করা যাবে এবং তাকে ঝাড়ু হিসেবে ঘরে রাখা যাবে। তখন সবাই তাকে ঝাড়ু হিসেবে দেখবে, মনে করবে ঘরে একটা পরিষ্কারযন্ত্র আছে। তাতে যদি ইমাম (রশি) না থাকত, তাহলে তাদের একতা ও মিল প্রতিষ্ঠা হত না।

ইসলাম একটি ঐক্যবদ্ধ জীবনবিধান। প্রতিটি বিষয়ে একতা রয়েছে, যোগসূত্র রয়েছে যে, নামায পড়া হয় জামাতে। আবার জামাতেও বিন্যাস

কায়েম করা হয়েছে। ইমাম কী-কী কাজ করবে, মুকতাদীরা কী-কী কাজ করবে, ইমাম কী-কী পড়বে, মুকতাদীরা কী-কী পড়বে। নামাযেও তোমাদের স্বাধীনতা নেই বরং একটা শৃঙ্খলার ভিতর নামায পুরো করতে হয়।

হাদীস শরীফে এসেছে, ইমাম যখন বলবে وَلَا الضَّالِّيْنَ তখন মুকতাদীরা বলবে اٰمِيْن। এটি হলো হাদীসের শেষ অংশ। হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এ কথা বোঝানো যে ইমাম اَللّٰهُ اَكْبَرُ বললে তোমরাও اَللّٰهُ اَكْبَرُ বল। যখন রুকু করবে, মুকতাদীরাও করবে, সিজদা করলে সিজদা করবে, কিয়াম করলে কিয়াম করবে, সালাম ফিরালে সালাম ফিরাবে। অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে সর্বকাজে ইমামের অনুসরণ না করলে মুকতাদীর নামাযই হবে না। ইমামের পূর্বে সালাম ফিরালে নামায হবে না। আগে আগে রুকু, সিজদা করে ফেললে নামায হবে না। জামাতের সাথে নামায আদায় করতে হলে ইমামকে পুরোপুরি অনুসরণ করতে হবে; অন্যথায় নামায হবে না। তবে একা-একা নামায পড়ার অনুমতি আছে, যত ইচ্ছা পড়া যাবে। কিন্তু জামাতে পড়া সুন্নতে মুয়াক্কাদা। কোন-কোন ইমামের নিকট ওয়াজিব। কারো নিকট ফরজ। কেউ যদি জামাতে নামায পড়া ছেড়ে দেয়, তাহলে তাকে হত্যা কর বা জেলে ভর। ইমাম আবু হানিফা রহ. এ ব্যাপারে সহজ অভিমত পেশ করেছেন। তিনি বলেন, জামাতে নামায পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, যা ওয়াজিবের কাছাকাছি। জামাত তো ইমাম ছাড়া হতে পারে না। আর ইমাম ইমাম হতে পারে না যতক্ষণ না সবাই অনুসরণ করে। ইমাম বানিয়ে দেয়া হলো, মুকতাদীরও দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু অবস্থা এমন হলো যে, কেউ তাকবীর বলে আবার কেউ সালাম বলে নামায শেষ করে। কেউ সিজদা করে আবার কেউ রুকু করে, কেউ পশ্চিম দিকে দাঁড়ালো আবার কেউ পূর্বদিকে। তাহলে ইমাম হওয়া না হওয়া একই কথা। তাই ইমাম তখনই হবে, যখন সবাই তাকে অনুসরণ করবে।

## শ্রবণ করা ও পালন করা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَاِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ

আমিরের কথা শোনো এবং আনুগত্য করো যদিও তোমাদের আমির নিযুক্ত করা হয় এমন হাবশী গোলামকে, যার হাত-পা কাটা অর্থাৎ বিকলাঙ্গ।

দেহ নেই, মর্যাদা নেই, বংশীয় মর্যাদা নেই এমন ব্যক্তিকে যদি সবাই মিলে আমির বা নেতা বানিয়ে নেয়, তাহলে মামুরদের উপর ফরজ হয়ে যায় তাঁর কথা শোনা ও তার আনুগত্য করা। তাঁর বিরোধিতা করবে না; তাহলে উম্মতের একতা টিকে থাকবে। নামায ফরজ করা হয়েছে তো তাতে জামাতের হুকুম লাগানো হয়েছে। আর জামাতের জন্য অবশ্যই ইমাম ঠিক করতে হবে।

## আমিরের দায়িত্ব

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে আগমন করেছেন। নবীজির সর্বপ্রথম সাহাবী হযরত আবু বকর ছিদ্দিক রা. কিছু সাহাবীদের নিয়ে সফরে বের হলেন। তখন তিনি সাথীদের লক্ষ্য করে বললেন, ভাইয়েরা! আপনাদের মধ্য হতে কাউকে আমির নিযুক্ত করে নিন। সাথীরা বলল, আমাদের মাঝে আপনিই হলেন সবচেয়ে উত্তম মানুষ। আমাদের মধ্যে এমন কোন মানুষ নেই, যাকে আমরা আমির নির্বাচন করব। আপনি হলেন সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবা। হযরত আবুবকর রা. বললেন, আমি তার উপযুক্ত নই; আপনারা অন্য কাউকে বানান। তারা বলল, না এমনটি হতে পারে না। পরিশেষে সবাই মিলে হযরত আবুবকর ছিদ্দিক রা.কে আমির নির্বাচন করেন।

হযরত সিদ্দিকে আকবার রা. বললেন, আমাকে যেহেতু আমির বানিয়েছ, তাহলে আমার আনুগত্য করবেন। তাঁরা বললেন, আমরা আবশ্যকীয়ভাবে আনুগত্য করব। তিনি তাদের থেকে অঙ্গীকার নিলেন তার থেকে পৃথক না হওয়ার জন্য। তারা বললেন, না কখনও না; আমরা পৃথক হব না। যখন তারা মঞ্জিল বা সরাইখানায় পৌঁছল, তখন সবাই নিজেদের বিছানা বিছানোর অনুমতি চাইল। তিনি বললেন, আমিরের কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। আমিরের আনুগত্য ওয়াজিব। তিনি কাউকে বিছানা করতে দিলেন না। তিনি কখনও জায়গা পরিষ্কার করছেন, কখনও কাপড় বিছাচ্ছেন। যখনই কেউ এসে বলল, হযরত আমি কি এ কাজটি করব, তখনও তিনি বলেন, আমি আমির আর আমিরের আনুগত্য করা ওয়াজিব।

সাথীরা অপারগ হয়ে গেল। খাবার পাকানোর সময় হলে তিনি লাকড়ি সংগ্রহ করতে জঙ্গলে যান। গোস্ত খরিদ করতে বাজারে যান। সাথী সাহাবীরা আরজ করলেন, হযরত! আমি এ কাজ করি। তিনি বলতেন, আমিরের কাজে

হস্তক্ষেপ করো না। সাথীর অপারগ হয়ে বলতে লাগল, আমরা কী মসিবতে পড়ে গেলাম যে, আমাদের আমির সকল কাজ নিজেই করেন! আমাদের জুতাও সিধা করেন, বিছানা বিছান, খাবার পাকান আর আমরা কিছু করতে পারি না, বলতে পারি না। যখন কেউ বলে, তখন তিনি বলেন, আমি আমির, আমিরের আনুগত্য ওয়াজিব।

## মজার একটি কাহিনী

উক্ত সফরে একটি কৌতুক সংঘটিত হয়েছিল। তাও শুনে নিন যদিও তা আলোচ্য বিষয় বহির্ভূত; তবে উক্ত ঘটনার অংশ। একদা হযরত আবুবকর ছিদ্দিক রা. খানা পাকিয়ে কাউকে না খেতে দিয়ে কোন বিশেষ কাজে বাইরে গেলেন। এক সাহবীর অনেক ক্ষুধা পেয়েছে। তিনি খানার নেগরানকে বললেন, ভাই! আমার অনেক ক্ষুধা লেগেছে, আমাকে অন্তত একটি রুটি দিন। আমি তো ক্ষুধার কারণে দাঁড়াতে পারছি না। তখন নেগরান বলল, যতক্ষণ আমির সাহেব না আসেন এবং তিনি অনুমতি না দেন, ততক্ষণ আমি খাবার দেব না। তিনি অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন, ভাই! আমার প্রচ-ক্ষুধা পেয়েছে, আমি দুর্বল হয়ে পড়েছি, আমার ক্ষুধার তেজ বেড়ে চলছে। একটা না হয় অর্ধেক রুটি দাও; সামান্য ক্ষুধা নিবারণ করি। নেগরান পুনরায় অস্বীকার করল; তাঁকে রুটি দিলেন না।

সাহাবারা যেমন পূত-পবিত্র ও সম্মানিত, তেমনি রসিকও। তাই তিনি মনে মনে বললেন, আমাকে রুটি না দেয়ার স্বাদ বোঝাব। তিনি ক্ষুধা নিয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে আস্তে আস্তে জঙ্গলের দিকে গেলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন গ্রাম্য এক লোক উটে চড়ে আসছে। তিনি গ্রামের সর্দার ছিলেন। তার পোশাক দেখে বোঝা যায়, তিনি গ্রামের বড়লোক হবেন। তিনি একটা মোটাতাজা উটের উপর আরোহণ করে আসছেন। তাকে ওই সাহাবী বললেন, চৌধুরী সাহেব! কোথায় যাচ্ছেন। তিনি বললন, ক্ষেত-খামারের কাজের জন্য একজন গোলাম খরিদ করতে হবে। সাহাবী বললেন, আমার নিকট একজন গোলাম আছে, তার মূল্য হবে ৫০০ দিরহাম। চৌধুরী সাহেব বললেন, গোলাম ভালো হলে ৫০০ দিরহাম কোন বড় কথা নয়। সাহাবী বললেন, অনেক কর্মঠ ও জ্ঞানী গোলাম। কেনাবেচা পাকাপোক্ত হয়ে গেল। তিনি পাঁচশত দিরহাম হাতে নিয়ে ঐ সাহাবীর দিকে ইশারা করলেন, যিনি তাকে রুটি দেননি। তিনি বললেন, ঐ যে বসে আছে তাকে ধরে নিয়ে যান।

সাথে সাথে বলে দিলেন, তার মাথায় কিছুটা পাগলামি আছে। তাকে যখন কেউ ধরতে যায়, তখন সে বলে আমি কবে গোলাম ছিলাম। আমি তো স্বাধীন, আযাদ। আপনি তাঁর এ কথায় কান দিবেন না। লোকটি বলল, ঠিক আছে কিছু মানুষের দেমাগ এমন হয়ে থাকে।

চৌধুরী সাহেব গিয়ে তার হাত ধরল। তিনি বললেন, চলো আমার সাথে, সাহাবী বললেন কোথায়? চৌধুরী বললেন, আমার বাড়িতে। সাহাবী বললেন, কেন? চৌধুরী বললেন, আমি তোমাকে খরিদ করেছি। সাহাবী বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তো গোলাম নই, আমি তো আযাদ। চৌধুরী বললেন, আমার জানা আছে তোমার স্বভাব সম্পর্কে। তিনি চিৎকার করে বলছেন, আমি গোলাম নই, আমি আযাদ। কিন্তু চৌধুরী সাহেব কোন কিছুই শুনলেন না। তিনি তাঁর হাত ধরে জোর করে নিয়ে চললেন। চৌধুরী সাহেব শক্তিশালী থাকায় সাহাবীকে জোর করে উটের উপর তুলে নিয়ে চললেন।

সাহাবী হা-হুতাশ শুরু করলেন এই বলে যে, আমি আযাদ আমাকে প্রতারণা করে গোলাম বানানো হয়েছে। চৌধুরী সাহেব বললেন, আমি তোমার ইতিহাস শুনেছি। তোমার অভ্যাসই এমন।

এদিকে হযরত আবুবকর রা. চলে এলেন। সাহাবী তাঁকে দেখে বলতে লাগলেন, হে আমিরুল মুমিনীন! আমার বাকশক্তি বন্ধ করে দিয়েছে। আমাকে গোলাম বানিয়ে দিয়েছে। এ চৌধুরী আমাকে নিয়ে যাচ্ছে। হযরত আবুবকর রা.কে সবাই সম্মান করত। চৌধুরী সাহেব তাঁকে সালাম দিলেন। হযরত ছিদ্দিকে আকবর বললেন, ইনি আমার সাথী, তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? চৌধুরী বলতে লাগল, হযরত! আমি একে পাঁচশ দিরহাম দ্বারা খরিদ করেছি। তিনি বললেন, সে তো গোলাম না, আযাদ। তাকে কে বিক্রি করল? চৌধুরী ইশারা করে বলল, অমুক ব্যক্তি বিক্রি করেছে। ক্রয়মূল্য তাকেই দিয়েছি। তিনি একে দেখিয়ে বললেন, গোলাম দাঁড়িয়ে আছে। নিয়ে চলো।

হযরত আবুবকর রা. বুঝতে পারলেন, কেউ মজা করেছে। যখন তারা ফিরে এল, তখন রুটি থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি চোখে ইশারা করে বুঝিয়ে দিল, এখন কী অবস্থা, আমাকে রুটি না দেয়ার স্বাদ পেয়েছ? হযরত আবুবকর সিদ্দিক রা.ও উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনা কী? সাহাবী বললেন, হযরত! আমার অনেক ক্ষুধা পেয়েছিল। আমি তার নিকট অনেক কাকুতি-মিনতি করে বলেছি, আমাকে একটা নয় অর্ধেক রুটি দাও, তাতে কিছুটা ক্ষুধা নিবারণ হবে। কিন্তু তিনি বলে দিলেন, আমির সাহেব না এলে রুটি দেব না। তাই আমি তার সাথে একটু মজা করেছি। তাকে পাঁচশত দিরহামে বিক্রি করে

দিয়েছি। তখন হযরত সিদ্দিকে আকবার রা. অনেক হাসলেন এবং পাঁচশ দিরহাম ফেরত দিলেন।

যখন এ ঘটনা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বলা হলো, তখন তিনি মুচকি হাসি দিলেন এবং মুখে রুমাল দিলেন। যখনই সেই ঘটনা আলোচনা হতো, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসি দিতেন এবং মুখে রুমাল রাখতেন।

## সর্ববিষয়ে একতার বিধান

নামাযে জামাতের নিয়ম রাখা হয়েছে এবং তার জন্য একজন ইমাম নির্ধারণ করা হয় আর তার অনুসরণ করতে হয়। সফরে গেলে সেখানে একজন ইমাম (নেতা) বানিয়ে নিবে, যাতে সময় সুশৃঙ্খল হয়। বাড়িতে অবস্থানের সময় একজনকে বড় মনে করা এবং তার হুকুম মেনে চলা; তাহলে বাড়িতে শৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। হজেও ইমাম নির্ধারণ করা হয় এবং তার আদেশ মানতে হয়। যাকাতের জন্য বাইতুল মাল প্রতিষ্ঠা করে সেখানও ইমাম বানানো হয়, যাতে সে সকল কিছু যাকাত আদায় করতে পারে। এত প্রতীয়মান হয়, ইসলামী শরীয়তে সর্বক্ষেত্রে ও সর্ববিষয়ে একতা ও দলবদ্ধতার নেযাম রাখা হয়েছে এবং প্রতিটির জন্য আলাদা আলাদা ইমাম নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। আর তার কথা শোনা ও মানা উভয়টা আবশ্যকীয় করা হয়েছে।

এমনিভাবে প্রতিটি বিষয়ে একজন ইমাম নির্ধারণ করা আছে। আকিদার জন্যও দুজন ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে। একজন হলেন আবু মানসুর মাতুরিদী রহ. আরেকজন হলেন ইমাম আবুল হাসান আশয়ারী রহ.। তারা এমন বড় মাপের ইমাম যে, আকিদা বিষয়ে তাদের রায় গ্রহণযোগ্য। এ কারণে কিছু মানুষ আশয়ারী আর কিছু মানুষ নিজেদের মাতুরীদির দিকে নিসবত করে 'আমি মাতুরীদি' বলে থাকে। তাদের পরস্পর অনেক মতভেদ রয়েছে। তবে তাদের মতভেদ শব্দগত। আকিদা উভয়ের এক ও অভিন্ন। এ বিষয়ে কোন বড় সমস্যা দেখা দিলে এ কথা বলো যে, এ বিষয়ে ইমাম আবুল হাসান রহ. একথা বলেছেন। ফিকাহ মাসয়ালাতেও একজন ইমাম নির্ধারণ করে নাও। তিনি ইমাম আবু হানিফা হতে পারেন, ইমাম শাফিয়ী রহ. হতে পারে, হতে পারে ইমাম মালেক বা হাম্বল রহ.। যদি কোন বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়, তাহলে তাদের যে কোন একজনের অভিমত গ্রহণ করে নাও; তাহলে তোমাদের মাঝে ঝগড়া সৃষ্টি হবে।

## দলিলভিত্তিক ইখতেলাফ দূষণীয় নয়

মূল মাসয়ালাতে কোন বাদানুবাদ নেই। তাতে যদি মতভেদ হয়, তাহলে মতভেদ হয় দলিলের ভিন্নতার। আর বাদানুবাদ ও ঝগড়া এগুলো মানুষের নফসের জযবা থেকে সৃষ্টি হয়, যা নিন্দনীয়। আর দলিল-প্রমাণ দ্বারা যে মতভেদ হয়, তা নিন্দনীয় নয়। তাই ইমামদের পরস্পর মতভেদ দূষণীয় কাজ নয়। উদাহরণস্বরূপ চোর ও ডাকাত পরস্পর একমত হয়ে গেল; এই একতা ভাল নয়। কারণ, দূষণীয় কাজে একতাও দূষণীয়। আর ভালো কাজে একতা হলে সেটা ভালো ও প্রশংসনীয় হবে। যে ইখতেলাফ দলিলভিত্তিক এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হাওয়ালা থাকে, সেই ইখতেলাফ গ্রহণ কর। কারণ, তা দীনেরই অংশ এবং তাকে ঝগড়া বলে না। কেননা, তাতে দলিল-প্রমাণ বিদ্যমান। ঝগড়া তো আমাদের জযবা থেকে সৃষ্টি হয়। তাতে মাসয়ালাকে আড়াল বা ঢাল বানাই। মাসয়ালার বৈশিষ্ট্য তো লড়াই করা নয়। যদি তা হতো, তাহলে সর্বপ্রথম সাহাবাদের মাঝে মারামারি হতো। তাদের কেউ রফেইদাইন করতেন, কেউ করতেন না, কেউ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব মনে করতেন, কেউ নাজায়েয মনে করতেন।

তাই মাসয়ালার বৈশিষ্ট্য যদি লড়াই করা হতো, তাহলে সর্বপ্রথম তাদের মাঝে লাঠি নিয়ে মারামারি হতো। কিন্তু সবাই নিজ নিজ মতের উপর আমল করেছেন এবং পরস্পর একজন অপরজনকে সম্মান করতেন। তারপর ইমামদের মাঝে ডাণ্ডা চলতো। ইখতেলাফ হলেই লড়াই বেঁধে যেত। কিন্তু সকল ইমাম পরস্পর একতাবদ্ধ। কারণ, তাদের মতভেদ ছিল প্রাসঙ্গিক বিয়য়ে। মূল বিষয়ে তাদের কোন মতভেদ ছিল না। যে কারণে তাদের অন্তরে অপরজনের সম্মান ও ভালোবাসা পোষণ করতেন। তার প্রমাণ হযরত ইমাম শাফিয়ী রহ. যখন বাগদাদে আসে, তখন তিনি তার মাজারে ফাতেহা পাঠ করে ইসালে সাওয়াব করেন। আর যখন নামায পড়তেন, তখন ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাযহাব অনুযায়ী পড়তেন। রাফেদাইন করতেন না, জোরে আমীন বলতেন না। লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করলো, হযরত! আপনি এমন করছেন কেন? তখন তিনি উত্তরে বললেন, আমি মাজারওয়ালাকে লজ্জা পাই যে, তাঁর কাছে এসে তাঁর মাযহাবের বিপরীত করবো। যে সকল মাসয়ালাতে ইমাম আবু হানিফাকে অনুসরণ করার সুযোগ ছিল, সেগুলোতে তিনি পুরোপুরি অনুসরণ করেছেন। আর যেগুলো জায়েয-নাজায়েযের ব্যাপার, সেগুলোতে তিনি অপারগতা প্রকাশ করতেন। যেহেতু তার অন্তরের

ভিতর ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর আযমত বিদ্যমান ছিল, তাই তিনি তার অনুসরণ করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয়, মাসয়ালার বৈশিষ্ট্য ঝগড়া-ফাদাদ নয়। বরং যারা ঝগড়া করে, তারা নফসের জযবার কারণেই করে থাকে।

## ঝগড়ার আমীন

আমার ছোটকালের ঘটনা। সাহারানপুরে থাইল্যান্ডের অধিবাসী একজন কালেক্টর ছিলেন। তার নাম মার্চ। বংশের দিক থেকে তিনি ইউরোপীয়ান ছিলেন। কিন্তু রুচি হিসেবে ছিলেন এশিয়ান। কারণ, তার জন্মস্থান হলো হিন্দুস্তানে। তার সময়ে একটা মজার ঘটনা ঘটে। একজন হানাফি মাযহাবের লোক আহলে হাদীসের মসজিদে গিয়ে আস্তে আমীন বলল। এতে জাহেল আহলে হাদীসরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে মারপিট শুরু করল। কেন সে জোরে আমীন বলেনি এটাই তার অন্যায়। তারা তাকে পিটিয়ে উচ্চ আওয়াজে চিৎকার করতে লাগল, এই হানাফি ভাগ ভাগ। এতে হানাফিরা একত্র হয়ে আহলে হাদীসদের উপর হামলা করে। তারপর আহলে হাদীসরা বলতে থাকে, হে আহলে হাদীস! দৌড়ে আস, দৌড়ে আস। এবার সবাই লাঠিসোটা ও দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। এতে উভয়পক্ষের অনেকে আহত হয়, কারো মাথা ফেটে যায়, কারো হাত-পা ভেঙ্গে যায়। লড়াই শেষে উভয়ে দল থেকে রিপোর্ট নিয়ে মামলার পেশ করা হলো। তখন মার্চের শাসন চলছিল।

উভয় পক্ষের উকিলগণ আমীনের মাসয়ালা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলো। এতে তার বুঝে এলো যে, তারা কি কারণে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে ভাই! আমীন কি কোন প্রয়োজনীয় আসবাব? জায়গীর, না কোন দালান? তো তোমাদের বিবাদটা কী নিয়ে। তারা বলল, সাহেব এটা একটা মাসয়ালা। তিনি বললেন, মাসয়ালা নিয়ে কেন যুদ্ধ কর? যুদ্ধ তো হয় মহিলাদের নিয়ে, সম্পদ নিয়ে, প্রয়োজনীয় আসবাব নিয়ে। মাসয়ালা নিয়ে কেন যুদ্ধ কর, যুদ্ধের কারণ কী। তখন তারা বললেন, সাহেব! এক হাদীসে এসেছে আমীন আস্তে পড়, অপর হাদীসে এসেছে আমীন জোরে পড়। তখন তিনি বললেন, যা নিকট জোড়ে পড়ার হাদীস পৌঁছে সে জোড়ে পড়বে আর যার নিকট আস্তে হাদীস এসেছে সে আস্তে পড়বে। পরস্পর ঝগড়া করবে কেন। নিজ নিজ দলিলের উপর আমল করবে। তার বুঝে আসছিল না, আমীন নিয়ে লড়াই বাঁধবে কেন। তিনি অত্যন্ত যাচাই-বাছাই

করে ফায়সালা লিখেন, অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ফায়সালা লিখেন। তিনি লেখেন, আমি বাস্তব রিপোর্ট দেখে এ ফলফল পেলাম যে, মুসলমানদের আমীন তিন প্রকার– ১. জোরে আমীন পড়া, ২. আস্তে আমীন পড়া, ৩. ঝগড়া করার জন্য আমীন পড়া। আমীন জোরে বা আস্তে এ নিয়ে কোন ঝগড়া নেই। কেননা, উভয় ব্যাপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস রয়েছে। আর হাদীস ঝগড়ার বস্তু নয়। এ সকল ঝগড়ার কারণ হলো 'আমীন বিশশার'। সুতরাং উভয় দল ফাসাদ সৃষ্টিকারী, আমি উভয় দলের সাজার ফায়সালা দিচ্ছি।

## মাসয়ালার আড়ালে ভিতরগত রাগ প্রকাশ

আমরা মূলত নফসের আবেগে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করি, মাসায়েলকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করি। মাসয়ালার বৈশিষ্ট্য তো লড়াই করা হয়। প্রত্যেকের হাতে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রাসূলুল্লাহর দলিল রয়েছে, তার উপর আমল করুক। লড়াই করার কী প্রয়োজন, ঘৃণা করার কী প্রয়োজন? পরস্পর মিলেমিশে বসবাস কর, কেউ যদি না মানে, তাহলে জোরজবরদস্তি তো চলবে না। তার সকাশে তো দলিল আছে, সে তার উপর আমল করছে। তোমার কি অধিকার আছে তাকে ফাসিক বা কাফির আখ্যা দেয়ার। এ কথার উদ্দেশ্য তো এমন হয় যে, আমার নিকট ওহী আসে, তাই সবাই আমার কথা মানো। অন্যরা সম্পূর্ণ বাতিল। কারণ, তারা হকের উপর নেই, তাদের নিকট ওহী আসে না। এমন কথা বলা নিতান্তই ভুল। মাসয়ালা ব্যবহার করা হয় শুধু আমল হিসেবে। মূলত ঝগড়া তো হয় নফসের আবেগের কারণে। পরস্পর যুদ্ধ করতে করতে মুসলমানদের রাজত্ব গেলো, সম্পদ নষ্ট হলো, ঘরবাড়ি ধ্বংস হলো। যুদ্ধ করতে করতে দুনিয়া শেষ হলো। এখন রয়ে গেল দীন, তা নিয়েও কি যুদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল? তা থেকে কি দূরে থাকতে পারতো না? এখন সব শেষ। তাই বলে এখন দীনকে আড়াল বানায়। সম্পদ নেই মাসয়ালার জন্য লড়াই কর। এ সকল লড়াই শুধু নফসের কারণে। মাসয়ালার দলিল হাতে থাকলে কোন ঝগড়া থাকার কথা নয়।

ইমাম শাফিয়ী রহ. বলতেন, হাদীসে যেহেতু এসেছে এ কারণে জোরে আমীন বলি। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলতেন, আপনি অপারগ যেহেতু আপনার নিকট হাদীসের দলিল রয়েছে। আমার নিকট হাদীসের দলিল থাকার কারণে আমি আস্তে আমীন বলি। ইমাম শাফেঈ রহ. বলেন, আপনিও অপারগ

যেহেতু আপনার নিকট আস্তে বলার দলিল আছে। আপনিও হকের উপর আমল করছেন। আমির হকের উপর আমল করছি। এতে সুন্দর সমাধান হলো, তাতে বন্ধুত্বও গেল না, ঘৃণাও সৃষ্টি হলো না। ঝগড়া হলো না। কারণ, উভয়ের নিকট দলিল রয়েছে। দলিল ছাড়া যত মতভেদ ও ঝগড়া হয়েছে, সেগুলো হয় গোষ্ঠীগত কারণে, না হয় দুশমনি হেতু, না হয় দলগত কারণে। সেগুলো মূলত নফসের আবেগ ও জযবা থেকে সৃষ্টি, সেগুলো মাসয়ালার সৃষ্টি নয়। তারা শুধু মাসয়ালা আড়াল করে নিজেদের ভিতরগত রাগ প্রকাশ করে আর এটাই মূল উদ্দেশ্য।

## ঐক্যবদ্ধকরণের উদ্দেশ্য

ফিকাহর মাসয়ালার ব্যাপারে কাউকে ইমাম মানতে হবে, যেখানে ইখতেলাফী মাসয়ালা আসবে, যেখানে কোন ইমামের দারস্থ হবে, এমনকি মানুষের স্বভাবজাত বস্তু। উদাহরণস্বরূপ একব্যক্তি চারজন ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করালো, তারা চারজন চার ধরনের রায় ছিল। একজন বলল, আমি গরম জাতীয় ঔষধ দিব, আরেকজন বলল আমি ঠাণ্ডা জাতীয় ঔষধ দিব, আরেকজন বলল আমি শুকনা ঔষধ দিব এবং অপরজন বলল আমি তরল জাতীয় ঔষধ দিব। তখন কি কেউ এ কথা বলে যে, এখন যেহেতু ডাক্তাররা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ শুরু করে দিল। তো আমার ইন্তিকাল করে দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া ভালো। আমি আর চিকিৎসা করাব না। আপনার নিকট আপনার প্রাণ যেহেতু প্রিয় বস্তু, সে জন্য সেই ডাক্তারদের থেকে যে কোন একজনকে নির্বাচিত করবেন। আর নির্বাচন যে কোন কারণে হতে পারে। এ ডাক্তার বড় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করেছেন বিধায় তিনি অনেক অভিজ্ঞ ডাক্তার। তাই তার চিকিৎসা গ্রহণ করব। অথবা এ কারণে যে তার হাতে অনেক রোগী সুস্থ হয়েছে তার ব্যবস্থাপত্র মিস হয় না; তীরের ন্যায় কাজ করে। তাই তার চিকিৎসা গ্রহণ করাব। অথবা এ কারণেও হতে পারে যে, তিনি খান্দানী ডাক্তার, বংশগত ডাক্তার, তা বাপ-দাদারা ডাক্তার ছিল। সুতরাং ডাক্তারি বিদ্যায় তিনি অন্যদের তুলনা বেশি পারদর্শী। এ কারণে তার চিকিৎসা নিবে।

এছাড়া যে কোন কারণে আপনি ডাক্তার নির্বাচন করবেন। কারণ, জ্ঞান আপনার নিকট প্রিয় জিনিস। শুধু ডাক্তারদের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা ভিন্ন হওয়ার কারণে আপনি মৃত্যুকে জীবনের উপর প্রাধান্য দিবেন না। বলবেন,

বাঁচতেও হবে চিকিৎসাও করতে হবে। তাই এই ডাক্তারদের থেকে কাউকে নির্বাচন করে নিব। যদি আলেমদের মাঝে মতের ভিন্নতা সৃষ্টি হয় আর আপনি এমন বলেন যে, আলেমরা পরস্পর লড়াই ঝগড়া করছে। আমরা ইসলামকে ছেড়ে দিবে, অনন্তকালের মৃত্যুকে প্রাধান্য দিবো। এমনকি কেউ করেছে এ পর্যন্ত? সুতরাং এখানেও নির্বাচন করতে হবে। আপনি যার দিকে যাবেন, তাকে দেখবেন তার ইলম কি সনদ মাধ্যমে প্রাপ্ত, তার ওস্তাদ ও শায়েখদের যোগসূত্র কি সহিহ সনদের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর যে আহকাম তিনি বর্ণনা করেন তার সনদ কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে। সুতরাং এমন হলে আমি তার মাসয়ালার উপর আমল করব, তার মাযহাব গ্রহণ করব। অন্যদের মাযহাব গ্রহণ করব না। যে কোনভাবেও হোক আলেম নির্বাচন করতে হবে। ডাক্তারদের মতের ভিন্নতা হলে, তাদের মধ্যে থেকে যাচাই করে ডাক্তার নির্বাচন করতে পার আর উলামাদের মধ্যে মতভেদ হলে তোমাদের দীন সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়ে যায় যে, মৌলবীরা কি নিয়ে পরস্পর মতানৈক্য করছে। এতে বোঝা যায়, জান আপনাদের নিকট বেশি প্রিয় দীন হতে। ঈমান আপনার নিকট বেশি প্রিয় নয়। আপনার নিকট জান বেশি প্রিয় হওয়ার দরুন ডাক্তারদের মধ্যে যত কঠিন মতভেদও হোক না কেন তাদের থেকে কাউকে না কাউকে অবশ্যই নির্বাচন করবেন। এখানে যদি আপনার নিকট ঈমান ও দীন প্রিয় হতো, তাহলে যত বড়ই ইখতেলাফ হোক না কেন যে কাউকে আপনি অবশ্যই নির্বাচন করতেন এবং তার অনুসরণ করতেন। যেহেতু এমনটি হয়নি তাই বোঝা গেল, আপনাদের নিকট জান বেশি প্রিয় ঈমান ও দীন থেকে।

অতএব নিজের ইমাম অবশ্যই নির্ধারণ করতে হবে এবং ব্যক্তি নির্বাচন করতে হবে ও তার অনুসরণ করতে হবে। চিকিৎসায় মতভেদ হলে যে কোন ডাক্তারকে নির্বাচন করতে হবে, অন্যথায় চারজনের চিকিৎসা গ্রহণ করে তাড়াতাড়ি কবরে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা, একজন সকালে ঠা-া ঔষধ দিবে, অপরজন বিকালে গরম জাতীয় ঔষধ দিবে, তৃতীয়জন তরল ঔষধ দিবে এবং অপরজন শুকনা জাতীয় ঔষধ দিবে। এতে রোগী শয্যাশায়ী হয়ে তাড়াতাড়ি পরপারে যাবার প্রস্তুতি নিয়ে নিবে। তাই একজনের চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে।

তরিকত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাওহীদ উদ্দেশ্য থাকবে। যে পীর বা শায়েখের হাতে বাইয়াত হবেন, তাকে মনে করতে হবে, তার মধ্যে আমার ইহ ও

পরকালের কল্যাণ নিহিত। তার মধ্যে অন্য কারো নিকট নিজেকে সোপার্দ করা যাবে না। তবে সবাইকে সম্মান করতে হবে। সম্মান সবাইকে করুন কিন্তু আত্মার চিকিৎসা একজন থেকেই করান। সুফিদের পরিভাষায় তার নাম তাওহীদে মুতলাক। অর্থাৎ যাকে আপনি শায়েখ বানাবেন তার জন্য একাকার হয়ে যেতে হবে। শায়েখ দুজন বা তিনজন হবে না। বরং একজনই হবে। আর এক তরিকার উপরই চলতে হবে। হ্যাঁ, যদি এমনটি প্রমাণিত হয় যে, তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রকৃত অনুসারী নন বরং বেদাতী, তাহলে তাকে বাদ দেয়া যাবে। তারপর কি করতে হবে? এ ব্যাপারে সুফিগণ লিখেছেন যে, তাকে বাদ দিয়ে আরেকজন আহলে হক শায়েখ ধরতে হবে। তবে আগের শায়েখের শানে বেয়াদবী করা যাবে না। তাই তিনি যেমনই হন না কেন, তার সাথে গোস্তাখি করা যাবে না, তার সাথে শিষ্টাচারমূলক ব্যবহার করতে হবে। তাই ডাক্তারের মধ্যে যদি তাওহীদ উদ্দেশে। তরিকতেও তাওহীদ উদ্দেশ। এমতাবস্থায় ইলম গ্রহণের ক্ষেত্রে কেন তাওহীদ উদ্দেশ্য হবে না? অবশ্যই একজনকে অনুসরণ করতে হবে। তাকে ইমাম মেনে তার ফিকহের উপর আমল করবেন। যদি এমনটি না করেন, তাহলে সর্বদা অস্বস্তিতে থাকতে হবে। একবার এদিকে, একবার ওদিকে। এতে নফসের অনুসরণ হবে; কোন ইমামের অনুসরণ একেবারেই হবে না। আর শরীয়তে নফসের অনুগত্য উদ্দেশ্য নয়।

অতএব ইসলামী শরীয়ত সর্বক্ষেত্রে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছে। মুয়ামালায় আলাদা শৃঙ্খলা, আকাঈদে আলাদা, ফিকহে আলাদা। এতে উদ্দেশ্য হলো সকল উম্মত যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। রায় ভিন্ন হোক কিন্তু নিজেরা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকুক।

এমনিভাবে আপনারা যখন সুফিয়ানে কেরামদের নিকট যাবেন এবং নিজেদের চরিত্রের প্রশিক্ষণ দিবেন, তখন তাদের ভিতর বিভিন্ন পদ্ধতি পাবেন। চিশতিয়া তরিকার তারবিয়্যাত এক রকম, সুহরাওয়ার্দীয়া তরিকার তারবিয়াত আরেক রকম, কাদিরীয়া তরিতার ওয়াজিফা অন্য ধরনের। কিন্তু তারা সবাই আল্লাহওয়ালা ও হকপন্থী। তবে যদি এ চার তরিকা একসাথে গ্রহণ করে আপনি আত্মার চিকিৎসা করাতে চান, তাহলে আপনার দীন-ধর্ম সবাই নষ্ট হবে। আপনি একসাথে চার ধরনের বিপরীতমুখী কাজ কিভাবে করবেন? তাই এক তরিকাকেই গ্রহণ করতে হবে। তবে সবাইকে তাজিম করতে হবে। কিন্তু আত্মশুদ্ধি একজনের দ্বারা করাতে হবে। তো তাসাউফের লাইনে এককত্ব উদ্দেশ্য যেমন চিকিৎসা ও ফিকহের ক্ষেত্রে এককত্ব উদ্দেশ্য।

## সামাজিক ও পারিবারিক মুয়ামালাতে আমির নির্ধারণ

তেমনিভাবে যখন কোন মুয়ামালাগত সমস্যা সৃষ্টি হয়, তখন যে কোন ব্যক্তিকে আমির বানাতে হবে; অন্যথায় ঝগড়া মিটবে না। উদাহরণস্বরূপ কোন ঝগড়া হলো। এখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে মানুষদের জিজ্ঞেস করতে থাকলেন, ভাই এ ঝগড়া সমাধান কিভাবে করবে? একজন বলল, এভাবে কর, আরেকজন বলল এভাবে কর, আরেকজন বলল, এভাবে কর। একেকজন একেকভাবে বলল। এখন যদি তাদের কথা অনুযায়ী ফায়সালা করতে হয়, তাহলে ঐ ঝগড়া ঝগড়া হিসেবেই থেকে যাবে। এমনকি আরো বেড়ে যেতে পারে। ফলে বাড়ি ও সমাজ ধ্বংস হবে। কিন্তু যদি একজন দীনদার ব্যক্তিকে বলেন, ভাই! আমরা আপনাকে আমাদের আমির নির্বাচন করছি। আপনার নিকট এ ঝগড়ার সমাধান চাচ্ছি, আপনি তার সমাধান করে দিবেন। আপনি যে কোন সমাধান দিবেন আমরা মেনে নিব। সঠিক দিলে তো মেনে নিবই। কিন্তু যদি আমাদের চিন্তার বিপরীত ভুল সমাধান দিলেও আমরা তা মেনে নিব। তবুও সমাধান আপনার দ্বারাই করব। তাহলে এক প্রকার প্রশান্তি ও স্থিরতা আসবে।

এ কারণে ফকীহগণ লেখেন, বিচারপতি ফায়সালা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয়ভাবে বাস্তবায়নযোগ্য। কাজী বা বিচারপতি যখন হুকুম করবেন, এ বিষয়ে এটা হলো সমাধান তাহলে তার হুকুম প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে উভয় অবস্থায় বাস্তবায়ন হবে। অর্থাৎ তার বিরোধিতা কেউ করতে পারবে না। যদিও পারে এ কথা প্রমাণিত হয়ে যে, রায়টা ভুল ছিল। তবুও ফায়সালা ভঙ্গ হবে না। বরং যে ফায়সালা হয়েছিল তা-ই বাস্তবায়ন হবে, কার্যকর হবে। কেননা, কাজীর ফায়সালা আল্লাহর পক্ষ হতে হয়। আর এমন মনোভাবে ও ক্ষমতা ছাড়া মনে প্রশান্তি এবং একনিষ্ঠতা সৃষ্টি হবে না। এ ভিত্তিতে কাজীর ফায়সালা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্যভাবে বাস্তবায়নযোগ্য হয়ে যায় এবং তা মানা জরুরি হয়ে পড়ে। এ কারণে ইসলামে আমির নির্ধারণ করবে, যাতে তিনি সামাজিক, ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান করতে পারেন।

## আমির হওয়ার অধিকার

ইসলামী বাদশাহ এবং খলিফাতুল মুসলিমীন যদি থাকেন, তাহলে মূলত আমির তিনি। তিনি যদি কাউকে নির্ধারণ করেন, তাহলে তিনিই আমির

হবেন। আর যদি ইসলামী হুকুমত না থাকে, এ ব্যাপারে ফকীহগণ লিখেন, তখন মুসলমানদের উপর ওয়াজিব যে, তারা সবাই মিলে নিজেদের মধ্য হতে একজনকে আমির নির্বাচন করে নিবে। যদি সারাদেশের মানুষ এক আমিরের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ না হয়, তাহলে এলাকাভিত্তিক আমির নির্বাচন করবে। প্রত্যেক প্রদেশে-বিভাগে আলাদা আলাদা আমির নির্বাচন করবে। প্রত্যেক মামুরদের উপর ওয়াজিব তাদের আমিরের আনুগত্য করা। এ সম্পর্কে কুরআনে কারীমে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য, রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনুগত্য এবং আমিরের আনুগত্য করা ওয়াজিব ও ফরজ করা হয়েছে।

## সত্তাগত আনুগত্য ও গুণগত আনুগত্য

কুরআন শরীফ তো কুরআন শরীফই। কুরআন তো বালাগাত ও ফাসাহাতের উৎসগিরি, অলংকার ও সাহিত্যের এবং নবীজীর সবচেয়ে বড় মুজেজাহ। এতে যেখানে যেখানে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে, সেখানে আল্লাহর নাম উল্লেখ করেছে যে, اَطِيْعُوا اللّٰهَ অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য কর। তার অর্থ হলো, আল্লাহর আনুগত্য সত্তাগত, কোন গুণের কারণে আনুগত্য ওয়াজিব নয় যে আল্লাহর নাম শ্রবণেই গর্দান নত করা উচিত। কেননা, তিনি সত্তাগতভাবে আনুগত্যের অধিকারী। আর আমরা কোন গুণের কারণে আনুগত্যের অধিকারী হতে পারি? যদি ইলম থাকে, তাহলে ইলমের কারণে আনুগত্য ওয়াজিব হয়। অন্যথায় আনুগত্য ওয়াজিব হবে না। যেমন– জাহেলের তো কেউ আনুগত্য করে না। হ্যাঁ, যদি তার মধ্যে ইলমের গুণাবলি এসে যায়, তাহলে আনুগত্য করা লাগবে। যদি কেউ পিতা হন, তাহলে পিতা হিসেবে তার আনুগত্য করা হয়। কেউ ওস্তাদ হলে, ওস্তাদ হিসেবে তার আনুগত্য ওয়াজিব হয়। কেউ পীর হলে, পীর হিসেবে তার আনুগত্য করা হয়। সুতরাং মানুষ জাতিগতভাবে ওয়াজিবুল ইতায়াত নয় বরং কোন গুণের কারণে আনুগত্য ওয়াজিব হয়। যখন কোন গুণ পাওয়া যাবে, তখন আনুগত্য ওয়াজিব হবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সত্তাগতভাবে ওয়াজিবুল ইতায়াত। তাকে সত্তাগতভাবে আনুগত্য করতে হয়। আর সিফাত বা গুণ জাতের সত্তার অনুগামী হয়। কেননা, সিফাত জাতের প্রতিবিম্ব। আসল উৎসস্থল তো

জাত। সিফাত গ্রহণযোগ্য হয় জাতের মাধ্যমে যে, এটি আল্লাহর সিফাত। কিন্তু সিফাতের মূল হলো আল্লাহ জাত। আল্লাহর আনুগত্যের যে কথা বলা হয়েছে, তাতো এভাবে বলা হয়নি যে– ঈসার আনুগত্য কর বা মুসার আনুগত্য বা মুহাম্মদের আনুগত্য কর, বরং বলা হয়েছে– রাসূলের আনুগত্য কর রিসালাতের গুণের কারণে।

এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি কোন ব্যক্তিগত পরামর্শ দেন, তাহলে তার আনুগত্য ওয়াজিব হবে না। এটা ভিন্ন কথা যে, আপনি নবীজীর মহব্বত ও ভালোবাসার কারণে তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছার আনুগত্য করেন। তবে শরীয়তের বিধান হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি কোন ব্যক্তিগত বা জাতিগত রায় প্রদান করেন, তাহলে তার আনুগত্য করা উম্মতের উপর ওয়াজিব নয়। তবে যদি এভাবে বলেন যে, আমি আল্লাহর হুকুম পৌঁছে দিচ্ছি, তাহলে তা ওয়াজিবুল ইতায়াত। যখন রিসালত পৌঁছাবেন তখন আনুগত্য ওয়াজিব। আর যখন বলবেন, এটি আমার ব্যক্তিগত পরামর্শ বা হুকুম, তাহলে তা গ্রহণও করতে পারেন আবার অপারগতাও প্রকাশ করতে পারেন। আদব রক্ষার্থে আপনি আমল করতে পারেন, তবে আপনার উপর ওয়াজিব নয়। যেমন– হযরত বারিয়াহ রা.-এর বিবাহের ঘটনা। তিনি হযরত আয়েশা রা.-এর বাদি ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মুগিসের রা. সাথে বিবাহ দিলেন। হযরত রাবিয়াহ রা. ছিলেন খুবই সুন্দরী। আর হযরত মুগিস রা. ছিলেন কালো ও বিশ্রী। এ কারণে তাদের মধ্যে বনিবনা ছিল না। রাত-দিন সর্বদা কথা কাটাকাটি চলত এবং ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকত। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ঝগড়া বারবার মিটিয়ে দিতেন। কিন্তু তারপরও পূর্ব অবস্থা বিরাজ করত।

হযরত আয়েশা রা. হযরত বারিরাহ রা.কে আযাদ করে দিলেন। শরীয়তের মাসয়ালা হলো, বিবাহকৃত বাদী আযাদ হলে বিবাহ তার আওতাধীন চলে আসে। সে ইচ্ছা করলে বিবাহ ঠিক রাখতে পারে আবার ইচ্ছা করলে ভেঙ্গে দিতে পারে। তিনি যখন আযাদ হলেন, তখন ইচ্ছা করলেন বিবাহ বন্ধনে থাকবে না বরং ভেঙ্গে দিবেন। তাই তিনি পাকাপোক্ত ইচ্ছা করে নিলেন বিবাহ ভেঙ্গে দিবেন।

হযরত মুগিস রা. তাকে খুবই ভালবাসতেন। তিনি যখন তার ইচ্ছার কথা জানতে পারেন, তখন তিনি পেরেশান হয়ে যান। কখনও হযরত আবুবকর রা. দ্বারা সুপারিশ করান, কখনও হযরত উমর ফারুক রা.-এর নিকট যান

বিবাহ ঠিক রাখার জন্য। হযরত বারিরাহ রা. তাদের সবাইকে বলে দেন, না আমি বিবাহ রাখব না। পরিশেষে তিনি হযরত রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিই তো আমাকে আর বারিরাহকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। এখন বারিরাহ ঐ বিবাহকে ভেঙ্গে দিচ্ছে। আপনি তাকে হুকুম করুন যেন সে বিবাহ ঠিক রাখে। এ সময় হযরত মুগিস রা. অত্যন্ত পেরেশান ছিলেন।

ঐতিহাসিকগণ লিখেন– হযরত মুগিসের একটা মুহূর্তে দেখার মতো ছিল যখন তিনি ক্রন্দনরত অবস্থায় মদীনার অলিগলিতে ঘুরছিলেন। চোখ দিয়ে অনবরত অশ্রু ঝরছিল আর তা ফোঁটা ফোঁটা করে দাড়িতে গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি বলছিলেন, হায়! বারিরাহ পৃথক হয়ে গেল! বারিরাহর প্রতি তার এত পরিমাণ ইশক ও মহব্বত ছিল। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে বললেন, আপনি বারিরাহকে বলে দিন বিবাহ ঠিক রাখার জন্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারিরাহর নিকট গেলেন এবং বললেন, বারিরাহ! মুগিসের সাথে বিবাহ ঠিক রাখ। আমিই এ বিবাহ করিয়ে ছিলাম। এখন এ বিবাহ বাকি রাখ। হযরত বারিরাহ রা. খুব মেধাবী ছিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা কি শরয়ী হুকুম না আপনার ব্যক্তিগত পরামর্শ? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না শরীয়তের হুকুম নয়। শরীয়তের হুকুম মতে তো তুমি আযাদ, বিবাহ রাখতেও পার ভাঙ্গতেও পার। এটি আমার নিছক পরামর্শ। হযরত বারিরাহ রা. বললেন, তাহলে আমি মানতে অপারগ। পরিশেষে মানেননি, তিনি তার বিবাহ ভেঙ্গে দিলেন।

এ হাদীস দ্বারা বোঝা গেল, যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তিগত বা জাতিগত কোন পরামর্শ দেন, তাহলে তার আনুগত্য ওয়াজিব হয় না। যদি রিসালাত পেশ করে বলেন, এটি আল্লাহর হুকুম, তাহলে তার আনুগত্য করা ফরজ। এতে প্রতীয়মান হয়, কোন নবী-রাসূলও জাতিগতভাবে ওয়াজিবুল ইতাআত নয়। তাহলে আপনি আমার কি মূল্য আছে। আমি ব্যক্তিগত কথা বলব আর এমন জিদ ধরব যে, না-না তা মানতে হবে। অবশ্যই মানতে হবে না, এটি শুধু আপনার একটি অভিমত। আমারও অভিমত আছে। হ্যাঁ, এটা জরুরি যে, যা হক ও সত্য হবে, তার উপর আমল করতে হবে।

তাই আল্লাহ তায়ালা যেখানেই নিজের আনুগত্যের হুকুম করেছেন, সেখানে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন যে, তা ওয়াজিবুল ইতাআত। আর নবীদের আনুগত্যের ব্যাপারে কারো নাম উল্লেখ করেননি। শুধু বলেছেন = অর্থাৎ

রিসালাত সিফাতের উল্লেখ করেছেন যে, এখানে রিসালাত সিফাতের কারণে ওয়াজিবুল ইতায়াত। যখন তারা আল্লাহ প্রদত্ত রিসালাত পেশ করবে তখন তার আনুগত্য কর।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

## আমিরের আনুগত্যের মানদণ্ড

وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ এখানে اَطِيْعُوا শব্দটি বিশেষ কারণে উল্লেখ করেননি। যেমনটি اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। এই اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ শব্দটি পিছনে اَطِيْعُوا শব্দের অনুগামী। এমন বিন্যাসের উদ্দেশ্য হলো যারা উলিল আমর হবে, তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগামী হবে। যেহেতু তারা রাসূলের নায়েব হিসেবে কাজ করেন, তাই তাদের আনুগত্য করা ওয়াজিব। পৃথকভাবে তাদের আনুগত্য ওয়াজিব নয়। আল্লাহ তায়ালার রাসূলের ফরমান যদি বাস্তবায়ন করেন, তাহলে তাদের আনুগত্য করা ওয়াজিব হবে। অন্যথায় তা শুধু ব্যক্তিগত পরামর্শ হবে, ওয়াজিবুল ইতাআত হবে না। আর اُولِى الْاَمْرِ শব্দটি সর্বশেষে এসেছে এ কথা বোঝানোর জন্য যে এরপর আর কোন আনুগত্য নেই। তাই আনুগত্য মোট ৩ প্রকার– ১. আল্লাহ তায়ালার, ২. রাসূলুল্লাহর, ৩. উলিল আমরের। উলিল আমর যদি কোন ভুল-অশুদ্ধ হুকুম করেন, তাহলে তার সংশোধন করে নিবে। কারণ, ব্যক্তিগত হুকুম পালন করা ওয়াজিব নয়। যখন তিনি এভাবে বলেন যে, কুরআন শরীফে এটা এসেছে। তাহলে আনুগত্য করা ওয়াজিব। চাই তিনি তা কিয়াস করে বলুন। কেননা, তিনি কুরআন থেকেই বলছেন। এটা কুরআনেরই সত্যায়ন। এ কারণে তা থেকে মুখ ফিরানো জায়েয নেই।

## যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ

হযরত উমর ফারুক রা.-এর খেলাফতকালে তাঁর দরবারে একজন মহিলা এসে বলল, হে আমিরুল মুমিনীন! আমার স্বামী সম্পর্কে আর কি বলব। তিনি সারাদিন রোযা রাখেন, রাতভর নামায পড়েন, সারারাত ইবাদত করেন। হযরত উমর রা. বললেন, মাশাআল্লাহ। আল্লাহ তাকে বরকত দিন। তোমার স্বামী খুব ভালো স্বামী– ইবাদতগোযার মানুষ, তাহাজ্জুদ পড়ুয়া

মানুষ। দায়িমী রোযাদার মানুষ। এ কথা শুনে মহিলা চুপচাপ চলে গেল। তখন হযরত উমর রা.-এর দরবারে হযরত আকসাম নামে একজন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! আপনি কি বুঝেছেন, মহিলা কী বলে গেল? তিনি বললেন, কেন সে তো তার স্বামীর প্রশংসা করে গেল। হযরত আকসাম রা. বললেন, তার কী প্রয়োজন ছিল যে, খলিফার দরবারে এসে স্বামীর প্রশংসা করবেন যে, আমার স্বামী এত এত নামায পড়েন, এত পরিমাণ রোযা রাখেন? খলিফা বললেন, তাহলে সে কী বলে গেল? হযরত আকসাম রা. বললেন, সে তার স্বামীর প্রশংসা করতে আসেনি বরং নালিশ করতে ও সাহায্য চাইতে এসেছিল। হযরত উমর রা. বললেন, কী দাবি করে গেল। তিনি বললেন, সে দাবি করেছে, সারারাত তো থাকে ইবাদতে, সারাদিন থাকে রোযা অবস্থায়, এতো আল্লাহ তায়ালার কাজ, আমার কাজ তো নেই। তার কথার উদ্দেশ্য হলো এই– এ কথার নালিশ সে করে গেছে। হযরত ওমর রা. চুপ হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, আমার মতো মানুষকে খলিফা বানানো হয়েছে, যে মুয়ামালাহ বুঝতে সক্ষম নয়। আমি তো আমির হওয়ার যোগ্য ছিলাম না। তারপর তিনি বললেন, হে আকসাম! আল্লাহ তায়ালা যেহেতু তোমাকে এতটুকু বুঝ দান করেছেন, তাহলে এ মুকাদ্দামার ফায়সালা তুমিই দাও। এই মহিলার সাহায্য চাওয়া এবং স্বামী সম্পর্কে নালিশের শরয়ী কী হুকুম হতে পারে। হযরত আকসাম রা. সাথে সাথে সমাধান দিলেন– হে আমিরুল মুমিনীন! ওই মহিলার স্বামীকে হুকুম দেয়া হোক সে যেন চার দিন অন্তর এক দিন অবশ্যই রোযা রাখবে না এবং বেশি করে খাবার গ্রহণ করবে। আর চার রাতের মধ্যে এক রাত একেবারেই জাগ্রত থাকবে না বরং স্ত্রীর নিকট ঘমাবে। তিন রাত ও তিন দিন তার ইচ্ছানুযায়ী রোযা রাখবে, নামায পড়বে। কিন্তু চতুর্থ রাত ও দিন নামায ও রোযা থেকে বিরত থাকবে। হযরত উমর রা. বললেন, হে আকসাম! তুমি এ হুকুম কোথা থেকে বের করলে। তিনি বললেন, কুরআন থেকে। হযরত উমর রা. বললেন, এটি কুরআনের কোন্ স্থানে আছে যে যদি কোন স্ত্রীর স্বামী রাত-দিন ইবাদত করে, তাহলে চার রাত-দিনের মধ্যে এক দিন এক রাত স্ত্রীর পাশে কাটাবে। তিনি বললেন, কুরআনে হুকুম করা হয়েছে–

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা চারজন স্ত্রীর বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করেছেন। যদি চার স্ত্রী থাকে তাহলে পালাক্রমে চার রাত তাদের নিকট থাকবে। আর যদি একজন থাকে, তাহলে তিন রাত আল্লাহর আর এক

রাত বিবির।

হযরত উমর রা. বললেন, সুবহানাল্লাহ। খুব সুন্দর ফায়সালা তো। এমন মানুষকে আমির বানানো হয়, যে কুরআন থেকে ফায়সালা বের করতে সক্ষম নয়। ঐ দিনই খলিফা তাকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দান করলেন। আল্লাহ তায়ালা যেহেতু তোমাকে প্রখর ধীশক্তি দান করেছেন, তাই আজ হতে তুমিই মুসলমানদর মুকাদ্দামা ফায়সালা কর। একটা ভাত দিয়েই পুরো পাতিলের খবর নেয়া যায়। যেহেতু সাধারণ একটা বিষয় কুরআন দ্বারা ফায়সালা করতে পেরেছ, তাহলে সকল মুসলমানদের ফায়সালা করতে পারবে।

## অবাধ্যতা ঐক্য নষ্টের কারণ

আনুগত্য তিন স্তরের– ১. আল্লাহর আনুগত্য, ২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও ৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যারা নায়েব তাদের আনুগত্য। যখন তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত চালু করে এবং তাদের ইলম ও আমলের উপর ভরসা করা যায় তখন তারা এ আনুগত্যের উপযুক্ত। তারপর তাদের থেকে এবং তাদের আনুগত্য থেকে অবাধ্যতা করা জাতির ঐক্য নষ্ট করার কারণ হয়। তাই জনগণের দায়িত্ব হলো যতক্ষণ আমি শরীয়তের হুকুম বাস্তবায়ন করব ততক্ষণ তার আনুগত্য করবে। আলহামদুলিল্লাহ! যখন তাকে আমরা আমিরে শরীয়ত বানালাম তো তার মধ্যে ঐ সকল গুণ রয়েছে, যেগুলো একজন আমিরের জন্য থাকতে হয়। আল্লাহ তায়ালা একে আমিরের উপযুক্ত বানাবেন। তাই যখন উপযুক্ত আমির পেলেন, তখন তার আনুগত্য করা আপনাদের উপর ফরজ। এখন এমন মানুষ তো মিলবে না, যে কখনও ভুল করবে না। আমাদের তো নিজেদের মধ্য হতেই একজনকে আমির বানানো হবে এবং তার আনুগত্য করতে হবে। তবে এতটুকু যাচাই-বাছাই করতে হবে যে, এমন আমির নির্বাচন করবে, যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী। সারাজীবন তাকওয়া ও পবিত্র অবস্থায় অতিবাহিত করছেন এবং তার জীবন শুধু ইসলাহ ও শুদ্ধতার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে ইত্যাদি। তাহলে এমন ব্যক্তি তো অবশ্যই আমাদের আমির ও পূজনীয় ব্যক্তি হবেন। ভুল থেকে কোন মানুষ মুক্ত নয়। সব মানুষই ভুল করে থাকে। এরপরও সে ওয়াজিবুল ইতায়াত থাকবে। তার আনুগত্য করতে হবে।

অতএব আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য একজন আমির বানিয়ে দিয়েছেন, যিনি ইমামতের উপযুক্ত। আমাদের সবার উপর ফরজ হলো তার আনুগত্য করা। এখন যদি তার থেকে কোন অতি উত্তম ব্যক্তি থাকে তাহলে এটা শর্ত নয় যে আমির সেই ব্যক্তি হবে। তার থেকে উত্তম যদি আরো কেউ থাকে তাহলে তারই আনুগত্য করতে হবে। কারণ, সারা জাতি মিলে তাকে আমির নিযুক্ত করেছেন।

## আমির হওয়ার জন্য কিছু বুনিয়াদী শর্ত

কেউ যদি বলে, আমি তার চেয়ে বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন তাই আমির আমি হব। তাহলে এ দাবিদারকে কেউ আমির বানানোর জন্য তৈরি হবে না। এ ব্যাপারে শরীয়তের মাসয়ালা হলো– যে নিজে নিজে নেতৃত্ব চায়, তাকে কখনও নেতৃত্ব দেয়া হবে না। যে ব্যক্তি উপযুক্ত কিন্তু আমির হওয়া থেকে সবসময় দূরে থাকে; স্বেচ্ছায় নিতে চায় না, এমন ব্যক্তিই নেতৃত্ব পাওয়ার উপযুক্ত, তাকেই সবাই মিলে আমির বানাতে হবে। মুসলমানরা মিলে কাউকে যদি নেতৃত্ব দিয়ে দেয় এবং সে নেতৃত্ব পেয়ে একজন বিচারপতি নির্বাচন করে নেয়, তাহলে সকলের উপর ফরজ হলো তার আনুগত্য করা। আল্লাহ না করুন, আমির যদি এমন ফায়সালা দেন, যে প্রকাশ্য কুরআন ও হাদীসের বিরোধী এবং কুরআন ও হাদীস নাশকারী, তখন চিন্তা করতে হবে, হায় এমন মানুষকে কেন আমির বানিয়েছি। কিন্তু যদি কুরআন ও হাদীস মোতাবেক ফায়সালা করে, তাহলে তাকে কেন পদচ্যুত করবে?

## ইসলামী হুকুমাত না থাকলে মুসলিমদের করণীয়

শরয়ী ইমারত প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি। ফকীহগণ লিখেন, যে দেশে ইসলামী রাষ্টব্যবস্থা নেই, সে দেশের মুসলমানদের উপর ওয়াজিব হলো নিজেদের মধ্যে থেকে একজন উপযুক্ত আমির নির্বাচন করা। তারা নিজেদের সমস্যাগুলো তার নিকট পেশ করবে এবং তার কথা শুনবে ও তার আনুগত্য করবে। তাহলে এর উপকারিতা সমগ্র জাতি ভোগ করবে। সে যখন তারা ঐক্যবদ্ধ থাকবে এবং তার অধীনে সুশৃঙ্খলা থাকবে, তখন অন্যান্য জাতির উপর তার একটা বিরাট প্রভাব পড়বে যে, মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলা জাতি। যখন ঈদের জামাতে এক ইমামের পেছনে ৫০ হাজার মানুষ নামায পড়ে, তখন অনেক অমুসলিমকে বলতে শুনেছি, এ নিয়মে কোন জাতির

ভাগ্যে জুটেনি, যা মুসলমানদের দেয়া হয়েছে, একজনের ইশারায় লাখ লাখ হাজার হাজার মানুষ মাথা নিত করে। হারাম শরীফে যাও তো দেখবে সেখানে ইমামের পিছনে ত্রিশ-ষাট লাখ মানুষ নামায পড়ে। একজন মাথানত করলে সবাই মাথানত করে, সেখানে বিস্ময়কর একটা নেযাম চালু আছে। একজন হজ্বের ইমামের পেছনে সকল হাজিরা চলে। একজন যাকাতের ইমামের নিকট সকলের যাকাত পেশ করে। এভাবে ইসলাম প্রতিটি শাখায় নিয়ম চালু করে রেখেছে। এমন নেযাম হতে পারে না যদি দলবদ্ধ না হয়। আর জামাতবদ্ধ হতে পারে না যদি ইমাম বা আমির না থাকে। আর আমির হতে পারে না যদি আনুগত্য ও অনুসরণ না থাকে। তাই সবচেয়ে বেশি জরুরি বিষয় হলো আমিরের কথা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করা। আপনারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন যে, আল্লাহ আমাদের তাওফিক দিয়েছেন যে, তারা একজন আমির নির্ধারণ করতে পেরেছি। আর আলহামদুলিল্লাহ আমিরও একজন সর্বজনস্বীকৃত ব্যক্তিত্ব।

## আমির নির্বাচনে সমষ্টিগত জীবন লক্ষণীয়

দুনিয়াতে এমন কোন সত্তা নেই, যিনি সমালোচনামুক্ত। যার উপর মনে চায় সমালোচনা করে। এমনকি সমালোচকরা, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও সমালোচনার উর্ধ্বে রাখেনি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেউ বলেছে গণক, কেউ বলেছে জাদুকর, কেউ বলেছে পাগল, আরো কত কি। তাই কবি বলেন, সমালোচকরা যেহেতু আল্লাহ ও তার রাসূলকে ছাড়েনি, তাহলে আমি কে। আমি তো কোন বিষয়ই না। দুনিয়া জুড়ে কে আছে এমন যে তার সমালোচনা করা হয়নি। সমালোচনা সবারই আছে। তাই সার্বিক জীবনধারা দেখতে হবে যে সমষ্টিগত জীবন সততার সাথে কেটেছে, নাকি ধোঁকাবাজি ও ফেরেববাজির মধ্যে। জীবনটা তাকওয়া ও পরহেজগারীর মধ্যে পরিচালিত করেছে, না মূখ্যতা ও অজ্ঞতার মধ্যে অতিবাহিত করেছে। এ কারণে সামান্য কটি ভুল পাপ গ্রহণযোগ্য।

যাদের নেকের পাল্লা ভারী হবে তারা সফলকাম। তারা আল্লাহর নিকট মুক্তি পাবে। একেবারে নিষ্পাপ তো নবী-রাসূলগণ। তবে নবীর পরে ওয়ালীরা গোনাহ থেকে বেঁচে তাকে। আউলিয়অদের পর আমরা যারা আছি তারা গোনাহ হতে বাঁচতেও পারি না এবং নিষ্পাপও না। কোন না কোন গোনাহ

হয়েই যায়। কিন্তু সমষ্টিগত জীবন দেখে হুকুম লাগাতে হবে। একটা দুটা ভুলকে ধরা যাবে না; তাহলে মনে হবে তাদের নিয়ত খারাপ। তার সারা জীবনের হাজারো ভালোর মধ্যে একটা খারাবী দেখে তা প্রকাশ করে দেয়। এটা বন্ধুত্বের আলামত নয় বরং তা দুশমনির পরিচয়। এটা কোন মানবতা হতে পারে না। এটা হলো নবীজীর ভাষায় ষড়যন্ত্রকারী বন্ধু বা বন্ধুরূপী ষড়যন্ত্রকারী। হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন বন্ধু হতে পানাহ চেয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন–

'হে আল্লাহ! এমন ষড়যন্ত্রকারী বন্ধু থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই, যার চোখ আমাকে দেখে এবং তার দিল আমাকে টুকে (মন্দ তালাশ করে)। যদি নেক কাজ দেখে তো তা গোপন করে আর খারাপ কাজ দেখলে তা জনসম্মুখে ছড়িয়ে দেয়।'

এমন বন্ধু পছন্দনীয় নয়। কারো মন্দ যদি আপনার সামনে থাকে, তাহলে তার ভালোগুলোও দেখতে হবে। তার ভালোগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে খারাপগুলো হতে দৃষ্টি ফিরাতে হয়। এমনটিই কুরআনের ফায়সালা হলো, নেকসমূহ গোনাহসমূহকে নিঃশেষ করে দেয়। যখন গোনাহ খতম হয়ে গেল তা তো আর বাকী থাকল না। তাহলে প্রচার-প্রসার করবে কী। কিন্তু সমালোচক ও গীবতকারীরা সর্বযুগে সর্বস্থানে থাকে। তাই কাজের মানুষদের তাদের পেছনে পড়লে কাজ হবে না। কেয়ামতের ময়দানে যখন আল্লাহ তায়ালার সামনে সবাই দাঁড়াবে, তখন সমালোচনাকারী ও কাজকারী উভয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু কামিয়াব হবে শুধু কাজ করনেওয়ালারা। তাই আমাদের আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করার দরকার যে, তিনি আমাদেরকে আমির বানানের তাওফিক দান করেছেন। সাথে সাথে আল্লাহর নিকট আরো তাওফিক চাই যে, আমরা যেন আমাদের আমিরের কথা শুনি এবং মানতে পারি। আর আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আমাদের পাপসমূহকে ক্ষমা করে দেন, আমাদেরকে দীনের উপর অটল-অবিচল রাখেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যু দেন। আমীন।

# বয়ান : ১৪

## উপদেশ দানকারী

মানুষ যদি মহাকাশ, নিজ সত্তা ও বিশ্বজগতের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করে, তার আকস্মিক দুর্ঘটনা ও স্বাভাবিক ঘটনাগুলোকে বিশ্লেষণ করে, জ্ঞান-বুদ্ধি, বিচক্ষণতা এবং চিন্তা ও গবেষণাভিত্তিক কাজ করে, তাহলে এগুলো তার জন্য বড় বড় বক্তা ও প্রভাষকের কাজ করবে। আর মানুষ সর্বদা ওয়াজ করতে পারে এবং তা থেকে উপদেশ অর্জন করতে পারে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ• كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ○

## উপকার শুধু আমল দ্বারা-ই হয়

সম্মানিত উপস্থিতি! বিশেষ কিছু কাজের দরুন আজ ওয়াজ করার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু যেহেতু মুয়াযযিন সাহেব ঘোষণা করে ফেলেছেন, তাই মুয়াযযিন সাহেব এবং অন্যান্য সম্মানিত লোকদের আবেগ ও উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রতি লক্ষ্য করে যে, আপনাদের ওয়াজ শোনার আগ্রহ আছে আর এ কারণে আপনারা জমে বসেছেন যে, আল্লাহর দীনের ও শরীয়তের কোন কথা কানে ঢোকে। আজ আপনাদের এমন কথা বলে দিচ্ছি যে, কোন ওয়ায়েজ থাকুক বা না থাকুক, কোন লেকচারার থাকুক বা না থাকুক, আপনারা সময় ব্যয় করে একত্র হোন বা না হোন, এক কথায় যে অবস্থায় থাকুন না কেন আপনি

নিজেই ওয়াজ করবেন এবং শুনবেন। আল্লাহ ও তার রাসূলের কথা বলবেন এবং শুনবেন। তারপর তার উপর আমল করবেন। আমলই আসল মাকসাদ। শুধু বলা ও শোনার দ্বারা ফায়দা হয় না, ফায়দা হয় শুধু আমলের দ্বারা।

## আকল, ফিকির ও নজর সবচেয়ে বড় উপদেশদাতা

আকল হলো মানুষের সবচেয়ে বড় ওয়ায়েজ বা উপদেশদাতা। মানুষ যদি জ্ঞান-বুদ্ধি, চিন্তা-ফিকির ও দূরদর্শিতা কাজে লাগায়, যুগের পরিবর্তন এবং দিন-রাতের আবর্তনের উপর যদি চিন্তা করে এবং অনুভব করে, তাহলে তা দ্বারা পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং তার সকল সৃষ্টিজগত, আশ্চর্য ও দুর্লভ মনোহরী মাল-আসবাব এবং তার বিচিত্র আবিস্কারের দিকে পথ দেখাবে। আর জ্ঞান ও হাকিকতের দ্বার উন্মুক্ত হবে। হেদায়েতের রাস্তা খুলে যাবে। জীবন এবং অস্থায়ী দুনিয়ার অস্থায়িত্ব জানা যাবে। মৃত্যু এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনে আগত ঘটনাবলির প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস ও ইয়াকীন অর্জন হবে। আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি মন ধাবিত হবে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ

আকাশ ও দিগন্ত এবং নিজেদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার হাজারো নিদর্শন ও আলামত রয়েছে।

যদি মনোচক্ষু দ্বারা দেখা হয়, ভালোরূপে খেয়াল করা হয়, অন্তরকে নিবিষ্ট করা হয়, তাহলে পৃথিবীর প্রতিটি অংশ আল্লাহর কুদরত এবং তার হেকমত, বুদ্ধিমত্তা ও অভিজ্ঞতা পরিলক্ষিত হবে। তবে শর্ত হলো ধ্যান-খেয়াল। যতক্ষণ না পূর্ণ ধ্যান-খেয়ালে দেখা হবে এবং চিন্তা-গবেষণা না হবে, সে পর্যন্ত কোন হেকমত-রহস্য প্রকাশ হবে না। আবার কোন উপাকারিতা এবং বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা জানা যাবে না, দিন রাতের পর্যবেক্ষণে। হাট-বাজারে মাদরাসার বাড়িতে যতক্ষণ না ধ্যান-খেয়াল হবে কোন কাজে ও জিনিসে, ততক্ষণ কিছুই বোঝা যাবে না। অথচ এগুলো চোখের সামনে ঘটছে। নিজের কান শুনছে, নিজ চোখ তা দেখছে। কিন্তু জিজ্ঞেস করলে বলতে পারছেন না। কারণ, এগুলোকে আপনি মনোযোগসহ দেখেননি, অন্তরকে সেদিকে ফিরাননি। তাই আসল হলো কলব বা অন্তর। অন্তর যদি মনোযোগী না হয়,

তাহলে চোখ কিছুই দেখবে না এবং কান কিছুই শুনবে না।

এ চোখ ও কান অন্তরের চশমা। মানুষ যদি শুধু নিজ ব্যক্তিতে গবেষণা করে যে, সে এক সময় ছিল না, তারপর দুনিয়ায় এল, আবার চলে যাবে এবং যদি লক্ষ্য করে দিন-রাতে, সকাল-সন্ধ্যায় কি কি ঘটনা ঘটছে এবং কি কি অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। কেউ জন্মগ্রহণ করে, কেউ মরে, কেউ ধনী, কেউ গরিব, কেউ সুস্থ, কেউ অসুস্থ, কারো জীবন আরাম-আয়েশে কাটছে আবার কারো অশান্তি ও দুঃখে অতিবাহিত হচ্ছে। অতএব মানুষ যদি মহাকাশ, নিজ সত্তা ও বিশ্বজগতের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করে, তার আকস্মিক দুর্ঘটনা ও স্বাভাবিক ঘটনাগুলোকে বিশ্লেষণ করে, জ্ঞান-বুদ্ধি, বিচক্ষণতা এবং চিন্তা ও গবেষণাভিত্তিক কাজ করে, তাহলে এগুলো তার জন্য বড় বড় বক্তা ও প্রভাষকের কাজ করবে। আর মানুষ সর্বদা ওয়াজ করতে পারে এবং তা থেকে উপদেশ অর্জন করতে পারে। পৃথিবী সৃষ্টি ও ধ্বংস, পৃথবীর ঘটনা ও দুর্ঘটনা, বিপ্লব ও পরিবর্তন সকাল-সন্ধ্যার পরিবর্তনে গভীর নজর দিলে, চিন্তা করলে, ধ্যান-খেয়াল দ্বারা বুঝলে, অনুধাবন করলে এগুলো দ্বারা সৃষ্টিকর্তা, আবিষ্কারক, মালেক চেনা যাবে, পরিচয় লাভ হবে। আর সৃষ্টিকর্তা স্বীকার করার পর তার কুদরত-শক্তিমত্তা, হেকমত, জ্ঞান এবং তার রাজত্বের প্রভাব অনুভব হবে। তারপর তার সাথে ভালবাসা, মনোবিশ্রাম এবং গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। তারপর তার আনুগত্য, অনুসরণ এবং ইবাদতের প্রতি আগ্রহী হবে। পরকাল, দীন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে মন ধাবিত হবে। ওয়াজ, নসিহত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মূল কারণ হলো এগুলো। মোটকথা, আকল ও এ পৃথিবীর সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণাই মানুষের সবচেয়ে বড় বক্তা এবং বিনা টাকার ওয়ায়েজ ও উপদেশকারী।

## মৃত্যু এক নীরব উপদেশদাতা

মানুষের দ্বিতীয় প্রধান উপদেশদাতা হলো মউত। মানুষ যদি চিন্তা করে মৃত্যুকে নিয়ে, মৃত্যুকালীন অবস্থা নিয়ে, মৃত্যুর পর কী হবে তা নিয়ে, দুনিয়াতে আল্লাহর সাথে আমরা কিরূপ ব্যবহার করেছি আর পরকালে আল্লাহ আমাদের সাথে কেমন আচরণ করবেন ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা স্বয়ং দীন এবং শরীয়তের মৌল উদ্দেশ্য। মরণের স্মরণে আল্লাহর স্মরণ হয়। আখেরাতের স্মরণ হয়। দুনিয়াবী আসবাবের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। আর ওয়াজ ও নসিহতের কাজই হলো উপরোক্ত বিষয়াবলি।

হাদীস শরীফে এসেছে–

كَفٰى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا

মানুষের জন্য বড় উপদেশদাতা মউত।

অন্য হাদীসে এসেছে–

اَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ

দুনিয়ার স্বাদ ধ্বংসকারী মউতের স্মরণ বেশি বেশি কর।

মৃত্যু থেকে গাফেল হবে না, মৃত্যুর ধ্যান-খেয়াল সর্বদা থাকতে হবে। ফলে দুনিয়ার স্বাদ এবং আরাম-আয়েশ লিপ্ততা কমে যাবে। আখেরাতের প্রতি মনোযোগী হবে। আনুগত্য ও ইবাদতে মন লাগবে। ওয়াজ ও নসিহতের কাজই এগুলো। গাফেলতি অনেক বড় খারাপ বস্তু। গাফেলতির কারণে মানুষ ধ্বংস ও ক্ষতির মধ্যে পরে। দুনিয়াবী কাজে রাত-দিন ব্যস্ত থাকা। বৃষ্টির সময় গাফেল কৃষক যদি আরামে থাকে, ঠা-া বাতাস ও সকালের আরামে পড়ে থাকে, ক্ষেত খামারে না যায়, বীজ বপণ না করে, হাল চাষ না করে, ক্ষেত-জমি দেখাশোনা না করে, তাহলে এ কথা তো সুস্পষ্ট যে, যখন কর্মঠ কৃষক নিজের তরতাজা ক্ষেত দেখে খুশি হবে এবং তা কাটবে, মাড়াই করবে, ধান-শস্য ও তরকারি ঘরে তুলবে, তখন গাফেল কৃষকের মুখ থুবরে পড়বে, আফসোস করবে এবং লজ্জিত হবে। কিন্তু যে সময়কে নষ্ট করেছে, সময়কে কাজে লাগায়নি, তার আফসোস ও অনুশোচনা কোন কাজে আসবে না। আখেরাতে এমনই অবস্থা হবে। হাদীস শরীফে এসেছে–

اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ

দুনিয়া আখেরাতের ক্ষেতস্বরপ।

দুনিয়ায় যদি মানুষ মনে প্রাণে আমল করে, গাফেলতি না করে, সময় নষ্ট না করে, অন্তরে ঈমানী বীজ বপণ করে, আমল দ্বারা তার সেচ দিবে। দান-খয়রাত এবং যাকাত-সদকা দ্বরা তার দেখাশোনা করবে এবং জিইয়ে রাখবে, মউতের স্মরণ করবে, দৈনিক আমলের হিসাব করবে এবং দিলের মুরাকাবা করতে থাকবে, তাহলে আখেরাতে সফলকাম হবে এবং উদ্দেশ্যস্থলে পৌছতে পারবে। অন্যথায় ক্ষতিতে পড়বে, কষ্টে পড়বে। হাদীস শরীফে এসেছে–

اَلنَّاسُ نِيَامٌ اِذَا مَاتُوْا اِنْتَبَهُوْا

মানুষ ঘুমিয়ে আছে গাফলতের ঘুমে। যখন মরে যাবে হিসাব কিতাব দিতে

হবে। সাওয়াল, জাওয়াব হবে, তখন বুঝতে পারবে, গাফলত থেকে জাগ্রত হবে। কিন্তু বিচক্ষণ ও পরিণামদর্শী ঐ ব্যক্তি যে সাওয়াল ও জাওয়াব এবং হিসাব-কিতাবে পাকড়াও হওয়ার পূর্বে নিজ হিসাব-নিকাশ পাক-পবিত্র রাখে এবং সর্বদা নফসের মুরাকাবা করতে থাকে।

## দৈনন্দিনের বক্তা

বলা হয়ে থাকে–

مُوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا حَاسِبُوْا قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوْا

মরার পূর্বে নিজেকে মরা ভাব, হিসাব-নিকাশের পূর্বে নিজ আমল এবং পরিণতির হিসাব করে নাও।

গোনাহ হতে পাক-পবিত্র হয়ে কবরে যাও। আল্লাহর দরবারে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র হয়ে উপস্থিত হও। মোটকথা, মৃত্যুও মানুষের জন্য বড় বক্তা। মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থতা, রোগ, বৃদ্ধতা, মসিবত, দুঃখ-কষ্ট ও মুসলমানদের জন্য উপদেশক পর্যায়ে। মানুষের চিন্তা-ফিকির ও ধ্যান-খেয়াল এবং আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া অত্যন্ত জরুরি বিষয়। গাফলতি ও অলসতা ছেড়ে দাও, পরিহার কর। হিম্মত, ও দৃঢ়তা এবং মজবুতির সাথে কাজ কর। তোমরা অল্প করলে আল্লাহ অনেক করবেন। আল্লাহর দিকে এক পা বাড়ালে আল্লাহ দু'পা বাড়াবে। ইরশাদ হয়েছে–

إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً

যে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হবে, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। আর যে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক গজ অগ্রসর হই। আর যে আমার দিকে মধ্যম চালে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে আসি।

আল্লাহ তায়ালার দয়া-অনুগ্রহের সীমা-পরিসীমা নেই। কিন্তু আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহের যোগ্যতার সাথে সাথে চেষ্টা-প্রচেষ্টারও দখল আছে। আমাদের সামান্য তাওয়াজ্জুহর কারণে আল্লাহর অধিক তাওয়াজুহ লাভ হবে। তাহলে আমরা দুনিয়া হতে সফলকাম ও কামিয়াব হয়ে যেতে পারব। নসিহত ও দোয়ার মাধ্যমে বয়ান শেষ করলাম।

# বয়ান : ১৫

## শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করা

'তোমাদের পূর্ব পুরুষদের ভাল নামে স্মরণ কর।'

নিজেদের মৃত ব্যক্তিদের ভালো কর্মগুলো আলোচনা কর। তাহলে ঐ ভালো কর্মগুলোর আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে একদিকে মানুষের অন্তরে মৃত ব্যক্তির ভালোবাসা সৃষ্টি হবে এবং ভালোবাসার দাবিতে মানুষ তাকে সাওয়াব ও দোয়ার দ্বারা স্মরণ করবে। আর অপরদিকে তার নেক কর্ম ও গুণাবলির আলোচনা দ্বারা স্বয়ং আমাদের ভিতর সেই গুণাবলি অর্জনের আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে। আর আমরাও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ঐ মাকাম-মর্যাদার স্থান অর্জন করবো যা তারা অর্জন করেছিলেন।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ•

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ.

## মৃত্যুর পেয়ালা[৩]

সম্মানিত উপস্থিতি! পৃথিবীর শুরু লগ্ন থেকেই জীবন-মরণের ধারা চলে আসছে। জন্ম হচ্ছে আবার মরণ আসছে। জন্ম হয়েছে, মরণ হবে না এমন কোন বিধান রাখা হয়নি। যে বস্তুর জন্ম আছে, তার মৃত্যু আছে। পৃথিবীর সকল বিধানে কিছু না কিছু ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু মউতের বিধানে কোনো ব্যতিক্রম নেই–

যখন নবী-রাসূর ও আউলিয়াগণ এবং রাজা-বাদশাহ আমির উমরাদের জন্য

---

৩. ২১ নভেম্বর ১৯৫৪ সালে দেওবন্দের ইসলামিয়া হাইস্কুল ময়দানে মরহুম খান বাহাদুর জিয়াউল হক সাহেবের শোকসভায় প্রদত্ত ভাষণ।

ছাড় নেই, তাহলে কে আছে মৃত্যুর থাবা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। সুতরাং যা কিছু সৃষ্টি হবে তার সর্বশেষ ঘাঁটি হলো মউত।

এ কারণেই জন্মের সাথে সাথে মৃত্যুর ধারাবাহিকতা দুনিয়াতে চালু আছে, থাকবে।

কবি বলেন–

> কারো নাম খোদাই করে রাখা হয়, কারো জীবনের সমাপ্তি ঘটে। রহস্যময় পৃথিবী যার সকাল সন্ধ্যায় কেউ যাত্রা করে কেউবা অবস্থান।

## মর্যাদার পার্থক্য

জীবন-মরণ বা জন্ম-মৃত্যু সবার এক রকম হয় না। বরং মানুষের জন্ম ও মরণের মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য আছে। কারো জন্ম শুধু মাতাপিতাকে আনন্দ দেয়। কারো জন্ম একটা বংশের জন্য আনন্দের বিষয় হয়। কারো জন্মে পুরো শহরবাসী খুশি প্রকাশ করে। আবার কারো জন্মের কারণে সারা পৃথিবীবাসী আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠে। তেমনিভাবে সকল মৃত্যুও সমান নয়। কারো মরণে কেউ কাঁদার মানুষ ও অংশীদার হওয়ার মতো থাকে না। যেমনটি হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

قَلَّتْ تُرَاثُهُ وَقَلَّتْ بَوَاكِيْهِ

তার কাদার কোন লোক নেই, নেই কোন ওয়ারিশ।

কারো মৃত্যুর কারণে শুধু তার মা-বাবা অথবা আত্মীয়-স্বজনরা শোক পালন করে। কারো মরণে সারা বংশ শোক পালন করে। আবার কারো মরণে কয়েক শহর শোকাহত হয়। আবার কারো মৃত্যুতে শুধু শহর নয়, বরং জেলা ও প্রদেশ কাঁদে। জনাব খান বাহাদুর রহ. ঐ লোকদের মধ্যে ছিলেন যাদের জন্মে শুধু মাতাপিতা নয় বরং কয়েক খান্দান এবং সারা এলাকা আনন্দ প্রকাশ করে।

## অনুগ্রহ হারানোর বেদনা

আজ যখন তিনি দুনিয়া হতে চির বিদায় হয়েছেন। তখন তাকে হারানোর দুঃখ-বেদনা শুধু তার আত্মীয়-স্বজনদের জন্য নয় বরং এ শহর ও জেলার

এমনকি সারা প্রদেশবাসীর। কারণ কেউ কোন ব্যক্তিসত্তার কারণে কাঁদে না বরং তার গুণাবলির কারণে তার দয়া-অনুগ্রহের কারণে এবং তাঁর ভালো কর্মের কারণে। যখন সুন্দর গুণে গুণান্বিত মানুষ মরার সময় হাসতে হাসতে ও সানন্দে নিজ প্রভুর সাথে মুলাকাত করে, তখন সারা দুনিয়া তার জন্য কাঁদে, দুঃখ প্রকাশ করে। কবি বলেন–

یادداری کہ وقت زادن تو ہمہ خندال شود تو گریاں

তোমাকে স্মরণ করছি যে তোমার জন্মের সময় কাঁদতে
ছিলে এবং সবাই আনন্দে হাসতে ছিল।

সুতরাং এমন জীবন গঠন কর যে মরনের সময় তুমি হাসবে আর সবাই কাঁদবে। বা এমন জীবন করহে গঠন মরিলে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন।

ঘটনা হলো জনাব খান বাহাদুর রহ. এ কবিতার মিসদাক বা সত্যায়ন। ইনশাআল্লাহ, তিনি নিজ ভাল কর্মের কারণে হাসতে হাসতে নিজ প্রভুর সাথে মিলিত হয়েছেন আর দুনিয়া আজ তার শোকে ক্রন্দনরত। তাই এ কাঁদা তার ব্যক্তির জন্য নয় বরং তার গুণাবলি ও ভাল কর্মের যা আজ আমাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।

## সুস্থ স্বভাবের মানুষ

মরহুম খানবাহাদুর সাহেবের যৌবন ও বৃদ্ধকাল আমি স্বচোখে দেখেছি। আমি ছোট ছিলাম আর তিনি যুবক ছিলেন। তার জীবনের একটা আশ্চর্য এবং উল্লেখ করার দিক হলো যে– শিশুকারে তার পিতা ইহকাল ত্যাগ করেন। তার ছেলেবেলার সময়টা মুরব্বী ছাড়া অতিবাহিত হয়েছে। এখন আপনারা অনুমান করেন যে, একটি শিশু যে বংশের চোখের মনি হবে বা বংশের মধ্যমণি হবে এবং ধন-দৌলতে ঘরভরপুর হবে, জীবন যাপনের সকল মাধ্যম এবং ধন-সম্পদ ও সম্মান বংশীয়ভাবে প্রাপ্ত। তার কাজে কেউ বাধা প্রদানকারীও নেই। সেই অবস্থায় ধন-সম্পদের প্রাচুর্যতা মানুষকে অধঃপতনে নিপতিত করে। এমন হাজারো সর্দারপুত্র রয়েছে যারা বিকৃত ও বেকারগ্রস্থ হয়েছে তার বাহবার না থাকার কারণে। বংশীয় সম্পদ কষ্ট ছাড়া হাতে পাওয়া কারণে খারাপ লোকদের সাথে মিশে, খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে ধন-সম্পদ নষ্ট করেছে, জমাজমিও ক্ষয় করেছে, এবং বংশ ও বংশীয় মর্যাদাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। এমন অনেক সর্দার পুত্র রয়েছে। কিন্তু আমাদের খানবাহাদুর এমন ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে বাড়ির সর্দারী হাতে ছিল,

তার উপর কেউ হাত পোড়ানেওয়ালা ছিল না। কিন্তু তিনি সুস্থ তবিয়তের কারণে কোন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হননি এবং অন্যায় কাজে জড়িয়ে পড়েননি। কোন প্রকার বিলাসিতার স্বাচ্ছন্দ্যে, কোন প্রকার অপব্যয় এবং কোন প্রকার যশ-খ্যাতি ও বাহাড়ম্বরের চক্করে জড়িয়ে যাননি। তার সহায়-সম্পদ খোয়া যায়নি বরং সংরক্ষিত হয়েছে এমনকি অনেক বাগ-বাগিচা যোগ হয়েছে।

নিঃসন্দেহে এগুলোর তার সুস্থ মনের ও সুস্থ স্বভাবের পরিচয়। তিনি নিজে নিজেই এমন রাস্তা অবলম্বন করেছেন, যা একজন নেককার সর্দার গ্রহণ করে থাকেন। এর ফলে আল্লাহ তায়ালা তাকে সম্পদের সাথে সাথে ইজ্জত-সম্মানও দান করেন। তিনি অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিল। তিনি অনেক বছর চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি প্রাদেশিক কাউন্সিলের মেম্বার ছিলেন। সর্বোচ্চ সোসাইটিত তার পদমর্যাদা ছিল, তিনি প্রদেশের উপদেষ্টা হিসেবে বড়দের মধ্যে গণ্য হতেন। অন্য কথায় তিনি সারা প্রদেশের নিকট গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছিলেন, যা সাধারনত সবার ভাগ্যে জোটে না।

## স্বচ্ছ ও সুন্দর মনের অধিকারী

আরো সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হলো এই যে, তিনি যখন স্বজাতির বিশ্বস্ত লোক ছিলেন, একই সময় সরকারেরও বিশ্বস্ত ছিলেন। বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্যতার সর্বশেষ ডিপ্লোমা, সরকারি খেতাব তাও তিনি লাভ করেন। তারপর আরো অভাবনীয় আশ্চর্যের বিষয় হলো, যখন কউম ও গভর্মেন্ট উভয়ের মাঝে মন কষাকষি ও পরস্পর মোকাবিলার ঘণ্টা বেজে গেল, তখনও তিনি একসাথে কউম (জাতি) ও গভর্নমেন্টের বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য লোক ছিলেন। অথচ অবস্থা ও প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন রকম। যারা মানুষের নিকট বিশ্বস্ত ছিল, তারা অবশ্যই সরকারের এন্টি বা বিরোধী ছিল। আর যারা সরকারের বিশ্বাসভাজন ছিল তারা জনগণের এটি ছিল। কিন্তু জনাব খান বাহাদুর সাহেবের মনের সমন্বয় এবং সততা-স্বচ্ছতা বিস্ময়কর যে তিনি ঐ লড়াই ঝগড়ার সময়ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে সরকার ও কউম উভয়ের আস্থাভাজন ছিলেন। কিভাবে থাকতে পারলেন? কিছু মানুষ দুদিকে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে মুনাফিকীর মাধ্যমে, সে যার নিকট যায় তার কথাই বলে। কিন্তু এমন বিশ্বস্ততা অস্থায়ী হয়। পরিশেষে এমন মানুষ লোকসামজে তিরষ্কার ও ভর্ৎসনার পাত্র হয়। আর খানবাহাদুর সাহেব দুটি বিরোধী পক্ষের গ্রহণযোগ্যতা অর্জই করেছেন অন্তরের স্বচ্ছতাও সততার মাধ্যমে। তিনি

সরকার ও জনগণের সামনের এমন কথা বলতেন যা তার অন্তর থেকে বের হতো। তার কথা কাজে কোন ধরনের লোভ-লালসা থাকতো না। কারো করুণার আশা করতেন না। তিনি সরকারকে তো জনগণের প্রভাবমুক্তির ভয় ও প্রভাব দেখিয়ে সরকারকে জনগণের সাথে ভালো আচরণ করার জন্য পরামর্শ দিতেন। আর জনগণকে সততার সাথে নিজের মনের কথা বলে দিতেন তাতে তিনি জনতার ঐক্য বা বিরোধিতা কোনটার পরওয়া করতেন না। যে কথাগুলো তার নিকট জনগণের কল্যাণ ও উন্নতি মনে হতো। তার ঐ সকল কথা-কাজগুলো এমন সমাধানযোগ্য ও গঠনমূলক হতো যেগুলো মানা ব্যতীত মানুষের উপায় থাকতো না। এ কারণে স্বজাতি ও সরকার উভয়ের নিকট তিনি বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য মানুষ ছিলেন। সুতরাং তিনি এ উপলক্ষে ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান অর্জনের কোন দুরভিসন্ধি ছিল না। দুনিয়াবী জাগতিক ইজ্জত-সম্মান বৃদ্ধির কোন প্রকার ইচ্ছা ছিল না। তিনি অনেক সম্পদের মালেক ছিলেন, উঁচু মানের সামাজিক ব্যক্তি ছিলেন। দুনিয়ার কোন কাজ তার কোন দিন অবনতি হয়নি– দিন দিন উন্নতি হয়েছে।

## দীনি গ্রহণযোগ্যতা

হ্যাঁ, তিনি যৌবনকালে এক মহান দৌলত লাভ করতে পেয়েছিল। সেটি হলো বুযুর্গদের সাথে উঠা বসা। তিনি তাদের মজলিসে যেতেন এবং দীনি কথাবার্তা শুনতেন। এটি তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। ইহা তার স্বচ্ছ মন ও হেদায়েতপ্রাপ্ত দিলের পরিচয়। তার ধন-সম্পদ দুনিয়া ও আখেরাতে মকবুলিয়্যাতের মাধ্যম হয়েছে এবং তার ইজ্জত-সম্মানকে আরো বৃদ্ধি করেছে। আমার স্মরণ আছে যে তিনি প্রতি সাপ্তাহের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. আমার সম্মানিত পিতার মজলিসে, হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান সাহেব রহ. মজলিসে বসা তিনি তার জীবনের অংশ বানিয়ে নিয়েছিলেন। আমাদের বাড়িতে তিনি বেশি বেশি যেতেন এবং আমার পিতার মজলিসে বসতেন এবং নসিহত ও ওয়াজ শুনতেন এটি তার জীবনের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। এ কথা তো সবাই জানে যে নেককারদের সাথে ওঠাবসা করে মানুষ নেককার হয়। আর বদকার সাথে উঠাবসা করে মানুষ বদকার হয়। অর্থাৎ, সৎ সঙ্গে স্বর্গ বাস, অসৎ সঙ্গ সর্বনাশ। জনাব খান বাহাদুর সাহেবের মতো সুস্থ-স্বচ্ছ মনের মানুষ যখন আল্লাহওয়ালা সৎ বান্দাদের মজলিসে যোগ দেন, তখন তার স্বচ্ছতা ও সততা আরো বহু গুণে বেড়ে যায়। আমার আরো মনে পড়ে, রমযান মাসে আমার তেলাওয়াত

শোনার জন্য দারুল উলুমের মসজিদে আসতেন এবং তারাবীর নামায পড় ঐ সমস্ত বুযুর্গদের মজলিসে বসে দীর্ঘ মহব্বত হাসিল করতেন। ফলে জাগতিক মাকবুলিয়াতের সাথে দীনি মাকবুলিয়্যাতেও অর্জন হয় বা হাসিল করেন।

## আকাবিরদের নিকট গ্রহণযোগ্যতা

আমাদের খান বাহাদুর সাহেব রহ. যেমনভাবে সরকার বা গভর্নর এবং স্বজাতির মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা ছিল তেমনিভাবে দীনি তবকা (স্তর) এবং উলামা শ্রেণীর নিকট ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিলেন। তার জীবনে এমন কিছু শিরোনাম রয়েছে যে তিনি যে স্তরের মানুষদের মধ্যে ঢুকেছেন, তাদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ফিরে এসেছেন, যা তার তবিয়ত মনোভাব, নির্ভেজাল এবং পরিষ্কার হওয়ার দলিল। গভর্নমেন্ট গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে যদি তিনি সরকারি খেতাবে ভূষিত হয়ে থাকেন, এবং জাতির গ্রহণযোগ্যতা হাসিল করে যদি তিনি কাউন্সিলের উপদেষ্টা সদস্য নির্বাচিত হতে পারেন এবং শহরবাসীর গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে যদি তিনি দেওবন্দ এলাকার চেয়ারম্যান হতে পারেন। তাহলে উলামাদের গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে তিনি দারুল উলুমের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ১৩৫৩ হিজরী থেকে ১৩৭৪ হিজরী পর্যন্ত দীর্গ একুশ বছর মেম্বার থেকে দারুল উলুমের খেদমত দীনদারী ও স্বচ্ছতার সাথে এমনভাবে সমাধান করেছেন যে, তার সকল বন্ধুবর্গ ও সমবয়স্করা তাঁর প্রতি খুশি ছিলেন। তার বড় কারণ হলো যে, তিনি সব পদক্ষেপ নিজ স্বচ্ছ অন্তর দ্বারা আন্তরিকতার সাথে করতেন।

কাউকে দেখানোর জন্য তিনি কাজ করতেন না। যার ফলে ছোট-বড় সবার নিকট তিনি প্রশংসনীয় ছিলেন। কেউ তার দ্বারা দুঃখ-কষ্ট পেতেন না, কাউকে তিনি কাঁদাতেন না। কেননা, তিনি নিজ উদ্দেশ্য পূরণে কাজ করতেন এবং কারো থেকে বদলা নেয়ার জন্য করতেন না। বরং নিয়মভিত্তিক তার অভিমত এবং কাজ সমাধান হতো। দীনি প্রতিষ্ঠানের মেম্বার এবং উলামাদের সংশ্রব ও সান্নিধ্যের পরিণামে জাগতিক উন্নতি ও সফলতার সাথে সাথে পরকালীন সফলতার সুরত প্রকাশ পেয়েছে, নামায, রোযার নিয়মানুবর্তিতা, যাকাতের হিসাব-নিকাশ, হজ আদায় করার তাওফিক, মুসলমানদেরকে চারিত্রিক এবং আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা তার থেকে দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ঘরে বসে মদীনা মুনওয়ারার গরীবদের সাহায্য করেছেন। দুবার তার ত্রাণ বা দান সামগ্রীর আমানদার আমি নিজেই হয়েছি। এবং তার ইচ্ছা

মোতাবেক তার দেয়া টাকাকে মদীনা মুনাওয়ারায় বণ্টন করেছি। সুতরাং আমাদের মরহুম রহ. এমন সুভাগ্যবানদের একজন ছিলেন যাদেরকে দুনিয়ায় সম্পদ এবং বৈধ আরাম আয়েশের সাথে সাথে আনুগত্য ও ইবাদতের তাওফিকও দেয়া হয়েছে।

## ভিন্ন ধরনের গ্রহণযোগ্যতা

আজ যদি এ শহর ও জেলাবাসী খান বাহাদুরের জন্য কাঁদে তাহলে তা তার ব্যক্তিসত্তার জন্য নয় বরং তা হবে তার গুণাবলির জন্য, যার কারণে তিনি প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে মাকবুল ও নির্ভরযোগ্য ছিলেন। তার মধ্যে আরো বড় সৌন্দর্য ছিল সরলতার, যে কারণে ছোটদের সাথে এমন ব্যবহার ও চরিত্র দেখাতেন যে ছোটরা তাকে বড় ভাবতে বাধ্য হতো। কেননা তিনি নিজেকে বড় মনে করতেন না। সমবয়স্কদের সাথে ভাইয়ের ন্যায়, বুযুর্গদের সাথে নেককার বালকের ন্যায় এবং ছোটদের সাথে দয়ালু দয়াবান বুযুর্গের ন্যায় ব্যবহার করতেন। ফলে মানুষদের মাঝে আলাদা গ্রহণযোগ্যতা ছিল। অতএব আজ শহর ও জেলাবাসী শোক পালন করছে এবং কাঁদছে ঐ সকল সুন্দর চারিত্রিক গুণাবলির কারণে। সুতরাং আজকের মাহফিল হলো ঐ শোক এবং মর্সিয়ার মাহফিল যা শহরবাসীর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ মাহফিলের আলোচ্য বিষয়ে এ বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে যে, শোক-বেদনা গোপন রাখা যায় না এবং অন্তরে তা সামলানো সম্ভব হয় না। আর চোখ কাঁদতে কাঁদতে থেমে গেলে তখন মনকে তা থেকে হালকা করার জন্য আজকের এ মাহফিলের আয়োজন। কিন্তু আমি সম্মানিত অতিথিদের খেদমতে আরয করছি, কাঁদা ও শোক এবং দুঃখ প্রকাশ করা, তাতে না আছে মুস্তাহাবতুল্য কোন লাভ, না আছে দুনিয়া ও আখেরাতের কোন উপকারিতা। যদি ক্রন্দন দ্বারা এবং শোক পারন করার দ্বারা মৃত্যু ব্যক্তি ফিরে আসত, তাহলে শত বছর পর্যন্ত কাঁদা বন্ধ হতো না। উরফির ভাষ্যমতে–

عرفی گر بگریہ میسر شدے وصال صد سال می تواں بہ تمنا گریستن

হে উরফি! যদি কাঁদার দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে পাওয়া যেত,
তাহলে আমরা শত বছর কাঁদতাম; ক্লান্ত হতাম না।

## প্রথাগত ক্রন্দন ও শোকগাথা

কাঁদা ও শোক পালন করার দ্বারা কাউকে ফিরিয়ে আনা যায় না। এ কারণে শরীয়ত, দুঃখ-চিন্তায় লিপ্ত থাকা এবং স্বাভাবিক ও সংকোচহীনভাবে শোক প্রদর্শন করাকে জাহেলী যুগের কুপ্রথা বলে আখ্যায়িত করেছেন। জাহেলী যুগে নিয়ম ছিল, যদি কোন ধনী মানুষ মারা যেত তখন সে তার বংশধরকে অসিয়ত করত যে, আমার জন্য এক বছর কাঁদার ব্যবস্থা করবে, যাতে দুনিয়াবাসী মনে করে যে, কোন বড়লোক মারা গেছে। এ কথা তো সুস্পষ্ট যে, এক বছর বা দুবছর পর্যন্তকে মন দিয়ে কাঁদবে। কেননা, তা মানুষের জন্মগত স্বভাবের বিপরীত। এ কারণে সেই যুগে কাঁদার মহিলা ভাড়া করা হতো এবং তাদের টাকা-পয়সা দিয়ে কাঁদানো হতো ও শোকগাথা গাওয়া হতো। যখন কেউ শোকগাথা এবং মাতম করানোর জন্য আসতো, তখন তারা গোল করে বসে উচ্চ আওয়াজে স্বর মিলিয়ে কান্না ও শোকগাথা শুরু করে দিতো। প্রভাব ফেলার মতো কবিতা এবং দুঃখ-চিন্তা বৃদ্ধির বাক্য দ্বারা মন গলাতো, আর লোকেরা চোখের পানি মুছে এ কথা বলে চলে যেত যে, বাস্তবে দুনিয়া তে একজন বড় মানুষ চলে গেছে, যার শোক পালন করা হচ্ছে। কিন্তু মূলত ঐ প্রথাগত কান্নার মধ্যে না ক্রন্দনরত ব্যক্তিদের মন লাগতো, না দেখনেওয়ালাদের মন লাগতো। উভয় দল কান্নার ভান ধরত এবং ভ্রাতৃত্ব ও শহরবাসীকে দেখানোর জন্য এ কাজটি করত।

ইসলাম ঐ সংকোচহীন কান্না ও শোক পালনকে নিষেধ করেছেন ঘোষণা করেছে– যে এ ধরনের কান্না ও শোক পালন দ্বারা মৃত্যু ব্যক্তি কষ্ট হয় এবং সে আযাব বা শাস্তিতে গ্রেফতার হয়।

## মৃত ব্যক্তির জন্য আরামদায়ক বস্তু পাঠানো

এ কারণে আমাদের মাহফিল এবং আমাদের পৃথক বৈঠকের আলোচ্য বিষয় লোক ও মাতম হওয়া উচিত নয় কেননা তা জাহেলী যুগের প্রথা। বরং আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত যে আমাদের পক্ষ হতে মৃত ব্যক্তি উপকার পাবে আর আমরাও তার থেকে উপকৃত হব।

শরীয়ত, মৃত ব্যক্তির উপকার পৌঁছানোর মাধ্যম হিসেবে ইসালে সাওয়াবকে নির্ধারণ করেছে। কারণ, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, অন্ধকার কবরে মৃত ব্যক্তি আশায় থাকে যে মনে হয় আমাকে কেউ স্মরণ করবে এবং আমার জন্য কিছু সাওয়াব পাঠাবে। অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে– কবরে মৃত

ব্যক্তির অবস্থা এমন হয় যেমন কোন ব্যক্তি নদীর মাঝখানে দুর্ঘটনায় পড়ে ঢেউয়ের ধাক্কা খাচ্ছে আর হাবুডুবু খাচ্ছে, তখন একটা খড়কুটাও যদিও পায়, তাহলে নিজের বাঁচার উপায় মনে করে। ঠিক তেমনিভাবে মৃত ব্যক্তি কবরে আরাম ও মুক্তি পাওয়ার খাতিরে নিজ ওয়ারিশ ও বন্ধুবান্ধব থেকে আশা করে, হায়! আমাকে যদি কেউ স্মরণ করত এবং সাওয়াব পাঠাত, তাহলে আমার কিছুটা আরাম হতো। তাই খান বাহাদুর সাহেবের হিতকামনা বা তার প্রাপ্য আদায় করা, যা আমাদের জিম্মাদারী তা এই নয় যে, তার জন্য আমরা চোখের পানি ফেলবো এবং রুমাল দ্বারা চোখ মুছতে মুছতে বাড়ি ফিরব। বরং আমাদের জিম্মাদারী হলো তার আরামের সামান পৌছানো আর তাহলে ইসালে সাওয়াব।

## সহজ ইসালে সাওয়াব

কোন ভারী কাজ নয়, যদি প্রতিটি মানুষ প্রতিদিন বা দু-তিন দিন পরপর সূরায়ে ইখলাস তিনবার পড়ে মৃত ব্যক্তিকে সাওয়াব পাঠাবে বা দোয়ায় স্মরণ করবে। সুরা ইখলাস তিনবার পড়ার সাওয়াব হাদীস শরীফে এসেছে, একবার পূর্ণ কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করার সমান সাওয়াব।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের কত সহজ করে দিয়েছেন যে, দু-মিনিটে তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করে এতটুকু সাওয়াব হাসিল হয়, যা ১০-১২ ঘণ্টা মেহনত করে পুরো কুরআন শরীফ পাঠ করলে অর্জন হতো। এ কারণে কিছু চোখের পানি ঝরানো বা কয়েকটা শোকের কথা জবান দ্বারা উচ্চারণ করা মৃত ব্যক্তির হিতকামনা নয় বরং ইসালে সওয়াব করা সত্যিকারের হিতকামনা। চাই জান দ্বারা হোক যেমন তেলাওয়াত, নামায এবং অন্যান্য ইবাদতের সাওয়াব পাঠানো। অথবা মাল দ্বারা, যেমন গরিব-মিসকীনকে ইসালে সাওয়াবের নিয়তে খানা খাওয়ানো বা কাপড় পরিধান করানো।

## মৃত ব্যক্তির ভালো গুণাবলির আলোচনা

সুতরাং আমাদের মাহফিল বা বিশেষ বৈঠকের একটা আলোচ্য বিষয়, শরীয়ত মতে এমন হওয়া উচিত যে, আমরা মৃত ব্যক্তিকে উপকার পৌছাব। আর দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় হবে যে, আমরা মৃত ব্যক্তি থেকে উপকার অর্জই করব। তার নমুনা শরীয়ত এভাবে পেশ করেছে যে–

اُذْكُرُوْا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ

নিজেদের মৃত ব্যক্তির ভাল গুণগুলো বর্ণনা কর, যাতে তাদের সুন্দর গুণাবলি আলোচনা দ্বারা একদিকে তো মৃত ব্যক্তির ভালবাসা অন্তরে সৃষ্টি হবে। ফলে ভালবাসার খাতিরে মানুষ তার জন্য ইসালে সাওয়াব করবে। অপরদিকে তার সৌন্দর্যগুলো আলোচনা দ্বারা স্বয়ং আমাদের মধ্যে তার গুণাবলি অর্জন করার আগ্রহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে। আর আমরা তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ওই মাকাম অর্জন করব যা তিনি অর্জন করে গেছেন। সুতরাং ইসলালে সাওয়াব দ্বারা আমাদের থেকে মৃত ব্যক্তি কিছু পায় আর আমরাও তার সৌন্দর্য আলোচনা করে উপকৃত হয়। এ কারণে শোক সভার আলোচ্য বিষয় শুধু কান্না ও শোক প্রকাশ হওয়া উচিত নয়। বরং খান বাহাদুর সাহেবকে উপকার পৌছানো এবং আমাদের তার থেকে উপকৃত হওয়া উভয়টাই আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

## মরহুমের রেখে যাওয়া স্মৃতি

খান বাহাদুর সাহেবের উত্তম স্মৃতি হলো এ হাই স্কুল, যা তার একক চেষ্টার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর এমন মুহূর্তে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল যখন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সবাই নিরাশ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তিনি বীরত্বপূর্ণ দৃঢ়তার সাথে নিরাশার সময় দৃঢ় পায়ে দাঁড়িয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেই ছাড়েন, যার উপকারিতা আজ হিন্দু-মুসলমান উভয়ে পাচ্ছে। মাঝে এক সময় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যে, স্কুল টিকিয়ে রাখার কোন উপয় অবশিষ্ট ছিল না। তিনি আমাদের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করলেন এবং মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতার কথা বলে দিতে বললেন। আমি তার আহ্বান পূরণে চেষ্টা করছি এবং তাতে সফলকামও হয়েছি। যে কারণে তিনি সর্বদা আনন্দ প্রকাশ করতেন। কিন্তু বাস্তবে এ প্রতিষ্ঠা তার বীরত্বপূর্ণ হিম্মতের ফসল।

তিনি নিরাশার ভিতরও স্কুল চালিয়ে নিয়েছেন। এমনকি কয়েক মাসের বেতন বাকি থাকায় নিজ পকেট থেকে হাজার রুপিয়া ব্যয় করেছেন। তবু এ মঙ্গলজনক কাজ থেকে পিছপা হননি। ইলম চালু থাকার পথ সৃষ্টি করা, তা যে কোন ধরনের ইলম হোক না কোন যদি নিয়ত ভালো থাকে, তাহলে তা কল্যাণজনক কাজ এবং সদকায়ে জারিয়া। কারণ, আমল তো আমলকারীর মৃত্যুর সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ইলম, আলেমের সাথে এবং ইলমের ব্যবস্থাকারীর সাথে সাথে বন্ধ হয় না, বরং বাকি থাকে জারি থাকে। ইলম

কোন প্রাকৃতিক বস্তু নয় যে, তা থেকে যতটুকু ব্যয় হবে ততটুকু হ্রাস পাবে বরং তা রূহানী সম্পদ যত ব্যয় ততই বৃদ্ধি পাবে।

এ জন্য মরহুম একটা সদকায়ে জারিয়া প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তা চালু রাখলে তিনি সর্বকালীন প্রতিদান ও সাওয়াব পেতে থাকবেন। তাই স্কুল জারি রাখার চেষ্টায় অংশগ্রহণ করা প্রথমত ভালো কাজে সাহায্য করা। আর দ্বিতীয়ত তাকে বাকি ও চালু রেখে স্বয়ং মরহুমকে সওয়াব পাওয়ার দায়েমী পথ বের করে দেয়া।

এ কারণে আমাদের সবার ফরজ দায়িত্ব হলো প্রতিষ্ঠানকে সুন্দররূপে পরিচালনা করে তা চালু রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা। তাতে মরহুমের আত্মা খুশি থাকবে এবং দায়িমীভাবে উপকার পেতে থাকবে। অতএব কান্না ও দুঃখ-বেদনা প্রকাশ না করে ইসালে সাওয়াব এবং সৌন্দর্য আলোচনা করা উচিত। ইহাই আমাদের ও মৃত ব্যক্তির উপকারী হবে। আর তার স্মৃতিকে চালু রাখার চিন্তা-ফিকির করা উচিত। এটি তাদের দিলকে সর্বদা জিন্দা রাখার পথ। পরিশেষে দোয়া ও প্রার্থনা যে আল্লাহ তায়ালা যেন মরহুম খানবাহাদুর সাহেবকে জান্নাতে সর্বোচ্চ স্থান ইল্লিইনে সমাসীন করেন এবং যেভাবে তিনি তাকে দুনিয়ায় কবুল করেছিলেন, তেমনিভাবে যেন আখেরাতেও কবুল করে নেন। আর তার সকল উত্তরাধিকারী এবং ওয়ারিশদার ও প্রিয়জনকে তার পদাঙ্ক অনুসরণের তাওফিক দিন। সবক ও সান্ত্বনা দান করুন। আমরা তাদের সমবেদনা জানাই ও দোয়া চাই।

# বয়ান : ১৬

## পূর্ণাঙ্গ ধর্ম

দারুল উলুম দেওবন্দের ফারেগীনগণ একই সাথে মুহাদ্দিস, মুফাসসির, দার্শনিক, মুবাল্লিগ ও সুফী। আল্লাহ তায়ালা দারুল উলুমকে এমন সমন্বয়কারী ও কেন্দ্রের মর্যাদা দান করেছেন যে, তার ফারেগীনরা পৃথিবীর সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন এবং দীনি খেদমত করে যাচ্ছেন। এটা ঐ সমন্বয়তা এবং কেন্দ্রীয়তা, যার উপর হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. দেশের প্রতিটি স্তরকে একীভূত করেছিলেন।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ. وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. اَرْسَلَهُ اللّٰهُ اِلٰى كَآفَّةٍ لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا•

اَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ•

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا•

## পূর্ণাঙ্গ ধর্ম

আয়াতে ইসলাম ধর্মকে জামে বা সমন্বয়কারী ধর্ম বলা হয়েছে। ইহুদী, নাসারাদের বিভিন্ন অংশকে পেশ করে এ কথা সুস্পষ্ট করা হয়েছে যে ইসলামকে পূর্ববর্তী সকল আসমানি দীন ও মিল্লাতের জামে বা সমন্বয়কারী বানানো হয়েছে। হযরত মূসা আ.-এর ধর্মে যেখানে কঠোরতা আছে, সেখানে হযরত ঈসা আ.-এর শরীয়তে নমনীয়তা ও উদারতা রয়েছে। হযরত মূসা আ.-এর শরীয়তে যদি হুকুম থাকতো, যদি কেউ তোমাকে একটা থাপ্পর মারে, তা হলে তুমিও একটা থাপ্পর মেরে দাও। আর হযরত ঈসা আ.-এর শরীয়তে এমন হুকুম থাকতে যে, তোমার গালে যদি কেউ চড় কষে, তাহলে তোমার অপর গালটি এগিয়ে দাও। আর আমাদের দীনে ইসলামে কঠোরতাও নেই, নমনীয়তাও নেই বরং মাঝামাঝি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

খারাপের বদলা খারাপ দ্বারা তবে যতটুকু।

এ বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা অন্য আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে যে, যদি তোমার একটা চোখ নষ্ট করে দেয়, তাহলে তুমিও তার একটা চোখ নষ্ট করে ফেল। আর যদি তোমার নাকে একটা ঘুষি মারে তাহলে তুমিও তার নাকে ঘুষি মেরে দাও। কেউ যদি তোমার একটা দাঁত ভেঙ্গে ফেলে, তাহলে তুমিও তার একটা দাঁত ভেঙ্গে ফেল। কিন্তু তার সাথে সাথে ক্ষমার করা অনুমতি আছে। সুতরাং ইসলাম ধর্মে প্রতিশোধ নেবার বিধানও আছে আবার ক্ষমা করারও বিধান আছে। এমনিভাবে ইসলাম হযরত মুসা আ.-এর শরীয়ত এসে গেছে এবং হযরত ঈসা আ.-এর শরীয়তও এসে গেছে। বিভিন্ন ঘটনাবলি এবং কুরআন ও হাদীসের হাওলাদা দিয়ে উক্ত অংশটিকে সুস্পষ্ট করে বলেছেন, ইসলাম পূর্ব বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন শরীয়ত চালু ছিল এবং তাদের পরস্পর মতভেদ ও শত্রুতার সাগর দিন দিন বাড়তে ছিল। ইসলাম এসে মতভেদ ও শত্রুতার সাগরকে বন্ধ করে দেয় এবং একতা ও সমতা সৃষ্টি করেন এবং পৃথিবীর সকল জনগোষ্ঠীকে এক শরীয়তে একীভূত করেন।

## দলভিত্তিক সমন্বয়

এমনিভাবে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রহ. হিন্দুস্তানের সকল ধর্মীয় দলগুলোকে বিভিন্ন স্তরগুলো যেমন উমারাগণ, সুফীগণ, সুলতানগণ, উজীরগণ, মোটকথা দেশের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সকল বিক্ষিপ্ত তবকাকে একত্র করার চেষ্টা করেন। চিঠি পাঠিয়ে ফরমান জারি করে মিল্লাতের সকল দল ও স্তরকে একই শ্রেণীতে একত্র করেন।

## দারুল উলুমের সমন্বয়ের অবস্থা

দারুল উলুমকে তার সর্বোচ্চ উত্তরাধিকারী হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী রহ.-এর পদ্ধতি মোতাবেক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার পূর্বে হিন্দুস্তানের আহলে ইলমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল। কেউ মুতাকাল্লিম (দার্শনিক), কেউ মানতেকি (তর্কবিদ), কেউ আহলে হাদীস, কেউ আহলে কুরআন এবং কেউ ফেলোসফি ছিলেন। কিন্তু দারুল উলুমের আকাবিরগণ তাদের মধ্যবর্তী এমন একটি পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করে

জারি করেন, যার দ্বারা দেশের সকল দল ও স্তরের মধ্যে একতা সৃষ্টি হয়। দারুল উলুম দেওবন্দ লাখ লাখ মুহাদ্দিস সৃষ্টি করেছেন, লাখ লাখ মুফাসসিরে কুরআন তৈরি করেছেন, দার্শনিক তৈরি করেছেন, যারা দীন ও ইসলামের সত্যতা এবং ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসার সারা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে দিয়েছেন। দারুল উলুম দেওবন্দের ফারেগীনগণ একই সাথে মুহাদ্দিস, মুফাসসির, দার্শনিক, মুবাল্লিগ ও সুফী। আল্লাহ তায়ালা দারুল উলুমকে এমন সমন্বয়কারী ও কেন্দ্রের মর্যাদা দান করেছেন যে, তার ফারেগীনরা পৃথিবীর সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন এবং দীনি খেদমত করে যাচ্ছেন। এটা ঐ সমন্বয়তা এবং কেন্দ্রীয়তা, যার উপর হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. দেশের প্রতিটি স্তরকে একীভূত করেছিলেন।

## বেফাকুল মাদারিস

দারুল উলুম দেওবন্দের শর্তবর্ষ পালন অনুষ্ঠানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী এবং কার্যকরী প্রস্তাবনা অনুমোদন করেন। সেই প্রস্তাবনার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল বেফাকুল মাদারিস। এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুস্তানের সকল মাদরাসা ও মক্তব্যগুলোকে এ কেন্দ্রের অধীনে একত্র করা। যদি হিন্দুস্তানের সকল মাদরাসা একটি কেন্দ্রের একীভূত হয়ে যায়, তাহলে তার উপকার উভয়ের দেশের সকল মাদরাসার এবং স্বয়ং দারুল উলুমের ও। সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মাদরাসাসমূহের খেদমত সম্পর্কে দারুল উলুম অবগত থাকবে। ঐ সকল মাদরাসা হতে ফারেগ এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত উলামাদের সুনাম ও বদনাম এবং খেদমত সভা উভয়টাই প্রকাশ হবে। আর অন্যান্য মাদরাসাগুলো নিজেদের মার্কায দারুল উলুম দেওবন্দের খেদমত, অবস্থা এবং কারগুজারি সম্পর্কে অবগত হতে পারবে। তাই বেফাকুল মাদারিসের প্রস্তাব এমন একটি যুগান্তকারী প্রস্তাব, যা বাস্তবায়িত হওয়ার পর মাদরাসাগুলো থেকে ফারেগ হওয়া ছাত্রদের মধ্যে একতা কায়েম হবে। ছাত্রদের তানজীম, এটি একক কোন উদ্দেশ্য নয়, তার প্রতি পুরোপুরি গুরুত্ব দেয়া জরুরি। বরং তার মূল হলো বেফাকুল মাদারিস ও তানযীমে মাদারিস যদি হিন্দুস্তানের সকল মাদরাসা ও মক্তবগুলো সুশৃঙ্খলা হয়ে একই মার্কাযে জড়িত হয়ে যায়, তাহলে ছাত্রদের তানযীম আপনাআপনি কায়েম হয়ে যাবে। কারণ, ঐ মাদরাসা-মক্তবগুলোর অধিকাংশ পরিচালক ও শিক্ষক দারুল উলুম দেওবন্দের ফারেগ।

# ইলম ও হিকমতের উপকারিতা

[কতগুলো ইলমী প্রশ্নের উত্তরের ধারাবাহিকতায় হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ করেন]

## নিয়ত ভালো হলেই হারাম জিনিস হালাল হয়ে যায় না

কোন এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, যদি কোন জাতি-গোষ্ঠী নিজ গোষ্ঠীর উপকারার্থে কিছু টাকার ফান্ড যোগাড় করে, উদাহরণস্বরূপ ১ লাখ বা দুই লাখ; তারপর তাদের এ কথা বুঝে এল যে, এ টাকাগুলো আমরা ব্যবসায়ীদের কর্জ হিসেবে দিব। তারা যেহেতু ব্যাংক থেকে সুদী ঋণ গ্রহণ করে, তাহলে আমরা কেন তাদের থেকে সুদ নিব না। তাতে ফান্ড ঠিক থাকবে এবং উত্তরোত্তর উন্নতি হবে। এতে জাতির উপকার বেশি হবে। তাই জাতির প্রতি এমন দরদ ইসলামী শরীয়তে জায়েয কিনা।

হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. বললেন, সুদের মাসয়ালা তো সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য, এটি তো কোন ইজতেহাদী শাখা মাসয়ালা নয়। আল্লাহ বলেন–

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল ও সুদকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন।

সুদ যে কোন প্রক্রিয়ায় হোক তা হারামই থাকবে। আর সহমর্মিতা যদি হারাম পন্থায় হয়, তাহলে তাতে ভিন্ন ধরনের মসিবত সৃষ্টি হবে, দুনিয়াতে এবং আখেরাতেও। কোন আমলের জন্য শুধু সুন্দর নিয়তই যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ না সে আমল শরীয়তসম্মত হয়। ভাল নিয়তে কেউ যদি গোনাহের কাজ করে, তাহলে তা নেক কাজে রূপান্তরিত হবে না এবং এমন নিয়তের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। দুটি বিষয়ের একটি হলো ব্যবসা আর অপরটি হলো সুদ। সুদ হারাম আর ব্যবসা হালাল। এ অবস্থায় ব্যবসার স্থলে সুদ গ্রহণ করলে প্রকাশ্য হারামে লিপ্ত হওয়া হবে, এতে নিজেও পাপে লিপ্ত হল এবং জাতিকেও পাপে জড়াল। উক্ত ফান্ডের টাকা কোন ব্যবসার কাজে লাগালেই তো হয়। সবার পক্ষ থেকে একজন উকিল হয়ে সবার পক্ষ হতে লাভ ও

লোকসানে অংশীদার থেকে ব্যবসা করবে। আর লভ্যাংশ দ্বারা জাতির খেদমত করবে এবং ফান্ডের মূলধন টিকে থাকবে। শুধু মূলধন স্থিতিকরণের জন্য কোন হারাম প্রক্রিয়া অবলম্বন করা কোনমতেই উচিত হবে না। ফলে মূলধনও হারাম হয়ে যাবে। এতে জাতির কোন উপকার হবে না বরং ক্ষতি হবে।

আমার বুঝে আসে না, যে সকল মুসলমান কুরআনের উপর ঈমান রাখে, তারা শুধু মানুষের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনের জন্য কিভাবে কুরআনের প্রকাশ্য বিরোধিতা করে। আজ ইউরোপীয়রা যে সুদ নিচ্ছে ও দিচ্ছে তাদের মধ্যে স্বজাতির দরদ রয়েছে যে, এতে স্বজাতির উপকার হবে। কিন্তু তারা তো শরীয়তের মুকাল্লাফ নয়। কিন্তু যারা শরীয়তের মুকাল্লাফ এবং তার উপর ঈমানও আছে আবার জানেও সুদ নেয়া দেয়া উভয়টাই ক্ষতিকর। তারপর জেনে শুনে কোন কাজ করা এবং তার উপর ভরসাও ফেলা এই বুঝে যে আমরা তো তা ভালো নিয়তে করেছি এমনটি অত্যন্ত গর্হিত ও অনুচিৎ কাজ। আর এটা কউমের সাথে হামদর্দীর আড়ালে তাদের দুশমনি করা হয়, দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও।

## শরয়ী কাজেই ভাল নিয়ত গ্রহণযোগ্য

কোন আমলের জন্য শুধু নিয়ত ভাল হওয়ায় যথেষ্ট নয়। নেক নিয়তে যদি কেউ চার রাকাত নামাযকে ছয় রাকাত পড়ে এ নিয়তে যে নামায তো ভালো জিনিস, তাহলে আসল চার রাকাতই আদায় হবে না তা নামাযীর মুখে নিক্ষেপ করা হবে। সুতরাং যে আমলে ভালো নিয়ত জরুরি সে আমলও ভাল হওয়া জরুরি। ভালো আমল বা আমলে সালেহ বলা হয় এমন আমলকে, যাতে ইখলাস নিষ্ঠা এবং ভালো নিয়তের সাথে সাথে আমল শরীয়ত সিদ্ধ হতে হবে।

এ কারণে সূরা মুলকে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ۡ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ ۙ الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

বরকতময় তিনি, যার হাতে দুনিয়া ও আখেরাতের রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর শক্তিমান। তিনি ঐ সত্তা, যিনি সৃষ্টি করছেন জীবন ও মরণ, যাতে তোমাদের পরীক্ষা

করেন কে তোমাদের মধ্যে আমলে শ্রেষ্ঠ। তিনি কাউকে অস্তিত্ব দান করেন, কাউকে অস্তিত্বহীন করেন। কাউকে জীবিত করেন, কাউকে মারেন। তার হাতেই সবকিছু।

পৃথিবীতে এ পরিবর্তন মৃত্যু, জীবন, নেয়ামত, নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া ইত্যাদি কেন রাখলেন?

তার কারণ বললেন–

لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

যাতে আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা করেন, তোমরা ভালো আমল কর, না খারাপ।

যখন তোমারা তার রাজত্বে বসবাস কর, তার শাসনের অধীনে তার শক্তি বেষ্টনে থাক। তো তোমরা কি তার হুকুমের আনুগত্য কর না না কর। এটি জানার জন্যই পৃথিবীতে এ পরিবর্তন রাখা হয়েছে, যাতে তোমাদের ঈমানের পরীক্ষা হয় এবং দেখেন তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমলকারী কে।

## আমলে সালেহের দুটি বুনিয়াদ

সালেহ বলা হয় এমন আমলকে যা পূর্ণ ইখলাসের সাথে সাথে শুধু আল্লাহ তায়ালার রাজি খুশির জন্য হয় এবং যাতে সৃষ্টি জীবের ও নিজের রেজা-খুশি থাকে না। যদি মাখলুকের রেজা-খুশির সামান্যতম সন্দেহের লেশ থাকে, তাহলে তাকে শিরকের মধ্যে গণ্য করা হয়। আর প্রকাশ্যভাবে তা নির্ভরযোগ্য সনদ দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে। অর্থাৎ হাদীসের মোতাবেক হতে হবে এবং সঠিকভাবে হবে। অর্থাৎ শরীয়ত যে পদ্ধতি বাতলে দিয়েছে, সেই পদ্ধতিতে আদায় করতে হবে। এতে বের হয় যে, আমলে সালেহের বুনিয়াদ হলো দুটি– ১. ইখলাস লিল্লাহ, ২. ইত্তেবায়ে সুন্নত।

ইখলাস লিল্লাহের অর্থ যা কালিমা তায়েবা বর্ণনা করছে। لا اله الا الله আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনিই সত্য বা অধিকারী। তার হুকুম পালন করার উপযুক্ত এবং তার রেজা অনুযায়ী চললে মুক্তি পাওয়া যাবে। এ কালিমার দ্বিতীয় অংশ হলো محمد رسول الله এ অংশ থেকে বের হয় আমলে সালেহ দ্বিতয়ি বুনিয়াদ ইত্তেবায়ে সুন্নত। কেননা, সঠিক পদ্ধতি হলো ওই পদ্ধতি, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতেনাতে করে দেখিয়েছেন অথবা যা সাহাবাদের আমল ছিল

মোটকথা, যে আমলের ভিতর পুরোপুরিভাবে لا اله الا الله محمد رسول الله পাওয়া যাবে, তা-ই আমলে সালেহ। আমরা যা বুঝি তাকে আমলে সালেহ বলে না। যে অমুকে অনেক বড় ভালো কাজ করেছে, জনকল্যাণমূলক কাজ করেছে, অনেক উত্তম কাজ করেছে ইত্যাদিকে আমলে সালেহ বলবে না। শুধু আমাদের বোঝার দ্বারা এবং শুধু আমাদের বলার দ্বারা আমলে সালেহ হবে না। যদি কেউ এমন বুঝে থাকে, তাহলে বড় ভুলে লিপ্ত আছে। বরং আমলে সালেহ গঠিত হয় দুটি বুনিয়াদ দ্বারা। একটি হলো ইখলাস লিল্লাহ আর অপরটি হলো ইত্তেবায়ে সুন্নাত। অর্থাৎ যে কাজে ইখলাস থাকবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাত মোতাবেক হবে, তা-ই আমলে সালেহ বা নেক কাজ।

## শিরক ও বিদয়াতের বুনিয়াদ

ইখলাসে কমতি সৃষ্টি হলে অর্থাৎ কোন কাজে আল্লাহর রেজামন্দির সাথে সামান্য পরিমাণ মাখলুকের রেজামন্দি শামিল হলে অথবা নিজ আত্মার রেজা মিশ্রিত হলে ওই কাজ আল্লাহর জন্য খালেস হয় না। এ কারণে ইখলাসের মধ্যে যত পরিমাণ গায়রুল্লাহর রেজামন্দি শামিল হবে, তত পরিমাণ শিরকের বুনিয়াদ বৃদ্ধি পাবে এবং তা শিরক ফিল আমল (কাজের মধ্যে আল্লাহর শরিক বানান) হবে। مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ الله অংশের অর্থ হলো ইত্তেবা হবে শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। ইত্তেবাতে যত পরমাণ কমতি দেখা দিবে, তত পরিমাণ বিদয়াতের বুনিয়াদ বৃদ্ধি হবে, যা শিরক পর্যন্ত গড়ায়। তাই দীনের ইসলাহের বুনিয়াদ দুটি– ১. ইখলাস ২. ইত্তেবায়ে সুন্নাত। দীনের ফাসাদের বুনিয়াদও দুটি– ১. শিরক, ২. বিদয়াত। لَا اِلٰهَ اِلَّا الله মধ্যে কমতি হলে শিরক সৃষ্টি হয় আর مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ الله মধ্যে কমতি হলে রিদয়াতের সৃষ্টি হয়।

এখন প্রতিটির কাজ হলো, সে তার প্রতিটি কাজের প্রতি গভীর নযর দিবে যে, আমি যা করছি তাতে কি কালিমা তায়্যেবার পুরোপুরি শামিল কিনা। যদি হয় মাশাআল্লাহ তা আমলে সালেহ বা নেক কাজ। যদি না থাকে, তাহলে তাও আমলে সালেহ। তবে উভয়ের মাঝে বিশদ পরখ রয়েছে। এক তো প্রকাশ্য বিষয়, যাকে শরীয়ত প্রকাশ্যভাবে নিষেধ করেছে। এমন বিষয়কে যদি বৈধ করার চিন্তা করা হয়, তাহলে তার অর্থ হয় যে, সে তো ইখলাসকে

প্রথমেই নষ্ট করে ফেলল। এ কাজ এখন আল্লাহর রেজামন্দির জন্য রয়নি। সাথে সাথে ইত্তেবায়ে সুন্নাতকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় করে দিল, এতে রিসালাতের পাবন্দী হয়নি। তাহলে এমন কাজে বরকত কোথায় থেকে হবে?

তা দ্বারা যতই প্রভাব সৃষ্টি হোক তা সবই নাপাক ও দুর্গন্ধযুক্ত হবে। কেননা, পাকস্থলি হলো দেহের হাউজ। তার পানি গান্ধা হলে দেহের প্রতিটি অঙ্গ দুর্গন্ধ পৌছে যাবে। আর তাতে পবিত্র জিনিস প্রবেশ করালে, প্রতিটি অঙ্গে পবিত্র বস্তুই পৌছবে এবং ঈমানী সুঘ্রাণ সৃষ্টি হবে। হাদীস শরীফে এসেছে, যখন মৃত্যু নিকটবর্তী হয় এবং ফেরেশতা রূহ কবজ করতে আসে, তখন ফেরেশতা সেই ব্যক্তির হাত-পা ও মুখে নাক দ্বারা ঘ্রাণ নেন এবং দেখেন তার মধ্যে কতটুকু ঈমান আছে। অন্তরের ঈমান হাত-পায়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং আমলের আকৃতিতে প্রকাশ পায়। ফেরেশতা পরিমাপ করতে পারে, তার হাত-পায়ে ঈমানের কি পরিমাণ সুঘ্রাণ আছে।

শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট দুটি বস্তুর পরীক্ষা হবে। একটা হলো প্রতিটি আমলে ঈমানের দখল ছিল কিনা। দ্বিতীয় হলে প্রতি আমলে ইত্তেবার দখল ছিল কিনা। ঈমানে কমতি হলে শিরক সৃষ্টি হবে। আর ইত্তেবায় কমতি হলে বিদয়াত সৃষ্টি হবে। আর দুটি বস্তুই দীনকে নষ্ট করে। মানুষ যদি কউমের হামদর্দী করে তাহলে সে প্রথমেই দীন ধন্যবাদ জানায়। এমন হামদর্দী দ্বারা কি হবে। নিজের হামদর্দী হবে না কউমেরও হবে না।

## জাতির চরিত্র হেফাজত করা

কউমের হামদর্দীর নামে আমরা কউমকে নাপাক হারাম খাদ্য পৌছলাম। সমস্ত কওমের চরিত্র বিকৃত করা এবং খারাপ চরিত্র কওমের মধ্যে সৃষ্টি করা এটা কোন ধরনের হামদর্দী। সুতরাং নিয়ত তো ভালো যে লাখ দুই লাখ রুপিয়া জমা করেছি কওমের সেবা করার জন্য। কিন্তু এ জমার ভিতর দীন তো শরীক থাকতে হবে। যাতে কওমের ভিতর খারাপ চরিত্র সৃষ্টি না হয় এবং তাদের থেকে খারাপ কাজ সংঘটিত না হয়। যদি তাদের খাবার হালাল ও শুদ্ধ হয়, তাহলে চরিত্র বিশুদ্ধ হবে। খাবার নাপাক হলে চরিত্রও নাপাক হবে। এ কারণে আমাদের আকাবিরদের দেখেছি, তারা বাইয়াত করার সময় প্রথমে জিজ্ঞেস করতেন, তোমার নিকট কারো অংশের জমি তো নেই? সুদ ও হারাম টাকা-পয়সা তো নেই, যা তুমি আহার কর? প্রথমে তা থেকে তওবা কর। তারপর বাইয়াত করব। কেননা, খাবার সন্দেহযুক্ত হলে যিকরুল্লাহ

তোমার ভিতর কী প্রভাব ফেলবে। যদি আল্লাহর নাম নাও, তাহলে তাছির হবে না। আল্লাহর নাম যেমন পবিত্র তেমন পবিত্র পাত্রকে চায়। নাপাক পাত্রে পবিত্র জিনিস ভরা যায় না। এতে পবিত্র বস্তু নাপাক হয়ে যায়। তাই হালাল খাবারের নির্ভরশীল হলো আকলাকে হাসানাহ্ বা উত্তম চরিত্র।

## চরিত্রের অন্ধকার

ইসলাম হালালের প্রতি জোর তাকিদ দিয়েছে। এ কারণে যে-সকল জিনিস ও খাবারে হারাম সৃষ্টি হয়, কোন অবৈধ সুরত সৃষ্টি হয়। সেই সকল বস্তুকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। সুদকে হারাম করেছে। ইহতেকার বা গুদামজাত করাকে হারাম স্বীকৃতি দিয়েছে। ইহতেকার বলা হয়, বেশি মূল্যের আশায় কোন সম্পদকে গুদামজাত করা এবং সৃষ্টিজীবকে অপারগ করে অবৈধ ফায়দা হাসিল করা। এতে সৃষ্টিজীবের কষ্ট হয়। জনগণের প্রয়োজন থাকার সত্ত্বেও নিজের উপকারার্থে মাল আটকে রাখা। এ সকল জিনিস ও পদ্ধতি অকাট্য হারাম ও মারাত্মক খারাপ। কিন্তু এমন সকল বস্তুকেও শরীয়ত হারাম স্বীকৃতি দিয়েছে, যা দ্বারা সম্পদে কোন প্রকার সন্দেহ সৃষ্টি হয়, হারামের হুকুম লাগে অথবা কোন অপছন্দতা সৃষ্টি হয়।

এ সবকিছুর উদ্দেশ্য হলো, মুসলিম সৃষ্টি হয়েছে দুনিয়ায় নিজের আখেরাত তৈরির জন্য। দুনিয়া হলো আখেরাতের মাধ্যম। মাধ্যমে গান্ধা হলে আসলও গান্ধা হবে। মাধ্যম পাক হলে আসলও পাক হবে। আসল মাকসাদ হলো আখেরাত। দুনিয়া হলো আখেরাতের মাধ্যম। তার জন্য নিয়ম-বিধান বানিয়ে দিয়েছেন হালাল পন্থায় উপার্জন, হালাল পন্থায় ব্যয়। নাজায়েয ও হারাম, মাকরূহ ও সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে বেঁচে থাকা। না বাঁচার সুরতে শুধু বরকত হবে না তা নয় বরং বরকত না হওয়ার সাথে সাথে অন্ধকারও হবে। আর নাপাকের চিহ্ন প্রকাশ হবে আমলে ও চরিত্রে।

## জাতির সেবা বৈধ পন্থায় হওয়া উচিত

আমরা যদি জাতির সেবা করি এবং তাদের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করি। কম করে হলেও মাকরূহ বস্তু প্রবেশ করাই অথবা প্রকাশ্য বস্তু মাল প্রবেশ করাই, তাহলে তা দ্বারা তো বরকত হবে না। বরং নিজেও নাপাকির মধ্যে লিপ্ত হলাম আবার জাতির অন্তরকে নাপাক করলাম, তাদের অন্তরে নাপাক প্রবেশের কারণ হলাম। এতে আমার অন্তরে খায়ের বরকত সৃষ্টি হবে না,

তাদের অন্তরেও না। এ কারণে এ নিয়ত তো খুব নিয়ত যে জাতির সেবার জন্য সম্পদ জমা করা।

মূলধন সংরক্ষণের জন্য কোন বৈধ প্রক্রিয়া গ্রহণ করলেই তো হয়। মুদারাবার সুরত গ্রহণ করলে চলে। কয়েকজন টাকাগুলো নিজ ব্যবস্থায় লাগিয়ে নিবে এবং পরিমাণমত টাকা আদায় করতে থাকবে। ফলে মূলধনও ঠিক থাকবে, লাভ আসতে থাকবে আবার আস্তে আস্তে উন্নতিও হতে থাকবে। পরিশেষে এর কি অর্থ হতে পারে যে, মুসলমান সম্পদ উপার্জন করবে আর তার দিল, তবিয়ত হারাম ও মাকরু হাতের দিকে কেন যাবে? যখন তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তাদের তবিয়ত ও স্বভাবের চাহিদা তো এমন হওয়া উচিত যে, সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকেও বেঁচে থাকবে এবং হারাম ও অবৈধ বস্তুর নিকটেও যাবে না। তাতে নিজেরও উপকার হবে এবং অন্যদেরও উপকার হবে। সাহেব! আমার বুঝে আসছে না যে, জাতির সেবা করবে সুদের টাকা দ্বারা। যদি কোন ইজতিহাদী বা শাখা-প্রশাখাগত বস্তু হতো, তাহলে কিছু একটা বিহিত করা যেত। কিন্তু একটা অকাট্য হারাম বস্তু দ্বারা উপকার লাভ করবে এমন পদ্ধতি কোনভাবেই উচিত হতে পারে না।

## হারাম বস্তুতে নিরাময় নেই

ওষুধ ও রোগনিরাময় সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

আল্লাহ তায়ালা হারাম ওষুধে তোমাদের জন্য নিরাময় রাখেননি।

মদ, জুয়া ও হাউজি ইত্যাদিতে নিরাময় নেই। প্রকাশ্যভাবে নিরাময় হবে হয়তো; কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে এমন রোগ হবে যে, সারা দেহ পচে যাবে। তারপর পুরোপুরি রোগী হয়ে যাবে। যখন সত্তাগত রোগের চিকিৎসা হারাম দ্বারা হয় না, তাহলে রূহানী রোগের চিকিৎসা হারাম দ্বারা কিভাবে হবে। হারম তো হারাম, আবার অকাট্য ও প্রকাশ্য হারাম। এ কারণে প্রশ্নই আসতে পারে না যে, নেক নিয়ত, নেক আগ্রহ ইত্যাদি। তারপরও যদি জাতির সেবা করতে হয়, তাহলে পূর্ণ শরয়ী মোতাবেক পরিচালিত হবে এমন কোন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে সেবা করা যেতে পারে।

## পরিবর্তিত প্রক্রিয়া

এ এক লাখ দেড় লাখ রুপির মূলধন হেফাজতের জন্য এমন করা যেতে পারে যে, কিছুটা পরিবর্তন করে তা হালালের ভিতর আনা যায়, যাতে হারাম থেকে বাঁচা যায়।

মুসলমানদের কাজ হলো, মুয়ামালাহ করবে, আনুগত্য করবে, ইবাদত করবে, এগুলোর হারাম সুরত থেকে বেঁচে হালাল সুরত গ্রহণ করবে। এমনটিই ইসলাম শব্দের অর্থ। অন্যথায় মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। তারাও সুদখোর, তোমরাও সুদখোর। ওরাও হারামখোর, তোমরাও হারামখোর। তো আমি তোমাদের হারামখোর বানাতে চাই না আবার হালালখোর বানাতেও চাই না। তবে এটা জেনে রাখ যে, মানুষ হালাল খাবারের উপর থাকবে। তাই তোমাদের আহ্বান জানাই যেহেতু তোমাদের নিয়ত ভাল নিয়ত, আবেগও ভালো, জাতির সেবা মোবারক কাজ, তাহলে তোমাদের পদ্ধতিতে কিছুটা পরিবর্তন করে তা জায়য পদ্ধতিতে নিয়ে আস। কেন হারাম পদ্ধতি অবলম্বন করে জাতির আত্মাগুলোকে পচাবে এবং নিজেরাও পচবে। আর পরকালের ধরপাকড় তো ভিন্ন কথা। কোন শরয়ী ব্যাংক করে নাও। অথবা অন্য কোন প্রক্রিয়া বের করে নিজেদের ব্যবসায় লাগিয়ে দাও। অথবা কোন কোম্পানিতে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে অংশীদার হয়ে যাও। তারপর লাভের অংশ জনসাধারণের সেবায় ব্যয় কর। এতে মূলধনও ঠিক থাকবে আবার দিন-দিন উন্নতিও হতে থাকবে। তারপরও আমার বুঝে আসছে না যে তারা কেন এমন করছে, তাদের ইসলাম কেমন ইসলাম যা তাদের এমন কাজে উৎসাহ দেয়।

## স্বশিক্ষা গ্রহণযোগ্য নয়

প্রশ্ন : জনাব! বলা হয়ে থাকে اضعافا مضاعفة দ্বারা রিবা (সুদ) উদ্দেশ্য। শুধু রিবা হারাম নয়। তিনি বলেন, এ কথা কোন আলেম বলেছেন, না কোন ব্যবসায়ী। প্রশ্নকারী বললেন, জনাব! এ কথা ডাক্তার ফজলুর রহমান বলেছেন। মানুষ তা পত্রিকায় দেখে তাকে বাহানা বানাচ্ছে। হযরত বললেন, পত্রিকায় তো অনেক বিষয় আসতে থাকে। তাতে হকপন্থীরাও লিখে, বাতেলপন্থীরাও লেখে। তাবীলকারীরাও লেখে এবং মিথ্যাবাদীরাও লেখে। এগুলো থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সত্য ও সঠিকটি বের করা তো দীনদার আলেমর কাজ। আর ব্যবসায়ী যে পয়সা উপার্জনের অভিযোগে অভিযুক্ত তার

কথার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। সে তো ব্যবসাসংক্রান্ত বিষয়ে হিলা তালাশ করবে যে, তার লাভ যেন হাতছাড়া না হয়, সে তো জায়েয ও নাজায়েযের পরওয়া করবে না। এ ব্যাপারে ফতওয়া নিতে হবে দীনদার উলামাদের থেকে। যাদের দীন ও দীনদারের ব্যাপারে দেশ ও জাতির নির্ভরতা রয়েছে এবং তাদের ইলম সনদযুক্ত উস্তাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত। মুতালায়ার শক্তি দ্বারা যে ইলম অর্জই হয় তার ঈমান নিজ আতগ্মা। তার নাফস যা চায় তাই করে। যেহেতু তার নাফস তাহজীবপ্রাপ্ত নয় তাই তার ইলম গ্রহণযোগ্য নয় যে অমুক উকিল সাহেব এ বলেছেন, অমুক ডাক্তার সাহেব এ বলেছেন, অমুক মিনিস্টার সাহেব এ বলেছেন। সুতরাং যার নামের শেষে 'টার' হবে, তার কথা মানা যাবে না। কোন দীনদার আলেম যদি বলে অথবা ফতওয়া দেয় অথবা কোন নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে ফতওয়া দেয়, তাহলে তা নির্দ্বিধায় মানতে পারেন। আর অমুকে বলেছে অথবা সে বলেছে এগুলো গ্রহণযোগ্য কথা নয়।

## মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে সুদী লেনদেন

ডাক্তার ফজলুর রহমান, তাহকীকাতে ইসলামীয়্যা, ইসলামাবাদ পাকিস্তানের একজন নির্ভনযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। সে মাসিক 'নযর ও ফিকির' পত্রিকায় নতুন নতুন ইজতেহাদী কলি ছাড়ছিলেন। করাচীর হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ. লিখিতভাবে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তার কথাগুলোর উত্তর দিয়েছেন। পরিশেষে তাকে ঐ প্রতিষ্ঠান থেকে বরখাস্ত করা হয়। ফলে জাতি তার নবউদ্ভাবিত চিন্তা-ফিকির থেকে জাতি মুক্তি পায়।

প্রশ্ন : একজন প্রশ্ন করল, জনাব! 'মুসলিম ও হারবীর মাঝে কোনো সুদ নেই।' এ হাদীস দ্বারা মুসলিম এবং হরবীর মাঝে সুদী লেনদেন হতে পারে?

তিনি বললেন, এ হাদীসটি কোথায় আছে? আর এ হাদীসের সাথে আরো অন্য একটি হাদীস আছে, তা আপনার সামনে নেই। স্বয়ং ইমামদের মাঝে এটি ইখতেলাফযুক্ত মাসয়ালা। অকাট্য কথা হলো, সুদ কোন অবস্থায়ই বৈধ নয়। এখন আপনি যা বলেছেন, এ কথা দ্বারা এ উদ্দেশ্য নয় যে সুদ জাযেয। বরং তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তা সুদই হয় না। দারুল হরবে মুসলিম ও কাফেরদের মাঝে লেনদেনের ভিন্ন বিধান রয়েছে। তবে তাতে শর্ত রয়েছে যে, যুদ্ধ চালু থাকতে হবে। নিরাপদকালীন নয়। যুদ্ধ চলাকালীন উক্ত মাসয়ালা। তখন তা সুই হবে না। দারুল হরব বলা হয় যেখানে শিয়ারে

ইসলাম চালু নেই, তার মাসয়ালাও ভিন্ন। দ্বিতীয় কথা হলো, যদি দারুল হরব মেনেও নেয়া হয়, তাহলে দারুল হরবের জন্য আহকাম এখন জ্ঞাত নেই।

## দারুল হরবের আড়ালে সম্পদ সঞ্চয় করা

দারুল হরব হলে তো হিজরত করা ওয়াজিব। দেশ ছেড়ে দারুল ইসলামে যেতে হয়। এমন সাহস তো কেউ দেখায় না। যে দেশ দারুল হরব এখান থেকে হিজরত করে দারুল ইসলামে যেতে হবে এ কথার ধ্যান-খেয়াল কারো আসে না। ধ্যান গেলে যায় শুধু পয়সার দিকে। পয়সা কামানো জন্য দারুর হরবের হিলা গ্রহণ করা হয়। এটি নিরেট হিলা-বাহানা এবং পয়সা জমার বাহানা। এ দেশকে যদি দারুল হরব মানেন, তাহলে অনান্য মাসয়ালার উপর কেন আমল করেন না। উদাহরণস্বরূপ, হিজরত করা আবশ্যক, শক্তি সঞ্চয় করা আবশ্যক, যাতে দারুল হরব দারুল ইসলাম হয়ে যায়। কাফেরদের সাথে জিহাদ করুন। জিহাদের পরিবেশ তৈরি করুন, টাকা-পয়সা এখানে ব্যয় করুন। জিহাদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করুন। এ কাজের জন্য কোন সাহেব তৈরি হবেন না, কারো আগ্রহও নেই। তাই দারুল হরব শুধু এ জন্য যে, তাতে সুদী লেনদেন জায়েয হবে এবং এখন পর্যন্ত জায়েয আছে। দারুল হরব সম্পর্কিত শুধু সুদী লেনদেনের মাসয়ালাই নয় বরং তাতে হিজরত রয়েছে, জিহাদ রয়েছে, জাতীয় মুয়ামালাও আছে। এ ছাড়া আরো বিষয় দারুল হরবের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাহলে শুধু পয়সার মাসয়ালা কেন সবার আগে থাকে? এতে প্রতীয়মান হয়, এখানে শুধু পয়সার আবেগ। আর দারুল হরব মাত্র হিলা-বাহান। তারা দারুল হরবের আড়ালে সুদী ব্যবসা করে সম্পদ সঞ্চয় করতে চায়।

এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হযরত শাহ আবদুল আযীয রহ. হিন্দুস্তানকে দারুল হরব বলে ফতওয়া দিয়েছিলেন, তাহলে তার ফতওয়ার কি উত্তর হতে পারে? তার উত্তরে তিনি বলেন, এটি আমাদের আকাবিরের ফতওয়া। তিনি কি সুদী লেনদেনের ফতওয়াও দিয়েছেন যে তোমরা তাদের সাথে সুদী ব্যবসা কর? হযরত শাহ আবদুল আযীয রহ. ফতওয়া দিয়েছিলেন ঐ সময়, যখন সারা হিন্দুস্তানে ইংরেজদের পূর্ণ শাসন চলছিল। কিন্তু তিনি তো এমন ফতওয়া দেননি যে, তোমরা সুদী লেনদেন শুরু কর।

## সুদ নিয়ে চিত্তাকর্ষক বাহাস

হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ., হযরত মাওলানা শাব্বির আহমাদ উসমানি রহ., হযরত মাওলানা মুর্তাজা হাসান চাঁদপুরী রহ.– এঁরা সবাই যখন লাহোর আগমন করেন এটি ওই সময়কার কথা। তখন হযরত মাওলানা তোফায়েল আহমাদ সাহেব জীবিত ছিলেন। তিনি আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার ছিলেন এবং দীনদার মানুষদের মধ্যে গণ্য হতেন। তার অভিমত ছিল, সুদী লেনদেন জায়েয হওয়া উচিত। সুদী লেনদেন ছাড়া জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। তিনি এ ব্যাপারে ছোট্ট একটি বই প্রকাশ করেছিলেন। সেই বইটির নাম ছিল 'সুদমান্দ'। সুদ জায়েয করার জন্য যত হিলা-বাহানা হতে পারে সেই সকল হিলা সেখানে বর্ণিত ছিল।

তার ব্যাপারে আমার একটা ঘটনা মনে পড়ল। হযরত থানুভী রহ.কে কেউ জিজ্ঞেস করল, হযরত! তোফায়েল সাহেব তো সুদকে জায়েয করার চিন্তায় আছেন। থানুভী রহ. উত্তর দিলেন, এ ছোকড়াটার কথার কি গ্রহণযোগ্যতা আছে? প্রশ্নকারী বললেন, হযরত সে বালক? মাওলানা তোফায়েল আহমদ সাহেব একজন বড় মানুষ। থানুভী রহ. বললেন, যার নাম তোফায়েল (তোফায়েল অর্থ ছোট বাচ্চা) সে বালক নয় তো কী?

সে সময় লোকমুখে তার কাহিনী চলছিল। সেই মুহূর্তে এই আলেমগণ লাহোরে উপস্থিত হলেন। তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন মাওলানা জাফর আলী খান সাহেব রহ., ডা. আল্লামা ইকবাল সাহেব রহ.সহ আরো অনেক নামিদামি ব্যক্তিবর্গ। ঘটনাক্রমে হযরত মাওলানা জাফর আলী সাহেবও মাওলানা তোফায়েল সাহেবের ন্যায় সুদ জায়েযের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি দীর্ঘ আধা ঘণ্টাব্যাপী সুদ জায়েয হওয়ার উপর যুক্তি-প্রমাণসহ বয়ান করলেন। সাথে সাথে অর্থনৈতিক দলিল পেশ করলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল, এ হযরতগণ সুদ জায়েযের ব্যাপারে কিছুটা নমনীয় হবেন, তাদের থেকে কঠোরতা দূর হবে। তখন হযরত শাহ সাহেব রহ. দুটি শব্দ দ্বারা তার কথার উত্তর দেন। কথা দুটি ছিল এই– 'জনাব! আমরা এমন পুল হতে চাই না যার উপর দিয়ে জাহান্নামে যেতে হয়। যেতে হলে আপনি একাই যান, আমাদের গর্দানে পা রেখে যাবেন না।'

হযরতের উত্তর শুনে সবাই থ হয়ে গেলেন। কোন কথাই বলতে পারেননি। আল্লামা ইকবাল রহ. এবং জাফর আলী খান সাহেবও নীরব হয়ে গেলেন। কিছুই বলার সাহস হলো না। তারপর আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানি রহ.

দীর্ঘ আধা ঘণ্টাব্যাপী বিস্তারিত আলোচনা করলেন। তিনি দলিল দ্বারা প্রমাণ করতে সক্ষম হলেন, সুদ সর্বাবস্থায় হারাম। হালালের কোন সুরত বা প্রক্রিয়া নেই।

## কওমের হামদর্দী শরীয়ত মোতাবেক হওয়া উচিত

সহানুভূতি ও সেবার ধারা অনেক দিন পূর্ব থেকে কওমী হামদর্দী নামে চলে আসছে। এমন হামদর্দ অনেক সৃষ্টি হয়েছে এবং অতীতেও হয়েছে। এমন আরো হবে এবং শেষও হবে। কিন্তু শরয়ী মাসয়ালা স্বস্থানে অটল ও অবিচল থাকবে এবং আছে। এ ব্যাপারে যদি কোন প্রকার সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তাহলে সোজা কথা হলো, এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে ফতওয়া নিয়ে নিবেন। ফতওয়া চাওয়ার সময় বিস্তারিত মানদণ্ড উল্লেখ করতে হবে যে, আমি এত টাকা সঞ্চয় করেছি। আমার উদ্দেশ্য হলো জাতির সেবা করব লভ্যাংশ দ্বারা এবং মূলধন ঠিক রাখব। এর বৈধ প্রক্রিয়া কী হতে পারে? একটা সুরত হলো সুদী লেনদেন করা। আর আরেকটি সুরত হলো ব্যবসায়ী কাজে শেয়ার করা। তো এ ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম জানতে চাই। তাহলে সনদসহ যে ফতওয়া আসবে, তার উপর আমল করতে হবে। এতে প্রতিদানও পাওয়া যাবে এবং জাতির উপকারও হবে।

## দলিল ও হুজ্জত হলো দীনের সীমারেখা

একজন জিজ্ঞেস করল, জনাব! জামাতের অধিকাংশ যদি রায় দেয়, সুদের টাকা নেয়া যাবে, এতে কোন অসুবিধা নেই। তাহলে এ ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী?

তিনি উত্তরে বললেন, দীনের সীমারেখা মেজরিটি বা মাথা গণনার উপর নয়। কোন কাউন্সিল বা সংসদ ক্যাবিনেটের উপর নয়। এগুলোতে তো শুধু মাথা গুনে ফয়সালা দেয়া হয়। আর মাথার ভিতর যে জিনিস আছে, তা দেখা যায় না। অর্থাৎ আকল আছে কি নাই তা জানা যায় না। তাই আকলের খেয়াল করা হয় না; শুধু মাথা গুনে বিল পাশ হয়। আর দীন ও ইসলামের সীমারেখা হলো দলিল-প্রমাণ। এ ব্যাপারে আল্লামা ইকবাল রহ. সুন্দর বলেছেন–

> এই গণতন্ত্রের নিয়ম ছেড়ে দাও এবং কোন বুদ্ধিমান
> পীরের হাতে বন্দি হয়ে যাও। যদি দু'শ গাধা জমা হয়,

তাহলে তাদের থেকে মানুষের সামান্য ফিকির কি বের হবে?

দু-চারশো গাধা একত্র হলে তাদের থেকে গাধার খেয়াল বের হবে। মানুষের খেয়াল কি করে বের হবে? মনুষ্যত্ব থাকলে মনুষ্যত্বের চিন্তা-ফিকির বের হবে আর তা না থাকলে নির্বোধ খেয়াল বের হবে। এ ব্যাপারে কুরআন শরীফে ঘোষিত হয়েছে–

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

পৃথিবীতে নির্বোধদের মেজরিটির অনুসরণ করো না, তাহলে তোমাদের গোমরাহ্ পথভ্রষ্ট করে হকের রাস্তা হতে দূরে সরিয়ে দেবে।

এ কারণে যদি অধিকাংশ মিলে ফয়সালা কর, তাহলে তা দীনি দলিলের মোকাবেলায় কোনই কাজে আসবে না। চাই সারা দুনিয়ার মানুষ একত্র হয়ে রায় পাশ করে আর দীনি দলিল যদি তার বিপরীত হয়। সুতরাং সুদ হারাম। হারামাই থাকবে। যেমনটি শরীয়তে হারাম স্বীকৃতি দিয়েছে। কারো হালাল করার দ্বারা হালাল হবে না। পায়খানাকে যতই ধৌত করা হোক, পরিষ্কার করা হোক তা নাপাকই থাকবে। এমনকি যে পানিতে পড়বে তাও নাপাক হয়ে যাবে এবং যে পানি দ্বারা পাক করার চেষ্টা করা হবে, তাও নাপাক হয়ে যাবে। তেমনিভাবে একটি অকাট্য হারাম বস্তু নিজে তো কখনও হালাল হবেই না, উপরন্তু ঐ সকল যেহেনকে গান্ধা ও বিকৃত করে দিবে, যে যেহেনগুলোতে এমন কল্পনা আসে যে, উপকার হওয়ার খাতিরে হারাম বস্তু হালাল করবে। এ কারণে এমন বিকৃত ও গান্ধা কল্পনা মস্তিষ্কে রাখা উচিত নয় এবং এমন ইচ্ছা করাও সঠিক নয়। যখন কোন বস্তু হালাল ও বৈধ পন্থায় অর্জন করা যায়, তাহলে তা অর্জনে কোন হারাম পথ অবলম্বন করতে হবে। এহন ধ্যান-ধারণা থেকে আল্লাহ তায়ালা আমাদের রক্ষা করুক।

## ইসমতের স্তর

প্রশ্ন : একজন প্রশ্ন করল, নবী-রাসূলগণ সর্বসম্মতিক্রমে মাসুম বা গোনাহ থেকে পবিত্র। তাঁদের ইসমতের ব্যাপারে কারো মন্তব্য নেই। আর যে সকল বাচ্চা এখনো বালেগ হয়নি তারাও শরীয়তের দৃষ্টিতে মাসুম। কেননা, শরীয়ত তাদের কোন খারাপ কাজে ধরপাকাড় করে না। সুতরাং এখানেও

ইসমত সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণিত এবং আল্লাহওয়ালারাও অনেক গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। এ হিসেবে তারাও মাসুম হবে। তাই জনাব, এখন একথা সুস্পষ্ট করে দিন যে, ইসমতের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে না সকল ইসমত এক রকম?

উত্তর : তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ পার্থক্য আছে। তাহলো এই বাচ্চাদের গোনাহের ক্ষমা রয়েছে; তা বালেগ হওয়ার পূর্বে জাগ্রত হয় না। এটির সম্পর্কের কাজের সাথে। তাই তখন তা প্রকাশ পায় না। কিন্তু গোনাহ করার মাদ্দা বিদ্যমান আছে। আর নবী-রাসূলদের মধ্যে মাদ্দাও আছে এবং নফসও আছে। কিন্তু তারা নফসের সাথে মোকাবেলা করে গোনাহ হতে বেঁচে থাকে। এটি তাদের বিশেষ যোগ্যতা ও কামাল।

## পাপের উৎপত্তিস্থল

বলা হয়ে থাকে, মানুষের মধ্যে গোনাহের উৎসস্থল হলো শুধু দুটি– ১. হুব্বেজাহ (পদের মহব্বত), ২. হুব্বেবাহ (যৌনশক্তির মহব্বত)। এ কারণে কিছু গোনাহ প্রকাশ পায় মর্যাদা লাভের কারণে। উদাহরণস্বরূপ মানুষ নেতৃত্ব ও ক্ষমতালিপ্সু। নেতৃত্বের জন্য অন্যকে ঘায়েল করে, অপদস্ত করে, জবরদস্তি করে, যাকে এ যুগের পরিভাষায় ইসতেহসালে আওরাম বলে। অর্থাৎ জনতাকে আয়ত্ত করে নেতা হওয়া। কাউকে খুন করে হলেও গদী দখল করতে হবে, ইজ্জত পেতে হবে। হাজারো মানুষ ধ্বংস হোক, হত্যা হোক; কিন্তু তার নেতৃত্ব উজ্জ্বল হতে হবে। তার একমাত্র বাসনা-কামনাই হয় হুব্বেজাহ এবং ক্ষমতার মহব্বত। এটি সুস্পষ্ট কথা যে, কেউ যদি নিজেকে বড় ভাবে তাহলে সে কাউকে সালাম দিতে লজ্জাবোধ করবে। সে বলবে, অন্যেরা আমাকে সালাম করবে। আমি বড় দামি, আর তারা ছোট। তাদের উপর আবশ্যক হলো আমার সামনে মাথা নত করা। সুতরাং অহংকারের অর্থ শুদু নিজেকে বড় মনে করা নয়; বরং তার হাকিকত হলো মানুষ ছোট মনে করা এবং তুচ্ছ জ্ঞান করা। নিজেকে অন্যদের চেয়ে বড় ও দামি মনে করা। আর এ জযবা ও আবেগ মানুষের ভিতর বিদ্যমান আছে। এর সাথে হাজারো গোনাহ সম্পর্কিত। যুদ্ধবিগ্রহ অশ্লীল গালিগালাজ, মারামারি এবং হামলা ও হত্যা ইত্যাদি। দুনিয়ার হাজারো গোনাহের কাজ শুধু মর্যাদা লিপ্সু হওয়ার জন্য প্রকাশ পায় বা কার্যকরী হয়। যদি মানুষ নিজেকে ছোট ও তুচ্ছ জ্ঞান করে, তাহলে ঐ সকল গোনাহ বন্ধ হতে পারে।

মানুষের মধ্যে আরেকটি জযবা আছে। তাহলো হুব্বেবাহ। অর্থাৎ যৌনশক্তি বা কামভাব শক্তি। হাজারো গোনাহ তার সাথে সম্পর্কিত। এ শক্তি দুভাগে বিভক্ত– ১. পেটের বাসনা। তা পূরণ করার জন্য খাবার জমা করে, ২. যৌনকামনা তা বের করার চেষ্টা করে, এটি হাজারো গোনাহের উৎসস্থল। এমন প্রকার খায়েশ পূরণ করার জন্য মানুষ হালাল-হারামের পরওয়া করে না। চুরি হোক, ঘুষ হোক, সুদ হোক এক কথায় যেভাবেই হোক পয়সা জমা করতে হবে। ফলে তা দ্বারা নফসের ঐ শক্তি বৃদ্ধি পায়, যার দ্বারা কামভাব পূরণ হতে পারে। সুতরাং পেটের খায়েশের নির্যাস হলো নফসের আনন্দদায়ক বা পছন্দনীয় বস্তু সঞ্চয় করা এবং জমা করা। সম্পদ হোক, কাপড় হোক এবং অন্যান্য সামান হোক মানুষ তা অর্জই করবে যেভাবেই হোক। মানুষ যখন এহেন শক্তিতে ডুবে যায় তখন তারা হালাল-হারামের তারতম্য করে না। পকেটমার পকেট মারে, চোর চুরি করে, ডাকাত ডাকাতি করে।

একদল বিশেষ প্রকারের ডাকাত আছে, যারা আইনের আড়ালে সম্পদের পাহাড় গড়ে। চাই ট্যাক্স লাগিয়ে হোক, চাই ভয়ভীতি ও ধমক দিয়ে হোক। যেমন– পুলিশ ভাইয়েরা করে থাকে। কারো কোন অন্যায় থাক বা না থাক তাকে ভয়ভীতি ও ধমক দিয়ে কিছু ঘুষ নিয়ে ছেড়ে দেয়। সুতরাং মাল উপার্জনে মানুষ হালাল ও হারামের পরওয়া করে না। ফলে তা দ্বারা হাজারো গুনাহ প্রকাশ পায়।

আরেকটি খায়েশ হলো লজ্জাস্থানের। তা দ্বারা মানুষ বদকার, যিনাকার, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, উলঙ্গপনা ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়। যেমনভাবে পেটের সাথে হাজারো গোনাহ সম্পৃক্ত, তেমনিভাবে যৌনাঙ্গের সাথেও হাজারো গোনাহ জড়িত।

## শয়তানের পাপ ও হযরত আদম আ.-এর পদস্খলন

আযাল জগতে শয়তানের পক্ষ থেকে গোনাহ এবং হযরত আদম আ. থেকে একটি ভুল প্রকাশ পেয়েছিল। শয়তানের গোনাহের উৎস ছিল সম্মান ও মর্যাদার মহব্বত। যখন তাকে আদেশ করা হয়, আদম আ.কে সিজদা করতে, তখন সে বলে, আমি আদমের সামনে কেন মাথানত করব? সে শুধু আল্লাহর হুকুমকে অস্বীকারই করেনি বরং আল্লাহর হুকুমে খুঁত বের করে (নাউযুবিল্লাহ) বলল, আপনার এ হুকুম সৃষ্টিগত ও স্বভাবের বিপরীত।

আপনি তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা আর আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দ্বারা। আগুনের জন্মগত বৈশিষ্ট্য হলো উপরে থাকা আর মাটির বৈশিষ্ট্য নিচে থাকা। তাই আপনি মাথা উঁচু থাকা বস্তুকে কেন নিচু থাকা বস্তুর সামনে নিচু হতে হুকুম দিলেন? উর্ধ্বগামী ব্যক্তি নিম্নগামী ব্যক্তির সামনে কেন মাথানত করবে? এটি পাপ আল্লাহর হুকুমে বিরোধিতা করার কারণে, যা সংঘটিত হয়েছিল অভিশপ্ত শয়তান থেকে। তার উৎস ছিল মর্যাদার লোভ, ইজ্জত, হিংসা, অহংকার, আমিত্ব এবং বজ্জাতি ও স্বেচ্ছাচারিতা।

আর ভুলচুক প্রকাশ পেয়েছে হযরত আদম আ. থেকে। এটি মূলত গোনাহ ছিল না বরং এটি ছিল একটি সাধারণ ভুল। আর তাহলো হযরত আদম আ.কে একটি নিষিদ্ধ গাছের ফল না খেতে বলা হয়েছিল। তার ফল খাওয়া তো দূরের কথা তার নিকটে যাওয়াও নিষেধ ছিল। ঐ গাছের ফল হযরত আদম আ. খেয়ে ফেললেন। কিন্তু তার মধ্যে আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করা লেশমাত্র মনোভাব ছিল না।

## অভিশপ্ত ইবলিসের প্রতারণা

ইবলিস সর্বপ্রথম হযরত আদম আ.-এর অন্তরে কুমন্ত্রণা দিল এবং প্রতারণা করে আল্লাহর হুকুমের ব্যাখ্যা বোঝাল যে, তার এ হুকুম সময়সাপেক্ষ, সর্বকালীন নয়। এখন আল্লাহর দেয়া নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। তাই এখন আপনার পাকস্থলি ঐ ফল হজম করতে সক্ষম। এ ফলের বৈশিষ্ট্য হলো, যে ফলকে আহার করবে সে আজীবন জান্নাতে থাকবে, তাকে এ নেয়ামত থেকে বের করতে পারবে না। শয়তান হযরত আদমের সাথে মিথ্যা বলেছে, ধোঁকাও দিয়েছে, আবার কসমও খেয়েছে।

وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ۝

আমি শপথ করে বলছি, আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী।

আপনারা যদি এ বৃক্ষের ফল আহার করেন, তাহলে আজীবন জান্নাতে থাকতে পারবেন। আর যদি আহার না করেন, তাহলে সম্ভাবনা রয়েছে, আপনাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দিবে। সে তাদেরকে আরো বোঝাল, আল্লাহ তায়ালার এ আদেশ সময়সাপেক্ষ। এখন জান্নাতের আবহাওয়া আপনার সয়ে গেছে, এখনই গাছের ফল খেলে কোন অসুবিধা হবে না। প্রথম অবস্থায় খেলে ক্ষতি হতো বিধায় আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করেছিলেন। এখন

খেতে পারেন। অপরদিকে হযরত আদম আ.-এর মস্তিষ্কে ছিল, এ গাছের ফল খাওয়া তো নিষেধ করা হয়েছে। আমি কেমনে আহার করব। আল্লাহ তায়ালার আদেশের বিপরীত কিভাবে করব? এমন প্রশ্নগুলো বারবার উঁকি মারছিল। কিন্তু অভিশপ্ত শয়তান তো আল্লাহর নামে শপথ করেছে। হযরত আদম আ.-এর মন ছিল স্বচ্ছ ও নির্ভেজাল। তিনি ধোঁকা কাকে বলে জানেন না। প্রতারণা কেমন চিনেন না। আল্লাহর নাম নিয়ে কেউ প্রতারণা করতে পারে তিনি কখনও ভাবতে পারেননি। আল্লাহর নাম নিয়ে কি কেউ মিথ্যা বলতে পারে? হযরত আদম আ.-এর বেলায় এমনটি হয়েছিল– যে সত্যবাদী হয় সে এমন ধোঁকা খায় যে মানুষ কি মিথ্যা বলতে পারে। সত্যবাদী মিথ্যাকে অনেক খারাপ ভাবে। এ কারণে সৎ মানুষ অন্য মানুষকে সৎ মনে করে। তার এমন সন্দেহ হয় না যে, সে মিথ্যা বলে ধোঁকা দিচ্ছে।

এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ বলেছেন– সুফিদের হাদীস মিথ্যা হয়।

এ কথার অর্থ এই নয় যে, তারা মিথ্যা বলেন (নাউযুবিল্লাহ)। সুফিগণ এমন সৎ ও সরল হন যে, কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাম নিয়ে কিছু বর্ণনা করলে তারা এতে এমন সন্দেহটুকু করেন না যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাম ব্যবহার করে কেউ মিথ্যা বলতে পারে। তারা এটি সহীহ মনে করেন। এ কারণে সৎ ও সরল মানুষ অনেক সময় আল্লাহর নামে কসম খাওয়ার কারণে এবং দৃঢ়তার সাথে বলার কারণে প্রতারণার শিকার হন। কারণ, তাদের অন্তর ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে পবিত্র। সুতরাং ইবলিস তো শুধু তাবিল করেনি বরং আল্লাহর নামে কসমও করেছে। অপরদিকে হযরত আদম আ.-এর অন্তর পবিত্র, তাঁর অন্তর ধোঁকা ও প্রতারণা সম্পর্কে জ্ঞাত না। আবার জান্নাতের ভিতর থেকে কেউ কসম খেলে যে আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই আদম আ. সন্দেহ হয়নি, সে মিথ্যা বলছে।

আবার এদিকে ইবলিস তো ধোঁকা দিয়েছে, অপরদিকে হযরত হাওয়া আ. বললেন খেয়ে নিন। একটা দুটো দানা খেলে কী হবে। মানুষ স্ত্রীদের কথা শুনে থাকে, তাদের কথার খেলাফ করে না। স্ত্রী হাওয়া আ.-এর কথা শুনে হযরত আদম আ.-এর দিলে এ কথা বসে গেল যে, সম্ভবত আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা সর্বকালীন ছিল না, তা ছিল প্রাথমিক অবস্থায়। এখন যেহেতু জান্নাতের আবহাওয়া মানিয়ে নিতে পারছি, তাহলে এক দুটা দানা খেলে কোন অসুবিধা হবে না। উপর থেকে শয়তান খেল কসম, আবার স্ত্রী দিল অভয়; তাই তিনি গাছের ফল খেয়ে ফেললেন।

## ইজতেহাদী ভুল ও ইসমতে আদম আ.

হযরত আদম আ.-এর কাজ মূলত গোনাহ ছিল না। গোনাহ বলা হয় জেনেশুনে আল্লাহর আদেশের বিপরীত করা। আর হযরত আদম আ. জেনেবুঝে আল্লাহর হুকুমের বিপরীত করা থেকে পবিত্র। তিনি বুঝেছিলেন, হতে পারে আল্লাহর হুকুমের অর্থ ও উদ্দেশ্য হলো এই যা ঐ ব্যক্তি কসম খেয়ে বলেছে। আমি মনে হয় ভুলের মধ্যে আছি। এ ধরনের ধোঁকা ও প্রতারণায় পড়ে হযরত আদম আ. ফল খেয়ে ফেলেন। এটি অবস্থাদৃষ্টে ভুলচুক, বাস্তবে গোনাহ নয়। বরং বোঝার ভুল। এভাবে বলা যেতে পারে, তা ছিল চিন্তার ভুল, ইজতেহাদী উদ্ভাবনার ভুল। নবীদের থেকে ইজতেহাদী ভুল হতে পারে। তবে পার্থক্য হলো, নবীদের ভুলের উপর রাখা হয় না। আল্লাহ তায়ালা সাথে সাথে শুদ্ধটা জানিয়ে দেন। আর মুজতাহিদরা ইজতেহাদী ভুল করলে হতে পারে তিনি আজীবন তাকে সঠিক মনে করবে। অথচ তা বাস্তবে ভুল। মোটকথা, এমন পরিস্থিতির শিকার হয়ে হযরত আদম আ. গাছের ফল খেয়েছিলেন।

## পদস্খলন ও গোনাহের পার্থক্য

হযরত আদম আ.-এর ভুলের মানশা অহংকার বা হুব্বেজাহ ছিল না। তিনি নিজেই বলেছেন, আল্লাহর হুকুমের বিপরীত কিভাবে করব। কিন্তু আল্লাহর হুকুমের মর্ম শপথকারী শয়তান ভুল বুঝিয়ে দিল। আর নিষেধ করা বস্তুটি ছিল খাবার জাতীয়। খাবার জাতীয় বস্তুতে কাম ও রতিশক্তি ধাবিত হয়। তাতে অহংকার ও গর্ব বা জাঁকজমকতা হয় না। আর শয়তানের গোনাহের মাশআ ছিল অহংকার ও গর্ব। হযরত আদম আ.-এর ভুলচুকের মানশা ছিল লোভ। লোভ মানুষের নিজস্ব বস্তু। আর অহংকার গর্ব মূলত শয়তানের কাজ। আল্লাহর নিকট অহংকারের পাপ খুব বড় পাপ তা মাফ হয় না যতক্ষণ পাপকারী ভালোরূপে তাওবা না করে। ইবলিশ তো তাওবা করেনি; তাই তাকে অভিশপ্ত আখ্যা দেয়া হয়েছে এবং অনন্তকালের জন্য জাহান্নামী বানিয়ে দেয়া হয়েছে। আদম আ.-এর দ্বারা যে ভুল সংঘটিত হয়েছিল, তাতে অহংকার ও গর্বের লেশমাত্র ছিল না। তবে লোভ ছিল এবং ভুল বোঝাবুঝি ছিল। এ কারণে যে গোনাহ কামশক্তি দ্বারা হয় তা কঠিন গোনাহ হয় না। লোভে পড়ে গোনাহ করা মানুষের বৈশিষ্ট্য। আর অহংকার করে গোনাহ করা তাহলো গর্ব ও বড়ত্ব প্রকাশ আর তা আল্লাহ তায়ালার শান। তাই এমন

গোনাহ কেমন যেন আল্লাহর সাথে শরীক করা। আর তা প্রকাশ্য শিরক। মোটকথা, অহংকারবশত গোনাহ অত্যন্ত বড় গোনাহ। হাদীস শরীফে এসেছে-

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ لَهُ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنَ الْكِبْرِ

যে ব্যক্তির অন্তর অণুপরিমাণ অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না (যদি তাওবা না করে)।

এক প্রকার গোনাহের মানশা হলো অহংকার ও গর্ব। আর এক প্রকার ভুলচুক যার মানশা লোভ। লোভে পড়ে গোনাহ করা মানুষের তবিয়ত। আর অহংকারবশত গোনাহ করা শয়তানের কাজ। অহংকার সরাসরি আল্লাহর সাথে মুকাবেলা হয়। আল্লাহও বড় এবং অহংকারীও বড়। আর লোভে পড়ে যে গোনাহ হয়, তাতে মানুষ নিজে নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করে যে, আমি লোভে পড়লাম। এতে আল্লাহর বড়ত্ব অন্তর থেকে কমে যায় না। এখন ফলাফল বের করে নেয়া যেতে পারে, হযরত আদম আ. থেকে যে ভুলচুক হয়েছিল, তাকে হুব্বেজাহ ছিল না, হুব্বেবাহ ছিল। চিন্তা করলে বের হয়ে আসে যে হযরত আদম আ.-এর অন্তরে আল্লাহর বড়ত্ব, মহত্ব ও সম্মান নিয়মতান্ত্রিকভাবে ছিল। আর অন্যের বড়ত্ব ও আযমত তখনও থাকতে পারে, যকন কেউ নিজেকে নিচু মনে করে, তুচ্ছ মনে করে। সুতরাং হযরত আদম আ.-এর ভুলচুকে অহংকারের চিহ্ন ছিল না। অপরদিকে অভিশপ্ত শয়তানের দিলে আল্লাহ আযমত বা বড়ত্ব ছিলই না। এ কারণে সে আজীবনের তরে অভিশপ্ত হলো। আর এদিকে হযরত আদম আ.-এর মাথায় খেলাফতের মুকুট পড়িয়ে দেয়া হলো। যখন তিনি কঠিন ও খাঁটি তওবা করলেন, দীর্ঘ চল্লিশটি বছর পর্যন্ত কাঁদলেন। অথচ বাস্তবে সেটি কোন পাপ ছিল না। বরং তা ছিল একটি চিন্তাগত ভুল।

## নাবালকের ইসমত

মানুষের মধ্যে দুটি চাহিদা শক্তি রয়েছে। একটি হলো মর্যাদা অন্বেষী, অপরটি হলো কাম অন্বেষী। নাবালেগদের মধ্যে এ দুটির কোনটিই জাগ্রত হয় না। তার ভিতরে অহংকার থাকে না। সে শুধু খেলাধুলা করে। শাহওয়াতের মাদ্দা থাকে; কিন্তু বালেগ হওয়ার পূর্বে তা জাগ্রত হয় না, উৎলে ওঠে না। সুতরাং তা না হওয়ার সমান। অতএব নাবালেগ বাচ্চা মাসুম হওয়ার কারণ হলো তার মধ্যে গোনাহ করার মানশা এখনও জাগ্রত হয়নি।

## নবী-রাসূলদের ইসমত

নবী-রাসূলগণের ভিতর সকল প্রকার শক্তি পুরোপুরিভাবে থাকে। তবে তারা বেঁচে থাকে নফসের বিরোধিতা করে, ধৈর্যধারণ করে, জোর করে পোক্তা নিয়তের মাধ্যমে এবং পুরোপুরি পৃথক থাকা ও আল্লাহ তায়ালার আযমত বড়ত্ব অন্তরে পোষণ করার মাধ্যমে। এমন নয় যে, নবীরা গোনাহ করা থেকে অপারগ, তাঁদের থেকে গোনাহ হতে পারে না। তাঁরা যদি অপারগ হতেন, তাহলে গোনাহ না করাটা তাঁদের জন্য কোন প্রকার কামালিয়াত হতো না। কামালিয়াত তো হলো গোনাহ করার ক্ষমতা থাকার পরও তা থেকে বিরত থাকা আল্লাহ তায়ালার হুকুমের সম্মানে নফসের মোকাবেলা করে। নবী-রাসূলগণের ভিতর এত পরিমাণ শক্তি আছে যে, তাদের থেকে গোনাহ প্রকাশই হয় না। তারা একেবারেই গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। নবীদের ইসমতের অর্থ আপারগতা নয় বরং তাঁদের মধ্যে গোনাহ করার মাদ্দাসহ সব ধরনের মাদ্দা পুরোপুরি থাকে। কিন্তু তাঁরা সব ধরনের মাদ্দাকে সার্বিকভাবে অনুগত করে নেন এবং আল্লাহকে বলে দেন, আপনি যেখানে আদেশ করবেন, সেখানে তা ব্যবহার করব আর যেখানে বাধা দিবেন, সেখানে আমরাও বিরত রাখব।

সুতরাং নবীদের ভিতর শক্তি ও মাদ্দা সবই আছে। তারপর তাঁদের গোনাহ থেকে বাঁচা তাদের ইচ্ছাধীন। এ কারণে গোনাহ থেকে বিরত থাকা তাঁদের কামালিয়াত। যদি তারা গোনাহ থেকে বিরত থাকা অপারগতা হতো, তাহলে এটা তাদের জন্য কোন প্রকার কামালিয়াত হতো না। কেননা, তা এমন যে একজন পুরুষত্বহীন ব্যক্তি বলর আমি বড় মুত্তাকি, আমি মহিলাদের কাছেও যাই না। তাহলে অন্যরা বলবে, হে বেকুফ তোর ভিতর তো শক্তিই নেই। তুই তো অপারগ হয়ে বেঁচে থাকছ। তোমার ভিতর খাহেশাতের মাদ্দাই নেই। কুপ্রবৃতি থেকে বেঁচে থাকা তো বলে খাহেশাতের পুরোপুরি শক্তি থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর ভয়ে তা থেকে বিরত থাকা। একজন ল্যাংড়া মানুষ হাঁটতে পারে না। সে বলে আমি চুরি করি না; তা থেকে আমি পবিত্র, তাহলে মানুষ বলবে তুমি পবিত্র কিভাবে, তুমি তো অপারগ। তোমার যদি আজকে শক্তি হয়, তাহলে তুমি আগামীকালই ডাকাতি করবা। তোমার ভিতর শক্তিই নেই তাই তুমি করবা কী। তোমার কাজ তো শুধু চেয়ারে বসে থাকা। আর গোনাহ হতে বেঁচে থাকা বলে ঐ সময়, যখন সামর্থ থাকে কাজ পুরোপুরি জানা থাকে, তারপর আল্লাহর ভয়ে বেঁচে থাকে। আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা

হবে বলে নিজ জ্ঞান ও আকল-বুদ্ধির আলোকে অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকার নাম হলো বেঁচে থাকা। আর যার কাজে জ্ঞানের আলো নেই, তার বেঁচে থাকাকে মূলত গোনাহ হতে বিরত থাকা বলে না।

## ইসমতে আম্বিয়া ও ইসমতে নাবালেগের পার্থক্য

শিশু বা নাবালেগ বাচ্চারা মাসুম এ কারণে যে, গোনাহ করার শক্তি তাদের মধ্যে এখনও জাগ্রত হয়নি, তবে শক্তি আছে। আর নবীগণের মধ্যে গোনাহ করার সকল শক্তি বিদ্যমান, তারপরও তাঁরা স্বেচ্ছায় গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। ইসমত উভয়ের মধ্যে আছে; কিন্তু পার্থক্য এতটুকু যে, নবীগণ স্বেচ্ছায় মাসুম আর শিশুরা অনিচ্ছাকৃত মাসুম। নবীগণ জেনেশুনে মাসুম এবং শিশুরা অজানা মাসুম। শিশুরা শক্তি না থাকায় মাসুম আর নবীগণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও মাসুম। এক দলের ইসমত ইসমতে কামাল বা পরিপূর্ণ মাসুম। আরেক দলের ইসমত ইসমতে কামাল নয়। দু-তিন বছরের শিশু যদি গোনাহ না করে, তাহলে তাকে কেউ কামেল বলে না। কারণ, তার মধ্যে ইচ্ছাশক্তি নেই, আবার গোনাহ করার শক্তিও নেই। সুতরাং তার মাসুম হওয়ার অর্থ হলো, আল্লাহ তায়ালা তাকে অপারগ অবস্থায় গোনাহ করা হতে ফিরিয়ে রেখেছে। গোনাহ করার শক্তি আল্লাহ তায়ালা এখনও জাগ্রত করেননি। এ কারণে বেচারা নিজ ইচ্ছায় কোন কিছু করতে পারে না। আর নবীদের মধ্যে সব ধরনের শক্তি বিদ্যমান তারপরও তারা বেঁচে থাকে। এরই নাম কামাল বা পূর্ণতা।

## বিস্ময়কর ঈমান

নিয়ম হলো, যেখানে অনেক প্রতিবন্ধক ও বাধা তারপরও নেক কাজ করে, তাহলে তার ঈমান বেশি গ্রহণযোগ্য হবে। আর আরেকজন এমন যে, তা কোন প্রতিবন্ধক নেই এবং নেক কাজ করার পরিবেশও আছে, তাহলে তার নেক কাজও নেক; তবে বেশি আশ্চর্যজনক ও দুর্লভ নয় এবং বেশি গ্রহণযোগ্য ও সম্মানযোগ্য নয়। এ ধরনের একটি হাদীসও আছে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন, বলো দেখি, সবচেয়ে বেশি বিস্ময়কর ঈমানদার কে? সাহাবারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! সবচেয়ে বিস্ময়কর ঈমামদার ফেরেশতাকুল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ফেরেশতাদের কী হলো, তারা কেন

ঈমান আনবে না। আরশে আজমি তাদের সামনে, কুরসী তাদের সামনে, জান্নাত ও জাহান্নাম তাদের চোখের সামনে। তারা যদি ঈমান গ্রহণ না করে, তাহলে কারা করবে। তাদের আনুগত্য করা বা মেনে নেয়া বেশি কামালের কাজ নয়। কারণ, তারা এমন বস্তুকে মানছে, যা নিজ চোখে দেখছে। তাই তাদের না মানার তো কোন কারণ নেই। তারপর সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! নবীদের ঈমান বেশি বিস্ময়কর। তিনি বললেন, নবীদের কি হলো যে তারা ঈমান আনবে না। অথচ আল্লাহর ওহী তাদের উপর নাযিল হয়। তারা ফেরেশতাদের দেখে, তারা আল্লাহ দর্শনে মাশগুল থাকে। জালাল ও জামালের দরজা তাদের খোলা। আল্লাহর নূরের তাজাল্লি তাদের সামনে। তারা যদি অস্বীকার করে, তাহলে কে আছে স্বীকার করবে। তাই তাকে ঈমানে কী বিস্ময় আছে?

তারপর বললেন, তাহলে আমাদের ঈমান বেশি বিস্ময়কর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কি হলো যে, তোমরা ঈমান আনবে না। আল্লাহর নবী তোমাদের সামনে উপস্থিত। তার ওহী তোমাদের সামনে নাযিল হচ্ছে। বিভিন্ন মুজেজাহ অলৌকিক ঘটনা তোমরা প্রত্যক্ষ করছ। তোমরা যদি ঈমান না আন, তাহলে আর কারা ঈমান আনবে। এ কারণে তোমাদের ঈমানও বিস্ময়কর নয়।

তারপর নিরুপায় হয়ে বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন, কার ঈমান বেশি বিস্ময়কর। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বিস্ময়কর ঈমানদার হলো তারা, যারা তোমাদের পরে দুনিয়ায় আসবে। তাদের সামনে রাসূল থাকবে না, থাকবে না কোন মুজেযা, ওহীও তাদের কাছে নাযিল হবে না। বরং ঈমান গ্রহণ করার প্রতিবন্ধক এবং প্রতিরোধক হবে অনেক। কেউ ঈমানে সংশয় সৃষ্টি করবে। কেউ অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করবে, কোথাও কাফের, কোথাও মুনাফিক, কোথাও নফসের জযবা ও আবেগ, তেমনিভাবে হাজারো প্রতিবন্ধক বিদ্যমান থাকবে। এছাড়া ঈমান গ্রহণের মতো দাবি ওহী ও রাসূল বিদ্যমান থাকা তারা তো থাকবে না তারপরও তারা ঈমানের উপর জমে থাকবে। তাই তাদের ঈমান হলো বেশি বিস্ময়কর।

## বাধ্যতামূলক ইসমত

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো, যে অধিক প্রতিবন্ধক এবং প্রতিকূল পরিবেশের ভিতর ভালো কাজ করে, সে বেশি মর্যাদাবান সেই ব্যক্তি হতে, যার কোন

প্রতিবন্ধক নেই বরং দাবিকারী এবং চালিকাশক্তি ও উদ্দীপকও বিদ্যমান আছে। তখন নেক কাজ করলে তা নেক কাজই হবে। তবে বেশি বিস্ময়কর ও দুর্বলের বিষয় হবে না। তাই কোন শিশু যদি গোনাহ থেকে বিরত থাকে, তাহলে তা জেনেশুনে কুপ্রবৃত্তির মোকাবেলা করে বাঁচা হবে না। কারণ, তার নাফসে তো গোনাহ করার জযবা-আবেগ আবেদন নেই। না আছে খাহেশাতের জযবা, না আছে অহংকার ও গর্বের জযবা। সুতরাং এভাবে গোনাহ থেকে মুক্ত থাকার নাম, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা নয়। সে তো গোনাহ থেকে একেবারে পৃথক থাকে ও দূরে থাকে। গোনাহ হতে মুক্ত থাকা তো বলা হয়, যার শক্তি আছে, ইচ্ছা শক্তি আছে, আবার সুযোগ আছে, তারপরও করে না। আর শিশুর মধ্যে যে ইসমত রয়েছে, তা অপারগ থাকার ইসমত। আর নবীদের মধ্যে ইসমত হলো ইচ্ছাধীনও স্বেচ্ছায়। তো নবী ও শিশু উভয়জন মাসুম। তবে পার্থক্য হলো জানা ও অজানার। ইচ্ছা ও অনিচ্ছার। খবর ও বেখবরের।

## আউলিয়াদের গোনাহ থেকে হেফাজত

এখন আল্লাহওয়ালা, সালেহীন, মুত্তাকিনদের গোনাহ হতে বেঁচে থাকার আলোচনা করা যাক। একটু পূর্বে আরজ করেছি, গোনাহ হতে আম্বিয়াগণ বেঁচে থাকেন, শিশুরা বেঁচে থাকে এবং আউলিয়ারাও বেঁচে থাকেন। তাদের মাঝে পার্থক্য হলো নবীদের ইসমত আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। অর্থাৎ তারা পরিপূর্ণরূপে গোনাহ থেকে মুক্ত। শিশুদের মধ্যে গোনাহ করার মাদ্দা আছে। তবে জাগ্রত নেই। অর্থাৎ তাদের মাঝে গোনাহ করার শক্তি নেই।

সুতরাং তারাও মাসুম। আর আল্লাহর অলিরা, তাঁদের থেকে গোনাহ হয় আবার হয়ও না, তাঁরা যথাসম্ভব গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। এ কারণে তাঁদের মাসুম বলা যাবে না; কিন্তু মাহফুজ বলা যাবে। আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁদের হেফাজত করা হয়। তাঁদের হেফাজতের ভিত্তি হলো আল্লাহর যিকির। তাঁরা রাত-দিন আল্লাহর যিকিরে মগ্ন থাকে এবং তারা জালাল ও জামালের মুশাহাদায় ডুবে থাকে। আর তাঁদের আত্মার সম্পর্ক ও যোগাযোগ এত শক্তিশালী যে এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর ধ্যান-খেয়ালের কল্পনা থেকে পৃথক হয় না। এ কারণে তাঁরা গোনাহ হতে বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু যদি কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে যায়, তাহলে ভুলচুক হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর এমনটা অতীতে হয়েছেও। কতক বড় বড় অলির মধ্যে কখনও কখনও

কুপ্রবৃত্তি প্রবল হয়ে গেছে এবং গোনাহ সংঘটিত হয়ে গেছে। তাতে অন্য কোন হেকমত হতে পারে; কিন্তু গোনার সম্ভাবনা আছে।

## হযরত শিবলী রহ.-এর নসিহতপূর্ণ ঘটনা

হযরত শিবলী রহ. একজন বড় মাপের অলী ছিলেন। তার ব্যাপারে এ-ও বলা যেতে পারে যে, তিনি আউলিয়াদের সর্দার ছিলেন। হযরত শিবলী রহ.-এর খানকা হতে হাজারো খানকা সৃষ্টি হয়েছে এবং আবাদ হয়েছে। তিনি তাকওয়া ও পবিত্রতার একটা কারখানা খুলেছিলেন এবং তা থেকে তিনি তাকওয়া ও পবিত্রতা বিস্তার করেছেন। যুগের সকল অলীগণ তাঁর থেকে উপকৃত হতেন।

একদিন তিনি মুরিদদের নিয়ে ঘুরতে বের হলেন। তিনি যখন এক খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজক মহল্লা অতিক্রম করেন তখন দেখতে পান, তারা শূকর চড়াচ্ছে। তাঁর দিলে এ ধারণা এলো যে, তারা কি মানুষ! তাদের মধ্যে না আছে ঈমান, না আছে পাক-নাপাক এর পার্থক্য। তারা শূকর চড়াচ্ছে, মদপান করছে। মূলত মুমিন আমরাই, আল্লাহ আমাদের প্রতিটি মন্দ কাজ হতে বাঁচান আর আমরা গোনাহ হতে পরহেজ করি এবং দীনের ভিতর সর্বদা ডুবে থাকি।

তাঁর দিলে এমন ধারণা সৃষ্টি হওয়াটা একটা ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণার পর্যায়ের ছিল। নিয়ম হলো, যারা আল্লাহর অধিক নৈকট্যশীল তাদের সামান্য সন্দেহও ক্ষমার অযোগ্য বিবেচিত হয়, তারা আল্লাহর দরবারে গ্রেফতার হন। বলা হয়ে থাকে, কেউ গোনাহের কাজ করেও এতটুকু হয়রানির শিকার হয় না, আল্লাহওয়ালারা যতটুকু হয়রানি ও কষ্টের শিকার হন সামান্য সন্দেহ দ্বারা। ফলাফল এই হলো যে, যখন তিনি খ্রিস্টান পল্লীতে পৌঁছান, তখন দেখতে পান কিছু মেয়ে কূপ থেকে পানি উঠাচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন খ্রিস্টান যুবতী অপূর্ব সুন্দরী ছিল। তার প্রতি হযরত শিবলী রহ.-এর তবিয়ত ধাবিত হয়ে পড়ে। আর এমন ধাবিত হয় যে, তিনি তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। তাকে গিয়ে বিবাহের প্রস্তাব দেন। যুবতী উত্তর দিল, আমি বিবাহ তখন করব যখন আমার পিতার অনুমতি হবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতা কোথায়। সে বলল, তিনি বাড়িতে আছেন। তখন তিনি তার বাড়িতে গিয়ে তার পিতার নিকট আবেদন জানালেন। তার পিতা বলল, আমি এক শর্তে বিবাহ দিতে পারি। তাহলো তোমার খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। হযরত শিবলী রহ. বললেন, আমি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করব। তারপর

ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যান। শায়খের মুরিদ, মুতাকিদরা এসে অনেক অনুরোধ-খোশামোদ এবং কাকুতি-মিনতি করল। কিন্তু শায়খের কিছুই বুঝে এল না। তিনি হতভম্ব হয়ে রইলেন। একজন জিজ্ঞেস করল, অমুক আয়াত আপনার মনে আছে? তিনি বললেন, আমার কোন আয়াত মনে নেই। অর্থাৎ পুরো কুরআন স্মৃতিশক্তি হতে বের হয়ে গেছে। তারপর মুরিদরা হাদীসের রেফারেন্স দিয়ে বোঝাতে চাইল। তিনি বলে দিলেন, আমার কোন হাদীস স্মরণ নেই। তিনি ঐ যুবতীর ইশকে ডুবে রইলেন। এমনকি যে লাঠির উপর ভর করে জুমআর খুতবাহ দিতেন, আজ সেই লাঠি দ্বারা শুকর চরাচ্ছেন।

শায়খের এহেন দুরবস্থা দেখে লোকেরা চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। সারা দেশের সকল খানকাগুলো পরিত্যাক্ত হয়ে গেল। যখন যারা শায়খের অবস্থা জানছিল, তখন তারা মূর্ছা যেত, বিহ্বল হয়ে যেত। অনেক মুরিদ সহ্য করতে পারেনি। সংবাদ শোনার সাথে হার্ট এ্যাটাক করে মৃত্যুবরণ করেছেন। এ ব্যথা কোন সাধারণ ব্যথা ছিল না যে, যুগের শ্রেষ্ঠ শায়েখ মুরতাদ হয়ে গেছেন। তাহলে অন্যদের ঈমানের অবস্থা কেমন হবে। এ কারণে মানুষেরা প্রথকভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে এও দলবদ্ধভাবে দোয়া করতে লাগলেন। তার একটি বিশেষ সংখ্যক লোক সর্বদা শায়খের পাশে থেকে আল্লাহর দরবারে দোয়া করে করে কাঁদছিলেন। এভাবে কিছু দিন চলে যাওয়ার পর শায়খের চেতনা আসতে শুরু করল। তিনি মনে মনে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি হালতে আছি। তিনি মুরিদদের জিজ্ঞেস করেন, আমি কি অবস্থায় আছি। তারা উত্তর দিল, আপনি খ্রিস্টান ধর্মে আছেন। তখন শায়েখ বলে উঠলেন, মায়াযাল্লাহ! আস্তাগফিরুল্লাহ! এভাবে কতক্ষণ তাওবা ইস্তেগফার পড়লেন। অতঃপর বললেন, আমাকে কালিমা পড়াও, মুসলমান বানাও। কালিমা তো তার দিলে পূর্বেই ছিল। কিন্তু এখন তার উপর অন্য জিনিস বিজয় হয়ে গেছে। এখন যখন আবার ধ্যান দিলেন তো সারা কুরআন আবার স্মৃতিতে চলে এল, হাদীস চলে এল। তিনি প্রশ্ন করলেন, আমি এখানে এসে কিভাবে ডুবে গেলাম? লোকেরা বলল, হযরত ঘটনা হলো এমন। তখন সাথে সাথে তওবা করে সেখান থেকে চলে এলেন এবং ইস্তিগফারে ব্যস্ত রইলেন। ফলে সকল খানকাগুলোতে লোকেরা আনন্দ উৎসব করতে লাগল। সারাদেশে আনন্দের ঢেউ বইতে লাগল যে, আল্লাহ তায়ালা আবার আমাদের শায়খকে ইসলাম ধর্মে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

এদিকে এ ঘটনা ঘটে গেল। অপরদিকে ঐ খ্রিস্টান লোকটি তার মেয়েকে নিয়ে হযরতের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আবেদন করল, হযরত আমার

মেয়েকে মুসলমান বানিয়ে বিবাহ করে নিন। তখন হযরত বললেন, আমার তো বিবাহের প্রয়োজন নেই। আমার স্ত্রী আছে। তার প্রতি আমার না আছে কোন ইশক, না আছে কোন প্রকার মহব্বত। পরে যখন তিনি চিন্তা ফিকির করলেন, তখন বুঝতে পারলেন অন্তরে যে আশংকা সৃষ্টি হয়েছিল, তা মূলত আত্মগর্ব ছিল যে সত্যিকারে আমরাই মানুষ। এ খ্রিস্টানরা কী করছে। এমন হালতের উত্তর দেয়া হয়েছে। এ ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয়, বড় বড় ওলীদের থেকে গোনাহ হতে পারে।

## অলীদের গোনাহ হতে হেফাজত থাকার মাধ্যম

আউলিয়াদের মধ্যে তাকওয়া বা খোদাভীতি প্রবল থাকে। এ প্রবলতার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের গোনাহ হতে অতি তাড়াতাড়ি ফিরে আসা নসিব করেন। এ ব্যাপারে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ۝

যাদের মনে ভয় রয়েছে তাদের উপর শয়তানের আগমন হওয়ার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনা শক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে।

যাদের স্বভাবই তাকওয়া ও পবিত্রতার আর অন্তরে তাকওয়াকে স্থান করে নিয়েছে, তাদের যদি শয়তান হামলা করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ তো শয়তানের হামলার শিকার হয়; কিন্তু পরক্ষণে তাদের ভিতর তাকওয়ার জোশ উঠে এবং সাথে সাথে ঈমানি শক্তি প্রকাশ পায়। তখন 'লা হাওলা...' পড়তে পড়তে শয়তানের হামলা থেকে বেঁচে থাকে।

এ থেকে একটা বিষয় বুঝে এল, কিছু গোনাহ তো এমন যে, তার উৎস অন্তরে জমা আছে এবং সর্বদা গোনাহ হয়েই চলছে। যেমন– যিনাকারীর মাদ্দা, সে তো সর্বদা তাতে লিপ্ত থাকে। আর কিছু গোনাহ আছে এমন যে অন্তর একেবারে পবিত্র, তাতে কোন গোনাহ করার মাদ্দাই নেই। কিন্তু পরিবেশের প্রভাবে পড়ে গোনাহ করে বসে। তাহলে সে হাজারো তাওবা করে। আর তার তাওবা এত বড় হয় যে, যদি সে গোনাহ না করত, হাজার হাজার নেক কাজ করত, তাহলে সম্ভাবত এত উঁচু স্থানে সমাসীন হতে পারত না, যতটুকু তিনি গোনাহ করার পর তাওবাহ ও ইস্তিগফার দ্বারা হয়েছেন।

তাই আউলিয়াদের মধ্যে গোনাহ করার মাদ্দা এছ এবং সম্ভাবনাও আছে যে, তারা গোনাহে লিপ্ত হবে এবং প্রকাশ্যে গোনার লিপ্ত হবে। কিন্তু যতক্ষণ তারা তাওবা না করে, ততক্ষণ শান্তি পায় না। আর তাদের অনেক উঁচু মানের তাওবা নসীব হয়।

## নবীদের ইসমতের কারণ

নবীগণ এমন নন যে, তাঁদের থেকে প্রকাশ্য গোনাহ হয়ে যাবে। তবে চিন্তাগত ভুল হতে পারে। কিন্তু তাঁরা স্বেচ্ছায় নিজ থেকে কোন আমল করবেন তা থেকে তাঁরা মুক্ত। তার অনেকগুলো কারণও রয়েছে। একটা কারণ তো এই যে, নবীদের পবিত্র দেহের অধিকাংশ জান্নাতের একটি মাটি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। তাই মাটি যেহেতু পবিত্র, তাহলে তার খামিরও পবিত্র। প্রথম বিষয় হলো শরীরে মাদ্দা পবিত্র বস্তু দ্বারা ঘটিত হলে তা দ্বারা যে তবিয়ত ঘটন হবে, কুদরতিভাবে সেই তবিয়ত পবিত্র হবে। আর এ কথা তো সুস্পষ্ট যে, যখন তবিয়ত ভাল হবে, তখন তা ভাল দিকেই যাবে। খারাপের দিকে কখনও যাবে না। আবশ্যকীয়ভাবে তার মধ্যে শুধু ভালোই হবে। কোন গোনাহ প্রকাশ হওয়া দূরে থাক তার মধ্যে গোনাহের শঙ্কাও সৃষ্টি হবে না।

তাই মাদ্দা যেহেতু পবিত্র, তাহলে দেহও পবিত্র। এ কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নবীদের দেহ থেকে যে কর্মসমূহ ও আমলসমূহ প্রকাশ পাবে, তাও পবিত্র হবে। যখন প্রকাশ্য বডি পাক মাদ্দা (ধাতু) দ্বারা তৈরি, তাহলে অবশ্যই তার ভিতরে আত্মা তেমনি পূত-পবিত্র। আর সেই রূহগুলোতে সর্বদা মুশাহিদা (আল্লাহর দিদার) বিদ্যমান। তারা সর্বদা আল্লাহর সকাশে উপস্থিত। মানুষ নিজ ঘরে বসে পাপের কল্পনা করবে, তা তো সম্ভব। কিন্তু যারা বাদশার দরবারে উপস্থিত, তার বড়ত্ব ও জালাল গুণ দেখছেন, সেখানে তা বাদশার হুকুমের বিপরীত করা সম্ভব নয়। নবীগণ যেহেতু সর্বদা মুশাহাদার অবস্থায় থাকেন, ফেরেশতারা তাঁদের সামনে। ওহী তাঁদের উপর আসে, তাহলে বেচারা নফস কী করতে পারবে। সে এ সকল মাদ্দার কাছে পরাজিত থাকবে। দেহ পবিত্র, আত্মা পবিত্র, উপরন্তু অবস্থাও পবিত্র, সর্বদা মুশাহাদা, ওহী নাযিল হয়, আল্লাহর ইলম হুবহু নাযিল হয়, আবার উপর থেকে আল্লাহর হেফাজত, তাই গোনাহের কল্পনাই করা যায় না। যেহেতু তাদের দ্বারা দুনিয়াতে হেদায়েতের কাছ করানো উদ্দেশ্য এ কারণে তাঁদের

মাসুম গোনাহ থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। যদি তাঁদের থেকে একটা গোনা ও প্রকাশ পেয়ে যায়, তাহলে মানুষ তাঁদের কথা শুনবে না। তারা বলবে, আপনারা তো এ কাজে লিপ্ত, তাহলে আমাদের কেন নিষেধ করেন, উপদেশ দেন। এ কারণে তাদের গোনাহ হতে মুক্ত রাখা হয়েছে। তাদের মাদ্দা পাক, আত্মা পাক, অবস্থা পাক, পরিবেশ পাক, তার উপর আবার মুশাহাদার গুণে গুণান্বিত। সর্বদা শাহী দরবারে উপস্থিতি। এ কারণে সেখানে স্বভাবগতভাবে গোনাহ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়। বেশি বেশি আকলিভাবে গোনা হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

## অলীদের থেকে গোনাহ প্রকাশ তাকওয়া বিরোধী নয়

আউলিয়াদের থেকে যুক্তিগত ও অভ্যাসগত উভয় অবস্থায় গোনাহ হওয়া সম্ভব। আল্লাহ প্রদত্ত যে সকল প্রতিবন্ধক নবীদের দেয়া হয়েছে, সেগুলো তাঁদের জন্মগত মাদ্দার নেই, আত্মারও নেই। তাঁদের সামনে ফেরেশতা নেই, তাঁদের উপর ওহী নাযিল হয় না। এ কারণে গোনাহ করার সম্ভাবনা আছে এবং অনেক গোনাহ হয়েছেও। কতক সাহাবা থেকে গোনাহ প্রকাশ পেয়েছে। যেমন হযরত মায়াজ ইবনে মালেক রা. হতে যিনার গোনাহ প্রকাশ পেয়েছিল। এ কারণে তাঁকে পাথর মারা হয়। কিন্তু পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, অন্তর তো পবিত্র এবং গোনাহ তাতে গেয়ে বসেনি, মজবুত হয়নি। পরিবেশের প্রভাবে গোনাহ সংঘটিত হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি এত তাওবা করেছেন যে, হাদীস শরীফে এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মায়াজ ইবনে মালেক এতবড় তাওবা করেছে যে, তার তাওবা যদি সারা জগতে ছড়িয়ে দেয়া হয়, তাহলে তার তাওবার প্রভাবে সকলের পাপ মাফ হয়ে যাবে। তো ওয়ালীদের মধ্যে যুক্তিগত গোনাহ সম্ভব, তাই নয় বরং এক প্রকার অভ্যস্ত হওয়াও সম্ভব যে, গোনাহ হয়ে যাবে। কিন্তু তাদের আল্লাহর পক্ষ হতে কুদরতিভাবে হেফাজত করা হয়। তাই গোনাহ হয় না। যদি হয়ে যায়, তাহলে এমন তাওবা নসিব হয় যে, শত বছর ইবাদত করেও মনে হয় এত উঁচু মাকাম লাভ হতো না যা তাদের তাওবা দ্বারা অর্জন হয়। সায়্যিদানা হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর ঘটনা। তিনি রাতে ঘুমালেন। শয়তান তার উপর কিছু বদ আসর ছড়িয়ে দিয়ে অন্তর ও মস্তিষ্ককে বিকৃত করে ফেলে। ফলে তিনি শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য চোখ খুলতে পারেননি। ফলে তাহাজ্জুদ ছুটে গেল। তাহাজ্জুদ ছেড়ে দেয়া গোনাহের কাজ নয়। তা উম্মতের উপর ফরজ বা ওয়াজিব নয়। কিন্তু যাঁরা আল্লাহ ওয়ালা

এবং তাহাজ্জুদের অভ্যস্ত, তাঁদের যদি এক দিনের তাহাজ্জুদ কাযা হয়ে যায়, তাহলে তাঁরা মনে করেন, সারাটা জীবনই বেকার আর তাদের কাছে মনে হয়, তাদের মাথায় পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে। তাই হযরত মুয়াবিয়া রা. তাহাজ্জুদ কাযা হওয়ার কারণে সারা দিন কান্নাকাটি করলেন, ইস্তিগফার করলেন, কেঁদে কেঁদে দোয়া করলেন এবং বললেন এটি আমার প্রথমবার কাযা।

মোটকথা, পরের রাতে যখন তাহাজ্জুদের সময় হয় তখন এক ব্যক্তি হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর আঙ্গুল নাড়াতে লাগল। বলতে লাগল, আমিরুল মুমিনীন! তাহাজ্জুদের সময় হয়েছে, উঠুন তাহাজ্জুদ পড়ে নিন। হযরত মুয়াবিয়া রা. অপরিচিত ব্যক্তির আওয়াজ অনুভব করে তার হাত ধরে ফেলেন। তিনি বললেন, আমার বিছানায় তুমি কে যে আমাকে আমার হেরেমের ভিতর তাহাজ্জুদের জন্য জাগাতে এলে? সে বলল, আমি শয়তান। আপনাকে তাহাজ্জুদের জন্য উঠাতে এলাম। তিনি বললেন, রে দুর্ভাগা! তুমি আমাকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত করেছ। শয়তান বলল, জি, আমার ভিতর আবেগ উথলে উঠল যে, আমি চাই না, আপনার তাহাজ্জুদ কাজা হোক। তিনি বললেন, তুমি আমার কল্যাণ চাইবে? আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا

শয়তান তোমাদের দুশমন, তাদের দুশমনই মনে কর।

শয়তান কখনও বন্ধু হতে পারে না। এ কারণে তুমি আমার বন্ধু তা হতে পারে না। সত্য সত্য বলো, কেন এসেছ? অন্যথায় আমি কিন্তু সাহাবী, এত শক্তি রাখি যে, তোমার ঘাড়টা মটকে দিব। তিনি তার হাত আরো শক্ত করে ধরলেন। তারপর সে আসল কথা বলল- এই আমিই আপনাকে গতকাল তাহাজ্জুদ পড়তে দেইনি। ফলে আপনার তাহাজ্জুদ কাজা হয়েছে। আমি কিছু ওয়াসওয়াসা ও প্রভাব আপনার অন্তর ও দেমাগে ঢেলে দিয়েছি বলে আপনি তাহাজ্জুদের সময় চোখ খুলতে পারেননি। এ কারণে আপনি সারাদিন কান্নাকাটি করেছেন। তাতে আপনার মাকায এত পরিমাণ উঁচু স্থানে পৌঁছেছে, যা তাহাজ্জুদ দ্বারা হতো না। আমি আপনাকে এ কারণে জাগ্রত করলাম যে, যদি আজও তাহাজ্জুদ কাজা হয়ে যায় এবং আপনি আবার তাওবা করেন, তাহলে আরো মত উঁচু মাকামে চলে যাবেন। তাই শত মাকাম হওয়া থেকে এক মাকাম হওয়াই ভাল। এতে কিছুটা তো উপকার হবে। এ কারণে আমি আপনাকে জাগ্রত করলাম। তারপর হযরত আমিরে মুয়াবিয়া

রা. তাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, ঠিক বলেছ। এমন খারাবি তোমার ভিতর লুকিয়ে আছে।

সুতরাং বড় বড় অলীদের থেকে গোনাহ্ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আবার স্বভাবগতভাবে হওয়া সম্ভবও। কিন্তু এমনটি তাকওয়া ও খোদাভীতির খেলাফ নয়। কারণ, তাকওয়া অন্তরে শিকড় গেড়েছে আর গোনাহ্ তা করতে পারে না। তা কিছু বহিরাগত প্রভাবে ঘটনাক্রমে হতে পারে। কিন্তু নবীদের থেকে এমনটিও সম্ভব নয়।

## ইসমতের মাকাম ও শয়তান

হাদীস শরীফে এসেছে, প্রতিটি কলবের ডান পাশে ফেরেশতাদের মাকাম আর বাম পাশে শয়তানের স্থান। ফেরেশতা ভালোর প্রতিশ্রুতি দেয় আর শয়তান খারাপ বোঝায়। উভয়ের লড়াই হয়। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কলবের বাম পাশেও কি শয়তানের মাকাম? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু আমার শয়তান নিজেই মুসলমান হয়ে গেছে। তার প্রভাব আমার উপর কি পড়বে, আমার প্রভাব তার উপর পড়েছে যে, তার হাকিকত পরিবর্তন হয়ে গেছে। কিছু বর্ণনায় এমন বাক্য এসেছে যে, সে শয়তানই রয়েছে; কিন্তু আমি নিজেকে তার থেকে বাঁচিয়ে চলি। তার ধোঁকা ও প্রতারণা আমার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে না। শয়তান নবীদের উপর কোন প্রকার প্রভাব ফেলতে পারে না। তাদের আকৃতিও ধারণ করতে পারে না। হাদীস শরীফে এসেছে, যদি কেউ আমাকে স্বপ্নে দেখে, তাহলে সে আমাকেই দেখল। কারণ, শয়তানের শক্তি নেই আমার আকৃতি ধারণ করার এবং এ কথা বলার যে, আমিই নবী। সে আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না, তাহলে কিভাবে আমার উপর প্রভাব ফেলবে।

## অলীদের হেফাজত ও শয়তান

শয়তান আউলিয়াদের অন্তরে প্রভাব ফেলতে পারে। তবে সম্ভাবনা আছে যে তারা কখনও পথভ্রষ্ট হতে পারে। কোন গোনাহ তাদের থেকে হতে পারে। কিন্তু যেহেতু তাদের ভিতর তাকওয়া প্রবল এ কারণে তাকওয়া গোনাহের উপর প্রবল হয়ে তা থেকে বাঁচাতে পারে। যদি ঘটেই যায়, তাহলে এমন আজিমুশ্বান তাওবা নসিব হয় যে, শত ইবাদতের চেয়ে বড় ইবাদত হয়।

## সারকথা

সারকথা হলো, নবীগণ মাসুম। তাঁদের ইসমত ইখতিয়ারভুক্ত। আর আউলিয়ারা মাহফুজ। তাঁদেরকে আল্লাহ হেফাজত করেন। হেফাজতের অর্থ হলো গোনাহ করা অভ্যাসগতভাবে সম্ভব। আর নবীদের বেলায় স্বভাবগত গোনাহ সম্ভব নয়, তবে যুক্তিগত সম্ভব। কিন্তু তাঁদের গোনাহ হবে না, যদি হয় তাহলে তা গোনাহ নয় বরং চিন্তাগত ভুল। আর এ ভুলের উপর নবীদের রাখা হয় না বরং তাৎক্ষণাৎ জানিয়ে দেয়া হয়। আর শিশুরাও মাসুম তবে তাদের ইসমত, অপারগতাসুলভ। কেননা, তাদের মধ্যে গোনাহের উৎসস্থল এখনও উথলে ওঠেনি। তার কামশক্তি, মর্যাদা লাভের শক্তি এবং চিন্তা-ফিকির ও ধোঁকাবাজির শক্তি কোনটাই জাগ্রত হয়নি যে, সে শয়তানি কাজ করবে। তার মধ্যে শুধু একটি ক্ষতিকর স্বভাব থাকে তাহলো খেলাধুলা। কিন্তু তার ইচ্ছাশক্তি থাকে না যে ইচ্ছা করে ধোঁকা ও প্রতারণা করবে। তাদের মন ও দিল একেবারে সাদাসিদে হয়। তাই মাসুম উভয়জনই। তবে একজন সৃষ্টিগত আর অপরজন স্বেচ্ছাজনিত। একজন জেনেশুনে মাসুম, আরেকজন অজানাবশত। একজন শক্তি-সামর্থ পুরোপুরি থাকার পর মাসুম, অপরজন হলো অসম্পূর্ণ থাকার কারণে মাসুম। আর আউলিয়ারা মাসুম নয় বরং মাহফুজ, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা কুদরতিভাবে হেফাজত করে।

## হুকুমের গোলামের নিকট রহস্য প্রকাশ হয়

হযরতের বয়ানের মজলিসে এক ব্যক্তি একটি কাগজের টুকরার একটা প্রশ্ন লেখে তার খিদমতে পেশ করল। তিনি তা পড়ে শুনালেন। প্রশ্নটি ছিল এমন– কাফের, মুশরিকদের নাবালেগ সন্তান, যারা নাবালেগ অবস্থায় মারা যায়, তাদের কেমন হাশর হবে? তারাও তো মানুষ। এ ব্যাপারে শরীয়তে কোন সমাধান থাকলে তার হুকুম ও রহস্য বর্ণনা করা হোক। প্রশ্নের শেষ অংশ হুকুম ও রহস্য বর্ণনা করার আবেদন হযরতের পছন্দ হয়নি। এ কারণে তিক্ত মেজাজে উত্তর দিতে গিয়ে বললেন, 'রহস্য ও হুকুমসহ বয়ান করা' এটি কেমন বাক্য। রহস্য ও হুকুম বর্ণনা করা আমাদের উপর কবে জরুরি হলো। আমরা শুধু হুকুম বর্ণনা করি। তাই হুকুম বর্ণনা করব। হুকুম ও রহস্য একসাথে জানতে চাওয়াও ভুল। রহস্যপ্রার্থী কখনও রহস্য পায় না। রহস্য খোলে খাদেম ও আনুগত্যকারীর নিকট। কেউ যদি বাদশাহর সামনে গিয়ে

বলে, জনাব! আপনার রাজত্বের সকল ভেদ ও গোপন রহস্য আমাকে বলে দিন এবং শাহী বেগমদের পর্দা উঠিয়ে দিন এবং এও বলে দিন যে, আপনার ভান্ডারে কি পরিমাণ মণি-মুক্তা আছে? তাহলে বাদশাহ বলবেন, এ বেকুফকে কান ধরে বের করে দাও। এ কে আমাদের গোপন রহস্য জানার!

আরেকজন বাদশাহর খুব অনুগত ও ফরমারদার। তাকে বাদশাহ হুকুম করে তুমি দাঁড়িয়ে যাও, সে বলে তাই হবে। হুকুম করে বসে যাও, সে বলে তাই হবে। হুকুম করে বাড়িতে চলে যাও, সে বলে তাই হবে। হুকুম করে অমুক সময় এখানে উপস্থিত হবে। সে বলে ঠিক আছে তাই হবে। সে এমন খাদেম যে, বাদশাহর সকল হুকুম সকল কথা, সর্বদা পালন করার জন্য তৈয়ার। সুতরাং সে হুকুমের গোলাম। সারা বছর আনুগত্য করতে করতে যখন বাদশাহর আত্মনির্ভর হবেন তখন বলবেন, খুব মুখলিস নিষ্ঠাবান ও আনুগত্যশীল গোলাম। তারপর তাকে হুকুম দেয়া হবে, তুমি আজ হতে সারা শাহী মহলে যে কোন সময় প্রবেশ করতে পারবে, তুমি নির্ভরযোগ্য, তোমার জন্য কোন বাধা নেই। তোমার জন্য বেগমদের পর্দা উঠে গেল। তুমি অন্দর মহলে প্রবেশ করতে পারবে। এখন সে আন্দর মহলে আসা-যাওয়া করে আর আনুগত্য আগের মতোই জারি আছে। সে একেবারে হুকুমের গোলামে পরিণত হয়েছে। এভাবে দুটি বছর কেটে গেল। তখন বাদশার পুরোপুরি ভরসা হয়ে গেল যে, সে অনেক বড় মুখলিস এবং আনুগত্যকারী খাদেম। আর উপর খুশি হয়ে বাদশাহ বলবেন, এসো আজ আমি তোমাকে নিজের ধনভান্ডার দেখাবো। ভান্ডার খুলে তাকে ভিতরে নিয়ে যাবে এবং দেখাবে এই জাওহার এই সোনা, এই রোপা দেখে নাও। কিন্তু তার আনুগত্য আগের মতো জারি আছে, সে আনুগত্য করেই চলেছে। এভাবে কেটে গেল জীবনে আরো চার-পাঁচটি বছর। তখন বাদশাহ বলেন, আসো তোমাকে হুকুমত পরিচালনার পলিসি বোঝাব.। হুকুমতের একটা পলিসি হলো এই, আরেকটি হলো এই। এভাবে তাকে সব বোঝাবেন। রহস্য ও ভেদ জানার জন্য এটিই কার্যকরী হেকমত। একমাত্র খাদেম এবং আনুগত্যশীল ব্যক্তিদের নিকট সব খুলে যায়। আর যে চাবে যে জনাব বেগমদের পর্দা সরিয়ে দেন, তাহলে তাকে কানে ধরে বের করে দাও; সে রহস্য জানার কে?

তাই রহস্য জানা যায় না। তা এমন প্রভাবের নাম, যা আনুগত্য দ্বারা অর্জই হয়। এ কারণে মানুষের উচিৎ হলো হুকুম জানবে। এমন প্রশ্ন করা উচিত নয় তার হেকমত বলেন, তার রহস্য ভেদ বলেন। এগুলো তালাশ করার উদ্দেশ্য হলো, আপনি হুকুম মানবেন না যতক্ষণ তার রহস্য না জানতে

পারবেন। তাহলে আপনি আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যশীল হলেন না, আনুগত্যশীল হলেন নিজের আকল ও যুক্তির। যদি আকল দ্বারা বুঝতে পারি, তাহলে মানব; অন্যথায় মানব না। এটি অত্যন্ত বেহুদা প্রশ্ন যে, রহস্য বলেন হুকুম বলেন। প্রশ্ন হওয়া উচিত হুকুম কী? তারপর রহস্যভেদ অর্জই করতে হলে প্রথমে তার আনুগত্য করতে হবে, মানতে হবে। দীনের উপর দৃঢ়ভাবে অটল থাকতে হবে এবং ফারায়েয ও ওয়াজিবসমূহ আদায় করে প্রমাণ করতে হবে, আমার তবিয়ত খাদেম, আকলও খাদেম, ইচ্ছাও আল্লাহর গোলাম, সবকিছুই আল্লাহর গোলাম। তাহলে রহস্য উন্মোচিত হবে। রহস্য তো এক প্রভাবের নাম এবং প্রভাব তালাশ করা যায় না। আর আহকাম তালাশ করা যায় তাই হুকুম জিজ্ঞেস করো যে, মুশরিকদের নাবালেগ বাচ্চাদের হুকুম কী?

## কাফেরদের নাবালেগ সন্তানরা জান্নাতি না জাহান্নামি

কাফেরদের নাবালেগ সন্তানদের সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কেরাম পৃথক অধ্যায় কায়েম করেছেন এভাবে যে, 'মুশরিকদের নাবালেগ সন্তান জান্নাতি, না জাহান্নামি?' এদের সম্পর্কে উলামাদের আট ধরনের অভিমত রয়েছে। একটি অভিমত হলো এই যে, তাদের ফিতরাতের উপর হুকুম লাগানো হবে। যেহেতু তারা এখনও বালেগ হয়নি তাদের ফিতরাত ছিল পবিত্র, নিখাঁদ। আমলের হুকুম তাদের উপর লাগেনি। জান্নাত ও জাহান্নাম তো আমলের কারণে। এদের তো আমলই নেই। এ জন্য ফিতরাতের উপর হুকুম লাগিয়ে তাদের জান্নাতি করা হবে। কিন্তু তাদের জান্নাতে প্রবেশ, শাস্তি বা বদলা হিসেবে নয় বরং পুরস্কার হিসেবে, সম্মান হিসেবে দেয়া হবে। তাদেরকে জান্নাতীদের জন্য খাদেম-খাদেমা বানানো হবে। তারা জান্নাত প্রবেশ করবে কিন্তু আসল জান্নাতির খাদেম-খাদেমা হয়ে। আর এটাই তাদের জন্য অনেক প্রাপ্তি হবে যে, তাদের জান্নাতে খাদেম বানিয়ে তাতে প্রবেশ করানো হয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত হলো, তাদের ব্যাপারে তাওয়াক্কুফ করা অর্থাৎ তাদের সম্পর্কে হুকুম লাগিও না। কেননা, তাদের ব্যাপার বিপরীতমুখী বর্ণনা করেছে। তাই অকাট্যভাবে তাদের জান্নাতি বা জাহান্নামি হুকুম লাগানো ঠিক না। এ কারণে নিশ্চুপ থেকে ব্যাপারটি আল্লাহর উপর ন্যস্ত করো। তিনিই ভালো জানেন তাদের কী করবেন; আমাদের জানা নেই।

আরেকটি মাযহাব হলো, তাদেরকে বাপ-দাদার অনুগামী করে দেয়া হবে। অর্থাৎ বাপ-দাদা জাহান্নামী হলে তারাও জাহান্নামী আর তারা জান্নাতী হলে

এরাও জান্নাতি। কেননা, দুনিয়াতে যখন আদমশুমারি হয়, তখন বাচ্চাদের গণনা করা হয়। মুসলমান বাচ্চাদের মুসলমান হিসেবে গণনা করা হয়। অথচ তাদের ইসলামেরও খবর নেই, অন্য কিছুরই খবর নেই। কিন্তু মা-বাবার অনুগামী বানিয়ে মুসলমান হিসেবে ধরা হয়। এ মাযহাবওয়ালারা কিয়াস করে থাকে কুরআনের এ আয়াতের উপর–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের বাপ-দাদাদের সাথে মিলিত করে দেব।

যারা ঈমান এনেছে; কিন্তু তাদের আমল বেশি শুদ্ধ ছিল। তাদের বাপ-দাদাদের সম্মানার্থে তাদের মর্তবা বাড়িয়ে দেয়া হবে; অথচ তাদের আমল সঠিক ছিল না। সুতরাং যখন মুমিনদের সম্মানার্থে তাদের সন্তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে, তাহলে তাদের পূর্বপুরুষ জান্নাতি হওয়ার কারণে তারা তাদের অনুগামী হয়। তাই কাফেরদের সন্তানরা জাহান্নামী হবে তাদের পূর্বপুরুষদের ন্যায়।

আরেকটি কারণ হলো– বাচ্চা যতক্ষণ নাবালেগ থাকে বিশেষ করে দুধখোর শিশু, সে বাস্তবে মাতাপিতার আত্মার অংশবিশেষ। মা দুধপান করায় এ কারণে মার নফসের অনুগামী আর বাবা উপার্জন করে, এ কারণে সে বাবার নফসের অনুগামী। যখন সে বড় হয়ে আকেল বালেগ হয়ে নিজ পায়ে দাঁড়াবে, তখন বলা যাবে, এখন তার মধ্যে স্বনির্ভরতা সৃষ্টি হয়েছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত বুদ্ধিতে পূর্ণতা না আসে, ততক্ষণ তাকে মাতা-পিতার অনুগামী মনে করা হয়। মাতাপিতা মুসলিম হলে তারাও মুসলিম। মাতাপিতা কাফের হলে তারাও কাফের। তার কাফের বা মুসলমান তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন সে তা নিজ আকল ও স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে। তাই নাবালেগ সন্তান মাতা-পিতার অনুগামী। সুতরাং তাদের যে হুকুম সন্তানদের একই হুকুম হবে। আরেকটি অভিমত এমন যে, তারা জান্নাতিও না, দোযখীও না। বরং তাদের জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থানে আরাফ নামক একস্থানে রাখা হবে, যা জান্নাতও না, জাহান্নামও না।

আরেকটি অভিমত হলো, কেয়ামত দিবসে তাদের পরীক্ষা করা হবে। আগুন প্রজ্বলিত করা হবে। তারপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে ঐ সকল বাচ্চাদের বলা হবে, তোমরা আগুনে লাফিয়ে পড়। তখন যাদের মেজাজ পবিত্র থাকবে

জন্মগতভাবে। তারা লাফিয়ে পড়ে যাবে। তখন ঐ আগুন আল্লাহর হুকুমে বাগবাগিচা হয়ে যাবে। আর কতক চিন্তা-ফিকির করতে থাকবে যে, আমরা আগুনে কিভাবে লাফ দেব, তারা ভয় পাবে, কাঁপতে থাকবে, তারা আগুনে লাফিয়ে পড়বে না। এতে বোঝা যাবে, তারা যদি বড় হতো, তাহলে এমন অবাধ্যতা তাদের মধ্যে হতো। তাদের ফিতরতের ভিতর অবাধ্যতা রয়েছে।

আরেকটি অভিমত হলো, সেখানে পরীক্ষা নেয়া হবে আমল প্রকাশ পাবে না। শুধু যাচাই করা হবে যে তাদের ফিতরতের রুখ কি? সেই অনুসারে তারা জান্নাতি বা জাহান্নামি হবে।

## অধিকতর নিরাপদ মাযহাব

উক্ত আটটি মাযহাব তন্মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ মাযহাব হলো ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর তাওয়াক্কফের মাযহাব যে, আমরা কোন ধরনের হুকু লাগাব না, আল্লাহ তায়ালা ভাল জানেন। চাই তিনি ফিতরতের উপর হুকুম লাগান বা আমলের উপর হুকুম লাগান। আমরা এ ব্যাপারে কিছুই বলতে পারব না। কেননা, শরীয়ত তো প্রকাশ্য অবস্থার উপর হুকুম লাগায় আর এখানে তো প্রকাশ্য কোন বিষয় নেই। তার ফিতরতের কথা ধরা যাক, তাতো বাতেনী বস্তু, বাতেন সম্পর্কে তো আমাদের কোন খবর নেই। আবার আমরাই বা কারা হুকুম লাগাবার অধিকার রাখি। সুতরাং সবচেয়ে নিরাপদ মাযহাব হলো তাওয়াক্কুফ করা। অথবা বেশির চেয়ে বেশি এতটুকু বলতে পারি, যা অধিকাংশ ইমাম বলেছেন যে, তারা জান্নাতবাসীর খাদেম-খাদেমা হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

## জন্মনিয়ন্ত্রণ

প্রশ্ন : বর্তমান সময়ে মুসলমানদের মধ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণের কাজ অধিক হারে বেড়ে গেছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এর কতটুকু সুযোগ আছে?

উত্তর : শরয়ী বিধানমতে জন্মনিয়ন্ত্রণ নিষেধ। কারণ, শরীয়ত চাই অধিক সন্তান। এ ভিত্তিতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ

এমন মহিলাদের বিবাহ কর, যাদের থেকে সন্তান বেশি হয়,

যাতে কেয়ামত দিবসে অধিক উম্মতের উপর গর্ব করতে পারি।

এ কারণে সাধারণ নিয়ামানুযায়ী অধিক সন্তান গ্রহণ করা। তবে ইসলাম যেহেতু পরিপূর্ণ এবং মধ্যম পন্থার জীবন বিধান এ কারণে অন্য সাইডের প্রতি লক্ষ্য রাখে। যদি স্বামী ও স্ত্রী এত দুর্বল হয়ে যায় যে সন্তান হলে জীবনের আশকা দেখা দিবে, আবার পরস্পর মিলে সিদ্ধান্তও নিয়ে নেয় যে সন্তান না নেবার তাহলে জন্মনিয়ন্ত্রণ ওষুধ গ্রহণ করতে পারে।

## বিশেষ মুহূর্তে ভিন্ন হুকুম

বিশেষ মুহূর্তে হুকুমকে কেউ যদি সাধারণ হুকুমের ন্যায় পেশ করে বলে যে, ইসলামে জন্মনিয়ন্ত্রণ বৈধ। তাহলে তা আমানতের খেয়ানত হবে। আর এটা এমন হবে যে, মদ হারাম এবং আইনি নাপাক। আবার অকাট্য দলিল দ্বারা তার অবৈধতার প্রমাণ আছে। কিন্তু মাসয়ালা এমনও আছে যে, কোন অভিজ্ঞ ডাক্তার যদি বলে তার মদপান করা লাগবে অন্যথায় মারা যাবে, তখন মদপান করানো জায়েয আছে। কারণ, জান বাঁচানো ফরজ। সুতরাং এটি একটি বিশেষ মুহূর্তে ভিন্ন হুকুম। কিন্তু কেউ যদি তাকে সাধারণ কানুনরূপে ঘোষণা করে যে, ইসলাম মদকে হালাল করেছে, তাহলে এটা জঘন্যতম খেয়ানত হবে।

এ কারণে আম কানুন স্বস্থানে প্রয়োগ হয় আর ইসতেসনায়ী কানুন বা বিশেষ ভিন্ন কানুন ভিন্ন স্থানে হয়। উদাহরণস্বরূপ কুরআনুল কারিমে রয়েছে, যে নিজ জিহ্বা দ্বারা কখনও কুফুরী কথা উচ্চারণ করা যাবে না। কুফুরী কথা যবান দ্বারা বের করা শরয়ীভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু পরবর্তীতে বলে, আপনারা মুহূর্তে কুফুরী কথা বলার অনুমতি আছে। উদাহরণস্বরূপ অন্তর এতমিনানের সাথে ঈমান থাকবে। কিন্তু কেউ যদি গলায় তলোয়ার রেখে বলে, কুফুরী কথা বলো অন্যথায় জবাই করে ফেলব, তাহলে এমন মুহূর্তে কুফুরী কথা বলার ইজাজত আছে যে, যবানে কুফুরী কথা বলে ফেলো, তবে অন্তরে ঈমান রাখ, তাহলে আল্লাহর কাছে গ্রেফতার হবে না।

এখন যদি সাধারণভাবে কেউ বলে, ইসলাম ধর্মে কুফুরী কথা বলা বৈধ এবং আম কানুনরূপে বলে বেড়ায়, ইসলামে কুফুরী কথা বলা জায়েয, তাহলে তা সরাসরি খেয়ানত হবে। এটি তো শুধু এক বিশেষ মুহূর্তের আদেশ, তার অনুমতি বিশেষ মুহূর্তে। এ কারণে সাধারণ কানুন এবং বিশেষ কানুন উভয়টা

আলাদা আলাদা হবে। আমকে আমের স্থানে রাখতে হবে আর খাসকে খাসের স্থানে রাখতে হবে।

শরীয়তের বিধানে নামায দাঁড়িয়ে পড়া ফরজ। তবে অসুস্থতার কারণে দাঁড়াতে না পারলে বসে বসে পড়। বসেও না পড়তে পারলে শুয়ে শুয়ে পড়। এখন যদি কেউ একে কানুনরূপে বলে দেয়, ইসলামের কানুন হলো নামায বসে বসে পড়া। তাহলে এটি খেয়ানত হবে। আম হুকুম যা ছিল তাই থাকবে যে দাঁড়িয়ে নামায পড়। তবে বিশেষ কারণে বসে পড়ার অনুমতি আছে। তবে সেটা ব্যক্তিগত নিয়ম, সাধারণ নিয়ম নয়। জন্মনিয়ন্ত্রণের বেলায়ও একই নিয়ম। অধিক সন্তান গ্রহণ করা তো সাধারণ হুকুম। তবে বিশেষ মুহূর্তে তার অনুমতি আছে। কিন্তু সেটা ব্যক্তিগত, সাধারণভাবে নয়। এ কারণে ফতওয়া গ্রহণ করা প্রয়োজন। যদি মুফতী সাহেব ফতওয়া দিয়ে দেন, তাহলে তা সাধারণ হুকুম থেকে বের হয়ে ব্যক্তিগত অনুমতিরূপ ধারণ করে। সাধারণ কানুন তার স্বস্থানে স্বঅবস্থায় বহাল থাকবে।

## সুপরিকল্পিত বিশৃঙ্খলা দ্বারা রুটির হেফাজত হয়

আমার নিকট সাহরানপুরের দুজন ডেপুটি সহকারি কালেক্টার এল। তারা জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করল। তাদের এ প্রশ্নের উত্তর আমি কৌতুক আকারে দিলাম। এতে তারা লজ্জিত হলো। তা ছিল এই– আপনাদের চিন্তার কারণ হলো সন্তান বৃদ্ধি পাচ্ছে, আবাদী বৃদ্ধি পাচ্ছে আর রুটির ঘাটতি হচ্ছে। আপনারা এ ব্যাপারে আলোচনা করেন না যে, এটি শুদ্ধ, না অশুদ্ধ। সুতরাং আপনাদের চিন্তা হলো আবাদী বাড়ার কারণে রুটির ঘাটতি হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করি, আগত এ মসিবত বর্তমান জনগণ দ্বারা, না আগত সন্তানদের দ্বারা আশংকা করছেন? তারা উত্তর দিল, বর্তমানদের দ্বারা এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তাদের উত্তরের প্রেক্ষিতে আমি বললাম, আগতদের রাস্তা বন্ধ করেন পরে, এখন বর্তমানদের কমানো শুরু করে দিন। আর তার সুন্দর প্রক্রিয়া হলো দেশগুলোতে মারামারি, কাটাকাটি শুরু হচ্ছে; সেগুলো সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক করা। প্রতিটি শহরে দৈনিক দু-তিনটি দাঙ্গা হতে থাকবে এবং গ্রহণযোগ্য সংখ্যক মানুষ নিহত হতে থাকবে। তাহলে জনসংখ্যা ইনশাআল্লাহ দশ বছরের মধ্যে যথেষ্ট কমে যাবে। আর আপনাদের রুটি বেঁচে যাবে। এ উত্তর শুনে তারা লজ্জিত হলো।

## সম্পদের সুষম বণ্টন না থাকায়

তারপর আমি বললাম, মুলত আপনাদের যা করার প্রয়োজন তা তো করছেন না, করছেন শুধু অপ্রয়োজনীয় কাজগুলো। রুটি-খাবার ঘাটতির কারণ এই নয় যে, জনসংখ্যা বাড়ছে। আজ ভূমি থেকে এত পরিমাণ কৃষিপণ্য উৎপন্ন হচ্ছে, যে পরিমাণ মানুষ হচ্ছে। মানুষ যত হবে সম্পদও তত বৃদ্ধি পাবে। তারপর যে ঘাটতি হচ্ছে, তার ভিত্তি হলো দেশে সম্পদের সুষম বণ্টন হয় না। যারা গরিব তারা সীমাহীন গরিব। আর যারা ধনী তারা অনেক ধনী। দেশের ঐ জনগোষ্ঠী যারা অঢেল সম্পদের মালেক, যাদের সম্পদের কোন হিসাব নেই, দেশীয় বিধানের উপর তাদের হস্তক্ষেপ রয়েছে। পার্লামেন্টের সদস্যরা তাদের বাধ্যগত। তারা এমন বিধান তৈরি করেছে ফলে ধনীদের সম্পদ বেড়ে চলেছে আর গরিবরা ফুটপাতেও পড়ে থাকতে পারছে না। এতে বোঝা যায়, দেশে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন নেই। যদি আপনার সম্পদের বণ্টন সুষ্ঠু করে দেন যে ধনী ও মালদারদেরকে কিছু নিচু করে দেন আর গরিবদের কিছু উঁচু করে দেন, তাহলে সমতা সৃষ্টি হবে। আর এ অভিযোগ দূর হবে যে, এ দেশে হাজার হাজার টন সম্পদ নষ্ট করে সমুদ্রে ফেলে দেয়া হয় যখন তা নষ্ট হয়ে যায়। এতে বোঝা যায়, সম্পদ ও খাদ্য কম নেই বরং নিয়ত খারাপ বা এ পদ্ধতি খারাপ। আপনারা সম্পদওয়ালাদের প্রতি বিধান করে দেন এবং সম্পদে এমন পন্থা বের করেন, যাতে গরিবরা পেতে পারে। দেশের কেউ যেন ফুটপাতে পড়ে না থাকতে হয়। আজ বোম্বে শহরের ফুটপাতে আট লাখ মানুষ ঘুমায়। যাদের না আছে ঘর, না আছে বাড়ি। সেখানে তাদের ছেলেমেয়ে কাঁদতে থাকে, ঝড়-বৃষ্টি হলে একদিকে সংকুচিত হয়ে পড়ে, কেউ খোলা আকাশের নিচে, কেউ কারো বাড়ির ছাদের নিচে, কেউ গাছের নিচে আশ্রয় নেয়। এভাবে প্রত্যেক শহরে আট লাখ করে মানুষ ফুটপাতে থাকে। এতে অনুমান করা যায়, দেশের গরিব শ্রেণীর মানুষ কত এবং তাদের অবস্থা কেমন। না আছে তাদের খাবার, না আছে কাপড় ও বাসস্থান।

অন্যদিকে দেখেন, বাটা ও টাটাসহ অনান্যান্য কোম্পানির মালেক, তাদের সম্পদের হিসাব নাই। তাদের সম্পদ দিন দিন বেড়েই চলেছে। আর গরিবরা দিন দিন আরো গরিব হচ্ছে। এটা নিয়ম খারাপ থাকার ফল। এমন খারাবীকে আপনাদের দূর করা দরকার। আর আপনারা এ খারাবী নিক্ষেপ করতে চাচ্ছেন মাদের পেটে। মাদের পেটের সাথে তার কি সম্পর্ক। আপনারা আপনাদের বিধান ঠিক করুন। এমন কথাবার্তা চলা অবস্থায় তারা

আমার নিকট থেকে কিছু নসিহত শুনতে চাইল। আমি তাদের নসিহত শুনিয়ে দেই। তারা সেখান থেকে চুপ হয়ে চলে যায়। তাদের বললাম; দুটি সুরত আছে; হয় দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিয়মতান্ত্রিক করে দিন; তাহলে ভালো মন্দ সবাই নিহত হবে, ফলে দশ-বার বছরের ভিতর অনেক মানুষ কমে যাবে। তা না হলে বিধান ঠিক করুন, সম্পদের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করুন।

## পুঁজিবাদীদের বিপত্তির কারণ

আমি বললাম, আসল ঘটনা হলো পুঁজিবাদীরা নিজেদের অসৎ কর্ম আড়াল করার জন্য সমাজে অলিক কথার পাঠক সাজিয়েছে। তারা বলে থাকে, জন্মনিয়ন্ত্রণ কর, এই কর, সেই কর যাতে তাদের সম্পদে প্রভাব ও চাপ না পড়ে। তাদের টাকা-পয়সা বা পুঁজি কমে না যায়। তারা নিজের সম্পদ গোপন করার জন্য চালাকি করে থাকে যাতে পাবলিক পার্সন ধোঁকায় পড়ে যায়। আমরা ধোঁকা খাওয়ার মানুষ নই। আপনারা সংবিধান শুদ্ধ করুন। এ সংবিধান সঠিক নয়। আমি তাদের বললাম, যদি জন্মনিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন, তাহলে বিশ বছর পর মাথায় হাত রেখে কাঁদবেন। সন্তান কমে যাবে, সেনাবাহিনীতে ভর্তি করার মতো উপযুক্ত যুবক পাবেন না, পুলিশ বাহিনীসহ যে কোন সেক্টরে উপযুক্ত লোক নিয়োগ দিতে পারবেন না। সুতরাং জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নিয়ে ভালোরূপে ভাবুন।

## অধিক সন্তান গ্রহণে পুরস্কার

আমি তাদের বললাম, এ দেশে আপনারা খাদ্যসংকটের কারণে আগত জেনারেশনের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে চাচ্ছেন। অথচ কিছু দেশে এমন বিধান রয়েছে যে, সন্তান যত বেশি হবে তাদের মাতাপিতা তত বেশি পুরস্কারের অধিকারী হবে। অর্থাৎ কারো যদি ১০ জন সন্তান হয়, তাহলে এতো পার্সেন্ট পুরস্কার দেযা হবে। ১২ জন হলে এতো পার্সেন্ট। তাদের দেশে খাদ্যসংকট কেন নেই? সেখানকার মানুষ ক্ষুধার্ত থাকে না কেন? কারণ, তাদের দেশে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টনব্যবস্থা আছে। ফলে তারা এহেন মসিবতে পড়ে না।

## বিশেষ মুহূর্তে অনুমতি

**প্রশ্ন :** বিশেষ মুহূর্তে জন্মনিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা যায় কিনা?

**উত্তর :** বিশেষ সময়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা তো ভিন্ন ফাংশন। তার জন্য কিছু ঔষধ রয়েছে। সেগুলো সেবন করলে সন্তান হয় না। যখন স্ত্রীর অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, সন্তান নেয়ার যোগ্যতা তার নেই, জীবনের আশংকা রয়েছে আর বলে আমি আর সহ্য করতে পারছি না, তাহলে এমন মুহূর্তে শরীয়ত অনুমতি প্রদান করে এমন ঔষধ সেবন করবে, যা দ্বারা সন্তান জন্ম নিবে না। তবে বিশেষ হুকুম বিশেষ মুহূর্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাকে সাধারণ নিয়মের মতো চালিয়ে দিলে অনেক বড় খেয়ানত হবে। কুরআন ও হাদীসের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা হবে।

# হাকীমুল ইসলাম আল্লামা কারী মুহাম্মাদ তৈয়ব সাহেব কাসেমী রহ.-এর সাক্ষাৎকার

[সাক্ষাৎকার সংগ্রহে হযরত মাওলানা সামিউল হক সাহেব রহ.]

[হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী রহ.-এর দাওয়াত ও ইলমী সংস্কার, রাজনীতি ও জীবনচরিত এবং সংস্কারমূলক কারগুজারি]

বিগত দিনে যখন হাকীমুল ইসলাম মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তৈয়ব সাহেব কাসেমী রহ. পাকিস্তান সফর থেকে নিজ মহব্বত ও সুসম্পর্কের কারণে দারুল উলুম হাক্কানিয়া আসেন। ফলে দারুল উলুমের পরিবেশ হযরতের আগমনের কারণে জাঁকজমকপূর্ণ মাহফিল এবং বৈঠকে সারা এলাকা আলোকিত করে। তখন মনে হঠাৎ আগ্রহ উদয় হলো যে, মাসিক আল হক পত্রিকার জন্য ইসলামের মার্কাযের পরিচালক এবং হাকীমুল ইসলাম মাওলানা নানুতুাবী রহ.-এর ইলম ও অজানা তথ্যের বিশ্বস্ত ব্যক্তি থেকে ইন্টারভিউ রেকর্ড করানো জরুরি। এদিকে আমার আগ্রহ, ঐদিকে হযরতের ব্যস্ততা ও কাজের চাপ, তারপর হযরতের অসুস্থতা এবং সফরের ক্লান্তির সাথে সাথে ঠা-া জনিত কফ এবং সর্দি-কাশিতে নতুন করে আক্রান্ত। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালার বিশেষ সাহায্য ছিল যে, রাত ১১টার পর এ উদ্দেশ্য কিছুটা একাকিত্ব সময় পেলাম।

## দারুল উলুমের ভবিষ্যৎ

হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর নিকট প্রথম প্রশ্ন ছিল, দারুল উলুম দেওবন্দের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। ভারত থেকে মুসলমানদের তাহযীব-তামাদ্দুন ও সংস্কৃতি, পার্সনাল ল' এবং তাহযীব-তামাদ্দুনের কেন্দ্র সম্পর্কে যে সংবাদ

আসছিল তা যদিও অতিরঞ্জনমূলক কিন্তু অবশ্যই তা চিন্তাদায়ক ও বেদনাদায়ক। তারপর ইলমের উৎসস্থল দারুল উলুম দেওবন্দের কথা স্মরণ হতেই হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়।

## মহব্বতের কারণে হাজারো কুধারণা

যে শাজারায়ে তুবার জন্য হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী রহ., শাহ আবদুল আযীয রহ., হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. এবং বালাকোটের শহীদগণ তার জমিন সমতল করেছেন, চাষাবাদযোগ্য করেছেন। চাষাবাদের ভিত্তি রেখেছেন হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুাবী রহ. এবং ফকীহুল ইসলাম মাওলানা রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.-এর মতো মুখলিস ও আমলদার বুযুর্গরা। তারপর সেই জমিনে পানির সেচ দিয়ে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান রহ., মাওলানা মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ., শায়খুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.-এর ন্যায় উম্মতের স্তম্ভ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিরা। আজকে নূর ও মারেফাতের বিশ্বস্ত এবং দারুল উলুমের প্রতিষ্ঠাতার একনিষ্ঠ খাদেম মাওলানা মুহাম্মদ কারী তৈয়্যব সাহেব কাসেমী রহ.-এর নিকট সর্বপ্রথম প্রশ্ন দারুল উলুম দেওবন্দ সম্পর্কে ছিল, যার প্রতিটি নির্মাণ ও খসড়া প্রস্তুতকরণের সাথে স্বয়ং হযরত কারী সাহেব রহ.-এর সারাটা জীবন উৎপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি পূর্ণ নির্ভরতা, শক্ত ঈমান এবং তাওয়াক্কুল সমৃদ্ধ আন্দাযে উত্তর দিয়েছেন।

হ্যাঁ, আল্লাহ কল্যাণ করুন। দারুল উলুমের ভিত্তি এমন যে, তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ইনশাআল্লাহ। আর তা এ জন্য যে, অনেক বড় বড় ঘাটতি এসেছে, আল্লাহ তায়ালা তাকে হেফাজত করেছেন, বড় বড় ইখতেলাফ ও বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু আল্লাহ তায়ালার ফজল ও করমে তা দিন দিন উন্নতি হচ্ছে।

সান্ত্বনার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে মনটা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব রহ. যিনি দারুল উলুমের প্রথম সদরুল মুদাররিস ছিলেন তাঁর একটা ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে গেল, যা কোথাও পড়েছিলাম, বা শুনেছিলাম। তারপর যখন খেয়াল হলো, দারুল উলুম তো একশত বছর পার করেছে, তখন দিল ও দেমাগে আনন্দের আলো জ্বলে উঠল। প্রশ্নকারী হযরত রহ.কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত! সম্ভবত হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব রহ.-এর একটি বাণী শোনা যায়। একশত বছর পর্যন্ত এ

প্রতিষ্ঠান আল্লাহ হেফাজত করবেন। তারপর আল্লাহ তায়ালার যা ফায়সালা করেন।'

হযরত রহ.এর উত্তর দিলেন এবং হঠাৎ করে ফিকির ও দুর্ভাবনার ঘর্ষণে, আশা ও আকাঙ্ক্ষার আলো জ্বলে উঠল। হযরত বললেন, না, আমি এতটুকু শুনেছি যে, এ মাদরাসা চলতে থাকবে, চলতে থাকবে, এরই মধ্যে হিন্দুস্তানে ইনকিলাব বা বিপ্লব ঘটবে। তারপর এ মাদরাসা ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে থাকবে। এ ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারে আমরা পুরোপুরি আশাবাদী। তারপর হযরত নিজেই বলেন, এটি একটি বিস্ময়কর বাণী আর এখন পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন হতে চলেছে। হযরত কারী সাহেব রহ. বিস্তারিত ব্যাখ্যা করছিলেন এবং কল্পনা চোখ দ্বারা দিল্লীর লাল কিল্লার উপর ইসলামী চাঁদখঁচিত পতাকা পতপত করে উড়তে দেখলেন আর কর্ণদ্বয় তার পতপত আওয়াজ অনুভব করেছে। আর মুসলমানদের ইজ্জতের ভয়শূন্য জমিনে ইসলামের প্রভাব ও দাপটের কল্পনা জেগে উঠল। কিন্তু এতো জীবনের সোনালী স্বপ্ন মাত্র এবং শত আফসোসের ন্যায় লজ্জাকর ব্যাখ্যা হয় অথবা নয়।

[এমন আশা ও ভয়ের মাঝে লেখক নিজের কথা অন্যদিকে ফেরালেন]

## দীন সংস্কারের সফল ময়দান

জনাব, দীন সংস্কারের সময়সীমা ব্যক্তি ও জনসাধারণ হিসেবে একশত বছর হয়ে থাকে। আর দারুল উলুম তো একটি দীন ও ইলমে দীনের সংস্কারক প্রতিষ্ঠান। তাহলে তার বয়স তো হাজার বছরের হওয়ার কথা। আমি এখনও আমার কথা শেষ করতে পারিনি। তখন হযরত এমন আশাব্যঞ্জক এবং ঈমানবর্ধক উত্তর দিলেন যে, দিল ও দেমাগে চিন্তা ও কম্পন ব্যতীত আল্লাহর রহমত এবং দীন সংরক্ষণের অঙ্গীকারের দৃঢ় বিশ্বাসের উজ্জ্বল দীপ্তি বৃদ্ধি পেল। তিনি বললেন, আমি আমার বুযুর্গ হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান সাহেব রহ. এবং অন্যান্য হযরত থেকে একাধিকবার শুনেছি, মুজাদ্দিদের (সংস্কারক) জন্য একজন ব্যক্তি হওয়া জরুরি নয়। বরং একদল মুজাদ্দিদ হতে পারেন। তাঁরা আরো বলেছেন, হযরত গাঙ্গুহি এবং হযরত নানুতুাবী রহ.-এর ন্যায় আকাবিরদের জামাত সবাই মুজাদ্দিদ ছিলেন, যারা সুন্নাত ও বিদয়াত এবং মারুফ ও মুনকারের মধ্যে পার্থক্য বিধান করেছেন। তারপর তিনি বলেন, ঐ সকল হযরতদের সংস্কারের মঞ্চ বা ময়দান হলো দারুল উলুম। তাকেই মুজাদ্দিদ বলা হয়। দারুল উলুম দেওবন্দই হলো সংস্কারক।

আর হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান সাহেব রহ. অন্য বাক্যে বলেছেন, তাজদিদে দীনের কাজ এবং তার সম্পর্কও স্থাপনের কেন্দ্র হলো দারুল উলুম। আর হিন্দুস্তানে এ দারুল উলুম একজন ভ্রাম্যমাণ কুতুবখানার মর্যাদা রাখে। যেমন চাক্কির পাটার নিচে একটা খিল থাকে, তার চারপাশে চাক্কি ঘুরে। এমনিভাবে দারুল উলুমে শুধু দীনি বিষয়াদি নয় বরং রাষ্ট্রীয় বিষয়াদিও তার চারপাশে ঘুরতে থাকে। দারুল উলুমের ভিতর আল্লাহ তায়ালা কিছু অলৌকিক শক্তি এবং চুম্বক রেখেছেন।

তৃতীয় বাণী যার মাধ্যমে সান্ত্বনা ও প্রশান্তি মিলে, সেটি হলো হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব রহ.-এর বাণী। তিনি বলেন, এ দারুল উলুম চলতে থাকবে, এমতাবস্থায় হিন্দুস্তানে ইনকিলাব সৃষ্টি। তারপর দারুল উলুম ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে চলে যাবে।

## কৌতুকমিশ্রিত শেকায়েত

হযরত নিজের বয়ান গুছিয়ে আনছিলেন। এমন সময় মাদরাসার শায়খুল হাদীস রহ. মঞ্চে তাশরীফ আনলেন। তিনি হযরতের একপাশে বসে গেলেন। তখন তিনি শায়খুল হাদীস সাহেবের দিকে ফিরে ইন্টারভিউ গ্রহণকারীদের অবিচার করার অভিযোগ এমন কৌতুকমিশ্রিত ভঙ্গিতে প্রকাশ করলেন যে, এদের মানশা হলো আপনি রাতেও জাগ্রত থাকেন, দিনেও জাগ্রত থাকেন। আজকেও ঘুমানো যাবে না, আগামীকাল ৮ ঘণ্টার সফরে না ঘুমিয়ে চলে যান। তাতে মুজাহাদা মুকাম্মাল হয়ে যাবে।

বুযুর্গদের উদারতার কারণে অন্তরে বেয়াদবী ও ঔদ্ধত্য চলে আসায় হযরতের সমীপে আবেদন পেশ করা হলো, হযরত আমাদের মূল্যায়নকারী হুকুমত আপনার পুরো সফরে বয়ানের নিয়মানুবর্তিতা করে আপনার অনেক উপকার করেছে। এখন আমরা আগামীকাল দারুল উলুম হাক্কানিয়ার তা ভঙ্গ করতে চাই। তখন হযরত যার তবিয়তকে আল্লাহ তায়ালা অভিযোগ ও অনুযোগের স্থলে, সবর, স্থিরতা ও সহনশীলতার নেয়ামত দান করেছেন। তিনি আমাদের হুকুমতের পক্ষ হতে অযৌক্তিক পদক্ষেপ প্রত্যাখ্যান না করে অথবা হতাশা প্রকাশ না করে উপকৃত হয়েছেন এমন ভঙ্গিমায় বলতে লাগলেন, জি হ্যাঁ এটি বাস্তবে হুকুমতের পক্ষ থেকে আমার উপর ধারণাতীত অনুগ্রহ। অথবা আমার দুর্বলতা, বার্ধক্য ও রুগ্নতার উপর আল্লাহর পক্ষ হয়ে গায়েবী অনুগ্রহ বা সাহায্য। অন্যথায় যদি বয়ানের নিয়মানুবর্তিতা না হতো আর সর্বস্থানে দোস্ত-

আহবাবদের চাহিদা অনুযায়ী বয়ান করা লাগত, তাহলে হয়তো আবার তবিয়ত আবদার রক্ষা করতে পারত না। সুতরাং আমি ওখানে থেকে এ ইচ্ছা নিয়ে এসেছি যে, অসুস্থতার কারণে যথাসম্ভব বয়ান করা থেকে বেঁচে থাকব। মুসলিম বিশ্বের একজন মর্যাদাসম্পন্ন আলেমে দীন এবং বিশ্ব মুসলিমের গৌরবযোগ্য বুযুর্গের নিজ দেশে এহেন বাধ্যবাধকতা অনুভভ করে নিজেকে লজ্জিত ও হালকা মনে হচ্ছিল। কিন্তু স্বয়ং হযরতের যবান থেকে এর ব্যাখ্যা শুনে নিজ আকাবিরদের অভিজাত ব্যক্তিত্ব এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়ার একটা নমুনা পরিষ্কার হয়ে গেল।

এমন কথাবার্তার পর আসল সাক্ষাৎ করে বা ইন্টারভিউ শুরু হলো। দৃঢ়তার সাথে কয়েকটি প্রশ্ন লিখে একটি কাগজের টুকরা হযরতের সামনে পেশ করা হলো। হযরত রহ. এক প্রকার পরিশ্রান্ত নয়নে তার দিকে দৃষ্টি দিলেন এবং আমাদের শিশুসুলভ খায়েশ ও সংকীর্ণতা দেখে হযরত মৃদুভাবে হাসতে লাগলেন।

হে ভাই! এটি তো অনেক বড় প্রশ্ন। তার একটা সাইড নিয়ে যদি আলোচনা করি, তাহলে সারা রাতও যথেষ্ট হবে না। কিন্তু সারা বছর ফুলদানকারী বাগানের পাশ দিয়ে অতিক্রমকারী একজন কৌতূহলী মানুষের দৃষ্টি বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ডিজাইনের বিলাসিতা ও আভিজাত্যের উপর পড়ে। তারা চোখের এরিয়ায় তো সারা উদ্যান বেষ্টন করে নেয়ার মতো, ফুল হলেও এবং সবুজ ও তরতাজা প্রান্ত হলেও।

সর্বপ্রথম প্রশ্ন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুাবী রহ.-এর সম্পর্কে। যার মাথার উপর আল্লাহ তায়ালা অন্ধকারাচ্ছন্ন হিন্দুস্তানে দীনের হেফাজতের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, যার সুদৃঢ় দৃষ্টিশক্তি, বীরত্বপূর্ণ চেষ্টা-প্রচেষ্টা, উচ্চতর জ্ঞান এবং আধুনিক তর্কবিদ্যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা, দাসত্ব ও পরাধীনতার যুগে হিন্দুস্তানের ইসলাম ও ইসলামীয়াতের ইলম ও তাহযীবকে রক্ষা করেছেন। নিঃসন্দেহে এমন বড় ইমামের দৃষ্টান্ত প্রথম শতাব্দিতে পাওয়া যেতে পারে। ইলম ও আমলে মুজাহাদা ও সাধনায়, দূরদর্শিতা ও রাজনীতিতে এবং তাসাউফ ও সুলুকে তিনি ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। একজন গবেষক আলেম একেবারেই সঠিক বলেছেন যে, হযরত নানুতুাবী রহ.-এর প্রশংসিত গুণাবলি উনিশ শত শতাব্দির শেষার্ধে নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর নিদর্শনাবলির একটি নিদর্শন। হযরতের ইলমী, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক কার্যাবলি দেখে হয়রান হতে হয় যে, আল্লাহ তায়ালা ইমাম রাজির রহ.-এর ফালসাফা, শারানি রহ.-এর যুক্তিবিদ্যা, ইমাম গাযযালি রহ.-

এর মনোস্তাপ ও ইবনে তাইমিয়্যা রহ.-এর বয়ানের প্রভাব, শাহ ওয়ালি উল্লাহ রহ.-এর হেকমত ও জ্ঞান, আহমাদ সারহিন্দী রহ. আত্মাভিযান ও ইসলামী সম্ভ্রমবোধ এবং টিপু সুলতানের বীরত্বসহ সমস্ত গুণ তাঁর ভিতর সমাবেশ ঘটিয়েছেন। হযরত থানুভী রহ.-এর ভাষ্যমতে, আমাদের আকাবির তো এমন যে যদি তাদের কিতাবগুলো আরবী ভাষায় ভাষান্তর করা হয় এবং কার কিতাব বলা না হয়, তাহলে পাঠকরা তাদের ইমাম রাজি রহ. ও গাযযালী মনে করবে।

এখন কারী তৈয়্যব সাহেব রহ.-এর নিকট ঐ ইমামে দাওয়াত ও আযিমত, স্বাধীনতার পতাকাবাহক, অসাধারণ মেধার অধিকারী ব্যক্তিত্বের দাওয়াত ও উদ্দেশ্যের উপর কিছু আলোকপাত করার জন্য বলা হলো। হযরত হুজ্জাতুল ইসলামের নাতি বলছিলেন–

## তিনটি বড় কাজ

হযরত নানুত্বাবী রহ. জীবনে অনেক কাজ সমাপ্ত করেছেন। এর কোন হিসাব নেই। তবে বুনিয়াদীগতভাবে তিনটি বড় কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। সর্বপ্রথম কাজ দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা। এটি এমন বড় কাজ যে তার প্রভাব সারা দুনিয়াজুড়ে ব্যাপৃত হয়েছে। দ্বিতীয় কাজ হলো, তিনি সর্বদা ইসলামী খেলাফতকে শক্তিশালীকরণে লিপ্ত থাকতেন। তখন সুলতান আবদুল হামিদ খান খলিফা ছিলেন। ঐ খেলাফত শুধু নামেই ছিল।

হযরত চাইতেন, সেটা নামে হলেও বাকি থাকুক, যাতে তা দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্রের একটা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ জন্য হযরত নিজেই সুলতানের সাহায্যার্থে কাসিদা লিখেন। মাওলানা মো. ইয়াকুব এবং মাওলানা যুলফিকার আলী রহ.সহ সকল বুযুর্গ অতিশয় প্রশংসাকারী ছিলেন। যখনই তুর্কিদের সাথে কারো যুদ্ধ হয়েছে, তখন তারা তুর্কিদের সাহায্যে হাত বাড়িয়েছেন। কোথাও চাঁদা উঠাচ্ছেন কোথাও জনমত তৈরি করেছেন। মোটকথা, সর্বদা কাজে ব্যস্ত থাকতেন।

এতে হযরতের উদ্দেশ্য ছিল খেলাফতের নাম অবশিষ্ট থাকুক। তিনি তৃতীয় একটি সংস্কারমূলক কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। সেটি হলো দেওবন্দ ও তার আশপাশে বিধবাদের দ্বিতীয়বার বিবাহ দেওয়াকে অনেক দোষের মনে করা হতো। এ কুপ্রথাটি হিন্দুধর্ম থেকে প্রবেশ করেছিল। এমন বিবাহের যদি কেউ নাম নিত, তাহলে যুদ্ধ বেঁধে যেত। হযরত রহ. অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তা

দূরীকরণের আন্দোলন শুরু করেন। তিনি ভিতরে ভিতরে যখন বিশেষ ব্যক্তিদের নিজ মতো নিয়ে আসেন, তখন তিনি সাধারণ মাহফিলের ব্যবস্থা করেন।

তিনি নবাব লুতফুল্লাহ খান সাহেবের মহলে জলসার ব্যবস্থা করেন। তিনি ছিলেন বাদশা আওরঙ্গজেবের পররাষ্টমন্ত্রী এবং দেওবন্দে উসমানি খেলাফতের উত্তরাধিকারী। তার মহলে বিরাট মাহফিল অনুষ্ঠিত হলো।

জলসার মাঝখান থেকে এ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরয করল, হযরত আমার কিছু বলার আছে। তিনি অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা বুঝে ফেললেন, লোকটি কি বলবে। তিনি তার উত্তরে বললেন, আমি একটু পরে আসছি। আমার একটা বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। লোকেরা মনে করল, হয়তো পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন হবে।

হযরত নিজ ঘরে গেলেন। তার ঘরে তার বড় বোন বিধবা ছিলেন, বয়স তার ৯৫ বছর। এ বয়সে তিনি বিবাহের উপযুক্ত ছিলেন না। কিন্তু প্রশ্নকারী তো এদিকে লক্ষ্য করেন যে, তার বয়স এখন ৯৫ বছর। সে তো এতটুকু বলতে চায় যে, আপনি সারা দুনিয়া জুড়ে নসিহত করে বেড়ান আর নিজ ঘরে নিজের বোন বিবাহ ছাড়া বসে আছে। তিনি ঘরে গিয়ে বড় বোনের পায়ে হাত রাখেন। বড় বোন ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, ভাই! তুমি তো আলেম মানুষ, তুমি এ কি করছ? তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি ছোট ভাই। আজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সুন্নাত জিন্দা হবে যদি আপনি হিম্মত করেন, এটি আপনার উপর নির্ভর করে। বড় বোন বললেন, আমার মতো নিষ্কর্মা দ্বারা রাসূলের সুন্নত জিন্দা হবে? তিনি বললেন, আপনি বিবাহ করুন। তখন বড় বোন বলল, হে ভাই! তুমি তো জানো মুখে দাঁত নেই, কোমর বাঁকা হয়ে গেছে, বয়স ৯৫ বছর। তিনি বললেন, এ সবকিছু আমি জানি; কিন্তু প্রশ্ন এ সবকিছু দেখেনি। তখন তিনি বললেন, ঠিক আছে, আমার দ্বারা যদি সুন্নাতে রাসূল জিন্দা হয়, তাহলে আমি বিবাহ করতে প্রস্তুত।

বড় বোনের দেবর স্ত্রীহারা ছিলেন। তিনি তার বংশের ১৪-১৫ জন লোকের সামনে তার বিবাহ পড়ালেন এবং সাক্ষীও বানালেন। এতে কিছুটা দেরি হয়ে গেল। তারপর তিনি মাহফিলে উপস্থিত হয়ে পুনরায় বয়ান শুরু করেন। ওই আগের প্রশ্নকারী আবার দাঁড়িয়ে বলল, হযরত আমার কিছু বলার আছে। তিনি বললেন, বলো। সে লোকটি বলল, আপনি দুনিয়াবাসীকে নসিহত করেন আর আপনার বোন বিবাহ ছাড়া ঘরে বসে আছে। তাই আপনার নসিহত কি প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া হবে? তিনি বললেন, কে বলল? আমার

বোনের বিবাহের সাক্ষী হয়তো এখানেও উপস্থিত আছে।

এ কথা বলার পর দু-তিনজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আমাদের সামনে তার বড় বোনের বিবাহ হয়েছে। তিনি সমাজশুদ্ধি এবং কুপ্রথা মিটানোর জন্য নিজ ঘরে থেকে কুরবানী পেশ করেছেন। ফলে সেই মজলিসে ৭০-৮০ জোড়া বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। তারপর এ সুন্নত এমনভাবে প্রচার-প্রসার হয় যে, হাজারো বিধবার বিবাহ হয়।

## দারুল উলুমের প্রাণশক্তি

হযরত নানুতুবী রহ.-এর প্রথম কাজ ছিল দারুল উলুম প্রতিষ্ঠা করা। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল, যদি ইলমে নববী ব্যাপক হয়ে যায় এবং ঈমানের হেফাজত হয়, তাহলে পরবর্তীতে মুসলমানরা সবই করতে পারবে। আর ঈমান না থাকলে কিছুই করতে পারবেন না। যখন রাজত্ব এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি উভয়টি গেল তো অন্তত পক্ষে দীনকে হেফাজত করতে হবে, দীন টিকে থাকলে ভবিষ্যতে সবকিছুই হবে।

এ কারণে তিনি যেখানেই যেতেন, সেখানেই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতেন। মুরাদাবাদে মাদরাসায়ে শাহী, আমরোহায় মাদরাসা আরাবিয়া, বেরলবীতে মাদরাসা ইশায়াতুল ইলম, আমবিটা ও থানভবনে মাদরাসায়ে দ্বিনিয়া, গিলাউটে মাদরাসায়ে কাসেমিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। যত মুরিদ মুতাকিদ ছিল সবার নিকট পত্রমারফত দাওয়াত দিলেন, আপনারা যে যেখানে আছেন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করুন। এটিই ছিল হযরতের বড় রাজনৈতিক আন্দোলন। তার উদ্দেশ্য ছিল জাতিকে ইলমের পথে প্রস্তুত রাখা যে, তারা দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকবে। আর যখন দীন ও ইলম থাকবে তো হতে পারে ভবিষ্যতে পুনরায় প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজত্ব ফিরে আসবে।

## ইসলাহে মুয়াশারায় এবং ইসলামী খেলাফত

তিনি সামাজিক জীবন ব্যবস্থাকে সংস্কার করেছেন। তন্মধ্যে বিধবা বিবাহের দিকে বেশি মনোনিবেশ করেছেন। তৃতীয় কাজ ছিল ইসলামী খেলাফতের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করা। তিনি সর্বদা সেদিকে খেয়াল রাখতেন। এতে আমি এমন বুঝেছিলাম যে, তিনি চাইতেন ইসলামী নিযামের কোন না কোন অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকুক। যদি হিন্দুস্তানে ইসলামী হুকুমত না থাকে, তাহলে

কমপক্ষে অন্যান্য ইসলামী হুকুমতের সাথে সুসম্পর্ক রাখা। এ কারণেই আমাদের আকাবিরদের আশার কেন্দ্রবিন্দু ছিল আফগানিস্তান।

## আফগানিস্তানের সাথে সুসম্পর্ক

বৃটেন বা লন্ডনের অভিযোগ ছিল, দেওবন্দি নামক জামাতটি বিশৃঙ্খলা করছে। তারা আফগানদের সাথে মিলে ব্রিটেনের সিংহাসনকে উল্টাতে চায়। কিন্তু আমাদের আকাবিরগণের চিন্তাধারা এমনটি ছিল না যেমনটি ব্রিটিশরা ভেবেছিল। তারা সর্বদা আফগানিস্তানের সাথে সুসম্পর্ক বজায়ে রাখত। এ কারণে যখন আমির নাদির খান রহ. ইন্তিকাল করেন এবং জহির শাহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, তখন দারুল উলুমের মজলিসে ওরা আমাকে প্রতিনিধি বানিয়ে আফগানিস্তানে পাঠান, যাতে নাদির খানের শোক প্রকাশ করি এবং জহির শাহের প্রশংসা করি ও অভিনন্দন জানাই। আমরা আফগানিস্তানে উপস্থিত হয়ে একটি পত্র লিখলাম যে, আমাদের উদ্দেশ্য কোন সম্পদ বা চাঁদা গ্রহণ করা নয়; বরং আমরা ঐ সম্পর্ক নবায়ন করতে এসেছি, যা আমাদের আকাবিরগণ রাখতেন। পত্র পেয়ে প্রেসিডেন্ট আমাদের ডাকলেন। আমরা প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে পৌঁছলাম। আমরা বসে আছি এই ভেবে যে, হয়তো আমাদেরকে প্রেসিডেন্টের খাস কামরায় ডাকবেন। কিন্তু দেখলাম স্বয়ং জহির শাহ অত্যন্ত নমনীয়তার সাথে এগিয়ে আসছেন। আমরা তার সম্মানে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি আমাদের মুসাফাহা ও মুয়ানাকা বা আলিঙ্গন করলেন এবং আফগান নীতি অনুযায়ী ডান ও বাম কাঁধে চুমু দিলেন। তিনি পূর্ণ ভালবাসা প্রকাশ করলেন। তারপর তিনি বললেন, আপনি আগে চলেন। আমি বললাম, না না এটি আদবের খেলাফ। তিনি বললেন, আপনার আগেই চলতে হবে, তার কারণ আমি পরে বলব। তার কথামতো আগে আগে চললাম আবার পিছনে প্রেসডেন্ট তার পিছনে সর্দার নঈম খান, তারপরে মাওলানা মুহাম্মদ জিয়া সাহেব (মানসুর আনসারী রহ.) এবং তার পিছনে গাজী সাহেব।

এভাবে আমরা এগিয়ে গেলাম, আমাকে প্রেসিডেন্টের নির্ধারিত আসনে বসালেন আর নিজে অপর একটি চেয়ার নিয়ে আমার সামনে বসলেন। তারপর বললেন, এখন আমি আপনাকে কারণ বলছি। তার সংক্ষিপ্ত কারণ হলো এই যে, আমি কাবুলের হুকুমত পেয়েছি আপনাদের বুযুর্গদের দোয়ার কারণে। আর তার ইশারা হলো এভাবে যে, জনাব আমির নাদির খানের চাচা

জনাব সর্দার মুহাম্মদ ইউসুফ খান ও সর্দার মুহাম্মদ আসিফ খান সাহেব উভয়ে বাইয়াত হন গাঙ্গুহি রহ এর হাতে। বৃটিশ সরকার তাদেরকে নযরবন্দি করে রাখে। তারা শিকারের বাহানায় হযরত গাঙ্গুহি রহ.-এর দরবারে হাজির হতেন। তখন হযরত তাদের নসিহত করতেন। সর্বশেষ যখন হযরতের সাথে মুলাকাত হয়, তখন তিনি বললেন, যাও কাবুলের রাজত্ব তোমার বংশে আসবে, ইনসাফের সাথে পরিচালনা করো। তারা এ ভেবে হয়রান হলেন যে, কাবুলের সাথে আমাদের কি সম্পর্ক?

জনাব আমানুল্লাহ সাহেবের রাজত্ব চলছিল। তিনি বনি আমাম গোত্রের লোক ছিলেন। তাদের বিভিন্ন পদ ও মন্ত্রীত্ব মিলত, হুকুমত পাওয়ার কোন প্রশ্নই ছিল না। তিনি বুঝলেন হযরত হয়তো মনোতুষ্টির জন্য এ কথা বলেছেন। এর কিছুদিন পর একজন অনপুযুক্ত ব্যক্তি হুকুমেত আসেন। জনাব আমানুল্লাহ খান বহিষ্কার হন। সে অত্যাচার শুরু করলে জাতিগুলোর আমির নাদির খান সাহেবের দিকে মনোনিবেশ করেন। তারা তাকে ফ্রান্স থেকে নিয়ে আসেন। এসে হুকুমতের লাগাম টেনে ধরেন। কিছুদিন পর শহিদ হন। এভাবে আমাদের বংশে রাষ্টক্ষমতা চলে আসে।

তারপর জহির শাহ বলেন, আমাদের নিকট আপনাদের আকাবিরদের কিছু বরকতপূর্ণ জিনিস আছে। আমার নিকট হযরত নানুত্বাবী রহ. একটি টুপি ছিল। যখন আমাদের কেউ অসুস্থ হতেন, তখন তিনি তা আমাদের মাথায় পরাতেন। ফলে আমরা সুস্থ হয়ে যেতাম। আজ ডা. রাফকি বেকে আমরা ছয় হাজার রুপি মাসিক বেতন দেই, তার ব্যবস্থাপত্রে এমন শিক্ষা মিলে না, যেমনটি ঐ টুপিতে মিলতো। তিনি আরো বলছিলেন, ঐ বাদশাহি যুগে আমাদের ঘরে ডাকাতি হয়। এতে লক্ষ রুপি জিনিস চুরি হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের দুঃখ হয় ঐ বরকতপূর্ণ টুপির প্রতি, যার প্রভাব এখনো আমাদের মাঝে বিদ্যমান। তারপর বলেন, আপনাকে আগে দেয়ার কারণ এগুলো।

## তুর্কীদের সাথে সম্পর্ক

এতো আফগানিস্তানের সাথে সম্পর্কে কথা জানা গেল। আর তুর্কী সুলতান আবদুল হামিদ সাহেবের সাথে সম্পর্কের কথা ইতিপূর্বে জেনেছেন, যা দ্বারা আমাদের আকাবিরদের মন-মস্তিষ্কের অনুমান হয় যে, তারা চাইতেন কোন রকম ইসলামী হুকুমত টিকে থাকুক। হযরত শায়খুল হিন্দু রহ. চাইতেন মুসলমানদের নেতৃত্ব আসুক। তিনি তামান্না করতেন ইসলামী বিশ্ব একত্র হয়ে

তুর্কী ও আফগানরা মিলে হিন্দুস্তান আক্রমণ করে দখল করে ইসলামী হুকুমত কায়েম করুক। এটি হযরতের আন্দোলন ছিল আর হামলাও হয়েছিল। কিন্তু তাদের প্রস্তুতি কম ছিল। বাহিনী ছিল অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তাই ফলাফল হলো পরাজয়। আর এ খায়েশ ও জোশ তিনি মিরাছ হিসেবে পেয়েছেন নিজ ওস্তাদ হযরত নানুত্বাবী রহ.-এর নিকট থেকে। ১৮৫৭ সালের যুদ্ধে হযরত নানুত্বাবী রহ. জিহাদের জোশে মত্ত ছিলেন এবং তিনি চাইতেন যেভাবেই হোক শহিদ হবেন। এর প্রেক্ষিতে তিনি তলোয়ার দ্বারা মোকাবিলাও করেছেন। মোটকথা, হযরতের জীবনের কার্যাবলি হতে একটি হলো ইলমী অর্থাৎ দারুল উলুম যার ফয়েজ সারা বিশ্বে পৌঁছেছে। দ্বিতীয়টি হলো মুয়াশারাতি। আর তৃতীয় হলো রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যাবলী। এগুলো তাহযীব ও তালিম দ্বারা করা সম্ভব। তবে ইসলামী বিশ্বের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক থাকা চাই।

## ইংরেজ আমলে বিচারালয় প্রতিষ্ঠা

বিচারকাজ পরিচালনা করার জন্য তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে আদালত কায়েম করেন। বিচারপতি নির্বাচন করেন হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব রহ.কে। ফলে হাজারো মুকাদ্দামা যা বছরের পর বছর ঝুলছিল তা মিনিটের মধ্যে সমাধা হচ্ছিল। এতে মানুষের সময় ও সম্পদ বাঁচতো। এর ধারাবাহিকতা জারি ছিল। কিন্তু এক সময় ইংরেজ সরকার এসে বন্ধ করে দেয়। তারা দেওবন্দে একজন দারোগা পাঠাল। সে খুব কঠোর মেজাজের ছিল। সে একদিন মাদরাসা এল। সময়টা ছিল রমযান মাসের শেষ দশ দিন। সে এসে নানুত্বাবী রহ.-এর সাথে মুসাফাহা করে, খুব দুঃসাহস দেখিয়ে বলল, আপনি হিন্দুস্তানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তের পতাকা গাড়তে চান। এ কি আপনি কোর্টকাচারি কায়েম করেছেন? তখন হযরত তাকে অনেক নরম করে বললেন, আমরা তো গভর্নমেন্টের সাহায্য করছি। যে মুকাদ্দামাগুলো লাখ লাখ রুপি ব্যয় করে ফায়সালা করতে হতো, সেগুলো মিনিটেই ফায়সালা করে দিচ্ছি। কিন্তু সে বলল, না আপনি সরকারকে পূর্ণরূপে মোকাবিলা করতে চাচ্ছেন। আমি গভর্নমেন্টের নিকট রিপোর্ট করব। এতে হযরত ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, তাকে কান ধরে বের করে দাও। ছাত্ররা তাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে বের করে দিল। তখন হযরত বলেছিলেন, যাও, আমি তোমার নামে রিপোর্ট করব। এ শয়তানকে এখান থেকে বের করে দাও।

পরের ঘটনা। ঈদের দিন দারোগার বাসার বালতি ভরা দুধ ছিল। নতুন জামা-কাপড় পড়ে আনন্দ উৎসব চলছিল। তখন হঠাৎ গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে হুকুম হলো যে, তার ঘুষ গ্রহণের সীমা অতিক্রম হয়ে গেছে। তাকে ততক্ষণাৎ বরখাস্ত করা হোক এবং বাজারে যে সকল দোকান হতে ঘুষ গ্রহণ করেছে সে সকল দোকানের সামনে দিয়ে পায়ে রশি বেঁধে ঘুরানো হোক। তাকে সেই অবস্থায় ঘুরানো হলো। তখন সে কাঁদতে কাঁদতে বলছিল, আফসোস শত আফসোস, আমি তো রিপোর্ট করিনি কিন্তু মৌলবীজি আমার রিপোর্ট দিয়ে দিলেন। সে তার কাজের পারিশ্রমিক অতি তাড়াতাড়ি পেয়ে গেল। তার স্থলে অপর একজনকে পাঠানো হলো। এর কিছুদিন পর বুযুর্গগণ ইন্তিকাল করে চলে যান। ফরে বিচারালয় বন্ধ হয়ে যায়।

হযরত নানুত্বাবী রহ.-এর ৪র্থ প্রাণ ছিল, ইসলামী পার্সনাল ল' এবং বিশেষ কানুন শরীয়ত মোতাবেক সিদ্ধান্ত হবে। এরই প্রেক্ষাপটে দারুল উলুম দেওবন্দের আকাবিরগণ যখন লন্ডন থেকে হিন্দুস্তানবিষয়ক মন্ত্রী আসেন এবং জার্জের যুগ চলছিল, তখন আমার পিতা হযরত হাফেজ মুহাম্মদ আহমাদ সাহেব রহ. উলামাদের একটা প্রতিনিধি দল নিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। তার সমীপে দরখাস্ত পেশ করেন যে, হিন্দুস্তানে পৃথক একটি বিচারালয় কায়েম করে দিন, যাতে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিশেষ বিষয় বিবাহ, তালাক, ইদ্দ, মিরাছ ও ওয়াকফ সম্পত্তি ইত্যাদি পরিচালনা করতে পারি। তখন সে প্রকাশ্যে বলেছিল, তা আমি বাদশাহর দরবারে পেশ করব এবং পার্লামেন্টের উত্থাপন করব। কিন্তু তা একটি সাময়িক কথা ছিল। তা সে পেশও করেনি আবার এমনটি হয়ওনি।

## তাহাফফুজে খেলাফত এবং ইসলামী বন্ধনের সুরক্ষা

কিন্তু ঐ সকল বুযুর্গদের অন্তরে সর্বদা একই আবেগ ছিল কিভাবে ইসলামী হুকুমত কায়েম হবে। তাহাফফুজে খেলাফত ও ইসলামী বন্ধন সৃষ্টির লক্ষ্যে হযরত নানুত্বাবী রহ. আকেটি সুন্দর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেটি হলো মানুষদের বেশি বেশি হজ্ব পালন করার প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। তিনি বলতেন, প্রথমত হজ্ব একটি ইবাদত, আবার ইজতিমায়ী ইবাদত। ওখানে গিয়ে মক্কাবাসীদের সাথে লেনদেন করতে হয়। এতে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হবে। ওখানে ইসলামী হুকুমত দেখবে। এতে অন্তরে তার প্রভাব সৃষ্টি হবে। ফলে ইসলামী প্রভাব অন্তরে নিয়ে দেশে ফিরবে। তাই হযরতের সকল খেদমতের

মেরুদণ্ড হলো ইলম, মুয়াশারাত, রাজনীতি এবং খেলাফত প্রতিষ্ঠা।

অর্ধ রাত চলে গেল। কিন্তু কাসেমী রহ.-এর আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা এমনভাবে নিমজ্জিত হলো যে, কেমন যেন তারা একটি অপূর্ব সুন্দর স্বপ্নে বিভোর। আর সময় পিছনে ফিরে চলছে। হঠাৎ করে হযরত কারী সাহেব রহ. বিছানায় শয়ন করতে চাইলেন। শ্রবণকারীদের নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। সংকুচিত হলো। হযরতের দুর্বলতা ও অক্ষমতা সত্ত্বেও তিনি হযরত নানুত্বাবী রহ.-এর বিশেষ শান ইলমী কামালাত বা যোগ্যতা বয়ানে ব্যয় করতে চাইলেন। এবং প্রিয়তমের আলোচনা আরো বাড়াতে চাইলেন। আর যারা কৌতূহলী তারা তো নিজদের উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যস্ত থাকে। অন্যথায় আকল ও আদব কোনটা চাচ্ছে না হযরতকে বেশি কষ্ট দিতে, কিন্তু দিল তার উল্টো।

'এমন দিল ভালো যার পাহারা দেয় আকল। কিন্তু কখনও কখনও তাকে একাই ছেড়ে দিতে হয়।'

## হযরত নানুতুবী রহ.-এর ইলমী শান হলো সংস্কার

হযরত নানুত্বাবী রহ.-এর ইলমী শান আলোচনা করার সময় হযরত কারী সাহেব রহ. একেবারে নিরোগ হয়ে যান। আর অধিক আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলতে লাগলেন, ইলম-মারেফাতেও তিনি একজন মহান সংস্কারক। হযরতের তাসানিফ বা লিখনি সম্পর্কে হযরত মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানি রহ. বলেন, শত বছর পর্যন্ত ফালসাফা কত রূপ ধারণ করে প্রকাশ পেয়েছে; কিন্তু হযরতের হেকমত তাদের লুকানো দোষত্রুটি প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট। শত বছর পর্যন্ত কেউ ইসলামের সাথে মোকাবেলা এবং ইসলামের উপর হামলা করতে পারেনি যতটুকু দলিল প্রমাণ দ্বারা তিনি তার চেয়ে বেশি দলিল ও প্রমাণ জমা করলেন। সুতরাং তিনি ইলমে কালাম বা যুক্তিবিদ্যার একটা নতুন ভিত্তি স্থাপন করেন, যার দ্বারা ইসলামের হাকিকত ও সূক্ষ্ম তথ্য পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে যায়। হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. বলতেন, আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলি যে, সালফে সালেহীনদের মধ্যে এমন লোক খুব কম পাওয়া যাবে, যারা এমন ধরনের হেকমত জমা করেছেন। সুতরাং এ কাজের বড় অংশ হযরতেরই এবং তিনি এও বলতেন যে, হযরত রহ. কোন বিষয়ের মধ্য ভাগে থাকতেন বরং তার সর্বশেষ কিনারায় পৌঁছতেন। হযরতের ইলম সম্পর্কে আমার আরেকটি কথা

মনে পড়ল যে, হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব রহ. কাশ্‌ফ ও কারামাতওয়ালা বুযুর্গ ছিলেন। তিনি কোন কিছু গোপন করতেন না, তিনি যা দেখতেন, বুঝতেন সবকিছুই ছাত্রদের সামনে খুলে বলতেন। রাতে আমি এই দেখেছি, আমার উপর এই ইলহাম হয়েছে। এমনটিই তার অভ্যাস ছিল।

তিনি একদিন বললেন, ভাই! আজ ফজরের নামায পড়ার জন্য দাঁড়ালাম। তখন অল্পের জন্য বেঁচে গেলাম। আমার মরণে কোন বাধা ছিল না। ছাত্ররা বলল, হযরত! আপনার কি হয়েছিল? তিনি বললেন, কুরআনুল কারীমের ইলমের বিশাল এক সমুদ্র আমার কলবের উপর দিয়ে অতিক্রম করেছে। তবে ভাগ্য ভালো যে, অতিক্রম করার সাথে সাথে চলে গেছে। অন্যথায় আমি সহ্য করতে পারতাম না। তারপর বলেন, তারপর আমি মুরাকাবায় বসলাম। বিষয়টি বোঝার জন্য তখন আমার কাশ্‌ফ হলো। তা ছিল আমার ভাই হযরত নানুতুবী রহ. নিকট হতে আমার প্রতি তায়াজ্জুহ দিয়েছেন। তার তায়াজ্জুর এমন প্রভাব যে, ইলমের এক বিশাল সমুদ্র আমার দিলের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করছে। তারপর তিনি নিজেই বলেন, যে ব্যক্তির তায়াজ্জুর এত প্রভাব যে সহ্য করার মতো নয়, তাহলে সে ব্যক্তি নিজে সেই বিশাল ইলমকে কেমনে বহন করে চলছেন, করছেন।

এ সম্পর্কে আরেকটি ঘটনা রয়েছে যে, মাওলানা ইয়াকুব সাহেব এবং দারুল উলুমের সকল আসাতিজা যাদের মধ্যে বিষয়ভিত্তিক ইমামগণও ছিলেন। হযরত সাঈদ আহমদ সাহেব রহ.কে মাকুলাতের (যুক্তিবিদ্যার) ইমাম বলা হতো। তারা সবাই মিলে হযরতদ নানুতুবী রহ.-এর নিকট আবেদন করলেন, তাফসীরের কোন কিতাব পড়ান, যাতে কুরআনের ইলম আমরাও শিখতে পারি। অথচ তারা সবাই ইলমের ইমাম ছিলেন স্বয়ং ইয়াকুব সাহেব রহ. তো সদরে মুদাররিস ছিলেন।

## উলুমের উচ্চতা ও উলুমের গভীরতা

তিনি তাদের আবেদন গ্রহণ করেন। তিনি সাত্তা মসজিদে দরস শুরু করে দেন। সুরা বাকারার আলিফ-লাম থেকে শুরু করেন। তিনি হরুফে মুকাততায়াত সম্পর্কে দু-আড়াই ঘণ্টা ব্যাখ্যা করেন। এতে তিনি বিস্ময়কর ও দুর্লভ ইলম ও মারেফাত ইরশাদ করেন যে, সবাই অবাক হয়ে যান। সবক শেষে সবাই পরস্পর বলতে থাকেন, এমন বিস্ময়কর ও দুর্লভ ইলম তাকরার (পর্যালোচনা) ছাড়া স্মরণ থাকবে না। সুতরাং তাকরার হোক, তাঁরা দারসে

বসে তাকরার শুরু করেন। হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব ব্যাখ্যা শুরু করলেন। মাঝে একস্থানে থেমে গেলেন। তার স্মরণ নেই আবার অন্যদেরও ইয়াদ নেই, তাই তিনি বললেন, হযরতের নিকট জিজ্ঞেস করে পরে ব্যাখ্যা করব।

ফজরের নামায আদায় করে হযরত যখন নিজ কামরায় ফিরছিলেন, তখন মাওলানা ইয়াকুব সাহেব আরয করলেন, হযরত! তাকরিরের ঐ অংশটি স্মরণ নেই। তখন হযরত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। হযরত ইয়াকুব সাহেব বলেন, ব্যাখ্যার শব্দ ও অর্থ কোনটাই সেই আলেমের ছিল না। অর্থাৎ আমি কিছুই বুঝি নাই। না শব্দ, না অর্থ, আপনি কি বলছেন। তখন আমি বললাম, হযরত কিছুটা নিচে নেমে বলেন, তাহলে হয়তো কিছুটা বুঝতে পারি। তিনি আবার ব্যাখ্যা শুরু করেন। তখন আমি সব শব্দ বুঝতে পারি কিন্তু অর্থ বুঝতে পারি না। তখন আমি বললাম, হযরত আরো নিচে নেমে বলেন, আমি এত উপরে পৌঁছতে পারিনি। তিনি বললেন, মাওলানা অন্য সময় আসেন তাহলে বলব। তাই অনুমান করার বিষয় যে, হযরতের ইলমের উচ্চতা কত ঊর্ধ্বে যে তিনি বলছেন আর অন্যরা বুঝতে পারছেন না। তার ইলমের অবস্থা ছিল এমন। আর আমলের হালত তো প্রকাশ্যই ছিল।

লেখক জিজ্ঞেস করেন, হযরত! এমন ইলম ও মারেফাতের সহজ-সরল ব্যাখ্যা করা হলে অনেক ফিতনার চিকিৎসা হতো। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি মারেফুল কুরআন মজলিস থেকে তা শুরু করি এবং দু-একটা পাণ্ডুলিপিও ছাপানো হয়। কিন্তু তা বেশি দিন চলেনি। কেননা, তাতে উলামাদের তাওয়াজ্জুহ ছিল না, তারা বলতো, এগুলো আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তু তাই বুঝে আসে না।

আমি বললাম, ভাই! হামদুল্লাহ, মুল্লাহাসান এবং কাজী বুঝতে পার তো এ ইলমের মধ্যে কি কাঠিন্য আছে। মূলত আপনাদের বোঝার ইচ্ছা নেই। তখন বলা হলো, মাওলানা মানাজির আহসান গিলানী রহ. সাওয়ানেহে কাসেমী গ্রন্থে উলুমে কাসেমীর যে প্লান পেশ করেছেন, তার মোতাবেক কাজ করলে হয়তো কোন একটা রাস্তা বের হয়ে আসবে।

হযরত কারী সাহেব রহ. বলতে লাগলেন, এ প্লান তো আমিই হযরত গিলানী রহ.-এর নিকট পেশ করেছিলাম যে, আপনি তিন খণ্ডে হযরতের জীবনী লিখেছেন; অথচ হযরতের আসল জীবনী হলো তার ইলমের। আপনি তার উলুমের উপর ব্যাখ্যা পেশ করেন। কিন্তু আফসোস হলো, উক্ত কাজ

করার পূর্বে তিনি দুনিয়া হতে চলে গেলেন। তিনি ভূমিকাস্বরূপ পাঁচ পৃষ্ঠা লিখেছিলেন। মোটকথা, হযরতের ইলম ছিল বড় বিস্ময়কর ও দুর্লভ তথ্য ও হাকিকতপূর্ণ।

## আপনার জীবনী সম্পর্কে কিছু বলুন

হযরত কাসেমুল উলুমের নূরানী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর আলোকপাত করার পর এখন আলাদা একটা প্রশ্ন উঁকি দিল স্বয়ং হযরত হাকীমুল ইসলামের জীবনী শোনার জন্য। ভয়ে ভয়ে দুঃসাহস দেখিয়ে হযরতের জীবনী থেকে কিছু জানতে চাইলাম।

## জন্মের পূর্বের ঘটনা

হযরত হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন, আমার জীবনে কী আছে, যা আমি বর্ণনা করব? হ্যাঁ আমার জন্মের একটা ঘটনা আছে। সেটি স্মরণ হলো, যা আমি বড়দের থেকে শ্রবণ করেছি। আমার পিতা মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আহামদ সাহেব রহ.-এর প্রথম স্ত্রীর কোন সন্তান ছিল না, যার বিবাহ স্বয়ং হযরত নানুতুাবী রহ. করিয়েছিলেন। বুযুর্গরা সবাই চাইতেন, বিশেষ করে হযরত শায়খুল হিন্দু রহ. চাইতেন হযরত নানুতুবী রহ.-এর বংশ জারি থাকুক। তাই দ্বিতীয় বিবাহ করান দেওবন্দে। সেই সংসারে আমার পূর্বে আরো তিনজন পুত্রসন্তান হয়। তারা সবাই অপুষ্ট হয়ে জন্মগ্রহণ করায় সাথে সাথে মারা যায়। হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর অস্থিরতা ছিল, যেন কোন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে বেঁচে থাকে।

তখন ফতেহপুরে একজন বুযুর্গ ছিলেন। তিনি সন্তান সম্পর্কে মুসতাজাবুদ দাওয়াত হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। হযরত শায়খুল হিন্দু রহ. মাওলানা আবদুস সামিকে সেখানে পাঠালেন দোয়া করানোর জন্য যে, মাওলানা হাফেজ আহমদ সাহেব যেন সন্তানওয়ালা হয়। তিনি সফর করে সেখানে গেলেন এবং বললেন, আমাকে হযরত শায়খুল হিন্দু রহ. পাঠিয়েছেন আর আবেদন হলো, তাঁর যেন সন্তান জন্মে। তিনি বললেন, এখন মধ্য রাত। আগামীকাল সকালে তার উত্তর দিব। হযরত মাওলানা তার বাড়িতে রাত্রি যাপন করেন। সকাল হলে এই বুযুর্গ বললেন, আমি দোয়া করেছি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত মঞ্জুর না হচ্ছে, ততক্ষণ সিজদা হতে উঠিনি। আমাকে অঙ্গীকার দেয়া হয়েছে, হাফেজ সাহেবের ছেলে হবে, যে হাফেজ ও কারী হবে, মৌলভী ও হাজী

হবে।

আমি এ ঘটনা জানতে পেয়েছি সর্বপ্রথম হজ্বে যাওয়ার প্রাক্কালে। আমি হজে যাচ্ছিলাম। তখন সকল ছাত্র, ওস্তাদ স্টেশনে এগিয়ে দিতে গেলেন। আমি যে টাঙ্গায় ছিলাম, সেখানে হযরত আবদুস সামী রহ. ছিলেন। তিনি বললেন, ভাই! আমি আপনাকে একটা ঘটনা শুনাতে চাই। তখন উক্ত ঘটনা শুনিয়ে বললেন, যখন আপনি হাফেজ হলেন, তখন বললাম আলহামদুলিল্লাহ! একটা অংশ কবুল হলো। তারপর যখন কিরাত তাকমিল করলেন, তখন বললাম, দ্বিতীয় অংশ কবুল হয়েছে। আর যখন ফারেগ হলেন, তখন বললাম, আলহামদুলিল্লাহ আরেকটি অংশ কবুল হয়েছে। আজ আপনি হজে যাচ্ছেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর শুকরিয়া, এখন চতুর্থ অংশটিও কবুল হতে যাচ্ছে।

আগে বেড়ে হযরত কারী সাহেব রহ. বললেন, আমার জন্মের পর কানে আযান দেয়ার জন্য হযরত হাজী মুহাম্মদ আবেদ সাহেব রহ.কে ডাকা হলো, যিনি আকাবির ও মাশায়েখে দেওবন্দের একজন। তিনি আমার জীবনের ৮-৯ বছর পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। তার দেহের গঠন আমার স্মরণ আছে। আমি তার কাছে হাজির হতাম। তিনিই আমার কানে আযান দিয়েছেন। হযরত হাফেজ মুহাম্মদ জামিন শহিদ সাহেবের সাহেবজাদা হযরত হাফেজ মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবও বড় বুযুর্গ ছিলেন। তিনি দেওবন্দে আগমন করেন। তখন আমার বয়স এক মাস দেড় মাস হবে। তখন আমার সম্মানিত দাদি সাহেবা আমাকে তাঁর নিকট পাঠালেন দোয়া করার জন্য। তিনি আমাকে কোলে নিয়ে বলেছিলেন, তাকে আমি নিয়ে নিয়েছি; তার জন্য কী দোয়া করব। তাকে কবুল করা হয়েছে। তাঁর কথার কি উদ্দেশ্য ছিল তা আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। তবে প্রকাশ্যভাবে এতটুকু হয়েছে যে, আমি বিবাহ করেছি রামপুরে তাঁর পরিবারে। তার স্নেহাশীষা আমার ঘরে এসেছেন। হতে পারে তার কথা উদ্দেশ্য এটি হবে থাকবে তা অন্যকিছুও হতে পারে।

## হযরত হাকীমুল ইসলামের বিসমিল্লাহ

তারপর আমাকে যখন আলিফ-বা-তা পড়ানোর জন্য বসানো হলো, তখন দারুল উলুমে বড় মজলিস কায়েম করা হলো। অনেক দূর-দূরান্ত হতে মেহমান এলেন। সেই মজলিসে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর পিতা হযরত মাওলানা যুলফিকার আলী রহ. বিসমিল্লাহ করালেন। হযরত শিব্বির আহমাদ

উসমানি রহ.-এর পিতা মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেব রহ. একটা কাসিদা পাঠ করেছিলেন। তিনি একজন বড় মাপের কবি ছিলেন।

## অতি আদর-সোহাগ

সুতরাং আমার জীবনে ঐ সমস্ত আকাবিরদের সোহবাত তো পেয়েছিই। উপরন্তু আমার জীবন অতিবাহিত হয়েছে শাহজাদার ন্যায় আদর ও সোহাগে। হযরত নানুতুবী রহ.-এর নাম ব্যবহারকারী বড় বড় আকাবির, হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.সহ অন্যান্যরা সবাই আমাকে শাহজাদার মতো আদর-সোহাগ করতেন। এখনও যারা আমাকে আদর-আপ্যায়ন ও সম্মান করেন তা আমার যোগ্যতার কারণে নয়। বরং সবটুকুই ঐ সকল বুযুর্গদের নেসবতের কারণে।

## মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ

হযরতের আলোচনা চলছিল। তখন মজলিসের এক সাথী হযরত কারী সাইদুর রহমান রাওয়ালপিন্ডি সাহেব একটা তিক্ত আলোচ্য বিষয় পেশ করেন যে, মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ। এটি এমন একটি বিষয়, যার আলোচনা-পর্যালোচনা অনেক দিন যাবত হচ্ছে। কিন্তু রোগের চিকিৎসা শুধু দুর্লভ এবং দামি দামি কিতাব পড়ার দ্বারাই কাবু হয়ে যেত যদি রোগ নিবারণের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হতো। আজ মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ সম্পর্কে অনেক বড় বড় কিতাব লেখা হয়েছে। মুসলমানদের কোন গুরুত্বপূর্ণ দীন ও সামাজিক অনুষ্ঠান ও মাহফিল এমন যায়নি, যেখানে খুব জোরেশোরে মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ বয়ান করা হয় না। মসজিদের মিম্বর, মাঠে ময়দানে, কিতাবের পাতায় রচনা ও প্রবন্ধে এক কথায় সকল স্থানে সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদের জাগ্রত করার আলোচনা হচ্ছে এবং অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ফিকির করা হচ্ছে। কিন্তু এতো কিছুর পরও মুসলমানদের মন্থরগতি এবং নিষ্কর্মতার শূন্যতা অপূর্ণই রয়ে যাচ্ছে। যখন বাইতুল মুকাদ্দাস ভাঙ্গনের ভয়ানক ঘটনা এবং ছোট ধরনের কেয়ামত আমাদেরকে অলসতার নিদ্রা থেকে জাগাতে পারেনি। তাহলে মনে একমাত্র ইসরাফিল আ.-এর সিঙ্গায় আমাদের জাগ্রত করতে পারে। হায়! ঐ জাগ্রত হওয়া তো আফসোস ও অপমান প্রাপ্তি ছাড়া কিছুই হবে না।

এমন কল্পনা মনে হয় হযরত কারী সাহেব রহ.-এর অন্তরে উদয় হয়েছিল।

তাই উক্ত প্রশ্ন শ্রবণ করার পর মনভাঙ্গা এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজেই আবার সেই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ। তারপর রাজনীতিবিদদের উপর ধারাল অস্ত্র ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, এ ব্যাপারে রাজনীতিবিদিদের রায়ই গ্রহণযোগ্য। একজন মোল্লা-মৌলভীর অভিমত কি গ্রহণযোগ্য হবে? এ রাজনীতি যা মুসলমানদের উন্নতি ও অবনতির আল্লাহরপ্রদত্ত বিধান হতে বেখবর হয়ে শুধু বস্তুবাদের উপর ভরসা করে ইতিহাসের প্রতিটি ঘটনায় মত প্রকাশকে অধিকার মনে করে। হযরতের এ ছোট বাক্যে মূলত রাজনীতিবিদদের একটা বড় আঘাত করা হয়েছে। মুসলমানদের অবনতির কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি তার মূলনীতি ও সামগ্রিকতা বর্ণনা না করে নিজ জীবনের কিছু অভিজ্ঞতার কথা আলোকপাত করেন। একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব এবং দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির কাজ হলো ইলমী ও তাত্ত্বিক বিষয় ব্যতীত ঐ আনুষাঙ্গিক এবং বাস্তবসম্মত দৃষ্টান্ত সামনে রাখেন, যার দ্বারা চিন্তাধারা এবং সামগ্রিকতা ফুটে ওঠে। কিন্তু মানুষের বুঝশক্তি সর্বদা বাস্তবধর্মী ও নমুনা ধাঁচের উদাহরণের দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়।

অবনতির কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি ফালসাফাবিদদের ন্যায় সূক্ষ্ম-তীক্ষ্ণ খুঁটিনাটি বিষয়ের আড়ালে আশ্রয় নেননি এবং দুষ্কর যুক্তিবিদ্যা ও তত্ত্ববিদ্যার নাতিদীর্ঘ শিরোনামও সাজাননি। বরং প্রচলিত জীবনব্যবস্থার এমন একটি কুয়াশাচ্ছন্ন চিন্তাধারা সামনে রাখলেন, যা সকলের বোধগম্য এবং সেগুলোর সাথে আমরা নিজেদের তুলনা করতে পারব যে, মুসলমানদের অবনতির কারণ আমাদের ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে?

আফসোস ওই সকল অনভিজ্ঞ লোকদের উপর, যারা মুসলমানদের অবনতির কারণসমূহের আলোচনা করতে গিয়ে বর্তমান মুসলমানদের অস্বাভাবিক জীবন যাপনের প্রতি তো দৃষ্টি দেয় না বরং তাদের সকল চিন্তা-চেতনা ও গবেষণা ইউরোপিয়ান তাহযীব তামাদ্দুন এবং পাশ্চাত্যের মরা-পচা দার্শনিকদের চারপাশে ঘুর ঘুর করতে থাকে।

হযরত হাকীমুল ইসলাম অবনতির কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মাত্র দু-তিন বছর পূর্বেকার ঘটনা সানওয়াল নামক মিরাটের একজন হিন্দু কমিশনার ছিল। তিনি দারুল উলুম এসে অনেক প্রভাবিত হলেন। এটি সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ শুরু হওয়ার এক মাস পূর্বের কথা। তিনি বললেন, মাওলানা! দেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় এবং ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। আমি বললাম, জি হ্যাঁ, সংবাদ মাধ্যম দ্বারা তো আমি একটি অনুভব করছি। তিনি

বললেন, এ অধঃপতন ও পেরেশানির কি কোন কারণ আছে। আমি বললাম, হ্যাঁ, কারণ তো অবশ্যই আছে। তিনি বললেন, কী কারণ থাকতে পারে? আমি বললাম, একেবারে নিষ্প্রয়োজন। এ কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল এ কথা বোঝানো যে, আমি একজন ধর্মীয়; মানুষ আমি প্রতিটি বিষয়কে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ দ্বারা অনুভব করি। আপনি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি এবং জনপ্রতিনিধি, আপনি প্রতিটি বিষয়কে রাজনীতির চোখে দেখেন। তাই আমার দৃষ্টিভঙ্গি আপনার উপর কী প্রভাব বিস্তার করবে? এ কারণে বললাম, নিষ্প্রয়োজন। সে পীড়াপীড়ি করতে লাগল, কিছু তো বলবেন। আর মানশাও ছিল যে, যদি জোর দিয়ে বলে তাহলে কিছু বলব।

## ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অধঃপতনের কারণ

আমি বললাম, শুনে রাখুন, আমার দৃষ্টিতে দুনিয়ার কোন জাতি-গোষ্ঠী কখনও উন্নতি লাভ করতে পারবে না। সম্পদে কোটিপতি হতে পারবে না এবং জাতির সংখ্যাধিকের উন্নতি লাভ করতে পারবে না যে, তাদের নিকট জনসংখ্যা বেশি হবে। আবার কোন জাতি শুধু রাজনৈতিক তোড়জোড় করেও উন্নতি লাভ করতে পারবে না। দুনিয়ার উন্নতি একমাত্র কীর্তি এবং আখলাক দ্বারাই হতে পারে। আর বর্তমানে আমাদের দেশের মানুষের চারিত্রিক অবনতি সর্বনিম্নে পৌঁছে গেছে। তাই দেশের অবস্থা নাজুক ও ভয়াবহ হবে না তো কী হবে? কমিশনার বলতে লাগল, একেবারে সত্য কথা বলেছেন। কিন্তু এটি একটি উসূল বা মৌলনীতি বললেন, তার উদাহরণ কী? আমি বললাম, উদাহরণ হিসেবে প্রথমে এ কথা বলতে পারি যে, আজ হতে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পূর্বে যখন কোন হিন্দু মহিলা বাইরে বের হতেন, তখন প্রায় এক গজ কাপড়ের নেকাব তার চেহারায় থাকতো এবং লজ্জার কারণে বাইরে প্রয়োজন ছাড়া বেশি বের হতেন না। আর এখন তো কোন ঘোমটা বা নেকাব দিয়ে বের হয় না বরং পোশাক পরে বের হয়ে পড়ে। এমনকি তার চেয়ে আরো এক পা এগিয়ে সেজেগুজে বের হয়ে যায়। অনুভব ও চিন্তা করে দেখুন তো, এমন মহিলার উদর হতে যে সন্তান জন্ম নেবে, তার মধ্যে কী ধরনের শরম, লজ্জা ও আত্মাভিমান থাকবে?

দ্বিতীয় কথা হলো, বর্তমান যুগে রেলপথে ভ্রমণ করা আমার সুযোগ হয়েছে। সেখানে আমি লক্ষ্য করেছি, স্কুল, কলেজের ছাত্ররা যে ডাব্বায় আরোহণ করে সেখানে এতটুকু পার্থক্য করা মুশকিল যে তারা কি মানুষ না অন্যকিছু। তারা

এতটুকু হট্টগোল ও অঙ্গভঙ্গি করে, যা একজন সুস্থ মনের মানুষ করতে পারে না। যদি এ ধরনের মানুষের স্কন্ধে দেশ পরিচালনার ভার পড়ে, তাহলে খারাবি ছাড়া আর কি প্রসার ঘটবে?

তৃতীয় কথা হলো, আমি ট্রেনে সফর করতে গিয়ে দেখতে পেয়েছি, যেখানেই সুগার মিল রয়েছে এবং আখের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, যেখানেই একশত জন পঞ্চাশ জন নেমে, কেউ একশতটি কেউ দুইশতটি কেউ পঞ্চাশটি, কেউবা আঁটি বেঁধে নিয়ে নেয়। তাদের এতটুকু বোধশক্তি নেই এ আখগুলো কি নিজেদের না অন্যের। তাহলে চিন্তা করে দেখুন তো যদি দেশের দায়িত্বভার তাদের কাঁধে দেয়া হয়, তাহলে তারা উল্টাপাল্টা ও অবৈধ শক্তি প্রয়োগ ছাড়া আর কী করবে?

চতুর্থ কথা হলো, ব্যবসায়ী শ্রেণী ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর দেশ নির্ভর করে। এ শ্রেণীর ভিতর বিভিন্ন রকমের অবৈধ আয় রয়েছে ও কেউ ব্লাকমেইল করে, কেউ অধিক মুনাফা করে, কেউ সিন্ডিকেট করে ইত্যাদি। সুতরাং ব্যবসায়ীদের মধ্যে খেয়ানত এসে গেলে দেশ কিভাবে চলবে?

পঞ্চম কথা হলো, প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের দেখা যায় কেউ ঘুষখোর, কেউ পক্ষাবলম্বনকারী, কেউ স্বার্থপর এবং কেউ দলীয়করণ ও আত্মীয়করণে লিপ্ত। এমনটি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। আর ঘুষ তো এমন হয়েছে যে, সেটা পাওনা বা অধিকারের ন্যায়। তাই যখন দেশের সরকারি কর্মচারীরা খেয়ানতপ্রবণ হয়ে যায়, তখন দেশ সুন্দরমতো কিভাবে চলবে? আমি তাকে বললাম, অবস্থা কি এমন? তিনি বললেন একেবারে সত্য কথা। তখন আমি বললাম, গভর্নমেন্টের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হলো প্রথমে দেশের চারিত্রিক অবস্থা শুদ্ধ করবে। আপনি তো সম্পদ এবং বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ে ব্যস্ত থাকেন কিন্তু চরিত্র শুদ্ধকরণের ফিকির কারো নেই।

কমিশনার সাহেব বলতে লাগলেন, চারিত্রিক অবস্থা দুরস্ত করা সম্ভব নয়। আমি বললাম, কেন? তিনি বললেন, হুকুমত সেটি চাইবে না। কেননা, চরিত্র সংশোধন হয় ধর্মীয় শিক্ষা দ্বারা। আর বর্তমান হুকুমত হলো সেক্যুলার বা ধর্মহীনতা। অর্থাৎ সে মধ্যমপন্থা গ্রহণ করবে না।

## দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা

আমি তাকে বললাম, আমার ও আপনার মাঝে চিন্তাধারার ভিন্নতা এখানে হয়ে গেল। আপনার নিকট সেক্যুলার অর্থ ধর্মীহনতা আর আমার নিকট

সেক্যুলার অর্থ হলো সর্বধর্মীয় হুকুমত বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সরকার সকল ধর্মের, তাই সরকারের উপর আবশ্যকীয় হলো প্রত্যেক শ্রেণীকে বাধ্য করবে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনে, যাতে তাদের চরিত্র দুরস্ত হয়। তিনি বললেন, এটি হতে পারে না। আমি বললাম, আপনি নিজেই চাচ্ছেন দেশে চোর-ডাকাত, সন্ত্রাস সৃষ্টি হোক। তিনি বললেন, আপনি যা চান তার উদ্দেশ্য বলে দেন কিন্তু তা হবে না। আমি বললাম, আমি একটি তদবির বলে দিব? তিনি বললেন, কি সেই তদবির? বললাম, দেশটা আমাদের হাতে ছেড়ে দিন, সব অবস্থা সংশোধন করে দিব। এ কথায় তিনি অনেক হাসলেন। সুতরাং দেশ ও জাতির উন্নতি হয় চরিত্র ও কাজের মাধ্যমে। যখন তা শেষ হয়ে যাবে, তখন দেশ ও জাতির অবনতি নেমে আসবে।

লিপিকার বললেন, হযরত! আমাদের অধঃপতনে পশ্চিমাদেরও হাত আছে। উত্তরে হযরত বললেন, এতে ঐ কথা বের হয়ে আসে যে, আমরা তাদের আখলাক গ্রহণ করেছি এবং ইসলামী আখলাক ছেড়ে দিয়েছি। পশ্চিমাদের শিক্ষা বিজয় লাভ করেছে আর দীনি শিক্ষা পরাজিত হয়েছে। দীনদার মানুষ পরাজিত আর বেদীনরা বিজিত। সবকিছুর ভিত্তি একটিই যে, তাদের ধর্মের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কর।

## উচ্চ শ্রেণীর লোকদের সংশোধনের পদ্ধতি

এখন তাদের সংশোধনের কী প্রক্রিয়া হতে পারে? হযরত তার অভিজ্ঞতা এবং ধীশক্তির ভিত্তিতে বললেন, আপনারা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর শুকরিয়া দীনের খেদমত করছেন। আল্লাহর শুকরিয়া যে লাখো কোটি মানুষ যারা এ খেদমতের পরিধিতে এসে যাবে তাদের দীন সঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু উচ্চ স্তরের মানুষ সম্পূর্ণ অন্য সাইজের, ভিন্ন ধরনের। তাদের ব্যাপারে আমার অভিমত হলো, কাউকে কোন কিছুর সম্মুখীন করে ইসলাহ করা যায় না। আপনি চাইলে ইজিটেশন বা হট্টগোল করে বা প্রতিপক্ষ হয়ে ইসলাহ করতে, তাহলে তা কখনও হবে না। তাদের ইসলাহ করার উত্তম পদ্ধতি হলো, স্বয়ংসম্পূর্ণতার পদ্ধতিতে তাদের দিলে কিছু প্রভাব বিস্তার করা। এতে নিজের কোন কিছু পাওয়ার চাই চাকরি হোক বা সম্পদ হোক, উদ্দেশ্য না থাকা। বরং তাদের মনে এমন বিশ্বাস জন্মাতে হবে যে, ক্ষমতা আপনাদের হাতেই থাকবে। আমরা আপনাদের সাহায্য করব। আমরা ক্ষমতা চাই না। কিন্তু এতটুকু করব, যা করা দেশ ও জাতি উভয়ের উপকার হবে। আর যদি

না করি তাহলে দেশ ও জাতি এবং আপনাদের ক্ষমতা সবই ভয়ে থাকবে। এমন আন্দাযে তাদের ভিতর কাজ করতে হবে। রাজনৈতিক ব্যক্তিরা রাজনৈতিকভাবে আর ধর্মীয় ব্যক্তিরা ধর্মীয় আন্দাযে ইসলাহের কাজ করে যাবে। যতক্ষণ না বিশেষ ব্যক্তিদের ফিরানো হবে, ততক্ষণ কাজ হবে না।

এখন সর্বসাধারণের প্রতি নজর দেয়া যাক। আর তাদের ব্যাপারে আজিটেইশনের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হোক, যার উদ্দেশ্য হলো হুকুমত উত্তেজিত হয়ে যাক, তারপর হুকুমত বিরক্ত হয়ে আক্রমণ করুক। তখন অবস্থা এমন হবে যে, তারা আপনাকে শুধু অস্বীকারই করবে না বরং উৎখাত করার চেষ্টা করবে। সুতরাং ইসলাহের কাজের জন্য কিছু মানুষ নিজের জীবনকে ওয়াকফ করে দিবে এবং উচ্চ শ্রেণী লোকদের নিকট আস্থা হাসিল করবে। তারপর তাদের কর্ণকুহুরে এ কথা শুনিয়ে দিবে সুন্দর বাচনভঙ্গিতে যে, অমুক অমুক কথা আপনার স্বার্থের বিপরীত।

## হুকুমত থেকে কাজ নেওয়ার পদ্ধতি

হযরত! পাকিস্তান সরকারের জন্য কি কোন বিশেষ পয়গাম আছে? তাদের ব্যাপারে আমার পয়গাম দেয়ার কোন অধিকার নেই। আমি ভিনদেশী মানুষ কি পয়গাম দিব। কিন্তু এটি তো আমি সকলবেলার বৈঠকে বিস্তারিতভাবে বলেছি যে, কিছু চিন্তাশীল আলেম, যারা প্রভাবশালী, দেশে যাদের প্রভাব রয়েছে, তারা স্মরণীয় বা ডায়েরি আকারে কিছু বুনিয়াদী বিষয়ে হুকুমতের নিকট পেশ করবে। তাতে এ কথা প্রকাশ করবে যে, আমরা আপনার হুকুমতকে নিজের হুকুমত মনে করি। আমরা পুরোপুরি সাহায্য করব এবং সাহায্য-সহযোগিতা করব ও শক্তি যোগাব। তবে এতটুকু যে, আপনি দীনের জন্য এবং দেশ ও জাতির জন্য এই এই কাজ করবেন। যদি এটি না হয়, তাহলে দেশ ও জাতির অকল্যাণ হবে। তারা খারাপ হয়ে যাবে আর আপনার হুকুমতের ভিত্তিও তার উপর।

ঐ ডায়েরি এবং সাক্ষাতে শাখা-প্রশাখার মাসয়ালা প্রকাশ করা যাবে না। বরং উসূলে এবং সমষ্টিগত রঙে বলা হবে, যাতে তারা কিছুটা মানুষ হয়, মানার মাদ্দা তৈরি হয়। তারপর আস্তে আস্তে শাখাগত মাসয়ালা যেমন সুদ, ঘুষ ইত্যাদি মাসয়ালাগুলো কানে দিতে হবে। কিন্তু প্রথমে ক্ষমতার অধিকারীদের যেহেনকে মৌলনীতিতে নিয়ে আসতে হবে। প্রকৃতপক্ষে আমি যদি এ দেশের বাসিন্দা হতাম এবং রাজদরবারে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ হতো, তাহলে

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে বলতাম, আমাকে আপনার খাদেম এবং হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করবেন। কিন্তু মাত্র দুটি কথা– ১. আপনি কুরআনের তালিম এবং দীনি ইলমকে ব্যাপক করুন আর এ কাজ সনদওয়ালা আলেম দ্বারা করান। এমন আলেমকে আলেম মনে করবেন, যারা ইলমের জুব্বা পরিধান করে আসে। যাদের ইলম শুধু পত্রপত্রিকা পড়ে বা একাকি অধ্যয়ন করে অর্জন করেছে, তাদের কাছে কোন সনদ নেই, নেই কোন ওস্তাদ। আবার বুযুর্গদের দরবারে থেকেও ইলম হাসিল করেনি এমন আলেমদের নির্বাচন করে তাদের থেকে পরামর্শ নিবেন না। প্রত্যেক দাবিদার আলেমকে আলেম মনে করবেন না বরং তাকে যাচাইবাছাই করে কাজ নিবেন।

কোন ডাক্তারের বেলায় তো এমন করা হয় না যে, একজন অসুস্থ ব্যক্তি যে কোন ব্যক্তির নিকট যেয়ে হাত দিয়ে দিবে এবং শিরা দেখাবে। বরং প্রথমে সে তালাশ করে যে ডাক্তার কোন্ কলেজের পড়ুয়া? তার লিস্ট ও সনদ দেখে, তার নিকট আগমনকারী রোগীদের প্রতি লক্ষ করে যে অধিকাংশ ভালো হবে ফিরে আসবে কি-না আপনি জান বাঁচানোর জন্য নির্বাচন করেন, তাহলে ঈমান বাঁচানোর জন্য কি জরুরি নয় যে, নেক্কার আধ্যাত্মিক ডাক্তার খালেস আলেমকে নির্বাচন করা।

আর দ্বিতীয় কথাটি তার কাছে আরয করতাম যে, আপনি আমরে বিল মারুফকে চালু করবেন না, তবে নাহি আনিল মুনকারকে তো বন্ধ করতে পারবেন। মুনকারাত বস্তু দ্বারা চরিত্র খারাপ হয়। সুতরাং আগের কাজ হলো ক্ষতিকর বস্তু দূর করা আর উপকার হাসিল করা হলো পরের কাজ। আর ক্ষতিকর বস্তু পরিহার করার ক্ষেত্রে অন্ততপক্ষে যেগুলো আকল দ্বারা অনুভব করা যায় সেগুলো নিঃশেষ করা দরকার এবং দুনিয়াবাসী যেগুলো খারাপ মনে করে সেগুলো নিঃশেষ করা দরকার। তারপর শরয়ীভাবে নিষেধকৃতগুলো রহিত করবে। তারপর এগুলো থেকে ফারেগ হওয়ার পর আমরে বিল মারুফগুলোকে বাস্তবায়ন করা। আর তা না হলে কম করে হলেও নিষিদ্ধ কাজগুলোকে খতম করা। আর এগুলো আস্তে আস্তে করেন। কেননা আপনার অপারগতা রয়েছে। আপনার সম্পর্ক এবং রাজনৈতিক রীতিনীতি ঐ জনগোষ্ঠীর সাথে, যাদের মাঝে শরয়ী নিষিদ্ধগুলো তাদের তাহযীব-তামাদ্দুনের অংশ। তাই আপনি যদি পূর্ণ সফল না হতে পারেন, তাহলে অন্ততপক্ষে মুনকারাতের রাস্তা বন্ধ করুন। আপনার নিকট আরেকটি আবেদন হলো– খুলাফায়ে রাশেদীন বা ন্যায় বিচারক বাদশার অনুসরণ করুন। অন্যথায় সাধারণত এমন রাজত্ব হবে, যারা নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার

ফিকিরে থাকে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে, বাদশাহর কোন আল্লাহওয়ালা আলেম থাকলে সেই বাদশাহর হুকুমাত অত্যন্ত উঁচুমানের হতো। অথচ সেই আলেম পদধারী সরকারি কর্মকর্তা হতেন না। বাদশাহ হারুনুর রশিদের সাথে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ছিলেন। বাদশাহ আলমগীর উলামাদের পরামর্শ নিতেন। মাওলানা শিব্বির আহমাদ উসমানি রহ. সম্পর্কে মরহুম নওয়াব লিয়াকত আলী খান সাহেব আমাকে বলেছেন, যখন আমরা কোন মাসয়ালা নিয়ে বিপাকে পড়তাম, তখন হযরত মাওলানা উসমানি রহ.-এর নিকট থেকে সমাধান নিতাম।

তাই আপনি যখন ইসলামের নামে দেশ পরিচালনা করছেন আর দেশটাও ইসলামের, তাহলে ইসলাম বহনকারীদের থেকে দৃষ্টি ফিরাবেন কিভাবে। আর যেহেতু পা বাড়িয়েছেন, তাহলে কমপক্ষে দু-চার জন্য আলেমের কথা শুনুন। তাদেরকে আপনার বাসা-বাড়ি দেয়া লাগবে না, বেতন দেয়া লাগবে না। তারা আপনা নিকট কিছু আবদারও করবে না।

## প্রশাসন ও দীনদারদের মাঝে দুরত্ব দূর করার প্রস্তাব

হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. ইসলাহী অবস্থার বিষয়বস্তু ঠিক করার জন্য নিজের অভিজ্ঞতা এবং ঈমানী বিচক্ষণতার আলোকে আলোচনা করছিলেন। আর আমি ভাবছিলাম, বর্তমান সময়ের ইসলামী নেতৃত্ব মুস্তফা কামালের পদাঙ্ক অনুসরণে ইসলামকে ধ্বংস করে এবং যুগের চাহিদা অনুযায়ী ঐকমত্য না হওয়ার বিশ্বাস-চেতনা দিল ও মেধায় পোক্ত করে নেয়। আর ধর্মের ভাষ্যকারীর জন্য যোগ্যতাও অধিকারকে ইজারাদারী ভাবতে থাকে। আর যখন অধিকাংশ জনগণ নিজ রায় ও অভিমতের প্রতি আত্মম্ভরিতার লিপ্ত থাকে। তারপর যখন তোষামুদে, স্বার্থপর এবং দরবারি ও লোভী প্রকৃতির আলেমরা সরকারের সাথে সম্পর্ককে ভাড়াটিয়ার দৃষ্টিতে দীন বিক্রয়ের অর্থে গ্রহণ করে আর নিরেট ইসলাহী সংশোধনমূলক চেষ্টা প্রচেষ্টাগুলোতেও রাজনীতির রং ছড়ানো হয়, তাহলে দীনি নেতৃত্ব সরকার ও দীনদারদের মাঝে দূরত্ব দূর করে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করার জন্য হযরত কারী সাহেব রহ.-এর হিতকামনামূলক প্রস্তাবনাবলি কতটুকু উপকারী হতে পারে? এ পথের দুষ্কর বিষয়গুলোকে এক বিশেষ ভঙ্গিতে তুলে ধরে আমি আবেদন করলাম, হযরত! যখন সরকারি হর্তাকর্তা বুঝে নিয়েছে যে, ইসলাম বর্তমান আধুনিক যুগের সাথে চলতে পারবে না, তাহলে তাদের ইসলাম বহনকারী আলেমদের গুরুত্ব

এবং প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া কখন সম্ভব? হযরত বললেন, তাদের ভুল ধারণা দূর করার প্রয়োজন যে, ইসলাম বর্তমান যুগের উন্নতির অন্তরায় নয়। বরং তাদের অন্তরে ঢেলে দিতে হবে যে, যুগের যে কোন বস্তু যা বাস্তবে সঠিক ও কার্যকরী, ইসলাম সেগুলোর বিরোধী নয়। কিন্তু ঐ নিষিদ্ধ বস্তু যেগুলো দুনিয়ার প্রতিটি জাতি-গোষ্ঠীর নিকট যুক্তিগত নিষিদ্ধ ও ঘৃণিত, যেমন যিনা-ব্যাভিচার মদ-জোয়া, সুদ-ঘুষ প্রকৃতির জিনিস, যেগুলো মন্দতা ও খারাবী যুক্তিসিদ্ধ অনুভব করার মতো, সে সকল বস্তুকে উন্নতির মাপকাঠি বানিয়ে সেগুলোকে ইসলামের সাথে জড়িত করা বা শামিল করা যাবে না। তবে সে সকল বস্তু মুনকার নয় এবং চরিত্র ও লেনদেন এবং চালচলনে বিরূপ প্রভাব পড়ে না, ইসলাম কোন দিন, কখনও সেগুলোর বিরোধিতা করে না। ইসলাম সর্বদা রাজনীতি ও দেশীয় বিষয়ক কাজে উদারতা দেখিয়ে আসছে। আর ইজতেহাদী বিষয়ে, ইসলাম অনেক সুযোগ-সুবিধা রেখেছে, সেগুলোর ভালো-মন্দ যাচাইবাছাই করার জন্য এমন ব্যক্তিদের পরামর্শক বানিয়েছে, যারা ফিকাহ ও শরয়ী জ্ঞানে বুৎপত্তি রাখেন।

তারপর কারী সাহেব রহ. বললেন, অবস্থা সংশোধন করা উদ্দেশ। কারণ, অবস্থা সংশোধন হলে ইখলাস ও আবেগ এমন হিতাকাঙ্ক্ষী পথ অবলম্বন করে যা একজন অপরজনের সাথে দূরত্ব দূর করে নিকটতর করে দেয়।

## গঠনমূলক প্রক্রিয়ায় ইসলাহ বা সংশোধন

রাত বেড়ে চলছে। সময় দ্রুততার সাথে দিল ও মেধায় নিজের সুন্দর চিত্র চিত্রিত করে অতিবাহিত হচ্ছে। এমন নকশা বা চিত্র যা বৈঠকে পরিচালিত টেপ রেকর্ডারের ফিতায় কম্পন এবং আওয়াজ থেকে বেশি মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী ছিল। সময় আপন স্থানে এমন একটি মেশিনতুল্য, যা এমন এক আমলনামার পাতায় সকল কিছু সংরক্ষণ করছে। যার গভীরতায় এবং গুপ্ততায় কেয়ামত ও কেয়ামতের কম্পনের ন্যায় ধ্বংসলীলা সৃষ্টিকারী প্রভাব ও প্রভাবিত করতে পারে না আর তা যখন কার্যকরীরূপে, স্বঅবয়বে প্রকাশ পাবে, তখন সবাই সমস্বরে বলে উঠবে–

مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰىهَا

এটি কেমন আমলনামা যে ছোট-বড় কোন কিছুই ছাড়েনি,
সবই সংরক্ষণ করেছে।

এমন সংশ্রব তো বারবার ভাগ্যে জুটবে না। আবার হযরতেক বেশি কষ্ট দেয়াও দিল ও মন চাচ্ছিল না। কিন্তু মনের অজান্তে, ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও মন চাচ্ছিল যে, এমন বরকতপূর্ণ বৈঠকে মাসিক আল হক এবং দারুল উলুম হাক্কানিয়ার কিছু আলোচনা যুক্ত হোক। তাই আমি জিজ্ঞেস করে বসলাম, হযরত! মাসিক আল হক পত্রিকার জন্য কেমন কর্মপদ্ধতি পছন্দনীয়? তিনি বললেন, ঐ পলিসি যা আমি পূর্বে পেশ করেছি। সমতার দ্বারা কাজ হবে, অসমতা দ্বারা নয়। গঠনমূলক সংশোধনের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে আপনার বিরোধীদের মাঝে প্রভাব সৃষ্টি করতে হবে, সমতার ভিত্তিতে হতে হবে। অন্যথায় ফল হবে না।

হযরত! যখন নাস্তিকতা এবং দীনহীনতা প্রবল আকার ধারণ করেছে, তখন অনুকূলতা কিভাবে সম্ভব? কিছুটা চিন্তা করার পর বললেন, তারই সংশোধনের জন্যই একতা জরুরি। আর এই একতা-সমতা নাস্তিকতা ও দীনহীনতার দ্বারা হবে না। তাদের সাথে ঐক্য হবে, যাঁতে ঐ ব্যক্তিদের নাস্তিকতা থেকে দূরে সরানো যায়। হযরত কিছু মানুষের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছে, ইসলাহের চেষ্টা ফলদায়ক মনে হয় না? হযরত কারী সাহেব রহ. বললেন, কাজের জন্য প্রথমত শর্ত হলো নিরাশ হওয়া যাবে না। আপনারা হলেন ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া নবীদের ইলমের অংশীদার। নবীরা আ. কখনও নিরাশ হতেন না। যখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমি এ জাতিকে শাস্তি দিতে চাই, যখন হযরত নূহ আ. বদ দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! কোন কাফেরকে জীবিত রেখ না। যখন তিনি সাড়ে নয়শত বছর দাওয়াত দিলেন। তো তা নিরাশের কারণ নয়। অন্যান্য ইসলামী শহর বা দেশগুলো নাস্তিকতা পাশ্চাত্যতা এবং দীনহীনতার পরিধিতে পৌঁছে গেছে এবং সেগুলো গ্রহণ করে ফেলেছে। এহেন অবস্থায় দীনদারদের অন্তর ভেঙ্গে চুরমার হবে না?

হযরত রহ. উত্তর দিলেন, উক্ত বিষয়গুলোকে দেশ ও জাতির সামনে দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করা দরকার যে, আজ ইসলামীক শহর ও দেশ শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ধ্বংস হচ্ছে। এ কারণেই তারা ইসলামী ভ্রাতৃত্ব এবং মুসলমানদের সাধারণ এ কথাকে গুডবাই বলে দিয়েছে আর দেশাত্মবোধ অগ্রে রেখেছে। ইসলামীয়াতকে পিছনে রেখেছে। এতগুলো দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও যদি আপনাদের চেতনা না জাগে তাহলে ধ্বংসের হাত থেকে কিভাবে বাঁচবেন?

## রাসূলুল্লাহর ওয়ারিশ

হযরত! দেশ ও জাতির সংশোধনের দায়িত্ব তো সম্মানিত ব্যক্তি এবং উলুল আযম স্থিরপ্রতিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপর। আমাদের মতো সর্বসাধারণের জন্য কিছু বলেন, তিনি বললেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ারিশ রেখে গেছেন কিতাবুল্লাহর এবং সুন্নাতে রাসূলুল্লাহর। আপনারা যতক্ষণ সেগুলো আকড়ে ধরবেন ততক্ষণ কখনও পথভ্রষ্ট হবে না।

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

তোমাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি। আমার পরে কখনও পথহারা হবে না যদি সে দুটি বস্তু দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর।

## দারুল উলুমের উন্নতি

হযরত! মাদরাসায়ে দারুল উলুম হাক্কানিয়া সম্পর্কে কোন উপদেশ? বললেন, আপনাদের মত (মানুষ) ব্যক্তিত্ব যা গ্রহণ করেছেন। আল্লাহর শুকর মাদরাসা ভালো চলছে, দিন দিন উন্নতি হচ্ছে। মাওলানার মতো ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান আছেন। সর্বদা কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন হচ্ছে। এর চেয়ে বেশি আর কি আধ্যাত্মিকতা এবং বাতেনিয়্যাত হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা মাদরাসায় এমন বুযুর্গ এবং আসাতিজা দান করেছেন, যারা সবাই দীনের বডিতুল্য।

হযরত! ইলমের মূল কেন্দ্র দারুল উলুম দেওবন্দের উন্নতির ধরন কেমন এবং তার বার্ষিক বাজেট কত?

তিনি বললেন, ইনকিলাব (বিপ্লব) এর সময় সোয়া লাখ ছিল। এখন সাড়ে দশ লাখ। ইনকিলাব পরবর্তী সময়ে কিছুটা পেরেশানি ও চিন্তা ছিল যে, মাদরাসা কিভাবে চলবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা দিন দিন বাড়িয়ে দিলেন। আর তার শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রথমে আটটি শাখা ছিল, এখন ২৪টি শাখা বা বিভাগ রয়েছে। তেমনিভাবে প্রথমে ওস্তাদ সংখ্যা ছিল ৩৮ জন আর এখন প্রায় ৭০ জন। এমনিভাবে বিল্ডিংও দ্বিগুণ-তিনগুণ হয়ে গেল। আল্লাহর অনুগ্রহে এখন ছাত্রসংখ্যা দেড় হাজারের মতো।

সর্বশেষ প্রশ্ন ছিল– হযরত! নতুন বংশধর দ্বারা ভবিষ্যতে দারুল উলুম দেওবন্দের জন্য কি আশা-ভরসা আছে?

তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হতে নেই। কিন্তু এতে কোন

সন্দেহ নেই যে, এ যুগে সবচেয়ে দুর্ভিক্ষ হলো ব্যক্তিত্বের। তবে আমাদের প্রবল আশা যে, আকাবিরদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা ব্যক্তি নতুন জেনারেশনের মধ্যেও আছে। চাই হাতেগোনা গুটিকয়েক হোক, কিন্তু এখনও এমন মানুষ পাওয়া যায়।

কথাবার্তার মাঝখানে বর্তমানকালের রাজনীতির ব্যাপারে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, আমার অভিজ্ঞতা হলো, এই বর্তমান যুগের রাজনীতি এবং দীনের মধ্যে বৈরিতা বিদ্যমান। এর রাজনীতি এবং ডিপ্লোমেসি (রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড) এর ভিত্তি হলো নিফাক, প্রতারণা ও পেটপূজা। এতে দীন থাকতে পারে না। শুধু ইসলামী রাজনীতিই দীনের নীতিতে চলে। দীনি রাজনীতি হলো ইসলাম ধর্মের মূল ধাতুতুল্য।

আর সমকালীন রাজনীতি আর ইসলামের মাঝে একেবারে বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক। ইসলামে যেগুলো হারাম সেগুলো তাতে আবশ্যকীয়। এহেন রাজনীতিতে যেগুলো প্রশংসিত, ইসলামে সেগুলো নিন্দিত। এমনটি শুধু আমার দাবি বা কথা নয়। হযরত মাওলানা আসগর হুসাইন রহ.ও এমন বাক্য ইরশাদ করেছেন– 'মৌলভী সাহেব! আজকের সময়ের রাজনীতি ও দীনদারীর মাঝে বৈরিতা ভাব।'

রাত একটা বেজে গিয়েছিল, তাই অনিচ্ছাকৃতভাবে আমোদ-প্রমোদপূর্ণ বৈঠক থেকে বিছানায় শুতে হলো।

## নবম খণ্ড সমাপ্ত